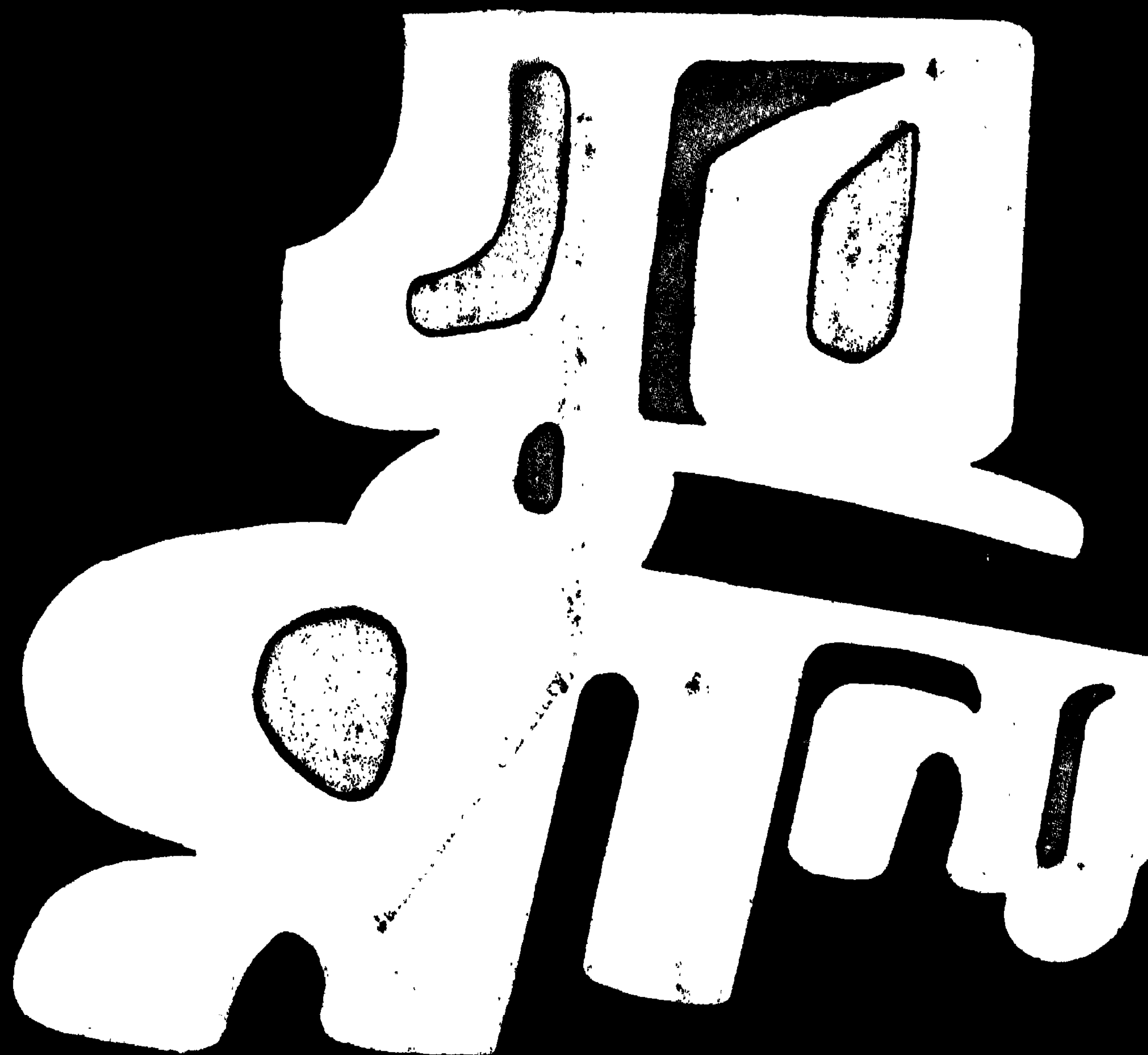






পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ/গৌতম ঘোষ দস্তিদার

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঞ্চাশ পয়সা

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩শ থেকে ২৯শ তারিখ—এই সাতটা দিন উত্তরবাঙলার শিলিগুড়ি শহরে 'রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব-'৮০' হয়ে গেল। শুধু যুব-ছাত্র উৎসব বললে বোধহয় সবটা বলা হ'ল না বরং বলি—পশ্চিমবাঙলার হিমালয় থেকে সুন্দরবন অবধি নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণ আর সম্প্রদায়ের মিলন মেলা, প্রাণে প্রাণ মেলাবার এক মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন পশ্চিমবাঙলার বর্তমান সরকার। উৎসব অনুষ্ঠানের গতানুগতিক গান-বাজনা এবং আর পাঁচটা আইটেমের মদির আবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে সুর এখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার তাৎপর্য উপলব্ধির অনেক গভীরে গেঁথে গেছে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের অ-সংগঠিত চেহারার পাশে পশ্চিমবাঙলার যুব-ছাত্র উৎসব সংগঠিত যুব-মানসের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাস্বর উদাহরণ নিঃসন্দেহে। বেল্‌চি-পরশ-বিঘা-পিপরার পৈশাচিক উন্মত্ততার পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের প্রাণচাঞ্চল্য কিংবা দার্জিলিং শহরে নেপালী ভাষা-ভাষীদের মুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা শিলিগুড়ি শহরের মূল অনুষ্ঠানে অসমীয়া শিল্পীদের প্রতি পশ্চিমবাঙলার মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা এসব-কিছুই প্রমাণ করেছে সুস্থ-সংগঠিত-স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং গণচেতনার সঠিক মূল্যায়নের দূরদৃষ্টিতে পশ্চিমবাঙলার মানুষ পরস্পরকে ঐক্যের উদাত্ত মঞ্চে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আদর্শ হিসাবে খাড়া করতে পেরেছে। পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অনেকবার বলেছেন, 'আমরাও দেশকে ভালবাসি, আমরাও ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাস করি'—এসব কথার কথা নয়, এ যে বাঙলার মানুষের সত্যিকার আঁতের কথা তা এই উৎসব নিন্দুকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একই মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ অথচ চিন্তায় চেতনায় সাঁওতালী-নেপালী-বাঙালী—সবাই মিলে মিশে একাকার! এই তো ঐক্য, একেই বলে সমন্বয়। সমস্ত বিভেদের কালিমাকে ধুয়ে ফেলার এই তো প্রকৃত ঘাট।

উৎসবের ক'টা দিন সমগ্র শিলিগুড়ি শহর যেন মেতে উঠেছিল। বসন্তের প্রকৃতির রঙে রঙ মিলিয়ে দলে দলে মানুষ চলেছে এক মঞ্চ থেকে আর এক মঞ্চে। শিশু-যুবা-বৃদ্ধা সবাই। দর্শকদের আগ্রহ যেমন বিখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠানে তেমনি তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অথবা নেপালী সংস্কৃতির কিছু উপকরণ। অসমীয়া যুবক-যুবতীদের অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের প্রাণের টান এত গভীর যে দর্শকদের অনুরোধে বার বার তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হয়েছে। তাঁদের বিদায় মুহূর্তের অশ্রুঘন মুখগুলি ভুলবার নয়। সেমিনার, বিতর্ক অথবা প্রদর্শনীর মত সিরিয়াস বিষয়গুলিতেও মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তাঁরা জানতে চেয়েছে। বুঝেছে। শিক্ষা নিয়েছে অনেক।

পাঁচটা মঞ্চে একযোগে অনুষ্ঠান চলেছে। বিশাল তার ব্যাপ্তি কিন্তু শৃঙ্খলা ছিল এদের অঙ্গের ভূষণ। শৃঙ্খলা ছাড়া কোন দিন কোন বড় কাজ কি কোথাও হয়েছে! কর্তৃপক্ষ এবং প্রস্তুতি কমিটি অসীম ধৈর্য্য আর আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক আর সাধারণ মানুষের বোঝাপড়ায় তা আরও সহজ হয়েছে, সাবলীল হয়েছে। এতসবের মধ্যেও খুঁত হয়ত অনেক ছিল, খুঁজলে ভুল যে পাওয়া যেত না এমন নয় কিন্তু সবকিছুকে ঢেকে দিতে ভাল কিছু করব এই সদিচ্ছা জয় করেছে জনগণকে। তাই তো সাধারণ মানুষ উৎসবকে নিজের করে নিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে প্রতিনিয়ত। রাজ্য সরকারের এও একটা বড় পাওনা বৈকি!

সংস্কৃতি বিনিময়ের এই তীর্থক্ষেত্র ক'টা দিন যে মুক্তির উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠেছে, যে কোলাহলের ঢেউ তুলেছে যুব মনে তাকে লালন করে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা ভারতবর্ষের বুকে, যেন সাম্রাজ্যবাদের চূড়াকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তা মুক্তির নীলিমায় একাকার হ'তে পারে। সার্থক হয় বিশ্ব যুব উৎসবের আহ্বান। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে শিলিগুড়ি শহরের গলিতে-বস্তিতে-রাজপথে যে সুর শুনেছি তাতে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি—যুব-ছাত্র উৎসব তুমি ফিরে এস। আবার। বার বার।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

পত্রিকার নাম	—	যুবমানস
প্রকাশের সময় ব্যবধান	—	মাসিক
মুদ্রক		দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯
প্রকাশক		শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় যুগ্ম-আধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার ৩২/১, বিবাদি বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—		শ্রী কান্তি বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী যুবকল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র (ছাড়পত্র) বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
সত্ত্বাধিকারী		পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমি, শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, ঘোষণা করছি, উপরে দেওয়া তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ

শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

১. ৪. ৮০

আমরা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি

গত ২০শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য ১৯৮০-৮১ সালের ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি পেশ করেন। দাবির উপর বিভিন্ন দলের সদস্যরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। বিতর্কের শেষে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যোতি বসু জবাবী ভাষণ দেন। ঐ ভাষণকে সম্পাদনা করে ছাপান হল।

—সম্পাদকমণ্ডলী যুবমানস

বিধানসভায় বিরোধী দলগুলি এখানে অনেক বক্তৃতা দিলেন। বললেন, পুলিস বাজেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা বলে বক্তৃতা দিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেস বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। পুলিস বাজেট সম্পর্কে আমরা কি বলি, অন্যরা কি বলেন, তা শোনবার দরকার নেই, বোঝবার দরকার নেই ওঁদের। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার দায়িত্বজ্ঞানহীন ইন্দিরা কংগ্রেস। ওঁরা গণ্ডগোল করছেন। পরিকল্পিতভাবে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত করার জন্য। সারা ভারতের মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চেহারা দেখুন, বুঝুন ওদের আসল উদ্দেশ্য—এটাই আমরা চাই।

আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারে আছি। এই বাস্তব কথা আমরা সর্বত্র বলছি। এই বিধানসভায়ও বারবার বলেছি। কারণ, কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ভুলে যেতে পারেন। সে জন্য একথা বার-বার বলার প্রয়োজন আছে। একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা একথা বলছি। আমরা দিল্লির ক্ষমতায় নেই। পশ্চিমবাংলায় আছি। সংবিধানের যে অবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অন্যান্য সাধারণ যে অবস্থা আছে তা আমরা দেশের মানুষকে মনে করিয়ে দিতে চাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটা আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছি। বলছি, আমাদের দেশে ৩২ বছর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে। এই ব্যবস্থায় একটা রাজ্য সরকারে থেকে আমরা সব কিছুতে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারি না। সব কিছু পরিবর্তন করে দেব—এমন কথা আমরা কখনো বলিও নি। বললে, সেটা হতো অসত্য প্রচার। এটা আমরা করতে পারি না।

পুলিসী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ৩২ বছর ধরে পুলিসকে ব্যবহার করা হয়েছে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ রক্ষার কাজে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দুঃখের সঙ্গে একথাও বলতে হচ্ছে, আমাদের দেশের লোকই পুলিসের কাজ করছে, গরিব ঘরের অনেক ছেলে কাজ করছে। মুষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষা, গণতন্ত্রের বিরোধিতা করার কাজে পুলিস ব্যবহার করার জন্য দায়ী তাঁরাই, যাঁরা এতদিন ধরে সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন বিশেষতঃ কেন্দ্রে এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায়। ওই সরকারের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই, মিল নেই। শাসকশ্রেণী তাঁদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য সেইভাবে পুলিস ব্যবহার করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? কিছু নেই। এসব বুঝেই আমরা সরকারে এসেছি। পশ্চিমবাংলার মানুষ এখানে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা সরকারে এসে জনসাধারণকে বলেছি, আপনারা অবস্থাটা বুঝুন। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, কোথায় কোথায় আমাদের বাধা আছে, বাধাগুলি কতটা অতিক্রম করতে পারি—এসব বুঝুন আপনারা। কিছুটা বাধা অতিক্রম করা যায়। সবটা যায় না। এ সব কথা আমরা জন-সাধারণকে বলেছি। এখনই বলছি। সেই হিসেবে পুলিসকে বলেছি, একটা সুযোগ, বড় সুযোগ যখন এসেছে, বামফ্রন্ট সরকারের মত একটা সরকার এখানে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সুযোগ আপনারা নিন। আগেকার দিনে সরকার যা করেছেন, পুলিসকে দিয়ে করিয়েছেন, পুলিসের অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি সেই সব কাজে। মুখ বুজে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। যার ফলে আজকে, স্বাধীনতার ৩২ বছর পরেও পুলিস মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত জায়গায়, সারা ভারতে বিচ্ছিন্ন। অথচ এটা বাঞ্ছনীয় নয়। একথা পুলিসকে বলেছি। পুলিসের সঙ্গে নতুন করে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায়, জেলায় জেলায় কমিটি করেছি, কেন্দ্রে কমিটি করেছি। আমি তার সভাপতি। যতগুলি সংগঠন আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি করেছি। এ জিনিস করেছে ভারতবর্ষে আর কোন্ সরকার? কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী এতদিন ধরে তো রাজত্ব করেছেন। আমরা পুলিসের সঙ্গে বসে আলোচনা করি। তাঁদের সংগঠন আছে। তাঁদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলি। দাবি-দাওয়া মানতে পারি না পারি, তাঁদের একথা বলি, এই কারণে মানতে পারছিনা। আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে আমরা চলবার চেষ্টা করছি। পুলিসকে বলেছি ব্যবহার পরিবর্তন করে এই সুযোগ আপনারাও গ্রহণ করুন। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে আপনারা যেভাবে অভ্যস্ত হয়েছেন, বিগত দিনগুলির সরকার যে অভ্যাস করিয়েছেন আপনারা সেটা ভোলবার চেষ্টা করুন।

আমি জানি সময় লাগবে। কারণ, ভয়ংকর জিনিস এই অভ্যাস। আমি জানি এখানে যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ রয়েছে এ সবের মধ্যে অভ্যাস বদল হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু তবুও তো কিছু করা যায়। কিছু হয়েছেও ইতিমধ্যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি, সরকার পক্ষের কেউ কেউ বলেছেনও, মানুষকে সাহায্য করার কাজে চরম বিপদের সময় পুলিস তো এগিয়ে গিয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পর, গত দু-তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু পুলিস প্রাণও দিয়েছেন, আহত হয়েছেন হয়ত ডাকাত ধরতে গিয়ে, দুষ্কৃতকারী ধরতে গিয়ে, সমাজবিরোধীদের ধরতে গিয়ে। এক্ষেত্রে পুলিসকে আমরা প্রশংসা করেছি, তাঁদের পুরস্কৃতও করতে চাই আমরা। এইভাবে আমরা পুলিসকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। এটা শুধু সরকার আর কয়েকজন মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়ে করে দিতে পারেন না, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে যেখানে পুলিসরা কাজ করেন সেখানে সেটা তাদের বুঝে নিতে হবে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা। কেউ কেউ হয়ত এই সুযোগটা গ্রহণ করছেন আবার কেউ কেউ হয়ত করছেন না। এখানে দু-একজন আমাকে বললেন যে, আপনি কি জানেন যে পুলিসের মধ্যে এরকম একটা ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে? আমি তো জানি, আমার কাছেও আছে সেটা। আমরা তো একেবারে মূর্খ নই। আমাদের চোখ তো খোলাই আছে। অসংখ্য মানুষ আমাদের প্রতিদিন খবরাখবর দিচ্ছেন, আমরা জানি। সব হয়ত না জানতে পারি কিন্তু কিছু জানি যে কোথায় কি হচ্ছে। কিন্তু আমরা করবোটা কি? ইস্তাহারটা হিন্দিতে পড়ে শোনালেন (বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য) দুজন পুলিস, আগে থেকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। তারা গুলি করে হত্যা করেছিল কাদের। সে সম্বন্ধে আমরা সরকারে আসার আগে থেকেই মামলা চলছিল। তারা সাজা পেলেন—যাবজ্জীবন—সেখানে অপরাধ হয়ে গেল আমাদের সরকারের! কিন্তু কি করবো আমরা? এই দুজন পুলিস বলছেন, আমরা তো বিগত সরকারের কথা শুনে মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি, সেখানে কোন উপায় নেই, আইনে যা আছে তাই হবে। আমরা কি করবো? এক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি না। এই যে বাইরে ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে সরকারের বিরোধিতা করো। এ সব তো আমরা জানি। দুবার আমরা সরকারে এসেছি, এ সব আমরা দেখেছি। এই বিধানসভার ভেতরেই আমরা আক্রমণ দেখেছি। কংগ্রেসীরা তার পেছনে ছিলেন যখন সেই আক্রমণ এখানে হয়েছে। তাদের আমরা স্তব্ধ করেছিলাম।

সারা ভারতবর্ষব্যাপী যা হয়েছে সেদিকে একবার আপনারা চেয়ে দেখুন। সেখানে পুলিসকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সি. আর. পি. নিয়ে গিয়ে, মিলিটারি নিয়ে গিয়ে। আমাদের এখানে এটা হয় নি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের পুলিসবাহিনীকে। তাঁদের সঙ্গে কি সব ব্যাপারে আমরা একমত? না, একমত নই। তথাপি ওই পথে তারা যান নি।

তারপর সি আই এস এফ-এর সঙ্গে গোলমাল হয়েছে জনতা পার্টির সরকার যখন ছিলেন। সেখানে গুলি গোলা চলেছে। আমাদের এখানে ওটা আমাদের আওতার মধ্যে নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিল্লির সরকারের সঙ্গে কথা বলে একটা সমঝোতায় যাতে আসা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এসব কি আর কোথাও হয়েছে? ভারতের আর কোথাও এসব হয় না। এখানে আমরা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলবার চেষ্টা করছি। কিছু সুফল আমরা পেয়েছি। এখনও অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। এই সামাজিক অবস্থার মধ্যে, যেখানে নিদারুণ দারিদ্র্য আমাদের দেশে রয়েছে, প্রচণ্ড বেকারী সমস্যা আমাদের দেশে রয়েছে। এ সবই আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে। তাছাড়া আমরা জানি কংগ্রেসীরা কয়েক হাজার সমাজবিরোধী তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। তারা আমাদের ছেলেগুলিকে বিপথে পরিচালিত করেছেন নিজেরা সরকারে থাকবার জন্য। তাদের হাতে বোমা, পিস্তল তুলে দিয়েছেন। মানুষকে হত্যা করতে শিখিয়েছেন, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করতে শিখিয়েছেন। আমাদের ঘরের ছেলেগুলিকে তারা সেই পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন যাতে তারা পরীক্ষায় টোকাটুকি করে। কংগ্রেসী মন্ত্রী নেতারা তাদের ডেকে এই সব ব্যবস্থা করিয়েছেন যাতে তারা সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়। তারা এটা করেছিলেন তার কারণ তাহলে যুব সমাজ আর দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে পারবে না। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তারা সফল হতে পারেন নি। চার পাঁচটি নির্বাচনে কত বড় জয় আমাদের এনে দিয়েছেন সেটা আপনারা দেখেছেন। সেজন্য মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁদের উপরই আমরা নির্ভর করি। আমরা বারে বারে বলেছি, গোপনে অন্য কথা বলি না, কংগ্রেসীদের মতন আমরা ভণ্ড নই। পুলিসকে খোলাখুলি বলেছি আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন আমাদের সরকারী দলের নাম করে যদি কেউ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। খুন জখম রাহাজানী বা অন্য কিছু করে তা হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আপনাদের লোকেরা ধরা পড়ে? একবার এই বিধানসভায় আমি হিসেব দিয়েছিলাম। আবার আপনারা প্রশ্ন করুন—আমি জবাব দিয়ে দেব কত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের ১১০০ ছেলে খুন হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সমস্ত ব্যবস্থা দিল্লি থেকে করেছেন। ক'টা মামলা হয়েছে? ক'জন সাজা

পেয়েছে? ভারতের আর কোথায় এত হত্যাকাণ্ড হয়েছে? আজকে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে পুলিস নিরপেক্ষ কি না! তবে এটা ঠিক পুলিসের মধ্যে আমি দেখেছি, যে ভাবে এখানে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—ইন্দিরা কংগ্রেসের ছেলেদের দেখে পুলিস অনেক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছেন। নিরপেক্ষ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? নিরপেক্ষ বলতে যারা আক্রমণ করে তাদের পক্ষে দাঁড়ানো বোঝায়, না যারা আক্রান্ত হয় তাদের উপেক্ষা করা? এই রকম উদাহরণ আমার কাছে আছে। তা তো চলবে না। পুলিসকেও একটু বুঝতে হবে। মাথা ঘামাতে হবে। আক্রমণকারীকেই গ্রেপ্তার করতে হবে। যার খুশি নাম দিয়ে দিলাম যা খুশি হয় হবে? যে আক্রান্ত হলো জেনেশুনে সে গ্রেপ্তার হবে? একে নিরপেক্ষ বলে না। কিন্তু আমি জানি এই পরিবর্তিত অবস্থা হবার পরে, স্বৈরাচারী শক্তি দিল্লিতে জেতবার পরে এই রকম সব ঘটনা ইতিমধ্যেই আমার কাছে এসেছে। এটাকে আমি অন্ততঃ নিরপেক্ষ বলতে রাজী নই। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যদি হিসাব আপনারা চান আমি দিয়ে দেব। জমি নিয়ে, এটা নিয়ে, ওটা নিয়ে, পারিবারিক কলহ, গ্রামের মধ্যে কোন কলহ বিবাদ ইত্যাদি এই সব নিয়ে যে মামলা হয়েছে সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছে সেখানে যে কোন পক্ষই আছে, যারাই এর মধ্যে লিপ্ত আছে, তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। কেউ আমাকে বলতে পারবেন, আপনারা নেই? সি পি আই (এম)-এর তথাকথিত সমর্থক, অন্য কোন বামপন্থী দলের সমর্থক নেই? এটা এই রাজ্যে প্রমাণ করা যাবে না, অন্য রাজ্যে খুঁজে বেড়ান নিরপেক্ষ কেউ আছে কি না। আমাদের এখানে এই সব চলতে পারে না। আমরা মন্ত্রী হবার জন্য সরকারে আসি নি, সমাজ পরিবর্তনের জন্য।

আমাদের লোক যদি কোন ভুল করে, অন্যায় করে আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের ডেকে বলি, ভুল বা অন্যায়টা বুঝিয়ে বলি। যদি কেউ না বোঝেন তাহলে, আমাদের পার্টির সে ক্ষমতা আছে, বলে দিই বামপন্থীতে তাদের কোন স্থান নেই। তারা বেরিয়ে যাবেন, কংগ্রেসে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সব থাকতে পারে না। এখানে আমি আপনাদের বলতে চাই, একটি কথা আবার শুনলাম, ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোলানাথ সেন বলে গেলেন, উনি বলেই চলে গেলেন, হয়ত ওঁদের সব ধরা পড়ে গেছে। বললেন, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমরা জনগণের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছি। তা ওঁরা 'জনগণ' কথাটা শুনলেই ক্ষেপে যাচ্ছেন। উনি বললেন, গ্রামে আপনারা আছেন, শহরে আপনারা আছেন, আপনাদের হাতে পঞ্চায়েত আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত তো কংগ্রেসের হাতেও আছে। আমরা ওইভাবে চলি না। আমরা জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি। অতীতের পঞ্চায়েত, পৌরসভা এই সব কথা বলি না। আমরা জনগণের প্রতিনিধি। আমরা বলেছি, যদি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধে তাহলে সেখানে যে দলের নেতাই থাকুন বা যারাই থাকুক তাঁদের সঙ্গে বসে আলোচনা কর—এতে অসুবিধার কি আছে? আমরা বরাবর এই নীতি নিয়ে চলেছি। কিন্তু উনি বললেন, জনগণের সঙ্গে সহ-যোগিতা কেন হবে—পুলিস গুলি চালাবে। লাঠি চালাবে, যা খুশি তাই করবে। কিন্তু আমরা ভোলা সেনদের এই সব কথা মানছি না। ওঁদের সরকার যেখানে আছে তারা এই সব করবেন। আমরা এই সব মানতে রাজি নই, পুলিস বুঝেছেন আমাদের এই মনোভাব। তাঁরা অনেক সময় অসুবিধায় পড়ে যান। গোলমালে পড়ে যান, নানারকম অভিযোগ হয় পরস্পর বিরোধী। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক সমিতির আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন ইত্যাদি নানা-রকম আন্দোলন যখন হয় তখন এই সব হয়। কিন্তু সাধারণ অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে আলোচনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে কারো সঙ্গে পরামর্শ করবো না, যোগাযোগ করবো না।

কেউ বলছেন, কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আপনাদের তফাৎ কি—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে আপনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ৫ কোটি টাকা বেড়েছিল বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? এখন এটুকু যদি বুঝতে না পারেন তা হলে আপনাদের বোঝাব কি করে? পুলিসের বাড়ি তৈরির জন্য খরচ করছেন বলে, মাইনে বাড়ছে বলে বাধা দিতাম? তা তো দিতাম না। আমরা বলেছি, এই পুলিসকে আপনারা ব্যবহার করছেন গণতন্ত্র হত্যা করার জন্য। জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা কাজ করাচ্ছেন। পক্ষপাতিত্বের কাজ আপনারা করছেন, এই জন্য বাধা দিতাম।

ভোলাবাবু বলে চলে গেলেন। এই তো কোন খাতে কিছু বাড়লো। সব কমে গেল। তিনি বাজেট বইটা পড়েন নি। এমন কি আমার বক্তৃতাটাও পড়েন নি। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক হলে যা হয়। আমার সব বলার সময় নেই। ১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাখাতে আমরা ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছি আর এবারে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। অন্য খাতগুলি দেখুন, গঠনমূলক যে সমস্ত খাত আছে, কোথায় আমরা কত খরচ করেছি। এগুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন, বাজেট ব্যয়ের মধ্যে গ্রামের জন্য আমরা কত ব্যয় করছি। এটা তো ওঁর দেখবার দরকার নেই। তিনি এই সবের দিকে না গিয়ে একটা হুমকি দিয়ে চলে গেলেন। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যাবেন কি না জানি না। সংবিধানের ৩৬৫ নং ধারার কথা বলে চলে গেলেন। প্রেসিডেন্ট রুল নাকি এখানে করা হবে আমি যা বুঝলাম ওঁর কথায়। এর মানে কি হবে? কেন্দ্র যদি আমাকে বলে এই জনতা পার্টিতে যাঁরা সব বসে

আছেন, তাঁদের গলা কেটে দাও—তাহলে আমাকে কাটতে হবে? আমি বলেছি প্রণববাবুকে (প্রণব মুখার্জি, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী) আপনারা বিনা বিচারে আটক করতে চান করুন আপনাদের যেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব আছে। আপনারা ন'টা রাজ্য সরকার ভেঙে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। আসাম আছে। আরও তো আপনাদের অনেক জায়গা আছে। আপনারা ক'জনকে বিনা বিচারে আটক করেছেন, বলুন। আপনারা গ্রেপ্তার করেন নি কারণ নির্বাচন আছে। কিন্তু আমরা তা করবো না। আপনাদের যদি সাহস থাকে আটকান। আপনারা বলুন আমাদের এখানে কাকে কাকে আটকাতে হবে। তাহলে অন্ততঃ আমরা বুঝতে পারি যে কারা কারা আপনাদের টাকা দেয়নি আমি সে লিস্ট পাই নি। বিনা বিচারে আটকের এই অসভ্য বর্বর আইনকে আমরা ব্যবহার করি না। এতে অসুবিধার কি আছে? সব ব্ল্যাক মারকেটিয়ার, জ্যোতি বসু থেকে আরম্ভ করে সবাইকে গ্রেফতার করে দাও। এই কথা আমাদের শুনতে হবে? এইসব কথা তো আমরা ৩৩ বছর ধরে শুনছি। এই সভায় বসে শুনলাম সিকিওরিটি অ্যাক্ট সম্বন্ধে। তখন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি বিরোধিতা করেছিলাম। জানি না কত সংশোধনী (অ্যামেন্ডমেন্ট) এনেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো আপনাদের বিরুদ্ধে নয়। কেন আপনারা নিজের গায়ে মাখছেন এইসব সমাজ-বিরোধীদের জন্য। কিন্তু সেদিন আমাকে ভোর ৪টায় সময় গড়িয়াহাটা রুট ধরে বাড়ি থেকে জীপ-এ করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি, ওই ভদ্রলোক (প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) রাস্তায় পাইচারী করছেন, মরনিং ওয়াক করতে বেরিয়েছেন। আমি তো তখন জীপ থেকে বলতে পারি না, কি মহাশয়, এ কি হোল, কি প্রতিশ্রুতি দিলেন আর কি হল? যা হোক আমি সে সব কথার মধ্যে যাচ্ছি না।

কে একজন বললেন যে, এখানে নাকি রেকর্ড খুন হচ্ছে। এখানে সাট্টার সব চেয়ে বেশি রেকর্ড। উনি নাকি পি ডবলিউ মিনিস্টারের কাছে গিয়েছিলেন। সাড়ে তিনটার সময় তিনজন অফিসারকে ফোন করেছিলেন, একজনকেও পাননি—এও রেকর্ড। এই রকম অনেক কিছু রেকর্ড বলে গেলেন। উনি কার নাম করলেন, উনি নাকি সাট্টাওয়ালাকে চেনেন এবং উনি পুলিস অফিসারের কথা বললেন। আমি জানি, দেখতে হবে এই সব জিনিস। এইরকমভাবে হচ্ছে আমি জানি না। আমি এখানে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১৯৭৮	ডাকাতি	ছিনতাই	হত্যাকাণ্ড
কলকাতা	৫২	১৭০	৯৭
দিল্লি	৫৩	৫৯৭	১৫৭
বম্বে	২২	৩১৪	১১১
বাঙ্গালোর	৪৭	৪৯৬	৪৯

১৯৭৯ সালে ডাকাতি কলকাতায় ৩৬, দিল্লিতে ৬১, বম্বে ৪১। ছিনতাই কলকাতায় ১৬০, দিল্লিতে ৬২১, বম্বে ৩৪৫। হত্যাকাণ্ড কলকাতায় ৯৩, দিল্লিতে ১৯০ এবং বম্বে ১৫৭। এই রকম আরো অনেক রেকর্ড আমার কাছে আছে। এটা একটা অজুহাত আমাদেরই যা ৯৩ হবে কেন, ২৩-এ নেমে যাওয়ার উচিত ছিল। আমি এটা বারে বারে স্বীকার করেছি। কিন্তু এখানে এমনভাবে দেখান হচ্ছে যেন আইন-শৃংখলা আর নেই। যাঁরা ৩৬৫-র কথা বলছেন ওখানে গিয়ে ৩৬৫ অ্যাপলাই (প্রয়োগ) করুন। ওখানে ইন্দিরা-কংগ্রেস রাজত্ব করছেন।

উত্তর প্রদেশে কি হবে জিজ্ঞাসা করি? এগুলিতো সাধারণ ডাকাতি নয়। আমরা দেখেছি, হরিজনদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, উপজাতিদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তাঁদের নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই সব লোকদের কাছে আমাদের শুনতে হয় আইন-শৃঙ্খলার কথা। এটা ঠিক, আমাদের এখানে যা ডাকাতি হচ্ছে, তার হিসেব দিলাম। অনেক জায়গায় প্রিভেন্ট (বন্ধ) করা যাচ্ছে না কিন্তু এইটুকু সান্ত্বনা আছে যে ডিটেকশন'টা আগের থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। আমার অনেক হিসেব আছে, সেগুলি দেবার দরকার নেই। সেন্ট্রালব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন, দিল্লি থেকে তাঁরা আমাকে লিখেছেন ২. ৫. ৭৯ তারিখে। ডি. সি. ডি. ডি. কে লিখেছেন, Heartiest Congratulations on the Excellent work done by you and your colleagues in the detection of sensational robbery in the State Bank of Hyderabad, Maharshi Debendra Road, on April 4, 1979. Indeed the recovery of a large amount within so short a time must be a record in the History of criminal investigation of this country. (মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে, ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল হায়দ্রাবাদ স্টেট ব্যাঙ্কের চাঞ্চল্যকর ডাকাতি ধরার জন্য আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এত বেশি টাকা এত অল্প সময়ে উদ্ধার করেছেন। এটা এদেশের অপরাধ কার্যে একটা নজির হয়ে থাকবে)। এখন এটা যাঁরা করেছেন তাঁদের আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। যেগুলি হয়নি সেটা হওয়া উচিত বা বিশেষ করে প্রিভেনশান—যেগুলি আরো ঠিক মত ইনভেস্টিগেশন হয়। হয়ত সেই ডাকাতগুলির এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা ওই অপরাধমূলক কাজ করবে না। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এখানে অনেক সদস্য যে সব কথা বলেছেন, এগুলি কাট মোশানে থাকতো তাহলে একটু দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু তা নেই। হঠাৎ টাইপ রাইটারের কাগজ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। ভোলা সেন

নেই। তাঁর উত্তর দেবারও প্রয়োজন নেই। তিনি চলে গেছেন। তাঁর সৎ সাহসটুকু নেই যে আমার জবাবটা শুনে যাবেন উনি যা বলেছেন, বেশিরভাগ অসত্য বলে গেলেন। আর বাজেটও পড়েন না, আমার বক্তৃতা পড়েন না। ঠিক করে এসেছিলেন এই সব বলবেন। গণ্ডগোল সৃষ্টি করবেন, করে চলেগেলেন। এখানে কথা উঠেছে যে ব্যক্তিগতভাবে কে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার ছিল। উনি জানলেন কি করে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার ছিল? যা খুশি তাই বললেই হল। স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার হওয়া কোন আপত্তি জনক কথা নয়। কিন্তু উনি কি করে জানলেন সেটা আমি জিজ্ঞাসা করি কবে ছিল, কে ছিল? জনপ্রতিনিধি হয়ে সব আজগুবি বললেন, ওরা সব ঠিক করে ফেলেছেন যে কে কোথায় পোস্টেড হবে। আপনারা জানেন যে, একটা গোলমাল হয়েছে আমাদের ক্যালকাটা পুলিসের ব্যাপারে। কিন্তু এতে এত ভীত সন্ত্রস্ত আপনারা হবেন না। আমরাও জনগণের প্রতিনিধি। সংকটের কথা মনে করে এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে? আমরা দেখছি, সমস্ত আমাদের হাতে আছে, জনগণ আমাদের পাশে আছেন। যদি তারা কিছু অন্যায় করে থাকেন, কিছু করে থাকলে, যতবড় অফিসারই হোন, আপনারা দেখেছেন আগেও আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। কিন্তু সেটা বিরোধীদলের সঙ্গে পরামর্শ করে করবো না। আমরা নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, যেভাবে চললে জনগণের উপকার হবে সেই ভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব, কাজেই সেদিকে যেতে চাইনা। আর যেহেতু নতুন কোন কথা নেই, বারে বারে ওই মরিচঝাঁপির কথা, কাশীপুরের কথা, বর্ধমানের কথা উঠেছে। বর্ধমানে উনি (ভোলা সেন) নিজে গিয়েছিলেন। ভোলাবাবু এটাতো বললেন না, বললে ক্ষতি কি হত যে ওরা প্রথম পুলিসটাকে মেরে ফেললেন। তখন পুলিসের হাতে আর্মস (অস্ত্র-শস্ত্র) ছিলনা—ওদের ট্রেনে তুলেদিছিল দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবার জন্য। উনি কতগুলি হাফ ট্রুথ (অর্ধসত্য) এবং কতগুলি অসত্য কথা বলে গেলেন। ওঁরা মরিচঝাঁপিতে লোকেদের উস্কাবার চেষ্টা করে ছিলেন ঃ কিন্তু উস্কানো যায় নি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এক লক্ষ কয়েক হাজার মানুষকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় মানুষ ওঁদের মানছে না। কাজেই বাইরে থেকে মানুষ এনে—নারী পুরুষ শিশুদের নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলেন। এটাই কি তাঁদের দায়িত্ব।

তারপর অনেক স্পেসিফিক (নির্দিষ্ট) কেসের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে সমস্ত কিছু না পেলে আমি কিছুই বলতে পারব না। সেগুলি লিখিত ভাবে দিলে নিশ্চয়ই দেখব কি হয়েছে, না হয়েছে। সব নতুন ভাবে আবার হাওড়ার কথা এখানে তোলা হয়েছে। সেদিন হাওড়ার কথার উত্তর হয়ে গেছে। সেখানে মামলা হয়েছে। কাজেই মামলা যখন চলছে, ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) যখন হচ্ছে তখন আমি আগে থেকে কি করে বলে দেব যে, সব প্রমাণ হয়ে গেছে? অথচ একজন আইনজীবী হয়ে ভোলাবাবু ওই সব কথা এখানে বলে বেরিয়ে গেলেন। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তা শুনলে আমাদের একটু আশংকা হয়। আগে প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কাছে দিস্তা দিস্তা কাগজে চিঠি যেত। সেগুলি উনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি সেগুলি দেখতাম। এখন সব দিল্লি চলে যাচ্ছে এবং সেসব সম্বন্ধে একবার জৈল সিং লিখছেন, একবার গান্ধী লিখছেন। আমি অবশ্য সেসবের জবাব দিচ্ছি। যে সব চিঠি আসছে এবং তার জবাব দিচ্ছি তা সব আমি পশ্চিমবাংলার জনগণকে ভারতবর্ষের জনগণকে দিয়ে দেব তাঁরা বুঝে নেবেন।

তবে ওই একটা ঘটনার কথা আমি বলি। বর্ধমানের যামুরিয়া না কোন্ জায়গার ঘটনা। সে সম্বন্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের কে একজন এম. পি. ইন্দিরা গান্ধীকে গিয়ে বলেছেন যে, ওখানে এক্স (প্রাক্তন) এম. এল. এ. এবং কংগ্রেসী লিডারের একমাত্র ছেলে খুন হয়ে গেছে, আর খুন যখন হয়েছে তখন নিশ্চয় সি পি আই (এম) করেছে। অথচ সেই কংগ্রেস লীডারের (নেতার) স্ত্রী কেঁদে কেটে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন, আমরা জানি কারা খুন করেছে এবং আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসেরই যারা আছে তারা খুন করেছে। যদিও সেই চিঠি অনুযায়ী আমি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করি নি। কারণ, ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) চলছে, আমরা চাই ইনভেসটিগেশন হোক। কিন্তু আমি তাঁদের বলব যে, ওই চিঠি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠান।

আমাদের পক্ষের লোকদের যেখানে মারা হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে? আমি তাই সমস্ত লিস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভোলাবাবুরা আবার বিপদে পড়লেই বলছেন, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে? এটা স্টেট সাবজেক্ট, রাজ্যের বিষয়। কাজেই ৩৬৫ ধারা অনুযায়ী এই সরকারকে বিতাড়িত কর।

যাই হোক, ভোলাবাবু নতুন ইন্দিরা মাহাত্ম্য গাইছেন। ইলেকশনের আগে উনি অন্য একটা কংগ্রেসে ছিলেন। এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে চলে গেছেন। এইসব লোকের কি কোনো মূল্য আছে, চরিত্র আছে? নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য দল বদল করে চলে গেলেন, আর তাঁর কাছ থেকে এসব বক্তব্য শুনতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন (কংগ্রেস-আ) অনেক কথা বলেছেন। আমি সব কথার উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি তাঁকে বলতে চাই যে, উনি অনেক ঘটনার কথার মধ্যে আবার বললেন, পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কিসের

পক্ষপাতিত্ব? আপনি তো আমার কাছে হিসাব চাইতে পারতেন। একটা কোশ্চেন (প্রশ্ন) করুন, হিসাব চান যে, কোন দলের তথাকথিত ক'জন ধরা পড়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করুন। আমি আবার বলছি, এভাবে সরকার চলে না। জয়নাল আবেদিন সাহেব আপনি নিজে কি করেছেন? আমি জানি সে সব নিশ্চয়ই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন কোন কংগ্রেসে আছেন তাই বোঝা মুস্কিল। আপনি এখানে হঠাৎ ওই কোথায় মসজিদ দখল হয়ে গেছে ইত্যাদি বললেন। এসব ভয়ংকর কথা। মুসলমান ভাইবোনদের ধর্মীয় স্থান নিয়ে এইভাবে এখানে আলোচনা করা কি উচিত? এটাকে কি রাজনৈতিক মূলধন করা উচিত? আপনি তো আসতে পারতেন আমার কাছে। কত ব্যাপার নিয়েই তো আসেন। আপনার পরিবারের লোকেরা আমার কাছে চিঠি লিখেছে.........আপনার বাড়ির লোকেরা আমার কাছে আসছেন। তা কি আপনি জানেন? আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাই নি। এই সব ব্যাপারে বিশেষ করে জমির ব্যাপারে—জমিদারদের ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে, আমরা বিচার করবার চেষ্টা করছি, সুবিচার করতে যতটুকু পারি ততটুকু চেষ্টা করছি। ভুল ত্রুটি হয়তো কিছু হতে পারে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসীরা গত ৩০ বছর ধরে সেই জিনিস করেছেন। আপনাদের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো উচিত ছিল—মানুষ আপনাদের সাজা দিয়েছেন, এখন অন্য জায়গায় বাকি আছে।

আপনারা কি ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা এখানে ২-৪ জন মন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করছিনা—আপনাদের মতন ঘর-বাড়ি তৈরি করার জন্য রাজনীতি করছি না। আমরা কমিউনিস্ট। আমরা বামপন্থী। আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই সেই লক্ষ্যে এখনও পৌঁছাতে পারি নি। আমরা সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছি। সত্যিকারের যাঁরা কৃষক, যাঁরা মজুর, যাঁরা মধ্যবিত্ত, যাঁরা ছাত্র-যুব-মহিলা তাঁদের যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন আমরা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। এ ছাড়া সমাজ বিপ্লব ঘটানো যায় না। এ ছাড়া আমূল পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এইসব ৩৬৫ ধারা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা একটা লোকসভার, একটা বিধানসভার, পঞ্চায়েত এবং আবার লোকসভার নির্বাচনে জিতেছি। সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের ঝড় উঠেছে বলে আমরা শুনেছিলাম, সেই ঝড় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার আকাশে। আর একবার ১৯৭১ সালে হয়েছিল—ইন্দিরা কংগ্রেস যেহেতু বাংলাদেশের লড়াইয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেইজন্য গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী জয়জয়কার শুনেছিলাম কিন্তু পশ্চিমবাংলার আকাশে কোন মেঘ দেখা যায়নি, পশ্চিমবাংলার আকাশে সেই ঝড় ওঠেনি। সেবারেও কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলাম যদিও বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তথাপি কংগ্রেসীদের আমরা এই পশ্চিমবাংলায় পরাজিত করেছিলাম। ১৯৭২ সালে পরাজিত করতে পারি নি এই জন্যে যে, আপনারা, কংগ্রেসীরা চুরি জোচ্চুরি করে নির্বাচন করেছিলেন, বেলা ১১টার সময়ে নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এবারে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছিল, যারা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকেছিলেন তাঁরা রাত্রি আটটা ন'টা পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

[২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কাছে অনুরোধ জানাই। আমরা চাই আমাদের আসাম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তপাত থেকে মুক্ত হোক; ভাষা-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী জনগণ আর ছাত্র-যুবকের ঐক্য অটুট থাকুক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অটুট থাকুক, তা সুদৃঢ় হোক।

আজকের এই মিলন উৎসবে সমবেত বন্ধুদের সামনে আসামের সমগ্র সংগ্রামী জনতার মুখপত্র হয়ে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি: আসামে আজ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা, মূল্যবোধ আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। চক্রান্ত চলছে ভারতের সংগ্রামী জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের বিরুদ্ধে। এই চক্রান্তকে ধ্বংস করতে আসামের গণতন্ত্রকামী, মানবতাবাদী আর প্রগতিবাদী শক্তিগুলি যে মরণপণ যুদ্ধ করছেন, সেই যুদ্ধে আপনারাও সামিল হোন, ঐক্য আর সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসুন আর অসমীয়া মানুষের ন্যায়-সঙ্গত ভয় আর সন্দেহ যাতে ঐক্য বিরোধী আর সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলো ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য অসমীয়া জনসাধারণের চিন্তা চেতনা বৃদ্ধির জন্য সহায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। প্রকৃত সাথী সুলভ মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটুক সেই কামনা নিয়ে—

ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ
গণসংস্কৃতি—জিন্দাবাদ
অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিতে শত পুষ্প বিকশিত হোক

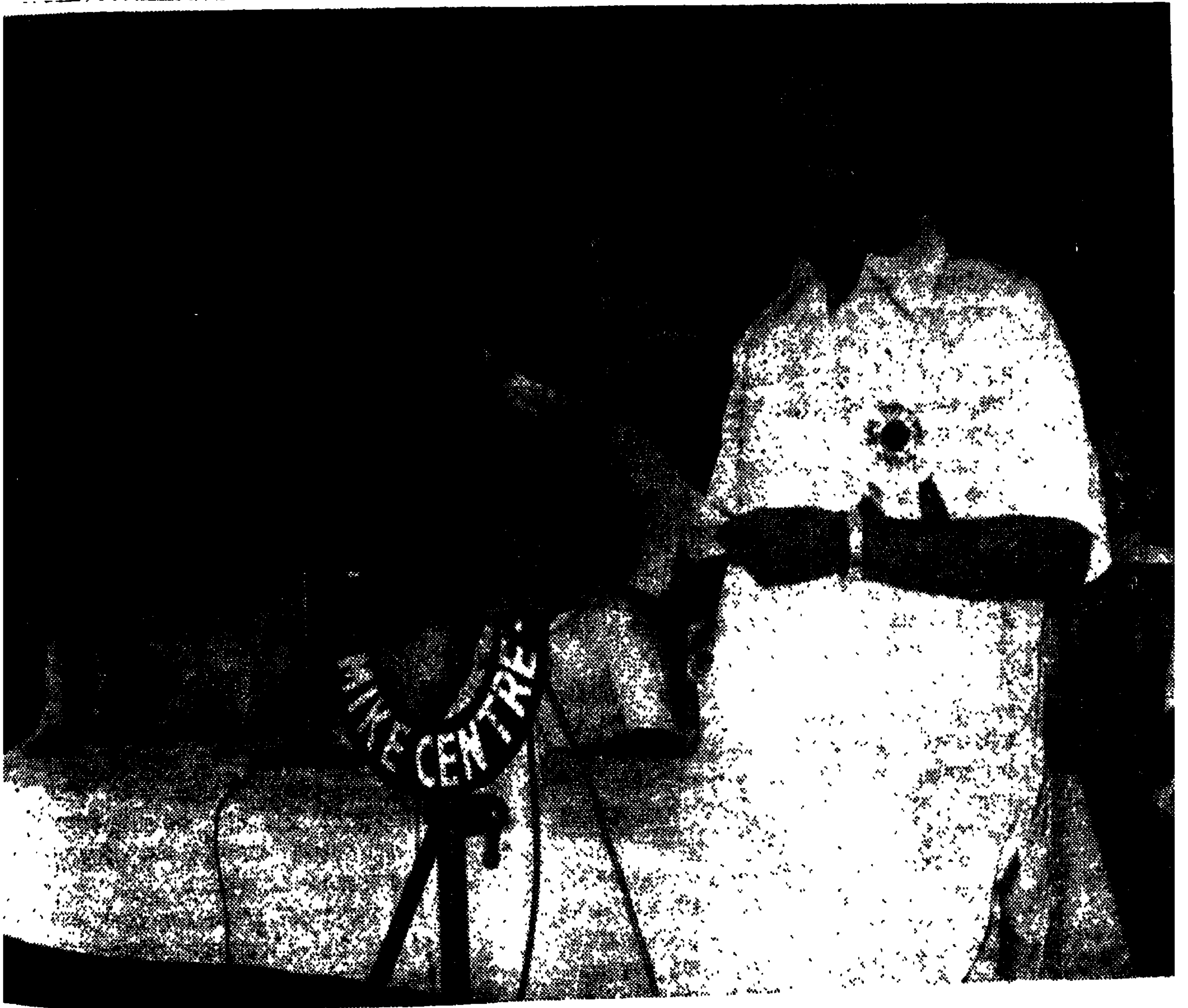
গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে ২৩-২৯শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব '৭৯-'৮০ উদ্বোধন করে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী

কমরেডস্,

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে পশ্চিমবাংলার যুবসমাজ আজ এই সম্মেলনে সমবেত। আমি তাদের প্রতি জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

সাম্রাজ্যবাদের সে যৌবন আজ আর নাই, যখন তারা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, কোন পশ্চাদপদ দেশকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রাস করে, পৃথিবীকে নূতনভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পারতো। পৃথিবীর একটি বড় অংশে ধনতন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে, শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠার ফলে, পৃথিবীর শক্তিসমূহের ভারসাম্য ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকেছে। তাই, পিছু হটতে হচ্ছে,



যুব উৎসবের উদ্বোধন করছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী

সাম্রাজ্যবাদকে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। প্রতিনিয়ত পাল্টাতে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম কৌশলও।

প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলাভের শুরু থেকেই, সাম্রাজ্যবাদীদের রণকৌশল ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'ঘেরাও করে কোনঠাসা করা', একঘরে করা, সামরিক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্য দিয়ে তাকে গলাটিপে হত্যা করে, পৃথিবীকে কমিউনিজম-এর বিপদ থেকে মুক্ত করা। তাই, সেদিন যুদ্ধের উত্তেজনা ছিল, বার্লিনকে কেন্দ্র করে, প্রধানতঃ ইয়োরোপে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চীন ধনতান্ত্রিক শিবির থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রণকৌশল ছিল, কমিউনিজমের প্রসার রুখবার জন্যে, তাকে 'গণ্ডীবদ্ধ' করে রাখার জন্য, মহাচীনের চারপাশে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি তৈরী করা, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চালিয়েছে ভিয়েৎনাম-লাওস-কাম্বোডিয়াতে, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ করেছে—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর।

আজ কিন্তু ইয়োরোপে সে উত্তেজনা নাই। ওয়ারসো সম্মেলনে পোলাণ্ডের সীমানা স্বীকৃত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র সেখানে ব্যর্থ।

উত্তেজনা কমেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। ভিয়েৎনামের দেশভক্ত বীর জনগণ—পর পর তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে, নিজেদের দেশকেই শুধু মুক্ত করেন নি, সমগ্র অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। মুক্ত হয়েছে লাওস, মুক্ত হয়েছে কাম্বোডিয়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের এখন শেষ ঘাঁটি হয়ে উঠেছে—পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, আমাদের এই উপমহাদেশ। এই অঞ্চলের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমবেত হচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতাকাতলে, কিন্তু তবু দমন করা যাচ্ছেনা—প্যালেষ্টাইনের মুক্তিকামী সংগ্রামীদের। ইজরাইলের যুদ্ধ-ঘাঁটি, মিশরের বিশ্বাস ঘাতকদের কোন কাজে লাগছে না।

তেমনি ধ্বস নামছে ইরানে। ইরানের ফ্যাসিষ্ট শাহ—বিতাড়িত হবার পর থেকে, তৈল অঞ্চলের এই মার্কিন ঘাঁটিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আজ আর নির্ভরযোগ্য নয়। গ্রীস ও তুরস্কের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী মৈত্রী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হটা যেমন লক্ষ্যণীয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য তাদের টিকে থাকার জন্য নানা-ধরনের বিভেদ ও উস্কানীমূলক ষড়যন্ত্র।

ঠিক যে সময়ে ধনতান্ত্রিক সংকট আরও তীব্রতা লাভ করছে, তৈল-সংকট বাড়ছে, প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশে মেহনতি মানুষ বিনা প্রতিবাদে অর্থনীতিক সংকটের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক সেই সময়ে আফগান জনগণ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন তাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা। জন্মদিলেন এমন একটি বিপ্লবী সরকারকে, যারা আফগানিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করতে অস্বীকার করছেন। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত এই উপমহাদেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধঘাঁটি করে, 'গালফ্' অঞ্চলের তৈল এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করার যে পরিকল্পনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রচনা করেছিল, তা সংগ্রামী আফগান জনগণের হাতে বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে দেখে তারা আজ ক্ষুব্ধ।

যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যে কোন ষড়যন্ত্র বিস্তৃত করার ক্ষেত্র তৈরী। যেখানে সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক, বিভেদপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী এজেন্টরা সক্রিয়। তাই, আফগানিস্তানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। আধা-সামরিক শাসনে, পাকিস্তানের জনগণ হারিয়েছেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই সেখানকার শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ডেকে নিয়ে আসছেন—আফগান উদ্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষার নাম করে, তাদের সশস্ত্র করে, আফগানিস্তানে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে অস্ত্র সাহায্য দিতে। পাকিস্তানে ৪০০ কোটি ডলারের অস্ত্র যাচ্ছে—শুধু আফগানিস্তানের স্বাধীনতা নয়, পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে, ভারত সমেত অন্যান্য সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। আফগানিস্তানে "ইসলাম বিপন্ন" বলে পাকিস্তানে যারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে সমবেত করতে আজ ব্যস্ত, তারাই সেদিন "ইসলাম বিপন্ন" বলে চীৎকার তুলেছিলেন—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রুখবার জন্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে।

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই সকল ষড়যন্ত্র আফগানিস্তানের প্রশ্নে জনগণের সামনে যতখানি ধরা পড়েছে, ঠিক ততখানি কিন্তু তা' ধরা পড়ে নি—যখন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তার থাবা বিস্তার করেছে, নয়া সাম্রাজ্যবাদী কৌশল অবলম্বন করে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল বিস্তার করতে।

যতদিন ধনতন্ত্র আছে, প্রত্যক্ষভাবে হোক, আর পরোক্ষভাবে হোক ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নয়া ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে —প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিককে। পৃথিবীর সেরা ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের শোষণের জাল

বিস্তার করেছে,—তৃতীয় দুনিয়ার সর্বত্র আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন প্রভৃতি মাধ্যমে, তাদের প্রায় ১১ হাজার শাখা এবং ৮২ হাজার উপ-শাখা বিস্তার করে। প্রায় ৫ লক্ষ মার্কিন সৈন্য বিদেশে মোতায়েন করে, দিওগো-গার্সিয়ার মত অসংখ্য ঘাঁটি সৃষ্টি করে। সমুদ্রে সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজের টহলদারী বিস্তার করে সেই শোষণ ব্যবস্থাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে। বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার শাখা, উপ-শাখার অধিকাংশের জন্মভূমি আমেরিকা-বৃটেন। বিশ্বের বিভিন্ন অনগ্রসর এলাকায় বিদেশী মূলধন কিভাবে সেসব দেশের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে এবং সেই বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ কিভাবে প্রতিবছর বাড়ছে—তাও লক্ষ্য করতে হবে। ১৯৭০-৭১-এ তার পরিমাণ যেখানে ছিল সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার, ১৯৭৭-৭৮-এ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ১০৫ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ের মধ্যে বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লগ্নি বেড়েছে—তিন বিলিয়ন থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলারে। তৈল প্রভৃতির মত সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জা সম্প্রতি আরো শক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। অনগ্রসর দেশগুলি সরবরাহ করছে কাঁচামাল, আর কারখানা-জাত পণ্য আসছে—ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে। সাম্রাজ্যবাদীরা অনগ্রসর দেশগুলির কাঁচামাল নিচ্ছে অল্প দরে, আর তাদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করছে—অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ে। এই অসম বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৭৭টি উন্নয়নকামী দেশের প্রতিনিধিদের দিল্লী সম্মেলনে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এতখানি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কোন আর্থিক সাহায্য, বহুজাতিক কর্পোরেশন বা ব্যাঙ্ক মাধ্যমে মূলধন খাটানো, নিছক ব্যবসা নয়, রাজনীতি-বর্জিত ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করছেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বলেই ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে ভারতের শাসকগোষ্ঠী কখনো কখনো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য গ্রহণ করেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যে বিরোধ আছে—তার সুযোগ গ্রহণ করেন, ভারতে ধনতান্ত্রিক শাষণব্যবস্থা আরো শক্ত করতেই বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে বেশী করে আগ্রহ দেখান, বৈদেশিকনীতি তার দ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উপর নির্ভর না করে, দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার নীতি গ্রহণ করছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা তাদের পথ নয়, তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়।

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো —"রাজনৈতিক অস্থিরতা"—যা শাসকগোষ্ঠীকে গণতন্ত্রকে আঘাত করতে, দুর্বল করতে সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু মূলধন নিয়ে আসে না, কোন রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তাকে আমদানী করতে হয়—প্রতিক্রিয়াশীল অপ-সংস্কৃতি ও মতবাদ। কোথাও সে মতবাদ আসে উগ্র-জাতীয়তাবাদের পোষাকে, কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের মুখোস পরে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আবরণ নিয়ে। কিন্তু পোষাক যত অভিনব হোকনা কেন, এইসকল বিভেদমূলক কার্যকলাপের মধ্যদিয়েই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া চক্রগুলি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা দপ্তরের (সি আই এ'র) টাকায় সক্রিয় হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়—যা আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আনন্দমার্গ ধর্মীয় সংগঠনের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, এমন কি বৃটিশ শাসনের দিনেও এমন ব্যাপক ছিল না—যেমন আজ দেখা যাচ্ছে, এই উপমহাদেশে। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা যেমন বাড়ছে, বেকার যুবসমাজের মধ্যে তেমনি বাড়ছে হতাশা—যা এই সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য চমৎকার জমি তৈরী করে দিচ্ছে।

ভারতের যুবসমাজের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য উজ্জ্বল। যখন যেখানে যেদেশে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ঘটেছে, সেখানে ভারতের যুবশক্তি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, মুক্তিকামী জনগণের সমর্থনে। ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যে আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ আমরা দেখেছি,—ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, আজও সেই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে—আফগানিস্তানের জনগণের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে আফ্রিকা, এশিয়ার জনগণের প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে। এই দায়িত্ব আমরা তখনই কার্যকরীভাবে পালন করতে পারবো—যখন আমরা রক্ষা করতে পারবো আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে, যখন আমরা রুখতে পারবো স্বৈরচারী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে। গণতন্ত্রকে রক্ষা না করে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী না করে—সাম্রাজ্যবাদকে রোখা যায় না—পৃথিবীর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এখনো বিপজ্জনক ভূমিকা নিতে সমর্থ হচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

[শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়]

লেনিন—এক মহান জীবনের কয়েকটি দিক

রথীন গঙ্গোপাধ্যায়

"তিনি (লেনিন) ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর নেতা—এক পার্বত্য ঈগল, যিনি কোন সংগ্রামেই ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না এবং যিনি রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের অজানা পথে পার্টিকে অসম সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালিত করে নিয়ে গেছেন।"

—স্তালিন

১৮৭০ সাল, ২২শে এপ্রিল ভলগার তীরে সিমবিরস্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভস্ক) ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের জন্ম। এই ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভই মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতিভাশালী উত্তরসাধক, প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক এবং বিশ্বের মেহনতী মানুষের প্রিয়তম নেতা ও শিক্ষক লেনিন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীই আজ আমরা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে পালন করছি।

পিতা—ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ। প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে স্কুল পরিদর্শক ও শেষ জীবনে, সিমবিরস্ক প্রদেশের স্কুল পরিচালক। শিক্ষাবিস্তারে দারুণ আগ্রহ। কিন্তু সাধ থাকলে কী হবে, সাধ্য নেই। মা—মারিয়া আলেকসান্দ্রভনা বাড়িতে বসে লেখাপড়া করলেও কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। ভালবাসতেন সাহিত্য ও সঙ্গীত।

উলিয়ানভ পরিবারের ছয়টি ছেলেমেয়ে। ভ্লাদিমির সন্তান—আন্না, আলেক্সান্দার ভ্লাদিমির, ওলগা, দমিত্রি ও মারিয়া। চঞ্চল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল শিশু ভ্লাদিমির। সবাই ডাকে ভলোদয়া বলে। খেলাধুলায় তার যেমন ঝোঁক পড়াশুনায় তেমনি তুখোড়।

সে সময় রাশিয়ায় পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। গড়ে উঠছে কলকারখানা। তাহলেও টিঁকে ছিল ভূমিদাস-প্রথা। শহরে ও গ্রামে চলেছে জারের ভীষণ অত্যাচার। গরিব চাষীর পেটে অন্ন নেই। পেয়াদা এসে তাদের গরু বাছুর ধরে নিয়ে যায়। মজুরদের কষ্ট হয়ে ওঠে অসহনীয়। বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের কাজের ঘণ্টা। ধর্মঘট করে মজুররা। জারের পুলিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর।

ঐ সব ঘটনা শিশু ভলোদয়ার অন্তরে দাগ কেটে যায়। খেলার সাথী ভেরা ও ইভানের কাছে শোনে গরিব চাষীদের কী কষ্টে দিন কাটে। ভলোদয়ার ভাবুক মনে তার ছাপ পড়ে। সারা জীবনে তা সে ভুলতে পারে না।

১৮৮৬। বাবা মারা গেলেন, নিতান্ত আকস্মিকভাবে। বড় বোন আন্না ও বড় ভাই আলেকসান্দার পড়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গে। ভলোদয়াই এখন বাড়ির কর্তা। মায়ের কষ্ট লাঘব করার জন্য মনের দুঃখ চেপে হেসে হেসে কথা বলে। সবসময় মায়ের কাছে কাছে থাকে।

'বড় হয়ে সাশা-দার (দাদা আলেকসান্দার) মতো হব।' ভলোদয়ার চোখে সাশা-দা ছিল যেন এক রূপকথার বীর। জারের অত্যাচারে ছাত্ররা তখন ভীষণ বিক্ষুব্ধ। অত্যাচারী জারকে হত্যা করতে হবে—গুঞ্জন চলে ছাত্রদের মধ্যে। সাশা তাদের নেতা।

ভলোদয়া তখন স্কুলে। খবর এল দাদা ধরা পড়েছে। আন্নাও রেহাই পায় নি। ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিল। মার বিছানা-পত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। স্টেশন থেকে ফেরার পথে ভলোদয়ার মনে অনেক কথাই জাগে—কেন সাশা-দা এমন কাজ করল? এ কি ঠিক পথ?

মা পিটার্সবুর্গ থেকে ফিরে এলেন নিদারুণ খবর নিয়ে—সাশাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ভলোদয়া কেঁপে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে সে অংশ নেবেই। সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের মে মাস।

তরুণ ছাত্রনেতা

দাদার মৃত্যু ভ্লাদিমিরকে কঠিন করে দিয়ে গেল। সে বছরই সে চলে যায় কাজানে কলেজে পড়তে। এবার সে যোগ দিল পুরোপুরি ছাত্র আন্দোলনে। সতের বছরের তরুণ ছাত্রনেতা। পুলিস ধরে নিয়ে গেল তাকে। বিচারক বিদ্রূপ করে বলল, 'ছেলেমানুষ! এ পাগলামী কেন? দেখছ না তোমাদের বিরুদ্ধে কত বড় বাধা, নিরেট পাথরের প্রাচীর। একে ভাঙার দুঃসাহস করে লাভ কী?'

ভ্লাদিমির শান্ত ও নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিল, 'জীর্ণ প্রাচীর, এক ধাক্কায় সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত। মায়ের অনুরোধে বিচারক ভ্লাদিমিরকে ককুসকিনো-তে (বর্তমানে লেনিনো গ্রাম) তার দিদি আন্নার কাছে নির্বাসিত করল। তিন বছর ভ্লাদিমির নজরবন্দী রইল তার দাদা মশায়ের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে। এখানে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল চাষীজীবনের সঙ্গে।

এরপর ভ্লাদিমির চেষ্টা করল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে, কিন্তু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তালিকায় তার নাম

থাকাতে অনুমতি দেওয়া হল না। চার বছরের পাঠ্য-সূচী দেড় বছরের মধ্যে নিজে নিজেই পড়ে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করল ভ্লাদিমির। ওকালতি শুরু করল। কিন্তু সে আর ক'দিন।

ভ্লাদিমির এখন ২৩ বছরের যুবক। কক্সাকিনোতে থাকতে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। ভ্লাদিমির এখন পুরোদস্তুর বিপ্লবী। দাদার পথ নয়, মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার মধ্যে তিনি তাঁর পথ খুঁজে পেয়েছেন; অত্যাচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেছে তাঁর সামনে।

যোগ দিলেন মার্কসবাদী চক্রে। গড়ে উঠল "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম সমিতি"। জারের পুলিস ওৎ পেতে আছে। পেছনে চলে সব কাজ। গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে চলাফেরা। মাটির নিচে ছাপাখানা। এখান থেকে হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে শ্রমিকরা তরিতরকারির ঝুড়ি নিয়ে হাটে-বাজারে যায়! তার নিচে লুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা বিলি করে সেই ইস্তাহার।

১৮৯২ সালে ভ্লাদিমির সামারা সদর আদালতে উকিল হিসাবে নাম লেখান। কিন্তু ওকালতি তিনি করতে পারেন নি। নিজের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য তিনি নিয়োগ করলেন মার্কসবাদ অধ্যয়নে, বিপ্লবের প্রস্তুতিতে। যোগাযোগ করলেন ভলগা তীরের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক সংগঠনের পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল উদারনীতিক ও সংস্কারবাদীরা, তাদের মুখোশ খুলে দিতে লেখনী চালান। লেখেন 'জনগণের বন্ধু' কারা এবং কী ভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়ে বইখানি ছাপা ও প্রচারিত হয় গোপনে। কপির সংখ্যা বেশি ছিল না। 'হলদে খাতা' নামে বইটি হাতে হাতে ফিরত, তুমুল তর্ক ও উত্তেজনা জোগাত।

নাদেঝদা ক্রুপস্কায়ার সাথে পরিচয়

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিমিরের পরিচয় হল নাদেঝদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে ক্রুপস্কায়া ছিলেন নেভস্কি ফটকের ওপারে শ্রমিকদের রবিবাসরীয় সান্ধ্য স্কুলের শিক্ষিকা। এ শ্রমিকচক্রের পরিচালনা করতেন ভ্লাদিমির। এভাবে তাঁর সঙ্গে ক্রুপস্কায়ার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথায় আছে, "শ্রমিকদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রতিটি ব্যাপারেই ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহ। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি চাইতেন শ্রমিকদের সমগ্র জীবনটাকে ধরতে, সেই জিনিসটার খোঁজ করতেন যার হদিশ পেলে সবচেয়ে ভালোভাবে বিপ্লবী প্রচার নিয়ে হাজির হতে পারা যায় শ্রমিকদের কাছে"।

পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের মধ্যে ভ্লাদিমির হয়ে ওঠেন সংগঠক ও নেতা। তাঁর লেখা পুস্তিকা ও প্রচারপত্রগুলি জনগণের মধ্যে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে, এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। লেখার প্রাঞ্জলতা আনবার জন্য সে সময় তিনি প্রায়ই কথাসাহিত্যের আশ্রয় নিতেন। 'নতুন কারখানা আইন' পুস্তিকায় তিনি 'সিংহের শিকার' গল্পটি তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ওভারটাইমের নতুন নিয়মটায় সিংহের মাংস ভাগ করার কথা মনে পড়ে। "প্রথম ভাগটা সে ন্যায্য মতে নিজেই নিল। দ্বিতীয় ভাগটা নিল এজন্য যে সে পশুর রাজা। তৃতীয় ভাগটা নিল কারণ সে সকার চেয়ে বলবান, আর চতুর্থ ভাগটার দিকে যে থাবা বাড়াবে, তার আর প্রাণে বাঁচতে হবে না।" মজুরদের উপর শোষণ ও লুণ্ঠন চালাবার সময় পুঁজিপতিরাও ঠিক তাই করে।

১৮৯৫ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভ্লাদিমির বিদেশে যান। সুইজারল্যান্ডে প্লেখানভের সঙ্গে দেখা করে 'রাবোৎনিক' (শ্রমিক) নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে ঠিক হয়। প্যারিসে মার্কসের জামাতা, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী পল লাফার্গের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করবার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু এঙ্গেলস তখন ছিলেন গুরুতর অসুস্থ। সুটকেসের গোপন-তলায় মার্কসবাদী সাহিত্য লুকিয়ে নিয়ে তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন।

পিটার্সবুর্গ জেলে—সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে

বিপ্লবী কর্মীদের পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই ফলল। ১৮৯৬ সালে সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে পিটার্সবুর্গে সুতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। প্রচণ্ড আঘাত হানল জার সরকার। গ্রেপ্তার হলেন ভ্লাদিমির ও তাঁর বহু সহকর্মী। 'রাবোচেয়ে দেলো' (শ্রমিক আদর্শ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হস্তগত করল পুলিস। ভ্লাদিমিরকে নিয়ে যাওয়া হল পিটার্সবুর্গ জেলে। এই জেলে বসেই তিনি লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচী। বই ও পত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে কালির বদলে দুধ দিয়ে তিনি লিখতেন ও বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। আগুনের উপর ধরতেই দুধের লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠত। পরদিন সেই লেখা ইস্তাহার হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সারা শহরে। রুটি দুধে ভিজিয়ে নিয়ে দোয়াত তৈরি করতেন তিনি। আর যেই সেলের গরাদের সামনে পায়ের শব্দ হত, অমনি তা খেয়ে ফেলতেন। পরিহাস করে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'জানো, ছয়টা দোয়াত আজ আমাকে খেতে হয়েছে।'

ভ্লাদিমির পিটার্সবুর্গ জেলে কাটান প্রায় ১৪ মাস। এখানে বসেই তিনি শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত বই "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ।" দিদি আন্না তাঁর প্রয়োজনীয় বই জেলে পৌঁছে দিতেন। ১৮৯৭ সালের

ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেললাইন থেকে শত-শত কিলোমিটার দূরে এক অজ সাইবেরীয় গ্রাম শুসেনস্কয়ে-তে থাকা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তবু এরই মাঝে তিনি পড়াশুনা ও লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। স্কেটিং করতেন, শিকারে যেতেন, দেখা করতেন আশেপাশে নির্বাসিত বন্ধুদের সঙ্গে। আর চিঠি লিখতেন এন্তার। এ সম্পর্কে আন্না ইলিনিচনা লিখে-ছেন, "চিঠিগুলিতে বিষাদ বা নালিশের কোন চিহ্ন ছিল না, বরং তার বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা থেকে আনন্দ উপচে পড়ত, যে কোন কাজের পক্ষে তা ছিল সেরা দাওয়াই।" চাষীরা তাঁর কাছে আসত, অভাব-অনটনের কথা জানাত, পরামর্শ ও সাহায্য চাইত। পরে ভ্লাদিমির সে সব কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, 'যখন সাইবেরিয়ায় ছিলাম, তখন আমাকে উকিল হতে হয়েছিল, অবশ্য আন্ডারগ্রাউন্ড উকিল।'

এক বছর পর শুসেনস্কয়ে গ্রামে নির্বাসিত হয়ে এলেন নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া। ভ্লাদিমিরের বাগ্‌দত্তা বধূ হিসাবে তাঁকে এখানে এসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিয়ে হয় তাঁদের এখানেই।

নির্বাসন থাকাকালে ভ্লাদিমির লেখেন তিরিশ-টিরও বেশি রচনা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্তব্য"। "রাশিয়ায় পুঁজি-বাদের বিকাশ" বইখানি তিনি এখানেই শেষ করেন। বইটি হল রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মার্কসের 'পুঁজি'র পূর্বানুসরণ।

দূর-নির্বাসনে থেকেও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ সময় ধর্মঘট ও শ্রমিক বিক্ষোভের খানিক সাফল্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাট-দের একটা অংশ শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করে, 'কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাও। রাজনৈতিক সংগ্রামটা বুর্জোয়াদের ব্যাপার।' 'অর্থনীতিবাদীদের' এই কার্য-কলাপকে ভ্লাদিমির গুরুতর বিপদ বলে মনে করলেন। এরা শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলছিল বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসের পথে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে ছোট করে রাজ-নৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে দিয়ে। এই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে তিনি মার্কস-বাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করেন। প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের উপর, যে পত্রিকাটি শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, হবে সংগঠকও। মেলাতে হবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্থানীয় চক্র ও গ্রুপগুলিকে একক সংগঠনে।

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে ভ্লাদিমির সস্ত্রীক শুসেনস্কয়ে ছাড়লেন। রাজধানী পিটার্সবুর্গে আসার তাঁর উপায় ছিল না। পুলিসে ধরবে। তাই আশ্রয় নিলেন তিনি পাশের একটি ছোট শহর পস্কভ-এ। পত্রিকা প্রকাশের জন্য এবার তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। পুলিসের উপদ্রবে রাশিয়ায় তা বের করা অসম্ভব। তাই বিদেশ থেকে তা প্রকাশের সংকল্প করলেন। এই উদ্দেশ্যে পুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মস্কো, পিটার্সবুর্গ, রিগা, সামারা, নিঝনি-নভগোরদ ও স্মলেনস্ক সফর করলেন। গ্রেপ্তার হলেন পিটার্সবুর্গ আসার পথে। তবে শীঘ্রই তিনি সেবার ছাড়া পান।

ইস্‌ক্রা প্রকাশিত হল

বহু কষ্টে সীমান্ত পার হয়ে ১৯০০-র ১৬ই জুলাই তিনি এলেন জার্মানীতে। শুরু হল তাঁর দেশান্তরী জীবন। সারা রুশ বিপ্লবী পত্রিকার নাম হয় "ইস্‌ক্রা" (স্ফুলিঙ্গ)। সম্পাদকমণ্ডলী আস্তানা নিলেন মিউনিকে। কাগজটির প্রতি সংখ্যায় বড় হরফে লেখা থাকত, "স্ফুলিঙ্গ থেকেই একদিন আগুন জ্বলে উঠবে।" পরে ঘটলও তাই। রাশিয়ায় বিপ্লববহ্নি লেলিহান হয়ে উঠল। আর তাতে ভস্মীভূত হল জার-স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সমস্ত মন তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই পত্রিকা প্রকাশে। সে-সময় এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমাদের সমস্ত জীবন-রস ঢালা চাই প্রসব-আসন্ন বাচ্চাটির পুষ্টির জন্য।" বাস্তবিকই 'ইস্‌ক্রা' ছিল তাঁর প্রিয়তম সন্তান।

রাশিয়ার মধ্যে গড়ে উঠল ইস্‌ক্রার সহযোগী গ্রুপ, এজেন্টদের একটা জালি-বুনট। তারা কাগজটি ছড়াত, খবরাখবর পাঠাত, চাঁদা তুলত। রাশিয়ায় কাগজটি পাঠানো ছিল খুবই কঠিন। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য, ইস্‌ক্রা যে সব স্যুটকেসে পাঠানো হত, তাতে থাকত দুটো করে তল। বইয়ের মলাটের মধ্যে বাঁধাই করে, যাত্রী কমরেডদের কোটের অন্তরণের মধ্যে সেলাই করে পাঠানো হত কাগজটি।

১৯০১ সালের শেষের দিকে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছু কিছু লেখার নিচে স্বাক্ষর দিতে শুরু করেন—লেনিন। ক্রুপস্কায়ার মতে, এ ছদ্মনাম নির্বাচনটা নেহাত আকস্মিক হতে পারে। ইস্‌ক্রার কাজ তিনি করতেন প্লেখানভের সঙ্গে। প্লেখানভ তাঁর লেখার তলে স্বাক্ষর করতেন ভলগিন (ভলগা নদীর নামে)। লেনিন হয়তো তাঁর ছদ্মনামটা নেন সাইবেরীয় মহানদী লেনা থেকে।

১৯০২ সালে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "কী করিতে হইবে?" এতে তিনি প্রলেতারিয়ান মার্কস-বাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। রাশিয়ায় পার্টি রূপ গ্রহণের আগে থেকেই পশ্চিম ইওরোপে শ্রমিক পার্টি বর্তমান ছিল। এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের অবস্থায়। বিপ্লবী সংগ্রামের যোগ্যতা এদের ছিল না। এরা চলত আপসের পথে। এই সুবিধাবাদীরা বোঝাত যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়াই শোষণের অবসান ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। আসলে এরা হয়ে দাঁড়াত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দালাল। এদের বিরুদ্ধে, লেনিন বললেন, নতুন ধরনের

সংগ্রামী পার্টি, খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গড়তে হবে। এ পার্টিকে হতে হবে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বে সমৃদ্ধ। "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়"—বললেন লেনিন।

কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মসূচী ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালে লেনিন লিখলেন "গ্রামের গরিবদের প্রতি"। এতে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝান, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কী চায় এবং কেন শ্রমিকের সংগে কৃষকের ঐক্য প্রয়োজন।

১৯০৩ সালের মে মাসে ইসক্রার পেছনে পুলিসের চর লাগে। সম্পাদকরা লণ্ডন থেকে কাগজ বের করবেন স্থির করেন। এপ্রিলে লেনিন এলেন লণ্ডনে। এখানে থাকতে তিনি ইংরেজ শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, তাদের আন্দোলনকে মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন, প্রায়ই যেতেন শ্রমিক সভায়, আর অনেকটা সময় দিতেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে, যেখানে একদা মার্কস পড়াশুনা করেছেন।

এরপর আবার ইসক্রার মুদ্রণ স্থানান্তরিত হল জেনেভায়। লেনিনও চলে এলেন সেখানে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। তিনি ইসক্রার সম্পাদকীয় বোর্ডে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কংগ্রেস প্রথম বসে ব্রুসেলসে, কিন্তু বেলজিয়ান পুলিসের হানার পরে অধিবেশন চলে লণ্ডনে। কংগ্রেসে ইসক্রাপন্থীরা সংখ্যায় বেশি থাকলেও বহু সুবিধাবাদী এসে ভিড় করেছিল। এদের বিরুদ্ধে লেনিন সতেজে সংগ্রাম চালান। বিপ্লবী কর্মসূচী, প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতা—এইসব মূল মার্কসবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সুবিধাবাদীরা, কিন্তু তাদের সমস্ত আক্রমণই পরাস্ত হয়। লেনিনের সমর্থকরা অধিকাংশ (বলশিনস্তভো) ভোট পান। সেই থেকে তাঁদের নাম হয় বলশেভিক। আর সংখ্যালঘুতে পরিণত (মেনশিনস্তভো) সুবিধাবাদীদের বলা হয় মেনশেভিক। মেনশেভিকরা চায় পার্টিকে সুবিধাবাদের পথে টেনে নিতে। ফলে তাদের সংগে চলে বলশেভিকদের একটা অবিশ্রান্ত লড়াই। ১৯০৩ সালের নভেম্বরে প্লেখানভ মেনশেভিকদের দলে ভিড়ে পড়েন, ইসক্রা মেনশেভিকরা দখল করে নেয়। লেনিন তার সম্পাদকীয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন।

স্তালিন তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লেনিন তাঁকে চিঠিতে পার্টির অবস্থা এবং পার্টির জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। জেনেভা থেকে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "এক পা আগে দু' পা পিছে"। মেনশেভিকদের প্রচারের বিরুদ্ধে লেনিন জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলেতারিয়েতের আর কোন অস্ত্র নেই। পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী সচেতন বাহিনী।"

লেনিন পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি পরিণত হয়ে উঠছিল। প্রয়োজন ছিল মেনশেভিকদের বিভেদমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার। পার্টির মধ্যে সংগ্রামে অধিকাংশ পার্টি কমিটিগুলি বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসে। পার্টির বিপুল অংশ সংহত হয় লেনিনের পেছনে।

১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে লেনিনের পরিচালনায় জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয় একটি বলশেভিক পত্রিকা —"ভ্পেরিয়োদ"। এতে প্রকাশিত "পোর্ট আর্থারের পতন" প্রবন্ধে লেনিন বললেন, রাশিয়ায় বিপ্লব আসছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত সৈন্যরা ফিরে এসে দেখে ঘরসংসারের দুরবস্থা চরম। পিটার্সবুর্গে শ্রমিকরা ঠিক করল, জারের কাছে গিয়ে তারা সাহায্য চাইবে। সাহায্য অবশ্য দিল 'ত্রাণকর্তা' জার, তবে রুটি নয়, বন্দুকের গুলি। ১৯০৫ সাল ৯ই জানুয়ারি। দু' হাজার শ্রমিক সেদিন রুটি চাইতে এসে গুলিতে প্রাণ দিল। শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞা করল, আর ভিক্ষা নয়, এবার দাবি। আর লড়াই করেই এ দাবি আদায় করবে তারা।

দূর প্রবাসে থেকে লেনিন সব কিছু লক্ষ্য করলেন। বুঝলেন তিনি, বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই অবিলম্বে কংগ্রেস আহ্বানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বসল লণ্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে। মেনশেভিকরা তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করল। জেনেভায় তারা ডাকল তাদের নিজেদের সম্মেলন, স্পষ্টতই এটা পার্টি ভাঙবার একটা পদক্ষেপ, বিপ্লবের মূল প্রশ্নগুলি আলোচিত হয় কংগ্রেসে। সভাপতি নির্বাচিত হন লেনিন। পেশ করেন তিনি একাধিক রিপোর্ট। সশস্ত্র বিপ্লব, সাময়িক বিপ্লবী সরকার, কৃষক আন্দোলনের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলির খসড়া তিনিই করেন। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে থাকেন লেনিন। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "প্রলেতারি" পত্রিকার সম্পাদকও হন তিনি।

কংগ্রেসের পর লেনিন জেনেভায় ফেরেন। এ সময় প্রকাশিত হয় "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল" বইখানি। লেনিন রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য করেন। এ বিপ্লবের লক্ষ্য—ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ। লেনিনই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুগের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকাশক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতের বিচার করেন। তিনি মনে করেন, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ হল বুর্জোয়া বিপ্লবকে সফল করা, কারণ এর ফলে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এগিয়ে

আসবে। বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি ও নেতা হতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হবে কৃষক। লেনিন দেখিয়ে দিলেন যে, মেনশেভিকদের লাইন হল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন করার প্রয়াস। লেনিন এ বইয়ে লিখলেন, কৃষকের সঙ্গে একত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়ী হবার পর প্রলেতারিয়েত তার শক্তি সংহত করে, গরিব কৃষক ও শহরের গরিবদের সম্মিলিত করে আঘাত হানবে পুঁজিবাদের উপর। এভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিণত হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

১৯০৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে পিটার্সবুর্গ ও অন্যান্য জায়গায় শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ উঠল। জুন মাসে কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীর "পতেমকিন" যুদ্ধ জাহাজে জ্বলে উঠল নৌসৈন্যের বিদ্রোহ। অক্টোবরে শুরু হল সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘট। বন্ধ হল কলকারখানা, ডাক ও তার অফিস। অচল হয়ে পড়ল দেশের জীবনযাত্রা। জার, জমিদার ও পুঁজিপতিরা সন্ত্রস্ত। জার সরকার ঘোষণা করল, সভাসমিতির স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার দেওয়া হল। এ হল বিপ্লবের প্রথম জয়।

কিন্তু জারের এই ঘোষণা লেনিনকে ধোঁকা দিতে পারল না। তিনি স্পষ্ট বললেন, জারের ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করো না। এখনও অনেক লড়াই বাকি। প্রস্তুত হও। সৈন্যদের দলে টেনে নিয়ে এসো। চাষীদের বুঝিয়ে এগিয়ে নাও। আরও ছড়িয়ে পড়ুক ধর্মঘট।

ঝড়ো দিনগুলির মধ্যে গড়ে উঠল গণ-রাজনৈতিক সংগঠন—শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। লেনিন বললেন, এগুলিই হবে আগামী দিনে মেহনতীদের রাষ্ট্রক্ষমতা। এ সময় রাশিয়া থেকে দূরে থাকা লেনিনের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ফিরে এলেন পিটার্সবুর্গে। আইনসঙ্গত বলশেভিক সংবাদপত্র "নভায়া ঝীজন" (নবজীবন) পরিচালনা করতে লাগলেন। জারের কাছ থেকে কিছু স্বাধীনতা আদায় হলেও লেনিনকে থাকতে হত পুলিসের চোখ এড়িয়ে। প্রায়ই পাসপোর্ট ও বাসা বদল করতে হত। কয়েকবার ফিনল্যান্ডেও চলে যেতে হয়েছিল।

বিপ্লব শীর্ষে পৌঁছল ডিসেম্বরে মস্কো শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। নয়দিন ধরে কয়েক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালায় জারের পুলিস ও কশাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে। গোর্কি তখন মস্কোয় ছিলেন। তিনি এক চিঠিতে শ্রমিকদের এ লড়াইকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মস্কোর পরই বিদ্রোহ জেগে উঠল অন্যান্য শহরে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন এ সব অভ্যুত্থান তেমন সংগঠিত ছিল না। জার তাই নির্মমভাবে তা দমন করে দিতে পারল।

অনেক নেতাই হাল ছেড়ে দিলেন। লেনিনের কিন্তু বুঝতে এতটুকু দেরী হয় নি যে বিপ্লবের এ শেষ পর্ব নয়, এটা শুধু প্রথম পর্ব। শ্রমিকদের তিনি বোঝালেন, প্রস্তুত হও, আমাদের এগোতেই হবে।

পিটার্সবুর্গ ছেড়ে লেনিন ফিনল্যান্ডে এসেছেন। এখানে তামারফর্সে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনেই তাঁর স্তালিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে স্তালিন লিখেছেন, "সাধারণত 'মস্ত লোকেরা' সভায় আসেন একটু দেরি করে যাতে লোকে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে এবং 'মস্ত লোকটি' এসেছেন শুনলেই 'ঐ আসছেন, চুপ চুপ' ধ্বনির একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু যখন শুনলাম, লেনিন অন্য প্রতিনিধিদের আগেই সম্মেলনে এসে এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেহাত মামুলি কথাবার্তা বলছেন, তখন আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম......পরে বুঝেছি, এই যে সরল বিনয়নম্র স্বভাব, সবার দৃষ্টির অগোচরে থাকার, নিজেকে জাহির না করার মনোভাব, লেনিন-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই সাধারণ মানুষের, নতুন জনগণের নতুন নেতার সব থেকে বড় গুণ।"

ফিনল্যান্ডেও জারের পুলিস লেনিনের পিছু নেয়। চলে যেতে হবে, অনেক দূর, একেবারে স্টকহোমে। যেতে হবে ডিঙি করে, কিন্তু সব ডিঙির উপরই পুলিসের কড়া নজর। ঠিক হল দূরে একটা দ্বীপে গিয়ে ডিঙি নেওয়া হবে। সে দ্বীপ কয়েক মাইল দূরে বল্টিক সাগরের মধ্যে। ডিসেম্বর মাস। জলের উপর বরফ জমেছে। তবে তখনও তা হেঁটে যাবার মতো শক্ত জমাট বাঁধে নি। এ অবস্থায় এ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি পায়ের তলায় বরফ একবার সরে যায়, তবে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু উপায় নেই দেরি করার। পুলিস ধাওয়া করছে। একবার ধরতে পারলে একেবারে ছিঁড়ে খাবে। তাই দুজন চাষীকে নিয়ে লেনিন এগিয়ে চললেন। হঠাৎ পায়ের নিচে বরফ ভেঙে বসে যেতে আরম্ভ করল। মুহূর্তমধ্যে ঐ বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ডুবে মরতে হবে। কী বিশ্রীই না হবে সে মরণ! ভাবলেন লেনিন। টেনেহিঁচড়ে কোনমতে তাঁরা একটা শক্ত বরফের চাঙড় ধরে সে যাত্রা বেঁচে যান। সময়মতো এটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষা।

এভাবে লেনিন গিয়ে পৌঁছলেন স্টকহোমে। যোগ দিলেন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে। বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের তীব্র সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস চলে। সে সময় অনেক বলশেভিক সংগঠন গণ-আন্দোলনে ব্যাপৃত ও দমনে বিপর্যস্ত থাকায় কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি। তাই মেনশেভিকরা সংখ্যাধিক্যে সমস্ত প্রধান প্রশ্নেই নিজেদের সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিতে পারে। কেন্দ্রীয়

কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ ও কেন্দ্রীয় মুখপত্র দখলও সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। কিন্তু মেনশেভিকদের এ জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মার্কসবাদের বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের জয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। শীঘ্রই বলশেভিকরা মেনশেভিকদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারল।

১৯০৭ সালের মে মাসে লন্ডনে বসল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস। লেনিন তার সভাপতিত্ব করলেন, লিখলেন কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাব। বিপ্লবে বলশেভিক কর্মসূচীর যথার্থতা সমর্থিত হল কংগ্রেসে। মেনশেভিকদের পরাভূত করল বলশেভিকরা। আগস্টে লেনিন স্টুটগার্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাজির থাকেন।

১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে লেনিন আবার জেনেভায় ফিরলেন। আত্মনিয়োগ করলেন নতুন উদ্যোগ নিয়ে নতুন বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, এ পরাজয় কেবল সাময়িক। স্বৈরাচারের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েতের জয় অবশ্যম্ভাবী। পার্টির উদ্দেশে লেনিন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "বিপ্লবের জন্য দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাজ করছি আমরা। আমাদের লৌহদৃঢ় বলা হয়, খামকা নয়। প্রলেতারিয়ান পার্টি প্রথম অসাফল্যে হতোদ্যম হয় না, মাথা খারাপ করে না, হঠকারিতায় নামে না...এই পার্টিই পৌঁছবে বিজয়ে!" প্রতিক্রিয়ার সে বিষণ্ণ বছরগুলিতে লেনিন ভাবছিলেন আসন্ন বিজয়ের কথা। তখন প্রতিশোধ নিচ্ছিল জার সরকার। হাজার হাজার মানুষের প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন দিয়ে ভেবেছিল সবকিছু স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে।

জেনেভায় এসে লেনিন "প্রলেতারি" পত্রিকার নব সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন করলেন। টেনে আনলেন গোর্কি, লুনাচারস্কি ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের। পুনঃপ্রকাশিত হল "প্রলেতারি"—বিপ্লবের নতুন জোয়ারের জন্য পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করে তোলার এক হাতিয়ার। লেনিন বললেন, প্রয়োজন অবৈধ পার্টি সংগঠনকে জোরদার করা ও সেই সঙ্গে প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা। শেখালেন, দুমায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দেবার যে কোন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ে কাজ করা দরকার। এভাবে আইনসঙ্গত কাজের সঙ্গে মেলাতে হবে বেআইনী কাজ। বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর মেনশেভিকরা আতঙ্কে পিছু হটে, শ্রমিক শ্রেণীকে বলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপস করতে। কেউ কেউ বলে পার্টি তুলে দেবার কথা। লেনিন দৃঢ়ভাবে বলেন, প্রলেতারিয়েতের পার্টির কর্তব্য এই সমস্ত সুবিধাবাদীদের ঝেড়ে ফেলা।

১৯০৮-এর এপ্রিলে লেনিন গেলেন ইতালির কাপ্রি দ্বীপে গোর্কির সঙ্গে দেখা করতে। লেনিন মন দিয়ে শোনেন গোর্কির বাল্য ও কৈশোরের কথা, তাঁর ভবঘুরে জীবনের কাহিনী, পরামর্শ দেন তা লিখতে। লেনিনের সঙ্গে আলাপ গোর্কির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে "প্রলেতারি" পত্রিকার প্রকাশন স্থানান্তরিত হয় প্যারিসে। লেনিন ও ক্রুপস্কায়া এ উপলক্ষে সেখানে আসেন। শ্রমজীবী ফ্রান্সের জীবন লেনিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, যান শ্রমিক সভায়, শ্রমিক এলাকার থিয়েটারগুলিতে। এ সময় পার্টির ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে লেনিন তাঁর তাত্ত্বিক ভিত্তির ভাবাদর্শগত বিশুদ্ধতা, মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদের প্রতি আনুগত্যের সংগ্রামও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। লেনিন এর জবাবে লেখেন, "বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা"। এঙ্গেলস বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।" লেনিন দর্শন নিয়ে 'মাথা ঘামান না' বলে প্লেখানভ বিদ্রূপ করতে খুব পটু ছিলেন বটে, কিন্তু সবাই জানেন যে লেনিনই এ গ্রন্থে সে কর্তব্য পালন করেছেন, প্লেখানভ তা করতে সাহস পান নি। বইটিতে লেনিন মার্কসবাদী দর্শনের বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

শুধু যে লিকুইডেটরদের (যারা পার্টি তুলে দিতে চায়) মতো প্রকাশ্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গেই লেনিন আপসহীন সংগ্রাম চালান তাই নয়, তিনি লড়েন তাদের বিরুদ্ধেও যারা নিজেদের সুবিধাবাদ চাপা দিত বিপ্লবী বুলির আড়ালে। পরে লেনিন " 'বামপন্থী' কমিউনিজম —শিশুসুলভ রোগ" (১৯২০-এ প্রকাশিত) বইয়ে লেখেন যে, বলশেভিক পার্টি তার বাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল এজন্য যে 'বুলিবাগীশ বিপ্লবীদের' মুখোশ নির্মমভাবে উন্মোচন করে তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়। ১৯০৮-১২ এই কয় বছর লেনিন প্রধানত দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্তালিন এক জায়গায় লিখেছেন, "অনেকে লেনিন সম্বন্ধে অভিযোগ করতেন যে, তিনি দারুণ বাদানুবাদ ও দল ভাঙাভাঙির প্রতি আসক্ত। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, যদি পার্টি থেকে সুবিধাবাদীদের না তাড়ানো হত, তাহলে পার্টির ভেতরকার দুর্বলতা ও ঢিলেমী ঘুচত না, পার্টির দৃঢ় শক্তিশালী চরিত্রও গড়ে উঠত না। বুর্জোয়া শাসনের দিনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বাড়তে ও শক্তিশালী হতে পারে ঠিক সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে সে তার ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সুবিধাবাদী, বিপ্লব-বিরোধী ও পার্টি-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়তে পারে।"

১৯০৯-এর নভেম্বরে গোর্কির সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করে লেনিন তাঁকে চিঠি দেন ও কয়েক মাস পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উপস্থিত থাকেন কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় বলশেভিক পত্রিকা

"রাবোচায়া গাজেতা"র প্রথম সংখ্যা। এতে থাকে লেনিনের প্রবন্ধ "বিপ্লবের শিক্ষা"। তলস্তয়ের মৃত্যুর উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন লেনিন।

১৯১০ সালে রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে ফের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলশেভিকরা পেত্রোগ্রাদ থেকে "জ্ভেঝদা" (তারকা) এবং মস্কো থেকে "মিস্‌ল্" (ভাবনা) পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হয়। লেনিনের পরিচালনায় "জ্ভেঝদা" হয়ে ওঠে সংগ্রামী মার্কসবাদী পত্রিকা। ১৯১১ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি পার্টি স্কুলের ব্যবস্থা করেন লেনিন।

১৯১২-র জানুয়ারি। প্রাগে এককভাবে বলশেভিকদের সম্মেলন হয়। বলশেভিক পার্টি, নতুন ধরনের পার্টি গঠনে প্রাগ সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এর একটি জরুরী সিন্ধান্ত ছিল—পার্টি থেকে মেনশেভিক-লিকুইডেটরদের বহিষ্কার, সুবিধাবাদের সঙ্গে বলশেভিকদের পুরোপুরি সাংগঠনিক সম্পর্কচ্ছেদ। সম্মেলনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন লেনিন, স্তালিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং লেনিন ও স্তালিনের সম্পাদনায় বলশেভিকদের বৈধ দৈনিকপত্র "প্রাভদা"র প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯১২-র ২২শে এপ্রিল। রাশিয়ার কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিন প্যারিস ছেড়ে ক্রাকাউ (পোল্যান্ড) আসেন। এখানে তিনি ছিলেন দু'বছরের বেশি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া নাগাদ। প্রাভদার জন্য লেনিন প্রায় প্রতিদিনই লিখতেন। সেগুলি প্রকাশিত হত নানা ছদ্মনামে।

লেনিন বললেন, রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ৮ ঘণ্টা কাজের দিন, জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত—এই তিনটি মূল দাবির উপর নির্বাচনী অভিযান চালাল বলশেভিকরা। নির্বাচনী ফলাফলে খুশি হলেন লেনিন। লিখলেন, বলশেভিক প্রতিনিধিদের চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝুরিতে নয়, বরং শ্রমজীবী জনগণের সম্পর্কে সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসর্গী কর্মে। সাইবেরিয়ায় লেনা সোনার খনিতে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যার ঘটনায় সারা রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল। লেনিন বুঝলেন, ১৯০৫-এর পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠেছে শ্রমিকরা। আবার নতুন করে আসছে বিপ্লবের ঢেউ।

১৯১৪-র আগস্ট। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম দিন থেকেই লেনিন দৃঢ়ভাবে এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কিছুদিনের মধ্যেই অস্থায়ী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে জার সরকারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। দু সপ্তাহ আটক রেখে তাঁকে সুইজারল্যান্ডে চলে যেতে দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রচনা করেন লেনিন। বার্নে আসার পরদিনই তিনি বলশেভিকদের সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন এবং পেশ করেন "ইওরোপীয় যুদ্ধে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কর্তব্য।" লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালায়। বুর্জোয়া ও তাদের সেবাদাস সুবিধাবাদীরা কুৎসা রটায় যে, বলশেভিকদের দেশপ্রেম নেই, তারা দেশদ্রোহী। মোক্ষম জবাব দিয়ে লেনিন বোঝান, সত্যকার দেশপ্রেমিক হওয়ার অর্থ কী। তিনি লেখেন, সুবিধাবাদীরা হল শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতী মানুষের শত্রু, যারা শান্তির সময় বুর্জোয়ার স্বার্থে শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে নিজেদের কাজ চালায় গোপনে, আর যুদ্ধের সময় খোলাখুলি জোট বাঁধে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে, গ্রহণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি। পশ্চিম ইওরোপীয় পার্টিগুলির মধ্যে যারা প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ছিল, তাদের সংহতি সাধনের কাজ লেনিন চালিয়ে যান অক্লান্তভাবে। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তিনি ভেঙে-পড়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্থলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়তে বলেন। রুশ বলশেভিক ও তাদের সহগামী পশ্চিম ইওরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থীরা সে সময় ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু মার্কসবাদের অনিবার্য বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেনিন বললেন, "আমরা একলা পড়েছি, এটা কোন বিপদ নয়। আমাদের সঙ্গেই আসবে লক্ষকোটি মানুষ, কেননা বলশেভিকদের মতটাই একমাত্র সঠিক মত।"

বামপন্থীদের সংহতির উদ্দেশ্যে লেনিন জিমারওয়ালডে ও কীন্থালে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। প্রধান নির্ভর ছিল তাঁর লেখার আয়। অথচ যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশন ছিল অতি দুষ্কর। সে সময় এক পত্রে তিনি লেখেন, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলি, রোজগার দরকার। নইলে স্রেফ ধ্বংস, সত্যি বলছি।" সাদাসিদে দিন কাটাতেন তিনি। একটি কামরায় তিনি আর ক্রুপস্কায়া। আরামের অবকাশ ছিল না তাতে।

১৯১৬। লেনিনের মা মারা যান। মাকে বড় ভালোবাসতেন লেনিন। এ বছরই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত বই "সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়।" লেনিন তাতে দেখালেন যে, বিশ শতকের গোড়া থেকে পুঁজিবাদ তার বিকাশের নতুন পর্বে—সাম্রাজ্যবাদের পর্বে—প্রবেশ করেছে। "সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাহ্ণ।"

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের প্রথম সারিতে এগিয়ে এল লেনিনের পরিচালনায় রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকরা। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়, ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ জারতন্ত্রে একেবারে পচন ধরিয়ে দিল, লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, বিপ্লব আসছে। ডাক দিলেন তিনি, "যেসব বিশ্বাসঘাতকের দল নিজেদের স্বার্থে মুনাফার লোভে তোমাদের পরস্পরকে গুলি

করে মারতে বলছে, ঐসব শাসকদের, ঐসব পুঁজিদার-দের বিরুদ্ধে বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ধর, এ যুদ্ধের আগুনে আজ বিপ্লববহ্নি জ্বালাও।"

প্রথম জেগে উঠল পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা। রক্তাক্ত রবিবারের বার্ষিকীতে একটা বিরাট যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল বের হল। মিছিল হল মস্কো, বাকু, নিঝনি-নভগোরদেও। ফেব্রুয়ারিতে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে নামল। তাতে যোগ দিল দুই লক্ষের উপর শ্রমিক। ধ্বনি উঠল, 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'যুদ্ধ ধ্বংস হোক', 'রুটি চাই'। জার সরকার সৈন্য দিয়ে দমন করতে চাইল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দিল সৈন্যদল ও নৌবাহিনী। শ্রমিকরা পেত্রোগ্রাদ শহর দখল করে নিল। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। কিন্তু সোভিয়েতগুলিতে যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা ঢুকে পড়েছিল, তারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিল বুর্জোয়াদের গড়া অস্থায়ী সরকারের হাতে। দেখা দিল দ্বৈত ক্ষমতা—একদিকে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার, অন্যদিকে সোভিয়েত বা প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ক্ষমতা।

লেনিন তখন সুইজারল্যান্ডে। রাশিয়ায় ফিরবার জন্য ব্যাকুল। এদিকে সীমান্তে রুশ-জার্মান যুদ্ধ সমান-তালে চলেছে। জারের জায়গায় যে নতুন সরকার বসেছে, তারা না আনল শান্তি, না দিল জনসাধারণকে রুটি। শ্রমিকদের ঠকাল তারা, বলতে লাগল রাজতন্ত্রের পতনের পর যুদ্ধ নাকি ন্যায়যুদ্ধ হয়ে উঠেছে। জন-গণকে প্রতারণার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সাহায্য করতে লাগল মেনশেভিকরা। এ অবস্থায় গুপ্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে বলশেভিক পার্টি তার শক্তি সমাবেশ করতে লাগল, বহু বিশিষ্ট কর্মী জার্জিনস্কি, সভের্দলভ, স্তালিন ফিরে এলেন জেল ও নির্বাসন থেকে। পুনঃপ্রকাশিত হল "প্রাভদা"। লেনিন লিখলেন, "বিপ্লবের প্রথম পর্যায় কেবল শেষ হয়েছে। ক্ষমতা গেছে বুর্জোয়াদের হাতে। অস্থায়ী সরকারকে বিশ্বাস করা চলবে না, চলবে না বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় পাকা হয়ে বসবার সুযোগ দেওয়া। সর্বোপায়ে লড়তে হবে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার লক্ষ্যসাধনের জন্য, বিধ্বস্ত করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং তৈরি হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য।"

লেনিন রাশিয়ায় ফেরার উপায় খুঁজতে লাগলেন। বাধা দিল অস্থায়ী সরকার। এ সরকার বিদেশে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাল লেনিন ও অন্যান্য বলশে-ভিকদের নামে একটা ব্ল্যাকলিস্ট। দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হল না তাঁদের। অবশেষে বহুকষ্টে সুইজার-ল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের একটা ব্যবস্থা হল। প্রায় দশ বছর ফেরারী জীবন কাটিয়ে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল লেনিন পেত্রোগ্রাদে এসে পৌঁছলেন। মহোল্লাসে বিপ্লবী রাশিয়া অভ্যর্থনা জানাল তার মহান নেতাকে। সৈনিক ও নাবিকদের বিপ্লবী বাহিনী দিল গার্ড অব অনার। তুমুল করতালি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে লেনিন উঠলেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ একটি সাঁজোয়া গাড়ির উপর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উদ্দীপ্ত আহ্বান জানা-লেন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের কাছে।

নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক

পেত্রোগ্রাদে পৌঁছেই ৪ঠা এপ্রিল বলশেভিকদের সভায় বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে থিসিস পেশ করেন। ইতিহাসে এটি "এপ্রিল থিসিস" নামে খ্যাত। এতে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা হাজির করেন।

এদিকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। দলে দলে সৈন্য পাঠানো হল ফ্রন্টে কামানের খোরাক হিসাবে। শ্রমিক-কৃষকের জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। ৩রা জুলাই শ্রমিক ও সৈনিকরা পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় নামল। তাদের কণ্ঠে গর্জে উঠল—সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই। সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল অস্থায়ী সরকার। জন-গণের রক্তে রাজপথ ভাসল। তছনছ করা হল "প্রাভদা" সম্পাদকীয় ভবন। কারাগারে পাঠানো হল বহু বল-শেভিককে। অস্থায়ী সরকারের নেতা কেরেনস্কি ঘোষণা করল, লেনিনকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার। পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা লেনিনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখল তাদের বস্তিতে। পরে তিনি চলে যান রাজলিফ হ্রদের তীরে একটা কুঁড়ে ঘরে, ফিনদেশীয় ঘেসুড়ে সেজে। কুঁড়ের কিছু দূরে ঝোপের মাঝে ছোট্ট একটু জায়গা সাফ করে রাখা হল। লেনিন রসিকতা করে বলতেন, "আমার সবুজ অফিস-ঘর।" সেখানে ছিল দুটো কাঠের গুঁড়ি, চেয়ার টেবিলের বদলে। এই কাঠের গুঁড়ির উপর বসেই লেনিন লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"।

১৯১৭-র আগস্টে আধা গোপনে পেত্রোগ্রাদে পার্টির যে ষষ্ঠ কংগ্রেস হয়, লেনিন তার পরিচালনা করেন গুপ্তভাবে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির খতিয়ান পেশ করেন স্তালিন। কংগ্রেস থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করার সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হয়। সিদ্ধান্তে লেনিনের এই নির্দেশের উপর জোর দেওয়া হয় যে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গরিব কৃষকের মৈত্রীই হল সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত। পার্টি কংগ্রেসের পর

কলকারখানায় গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে লাল রক্ষীবাহিনী। সেপ্টেম্বরের দিকে ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান সেজে লেনিন ফিনল্যান্ডে হেলসিংফোর্সে (হেলসিঙ্কি) চলে যান। বিপ্লবের শত্রুদের অভিসন্ধি তিনি আঁচ করেছিলেন। পার্টি ও জনগণকে তিনি সতর্ক করে দেন। জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ করে সৈন্য চালায় পেত্রোগ্রাদের দিকে। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব নিল পার্টি। বিধ্বস্ত হল কর্নিলভ। ফিনল্যান্ড থেকে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট পাঠালেন দুটি ঐতিহাসিক চিঠি— "বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে" এবং "মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান।" এরপর লেনিন চলে এলেন ভিবর্গে পেত্রোগ্রাদের কাছাকাছি যাবার জন্য। "বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?" প্রবন্ধে লেনিন বোঝালেন যে, বুর্জোয়াদের এ প্রচারটা কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দেবার মতলবে। এরপর এক পত্রে লেনিন লিখলেন, "অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিলম্ব করা চলে না, এই মুহূর্তে এগুনো দরকার।" ২০শে অক্টোবর গোপনে লেনিন পেত্রোগ্রাদে এলেন। ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিন রচিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হল। ২৯শে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হল স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সামরিক বিপ্লবী কেন্দ্র। পার্টিতে হেরে গিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেয়, ফাঁস করে দেয় কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিদ্ধান্ত। লেনিন তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন।

৬ই নভেম্বর লেনিন রাত্রে ছদ্মবেশে এলেন পেত্রোগ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য। শুরু হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। শ্রমিক, সৈন্যদল ও নৌবাহিনী একযোগে ঝড়ের মতো আক্রমণ চালাল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবী অভ্যুত্থান বিজয়ী হল। রাষ্ট্রক্ষমতা এল সোভিয়েতগুলির হাতে।

সন্ধ্যায় স্মোলনিতে বসল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। লেনিন শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি প্রস্তাব আনেন, অবিলম্বে ফ্রন্টে যুদ্ধ বিরতির জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে ঘোষণা পাঠানো হোক। শান্তি ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব—প্রথম দিন থেকেই এই হল নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি। কংগ্রেসে শান্তি ও ভূমি ডিক্রি গৃহীত হল। ভূমি ডিক্রিতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি মালিকানা উচ্ছেদ হল। প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন।

স্মোলনিতে হল নতুন সরকারের কর্মকেন্দ্র। এখান থেকেই পাঠানো হত সব নির্দেশ ও সার্কুলার। দেশের সব প্রান্ত থেকে লোকজন আসত। সর্বদিকেই ছিল লেনিনের নেতৃত্ব। কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। তিনি ছিলেন এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। "জনগণের প্রতি" আবেদনে তিনি তাদের সোভিয়েতগুলির চারপাশে দাঁড়াবার, নির্ভয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ হাতে নেবার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রের কাজটা নাকি শুধু ধনীদের পক্ষেই সম্ভব, এই মিথ্যা রটনার সমাপ্তি করতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের লেনিনীয় খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয় সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিনগুলিতেই। ঘোষিত হয় রাশিয়ার সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমানাধিকার। স্তালিন ঐ ঘোষণাটি রচনা করেন এবং এতে স্বাক্ষর দেন লেনিন ও স্তালিন উভয়েই। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পাঠানো হয়েছিল ট্রটস্কিকে। ট্রটস্কি পার্টির নির্দেশ অমান্য করে শান্তির আলোচনা ভেঙে দেন। এই সুযোগে জার্মান সৈন্য নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। প্রতিরক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগের প্রস্তাব করেন লেনিন।

১৯১৮ সালে ৬ই মার্চ পেত্রোগ্রাদে বসল পার্টির ৭ম কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই প্রথম পার্টি কংগ্রেস। গৃহীত হয় 'যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত'। পার্টির নতুন নামকরণ হয়। ১৯১৮-র মার্চে রাজধানী স্থানান্তরিত হল মস্কোতে। লেনিন বাসা নিলেন ক্রেমলিনে।

কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শত্রুরা চুপ করে রইল না। কেরেনস্কি বাহিনীকে চূর্ণ করা হল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যোগ দিল রাশিয়ার ধনী ব্যবসায়ী জমিদারদের সঙ্গে। এই 'হোয়াইট'রা তিন দিক থেকে সোভিয়েতকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করে এল। বহু ত্যাগ ও কষ্টের মধ্যে রাশিয়ার মেহনতী মানুষ যে ক্ষমতা দখল করেছে, তা রক্ষা করতে তারা এগিয়ে এল। ১৯২০ সালের মধ্যে পরাজিত হল 'হোয়াইট'রা লালফৌজের হাতে। খাদ্য পরিস্থিতি হল গুরুতর। কুলাক ও চোরাবাজারীরা শষ্য লুকিয়ে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে বিপ্লবকে মারতে চাইল। লেনিন ধ্বনি তুললেন, শষ্যের সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। শ্রমিকদের তিনি বললেন, 'কমরেডস, মনে রাখবেন, পরিস্থিতি সংকটজনক। বিপ্লবকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনারাই, আর কেউ নয়।'

প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি লেনিন ও সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ছড়াতে লাগল। লেনিন হল তাদের ভাষায় দানব দস্যু। তারা গুজব রটিয়ে চলল, লেনিনকে হত্যা করা হয়েছে। আর তাঁকে হত্যার চেষ্টাও চলল। ১৯১৮, ৩০শে আগস্ট। একটা কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন লেনিন। হঠাৎ সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারি সদস্যা কাপলান রিভলবার খুলে শ্রমিকদের প্রিয়তম নেতার উপর গুলি চালাল। গুরুতর আহত হলেন তিনি। উল্লসিত হল শত্রুর দল।

কিন্তু লেনিন বেঁচে উঠলেন। তাঁর যে এখনও অনেক কাজ বাকী রয়েছে।

১৯১৮-১৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে নামল। দশ লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য চারদিক থেকে বেষ্টন করল নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে। গড়ে উঠল লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ। স্তালিন ও জার্জিনস্কিকে পাঠালেন লেনিন প্রাচফ্রন্টে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য।

প্রকাশিত হল লেনিনের "প্রলেতারিয়ান বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি" বইখানা। এই শক্তিশালী রচনায় তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি সুবিধাবাদের প্রবক্তা কাউটস্কির বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে ধরেন।

১৯১৯ মার্চ। লেনিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। এতে তিনি "বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব" বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। এরপরই বসে পার্টির অষ্টম কংগ্রেস, প্যারি কমিউন দিবসে ১৮ই মার্চ। কমিউনিস্টরা সেদিন যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত করেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। এ কংগ্রেসের কর্মসূচীতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের গোটা পর্বটার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়।

১৯২০ সালের মার্চে নবম কংগ্রেসে লেনিন অর্থনৈতিক নির্মাণের পরিকল্পনা হাজির করলেন পার্টির সামনে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের তিনি ছিলেন অনুপ্রাণক ও সংগঠক।

জুলাই-আগস্টে পেত্রোগ্রাদে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস পরিচালনা করেন লেনিন। ১৯২১-এ পার্টির দশম কংগ্রেসেরও পরিচালক ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি ট্রটস্কি, বুখারিন প্রভৃতি উপদল-নেতাদের ক্রিয়াকলাপ ও পার্টি-বিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনেন। শুদ্ধির ফলে পার্টি সুসংহত হয়, দৃঢ় হয় তার ঐক্য।

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন লেনিন। তাঁর একমাত্র বিশ্রাম ছিল ক্রেমলিনের ময়দানে একটু পায়চারি অথবা বিশেষ ছুটির দিনে ক্রুপস্কায়া ও মারিয়া ইলিনিচনার সঙ্গে মস্কোর উপকণ্ঠের পাহাড়ে একটু বেড়ানো। কাজের চাপে ও গুলির জখমের ফলে (একট গুলি তখনও বের করা যায় নি) লেনিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। নিজের শরীরের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না, কিন্তু অন্য কারও শরীর একটু খারাপ হলেই বড় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তিনি। গোর্কির অসুখের জন্য লেনিন তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯২২ সালের মার্চে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিন ভাষণ দেন। রিপোর্টে তিনি নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রথম বছরের খতিয়ান করেন এবং সানন্দে জানান যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতি শুরু হয়েছে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। পার্টি কংগ্রেসে এই লেনিনের শেষ বক্তৃতা।

১৯২২ সালের গ্রীষ্মে অসুস্থ হয়ে পড়ে লেনিন মস্কোর উপকণ্ঠে গোর্কিতে চলে যান। চাষীরা ঝুড়ি বোঝাই ফলমূল এনে দিত। তিনি রেগে উঠতেন, বারণ করতেন, কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না পাছে তারা মর্মাহত হয়। সব খাবার তিনি রুগ্ন কমরেডদের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

অক্টোবরে মস্কো ফিরে এসে আবার কাজে লাগলেন। সভাপতিত্ব করলেন জনকমিশার পরিষদের, অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে, বক্তৃতা দিলেন। ১৩ই নভেম্বর তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসে রিপোর্ট দেন, "রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর ও বিশ্ব-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত।" ২০শে নভেম্বর মস্কো সোভিয়েত অধিবেশনে লেনিন তাঁর শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মিলিত করার কর্তব্য তিনি হাজির করেন। এ প্রশ্নের সিদ্ধান্তের জন্য স্তালিনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯২২-এর ডিসেম্বরে লেনিন ফের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার একটু সেরে উঠলেন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। এ সময় তিনি শ্রুতি-লিখন দিয়ে যান তাঁর শেষ প্রবন্ধগুলির—'কংগ্রেসের নিকট পত্র', 'দিনলিপির পাতাগুলি', 'সমবায় প্রসঙ্গে', 'আমাদের বিপ্লব', 'কি ভাবে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন পুনর্গঠিত করা উচিত', 'বরং অল্প কিন্তু ভাল করে'। "বরং অল্প কিন্তু ভাল করে" এই প্রবন্ধে লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেন—রাশিয়া ভারতবর্ষ ও চীন মুক্তি-সংগ্রামের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে বলে সমাজতন্ত্রের জয় আজ পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী।

লেনিন নির্দেশ দিলেন, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য আবশ্যক ভারী শিল্পের বিকাশ, টেকনিক্যাল পশ্চাদ-পদতার অবসান, সারা দেশের শিল্পায়ন ও বৈদ্যুতি-করণ। তিনি বললেন, জনশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে যেন কোন কুণ্ঠা না করা হয়। তিনি শেখালেন, প্রলেতারিয়ান রাষ্ট্রই হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের মূল হাতিয়ার। পার্টি কর্মীদের কাছ থেকে কঠোর শৃঙ্খলা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন নিজেই সে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত রেখে যান। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সম্পর্কে যেমন তিনি ছিলেন কঠোর ক্ষমাহীন, তেমনি ছিলেন বিনয়ী অনাড়ম্বর সংবেদনশীল। শত্রুরা তার বলিষ্ঠ ও শাণিত যুক্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস পেত না। লেনিনের যুক্তি ছিল এত স্পষ্ট ও জোরালো যে তা শ্রোতাদের মনকে প্রথমে আলোড়িত, ক্রমে উদ্দীপিত ও শেষপর্যন্ত, চলতি ভাষায় বলা চলে একেবারে দখল করে বসত। নীতির প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাঁর অবিচল। "নীতিনিষ্ঠ কার্য-পদ্ধতিই নির্ভুল কার্যপদ্ধতি" বলতেন লেনিন। আর

জনগণের সৃজনশীল শক্তিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস।

সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর বিপ্লবপ্রতিভা। সত্য-দ্রষ্টার মতো বিভিন্ন শ্রেণীর গতিপ্রকৃতি ও বিপ্লবের সম্ভাব্য গতিপথের বাঁকগুলো পরিষ্কার তিনি দেখতে পেতেন, যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে। লেনিন চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্তালিন দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

"প্রথম ঘটনাটা নভেম্বর বিপ্লবের ঠিক আগে, যখন লাখ লাখ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ও দেশের মধ্যে সংকটের তাড়নায় শান্তি ও মুক্তির দাবি তুলছে; যখন সেনাপতিরা ও বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবার মতলবে সামরিক শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে; যখন সমস্ত তথাকথিত 'সোশ্যালিস্ট' পার্টি-গুলো বলশেভিকদের বিরোধী এবং তাদের জার্মান-গুপ্তচর বলে বদনাম রটাচ্ছে, যখন কেরেনস্কি বল-শেভিকদের আত্মগোপনে বাধ্য করার চেষ্টা করছে; যখন একদিকে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদের ক্লান্ত ধ্বংসোন্মুখ রুশবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অন্যদিকে পশ্চিম ইওরোপের 'সোশ্যা-লিস্টরা' নিজ নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে ভিড়ে গেছে 'চূড়ান্ত জয়লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবার জন্য'......এ অবস্থায় বিদ্রোহ শুরু করার অর্থ সর্বস্ব পণ করা। কিন্তু লেনিন সে ঝুঁকি নিতে মোটেই ভীত হন নি, কারণ, তিনি জানতেন, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং বিজয়ও সুনিশ্চিত। লেনিনের এই বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তী ঘটনায় সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

"দ্বিতীয় ঘটনা—নভেম্বর বিপ্লবের প্রথম দিন-গুলির কথা—যখন গণপ্রতিনিধি পরিষদ বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারেল দুখোনিনকে যুদ্ধ-বন্ধ ও জার্মানীর সঙ্গে আপস আলোচনা শুরু করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন। মনে পড়ে, লেনিন, ক্রাইলেঙ্কো ও আমি পেত্রোগ্রাদের সর্বোচ্চ সমর-পরিষদে গেলাম দুখোনিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। দুখোনিন ও সমর-পরিষদ সটান বলে দিল, তারা গণ-প্রতিনিধি পরিষদের হুকুম মানবে না। সে একটা মারাত্মক মুহূর্ত। সামরিক কর্মচারী সমর-পরিষদের বশবর্তী। সৈন্যদের কথাও কিছু বলা যায় না। তার উপর কেরেনস্কি পেত্রো-গ্রাদের দিকে অভিযান চালাচ্ছে। টেলিফোনের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লেনিনের মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোঝা গেল, একটা সিদ্ধান্তে তিনি পেঁৗছেছেন। বললেন, বেতার স্টেশনে চল। আমরা দুখোনিনকে বরখাস্ত করে, তার জায়গায় কমরেড ক্রাইলেঙ্কোকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এক বিশেষ আদেশ জারি করব এবং অফিসারদের ডিঙিয়ে সৈন্যদের কাছে আবেদন জানাব, তারা যেন সেনাপতিগুলোকে ঘেরাও করে ফেলে, যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং জার্মান-অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়—এ ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু লেনিন ঘাবড়ালেন না, কারণ তিনি জানতেন, সৈন্যরা শান্তি চায় এবং শান্তি তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের দূরদৃষ্টি আশ্চর্যরকমভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়।"

১৯২৩ সালের মে মাসে লেনিন আবার গর্কিতে চলে আসেন। গ্রামের মুক্ত হাওয়া তাঁকে একটু সজীব করে তোলে। ছোটবেলার খেলার সাথী ভেরা এল তার ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দেখতে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা এল। হাসিমুখে সবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন লেনিন। কিন্তু এই ভাল হওয়া বেশি দিন টিকল না।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে লেনিন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ মারা গেলেন। এক মহাজীবনের অবসান হল।

কিন্তু মৃত্যু নেই লেনিনের। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মেহনতী মানুষ যেখানে শোষণের অবসান ঘটিয়ে নবজীবনের পথে, সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছেন, যেখানে মুক্তিকামী মানুষ কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, শহরের রাজপথে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর মুখোমুখি আজও লড়ছেন, তাঁদেরই মধ্যে বেঁচে রয়েছেন লেনিন, লেনিন তাঁদের পথ প্রদর্শক, মহানায়ক। দীর্ঘজীবী হোন কমরেড লেনিন।

[গণশক্তি লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

[গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে: ১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর, সাম্প্রতিক কার্যকলাপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমেত অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণমুখী হতে সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক শিবির যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণ, প্রতিটি হস্ত-ক্ষেপ, প্রতিটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে—তারজন্যে ভারতের যুবসমাজকে জনমত সৃষ্টি করতে হবে ভারতের যুব শক্তিকে এইভাবেই আগামী দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দল-মতের যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।' ইনক্লাব—জিন্দাবাদ

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

বন্ধুগণ,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এনে যে স্নেহ আর সম্মান দিয়েছে, তার জন্য আমরা এই উৎসবের কর্মকর্তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর সাথে সাথে এই সম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা আর বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসামের বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ছ'মাস ধরে বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলনের ফলে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে আর এই আলোড়নে আসামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে।

বর্তমানের এই আন্দোলনের মূলে যে অসমীয়া মানুষের ভয় আর ভাবাবেগ কাজ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদেশীর প্রাবল্যে অসমীয়ারা নিজের ঘরেই সংখ্যালঘু হওয়ার আশঙ্কা করেছে। তাছাড়া এই অবস্থায় আর্থিক বিকাশ, উদ্যোগীকরণ, কর্মসংস্থান আর কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যিক সরকারের দৃকপাতহীন মনোভাবের ফলে যে অন্তহীন নির্মম শোষণ আর বঞ্চনা চলছে তাও আসামবাসীদের মনে প্রচন্ড ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে।

আসামবাসীর এই ন্যায়সঙ্গত ভয় আর ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদী আর ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো ব্যবহার করে আসামে হিংসা আর সংঘর্ষের এক দাবানল সৃষ্টি করেছে। বিদেশী সনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের মত একটা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা আর ন্যায়িক বিধি ব্যবস্থার বাইরে অন্য পথ নেই। এবং এই শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আর সহযোগিতাকে উপেক্ষা করার ফলে বিদেশী বিতাড়নের পরিবর্তে আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের মনে শত শত বছর ধরে চলে থাকা ঐক্য আর সম্প্রীতির উপরে এক প্রচন্ড আঘাত আসলো; ভাষিক আর ধর্মীয় উভয় সম্প্রদায়েরই রক্ত ঝরলো; হাজার হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হলো। আর সংখ্যালঘুদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মরণপণ সংগ্রামকারী গণতান্ত্রিক সংগঠন, দল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরাও এই অমানুষিক আক্রমণের শিকার হলেন। ভ্রাতৃঘাতী আর সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি বর্তমানের আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ঐক্য আর ভারতের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও দীর্ঘদিন থেকে তেমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার এই আন্দোলনকে মূলধন করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা আসামের সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা অচল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। গরীব কৃষক শ্রমিকের অবস্থা জঘন্যতম হয়েছে। বাজার নেই, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নেই, হাজিরা নেই। শ্রমিকের মজুরী আর অন্যান্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনও একেবারে বন্ধ। শিক্ষাজগতেও সেই একই অচলাবস্থা। শিক্ষাজীবনের একটা অমূল্য বছরও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপদ নেমে আসছে। বিভিন্ন ভাষা ধর্মের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ অসমীয়া জাতির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা পড়েছে। মুসলমান কৃষিজীবী আর চা মজদুর, যারা অনসমীয়া হয়েও অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে অসমীয়া জনসমাজের সাথে মিশে গিয়েছেন, তাদের মধ্যেও সন্দেহ আর ভীতি জন্ম নিয়েছে। এককথায় অসমীয়া জাতি আর ভাষা সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক সংগ্রামী আর ঐক্যবদ্ধ পরম্পরার ওপরে প্রতিক্রিয়াশীলরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গৌহাটী শাখা আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিলন আর ঐক্যের পতাকাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি আসামের বিপ্লবী সংস্কৃতির অগ্রদূত আর এই সংঘের কর্মী জ্যোতিপ্রসাদ, বিষ্ণুরাভা আর মঘাই ওজা প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে রক্ষা আর প্রবাহিত করতে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ আর ঐক্যকে সুনিশ্চিত আর প্রবাহিত করে আসামে মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যে এই সংঘের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের পূর্বসূরীরা নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন। আমরাও ব্যাতিক্রম নই। আর তাই বিদেশী সনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের ক্ষেত্রে আমরা এক শান্তিপূর্ণ, ন্যায়িক আর গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার দাবী করি আর বর্তমানের উত্তেজনা আর ভ্রাতৃঘাতী হিংসার অন্ত ফেলানোর জন্য জনগণের

[শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়]

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা

অশোক ভট্টাচার্য্য

অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব গত ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নানা দিক দিয়ে এবারের যুব-ছাত্র উৎসব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। প্রথম কারণটি হ'ল—এবারই ক'লকাতার গন্ডী পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর এই উৎসবটির আয়োজক। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল--পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতির প্রতিফলন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। তৃতীয়টি—ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা। উপরের প্রথম দু'ট কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। কোলকাতার বাইরে যুব-ছাত্র উৎসব কতখানি সফল হ'তে পারে এনিয়ে যেমন সরকারী পর্যায়ে এবং অভিজ্ঞ মহলে আশংকা ছিল, তেমনি শিলিগুড়ির একজন যুবকর্মী হিসেবেও নিজেদের উপর পূর্ণ আস্থা কখনই রাখতে পারি নি। কারণ কোলকাতার বাইরে উত্তরবঙ্গের যাঁরা এই যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটির কর্মকর্তা বা কর্মী ছিলেন তাঁদের অনেকেরই যুব-ছাত্র উৎসব সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। যে যুব-ছাত্র উৎসব এ' বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হ'ল তা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। সেই ভাবেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল, কিন্তু লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন ইতিমধ্যে এসে পড়ায় উৎসবের দিনটিকে পিছিয়ে দিতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে যুব-উৎসব প্রস্তুতির সাথে যুক্ত কর্মীদের জড়িয়ে পড়তে হয় বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। স্কুল-কলেজগুলোও এই সময় হয় বন্ধ ছিল নতুবা স্বাভাবিক ক্লাস ব্যাহত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক কাজগুলোকে চালু রাখতে হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতাগুলোতে নাম লেখায়। লোকসভার নির্বাচনের পর যুব-ছাত্র কর্মীরা এই উৎসবের কাজে দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে আসতে থাকে। কেন্দ্রীয় অফিসে স্থান সংকুলানের অভাব ঘটে ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ গ্রহণ করবার আবেদন জানায়। ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় উত্তরবঙ্গের তিনটি কেন্দ্রে। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো প্রথম দিন থেকেই এমনভাবে শুরু হয় যা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড়ই ছিলো ব্যাপক। আনন্দের কথা এই অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনায় যত স্বেচ্ছাসেবক ছিল তার সবটাই ছাত্র-ছাত্রী কর্মী। সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাগুলোতে শুধু মাত্র প্রতিযোগীদেরই ভীড় হ'ত না, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও ভীড় হ'ত প্রচুর। বিচারক হিসাবে শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের যাদের কাছেই আবেদন করা হয়েছিলো তারাই সাড়া দিয়েছিলেন অকুণ্ঠচিত্তে। এমন অনেক বিচারককে দেখা গেছে যেদিন তাঁদের বিভাগের প্রতিযোগীতা ছিল না, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকে উপেক্ষা করেও দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। কি বিচারক, কি অভিভাবক, কি প্রতিযোগী সকলের মুখেই ছিল একটি কথা উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ধরনের সুযোগ কোনও দিন পায় নি। চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল দারুণভাবে সফল, প্রতিযোগীদের গুনাগুণ বিচারও ছিলো উন্নত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ সুদূরে কোলকাতা থেকে এগিয়ে এসেছিলেন শিলিগুড়ি শহরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সংখ্যার দিক দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ছিলো আরও ব্যাপক।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিটি দিনই তিলক ময়দানে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সাধারণ মানুষের প্রচুর সমাগম ঘটেছিলো। ভলিবল, খো-খো, হা-ডুডু, কাবাডি প্রতিযোগিতাগুলো দেখতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভীড় হয়েছিলো। প্রতিটি মুহূর্তে ছিল উত্তেজনায় ভরা। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহর থেকেও বিচারকরা এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। শিলিগুড়ির অনেক ক্রীড়া অনুরাগী মানুষের মুখেই শোনা যায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপকভাবে সফল হয় নি। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলোর মধ্যেও ছিল নতুনত্ব। সেদিক দিয়েও এই অনুষ্ঠান মানুষকে আরও বেশী আকর্ষিত করে। এবারের রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হ'ল প্রতিযোগিতায় নেপালী ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন। দার্জিলিং শহরে ১লা, ২রা, ৩রা ফেব্রুয়ারী নেপালী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়ে শহরটি রূপ নিয়েছিলো ছোটো খাটো উৎসবের। প্রতিযোগীদের সংখ্যা ও মান ছিল অভিনন্দন যোগ্য। নেপালী-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে হয় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নতুবা অন্য যেকোনো ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন অনুষ্ঠানকে সফল করতে। দার্জিলিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশ পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব। চা-বাগান ও গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীদের সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। যে নৃত্য ও সংগীত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুমাত্র তাদের সমাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল সেই নৃত্য ও সঙ্গীতের যে একটি প্রতিযোগিতা হ'তে পারে ইতিপূর্বে তার প্রতিফলন কোথাও ঘটেছে কিনা জানা নেই। তরাই এলাকার প্রায় ১৬টি দল গত ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে যুব-ছাত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসী নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শহরের মানুষকে এই অনুষ্ঠানের কথা না জানানো সত্বেও দু'টো দিনই প্রায় ৩ হাজার করে লোকের সমাগম ঘটেছিলো, মানুষ তাদের নৃত্য ও সঙ্গতকে মুহু-র্মুহু অভিনন্দন জানিয়েছে করতালির মধ্য দিয়ে। আদিবাসী ভাই বোনেরা পেয়েছে প্রাণভরা ভালবাসা ও প্রেরণা। এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি কি হ'তে পারে এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়েই মানুষের



প্রদর্শনী দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

তা বোধগম্য হয়েছিল। ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর দিনগুলো যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই মানুষের মধ্যে উৎসাহ বাড়তে লাগল। শারদ উৎসবের দিনগুলোর আগমনকে কেন্দ্রকরে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেমন পড়ে যায় আনন্দের প্রতিধ্বনি তেমনি ভাবেই আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। ছাত্র টিকিট পেতে হাজার-হাজার স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল লাইন দেখে প্রস্তুতি কমিটি হতভম্ব হয়ে যায়। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরই টিকিট দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছাত্র টিকিটকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কিছু সূক্ষ্ম চক্রান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে যুব-ছাত্র উৎসবকে তাদের নিজেদেরই উৎসব বলে ধরে নিয়ে ছাত্র টিকিটের দাবী জানিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। এদের একটি অংশকে যতই উত্তেজিত করবার চেষ্টা থাকনা কেন, যখনই উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ বসু সেই সমস্ত উত্তেজিত ছাত্রদের সাধারণ টিকিট নিতে আবেদন জানান, তখনই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাধারণ টিকিটই সংগ্রহ করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতখানি সহযোগিতার মনোভাব ছিল তা এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। মূল উৎসবের ৭ দিনে প্রতিদিন যে ৪০ হাজার লোকের সমাগম ঘটেছিল তা শুধু শিলিগুড়ি শহরেরই নয়, তার মধ্যে একটি ভাল অংশ ছিল গ্রামাঞ্চল ও চাবাগানের। মানুষ এসেছিলো প্রতিদিনই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ইসলামপুর থেকেও। সাধারণভাবে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করেই বাঁধ-ভাঙ্গা জনস্রোত দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু এই যুব-ছাত্র উৎসবের এই জনস্রোত মানুষকে দিয়ে গেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। হিলকার্ট রোড, সেভক রোড সহ সমস্ত বড় বড় রাস্তাগুলো ধরে মানুষ চলেছে হয় ভানুভক্ত মঞ্চে নয়তো গুরুদাস বা ঋত্বিক নতুবা সমীরণ মঞ্চ বা তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে চলেছে যুব উৎসবের প্রাঙ্গণে প্রাণে প্রাণ মেলাতে। রাত ১টা বা সারারাত্রি ব্যাপী মানুষ উপভোগ করেছে অনুষ্ঠানগুলো, এই মঞ্চ থেকে ওই মঞ্চে ছুটে গেছে। মেয়েরা ঘুরেছে একা একাই, নির্ভয়ে। সমস্ত পরিবেশটাই গড়ে উঠেছিল এত সুন্দরভাবে যে সমাজবিরোধীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতেও সমীহ করতে হয়েছিল। উৎসবের অঙ্গণে যে ধরণের অবস্থায় কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এই পবিত্র প্রাঙ্গণ থেকে। এই হাজার-হাজার মানুষের ভীড়েও একটিও ছিনতাই বা অশালীন কোন ঘটনা ঘটে নি। অনেক মেয়েরা অভিভাবক ব্যাতিরেকেই উপভোগ করেছে সারারাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠানগুলো। প্রতিটি দিনে সেই সেই অংশের মানুষের ভীড়ই ছিল বেশী। শিশু ও মহিলা দিবসে এই দুই অংশের ভীড় ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৫ হাজার শিশুর সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল ও মুখরিত মিছিল শিশুদিবসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। হাজার-হাজার মানুষ এই মিছিল উপভোগ করে রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে থেকে। মহিলা মিছিলটিও ছিল আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা ৫-শত স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে সম্ভব হ'ত না যদি না হাজার-হাজার সাধারণ দর্শক আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতেন। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সামান্য প্রচেষ্টা হলেই দর্শকরা নিজেরাই সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল। দর্শকদের পক্ষ থেকে কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেও ন্যূনতম বাধা পর্যন্ত আসে নি। আসাম, ত্রিপুরা, কেরালা রাজ্যের এবং বিভিন্ন লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষ দারুণভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। আসামের শিল্পীদের অনুষ্ঠান মানুষ এমনভাবে নিয়েছিল যে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট মঞ্চ ব্যাতিরেকেও আরও দু'টো মঞ্চে অনুষ্ঠান করান হয়েছিল। আসামের অনুষ্ঠান চলাকালীন মানুষ এমন সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন দেখিয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসেবে আমাদের গর্বিত করে তুলেছিল। আসামের শিল্পীরাও এই ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন। অশ্রু সজল নয়নে তারা বিদায় নেয় উৎসব অঙ্গণ থেকে।

রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটেছিলো ২৯শে ফেব্রুয়ারী উৎসবের শেষ দিনটিতে। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। বৃষ্টি সাময়িকভাবে শেষ হ'তেই মানুষ আবার সমবেত হ'ল ময়দানে। তাদেরই অনুরোধে আবার শুরু হ'ল অনুষ্ঠানগুলো। ৭টি দিনের উৎসব শেষ হ'তেই উৎসব মুখর শিলিগুড়ি শহরের প্রাণস্পন্দন কেমন বন্ধ হয়ে গেল। সকলের মুখেই একই কথা শহরটাকে যেন শ্মশান করে দিয়ে গেল। এই সরকারের অতি বড় সমালোচকও বলতে বাধ্য হয়েছে এত সুশৃঙ্খল ও এত সফলভাবে ৭টি দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে কেবলমাত্র সুশৃঙ্খল আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বই। ৭টি দিনের একটি দিনেও ন্যূনতম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নি, অনেক মানুষের কাছে এটাই একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তুতি-কমিটির নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছে সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানগুলোর বৈচিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছে। আলোচনা চক্রগুলোতে বিপুল মানুষের ভীড় প্রমাণ করেছে মানুষ জানতে চায়।

অনেক মানুষেরই ভাল লেগেছে এই উৎসবে শ্রমিক-কৃষক-গরীব মানুষের বিপুল সমাবেশ দেখে। উৎসবের শেষটাকে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ কিছুতেই যেন

মেনে নিতে পারছে না। একটি স্থানীয় ইন্দিরা কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা উৎসবের কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছিল "এই যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের কোন উৎসাহ নেই"। তাদের সে গুড়ে বালি দিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালের যুব-ছাত্র উৎসবের বিরাট সাফল্য উত্তরবঙ্গের গণতান্ত্রিক মানুষের মনে নতুন আত্মপ্রত্যয় জন্মে দিয়েছে। সাংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার বাইরেও বাঙলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়া যায়, শিলিগুড়িতে যুব-ছাত্র উৎসব তাই প্রমাণ করেছে। যুব-ছাত্র উৎসবের এই সাফল্যের সিংহ ভাগেরই দাবীদার নিঃসন্দেহে শিলি-গুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জনগণ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে।



টিকিট কাউন্টারে দর্শকদের বিরাট লাইন

এবারের যুব-ছাত্র উৎসবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সমীর পুততুণ্ড

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে সুস্থ সামাজিক এবং সংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে যুব-ছাত্র উৎসব উদ্‌যাপনের যে কর্মসূচী ক্ষমতায় আসীন হবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবারের যুব-ছাত্র উৎসব কর্মসূচী পালনের মধ্যদিয়ে তা আরো পরিণত রূপলাভ করলো। বিশ্ব যুব উৎসবের অংশ হিসাবেই বিগত যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছিল। কিউবার হাভানা শহরের বুকে বিশ্ব যুব-ছাত্র সংস্থা সমূহ সারা দুনিয়ার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুব-ছাত্র উৎসবে সামিল হবার আহ্বান জানিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের আহ্বান পৌঁছে দেবার অংশ হিসাবেও বিগত বছরের যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছে।

এবছর বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানসূচী ছিল না। দুনিয়াব্যাপী যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় আহ্বান না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের যুব ছাত্র সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আহ্বান পৌঁছে দেবার মঞ্চ হিসাবে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০)" গঠন করেছিলেন। উৎসবের জৌলুসে যুবমানসে শুধুমাত্র আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য নয়—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাধারণ চেতনার যুব-ছাত্র সমাজকে উৎসবের প্রাঙ্গণে সমবেত করা, এবং উৎসবে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে যুবমানসে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য নিয়েই আয়োজিত হয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসব। বিগত বছরের চাইতে বহুবিধ স্বাতন্ত্র নিয়েই অনুষ্ঠিত হলো এবারের উৎসব।

অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কলকাতাই পশ্চিমবাংলার পীঠস্থান। সেকারণেই এযাবৎ সমস্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনই হয়েছে কলকাতা শহরে। সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার আহ্বান ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবারের উৎসব অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল, উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরে। উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলাতেই যুব-ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়েই শুরু থেকে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। উৎসবের দিনগুলিতে উৎসব সংগঠকদের মুখ সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে উৎসবমুখর শিলিগুড়ি শহরের চেহারা দেখে। উৎসবের সময় যেন উত্তরবাংলার যৌবনশক্তির ঢল নেমেছিল উত্তরবাংলার প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরে। যৌবনের উৎসব প্রাঙ্গণে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী মিলে মিশে একাকার।

সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানকে বিশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছে উৎসবের অন্যতম অঙ্গ, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসমূহ। মূল উৎসবের অনেক আগেই শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো দু'টি কেন্দ্রে—শিলিগুড়ি শহর এবং মেদিনীপুর শহরে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে স্থান নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতা, মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, কুচবিহার, শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং শহর। মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হলো শুধুমাত্র আদিবাসীদের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সারা-রাজ্যে যুব-ছাত্র সমাজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করা হয়েছিল শিলিগুড়ি শহর। কলকাতা, রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং শিলিগুড়ি শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। আর দার্জিলিং শহরে নেপালীভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। এছাড়াও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলো শিলিগুড়ি শহরে।

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান কেন্দ্রের হিসাব থেকেই বিগতবছরের চাইতে এবারের অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র বোঝা যাচ্ছে। মূল উৎসবের একমাসেরও বেশী সময় আগে থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ফলে রাজ্যের ভাবী সংস্কৃতিক শিল্পী এবং ক্রীড়াবীদেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে কার্যতঃ ৭ দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের সময় সীমাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন ৩৮ দিনে। ২১শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতায় যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার শুরু তা রায়গঞ্জ এবং কুচবিহার শহরে গিয়ে শেষ হল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, '৮০ তারিখে। পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে শিলিগুড়ি শহরে শুরু হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। চললো ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মাঝের দু'দিন বাদ দিয়ে শিলিগুড়ি শহরে মূল অনুষ্ঠানের শুরু ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে। একটানা ৩১ দিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ৬৭৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতী।



শিশু দিবসে শিশুদের বর্ণাঢ্য সমাবেশ

একই মঞ্চ থেকে একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য একাধিক স্থানে এজাতীয় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ পশ্চিমবাংলার বুকে এই প্রথম। বর্তমান রাজ্য সরকার আয়োজিত বিগত যুব উৎসবের প্রাথমিব ঘোষণাতেও একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবারে পূর্ব ঘোষণ অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষায় সাঁওতালীদের, হিন্দী ভাষায় আদিবাসীদের, নেপালী ভাষী এবং বাংলা ভাষার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক অংশের ভাষাভাষীদের অনুষ্ঠানেই বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ বসু, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছেন—"আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশে, বহু বিচিত্র চেহারার প্রতিযোগিতা চলছে সমাজের সর্বত্র।। ব্যক্তি প্রতি-যোগিতার এমনি পরিবেশে আমরা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। বর্তমান সমাজের ব্যক্তি প্রতিযোগিতার সাধারণ চেহারার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।...বিভিন্ন বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা।" এই স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা এবং বিচারক মণ্ডলীও সংগঠকদের এই মনোভাবের কথা জেনেই অনুষ্ঠান সফল করতে এগিয়ে এসেছেন।

মেদিনীপুরের অনুষ্ঠান

আঞ্চলিক ভাষী সাঁওতালীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঁওতাল অধ্যুষিত মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে। মেদিনী-পুরের অরবিন্দ ষ্টেডিয়ামে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সর্বমোট ১৬টি বিষয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সমবেত নৃত্য (করম নাচ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি দলে সর্বমোট ২৭২ জন সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মেদিনীপুরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগিদেরই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। চেতনার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাঁওতালী সম্প্রদায়ের ছাত্র-যুবদের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহিত করার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। সাঁওতালীদের ৫২ জন প্রতিযোগীর সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর জেলার গণ-আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা সুকুমার সেনগুপ্ত। এছাড়াও রাজ্য সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শম্ভু মাণ্ডি মহাশয়ও সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অরবিন্দ ষ্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়।

দার্জিলিংয়ে নেপালী ভাষার আসর

১লা থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী দার্জিলিং শহরের জি. ডি. এন. এস. স্কুলে নেপালী-ভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময়কালে দার্জিলিং শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজে শীতকালীন ছুটি চলছিল তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান সফল করতে দূর-দূরান্তের পাহাড়ী এলাকা থেকেও প্রতিযোগীরা ছুটে এসেছেন। একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের তিনদিন থাকা এবং সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্যই খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিকিম এবং ভুটানের কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীও আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের তিনদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানেই দার্জিলিং শহরের মানুষ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকেরা যেমন অনুষ্ঠান দেখে আনন্দ উপ-ভোগ করেছেন, তেমনি প্রতিযোগীরাও দর্শকে ঠাসা হলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও নেপালীভাষার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠকেরাই স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নেপালীভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধি-জীবীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছেন। সারা রাজ্যব্যাপী প্রবল আন্দোলনের ঢেউ না উঠলেও নেপালীভাষা অধ্যুষিত দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বিগত কিছু দিন আগেও প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষই নেপালীভাষীদের এই সংগ্রামকে সমর্থন যুগিয়েছেন। কি কংগ্রেস, কি জনতা পার্টির সরকার—কোন কেন্দ্রীয় সরকারই নেপালীভাষীদের এই দাবীকে তখনো পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি। যদিও উভয় দলই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন নেপালী-ভাষীদের এই এই দাবীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

নেপালীভাষীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীকে নির্বা-চনী বিজয়ের কাজে উভয় দলই ব্যবহার করেছেন। অথচ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকার নিজস্ব ভাষা-নীতি অনুযায়ীই নেপালীভাষার প্রতিও যথাযথ মর্যাদা দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারী ক্ষমতায় আসীন হবার পরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা খোলাখুলি সাধারণ মানুষকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় নেপালীভাষার সমর্থনে উত্থাপিত সরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত এই দাবী সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত আলোচ্য অনু-ষ্ঠানের মধ্যদিয়েও নেপালীভাষার স্বীকৃতির দাবীই আর একবার জোরালো সমর্থন লাভ করলো। একই সাংগঠনিক মঞ্চ থেকে বাংলাভাষার সাথে সাথে নেপালী-ভাষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়াতে নেপালীভাষীরাও অনেক বাড়তি উৎসাহ নিয়ে প্রতি-কূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা অনু-ষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করতে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিষয় সমূহের মধ্যে ছিল—একাংক নাটক, সমবেত নৃত্য ও সংগীত, একক সংগীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা রচনা। নেপালীভাষার প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসবের মূলমঞ্চে পুরস্কার বিতরণ করা ছাড়াও দার্জিলিং শহরের প্রতিযোগিতা-কেন্দ্রেও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা

মূলতঃ উত্তরবাংলা ভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হলেও দক্ষিণবাংলার প্রতিযোগীদের প্রাথমিক পর্বের বাছাই করার জন্য কলকাতায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত এবং ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা



আদিবাসী দিবসের মিছিল

সম্ভব হয়নি। আর্থিক সমস্যার কারণে দক্ষিণবাংলার অনেক প্রতিযোগীর পক্ষেই অংশ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও দক্ষিণবাংলার প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ২৪৫৭ জন প্রতি-যোগী অংশ গ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক ছাত্র-যুবর পক্ষে আলোচ্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতা শহরে প্রাথমিক বাছাই কেন্দ্রের আয়োজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হলেও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যয় করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব—এমন চিন্তা সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়ে শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এমন প্রতিযোগীর সংখ্যা একাধিক। এদের নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতির অভাব থাকলে এদের শুভানুধ্যায়ীরাই আর্থিক সাহায্য যুগিয়েছেন। এদিক থেকেও শিলিগুড়ি শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত কলকাতার শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন সার্থক হয়েছে।

উত্তরবাংলার প্রাথমিক বাছাইয়ের আসর

উত্তরবাংলার ব্যাপক সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি এবং কুচ-বিহার শহরে তিনটি কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ফলও ফলেছে ভালো। উৎসব কমিটির প্রাথমিক ঘোষণাতেই এই তিন কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলে আরো বেশী সংখ্যক প্রতি-যোগীর অংশ গ্রহণ ঘটতো। দেরীতে হলেও উৎসব কমিটির এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কুচবিহার এবং রায়গঞ্জ শহরের অবস্থান শিলিগুড়ি শহর থেকে বহু দূরে। দূরবর্তী এই শহর দুটিতে পৃথকভাবে প্রাথমিক বাছাই অনুষ্ঠানের আয়োজনের ফলে যুব উৎসবের প্রচারও যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে তেমনি এই দুটি শহরের যে সমস্ত মানুষের পক্ষে শিলি-গুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে মূল উৎসব দেখা সম্ভব হয়নি তাদের অনেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে উৎসবের সমগ্র আয়োজনের এক ভগ্নাংশমাত্র হলেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। যেমনটি পেরেছেন মেদিনীপুর দার্জিলিং শহরের ক্ষেত্রে। সাধারণের উপভোগের যে সুযোগ কলকাতার মানুষদের জন্য করা সম্ভব হয়নি সেই ব্যবস্থা মেদিনীপুর, দার্জিলিং এবং কুচবিহার শহরের মানুষের জন্য করা হয়েছিল।

রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং দার্জিলিং শহরে প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে, সূচনায় কিছু আলোচনা অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুব উৎসবে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় সমূহের আলোচনা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আলোচনার বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বক্তা উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত সকলের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্য এবং রাজ্যের সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যুবসমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন।

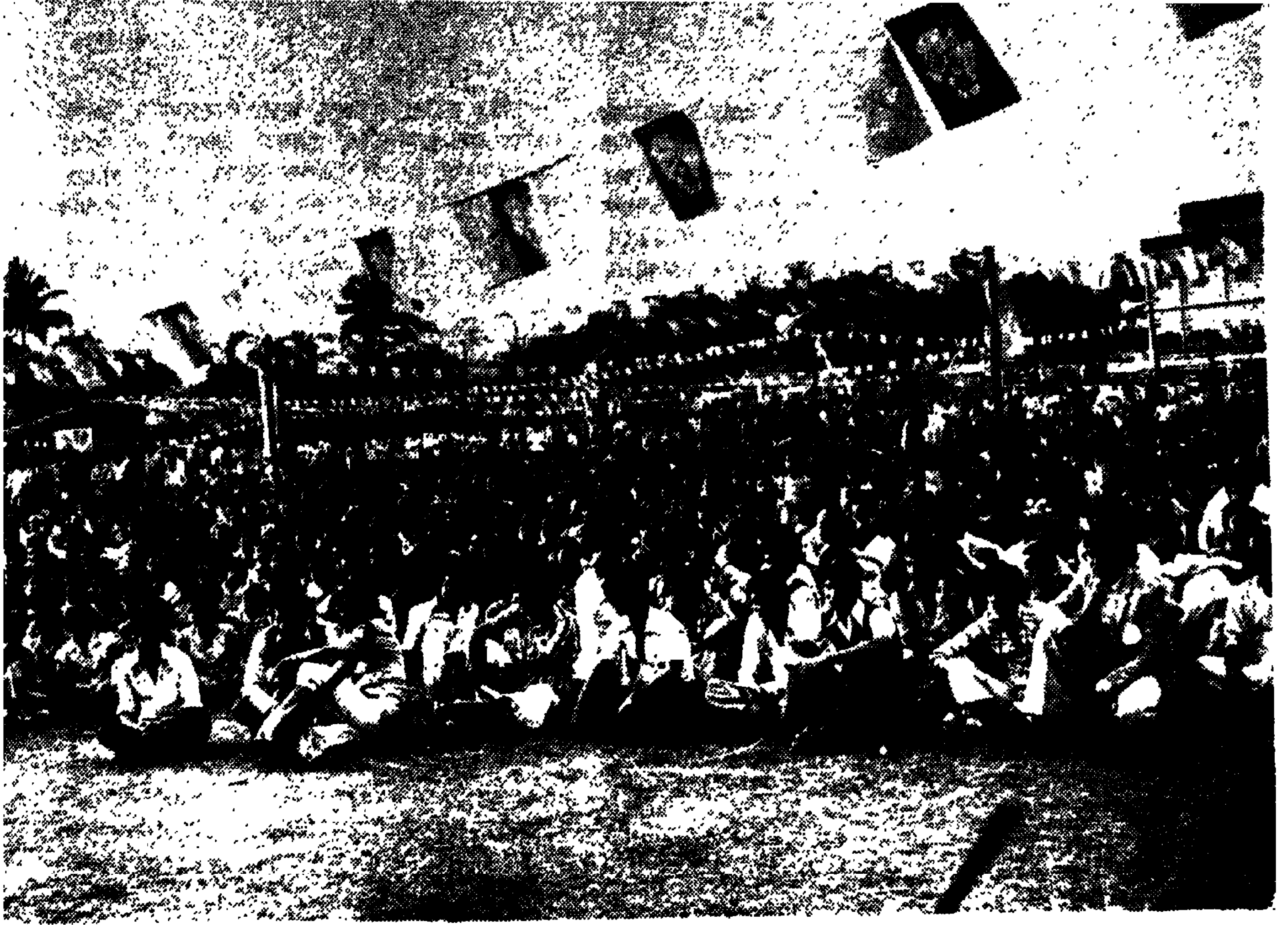
অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রসঙ্গে

প্রাথমিক অবস্থায় সর্বমোট সাতটি দপ্তর থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলেছে। স্থানীয় ছাত্র-যুব সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত উদ্যোগের ফলেই প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগীদের নাম তালিকাভুক্তির কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে ৭টি দপ্তর থেকে আবেদনপত্র বিতরণ এবং গ্রহণ করে নাম তালিকাভুক্তির ফলে অনেক আবেদনকারীই নিজস্ব বসবাসের কাছাকাছি কেন্দ্র থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ডাকযোগে আবেদনপত্র সংগ্রহে ইচ্ছুক এমন ৪৭৮ জনকে ডাকযোগেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

একই সঙ্গে এতগুলো দপ্তর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছে—এমন দাবী করা যায় না। যে সমস্ত দপ্তর থেকে মূল দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি সে সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতি-যোগীদের সামান্য বিষয়ে সাময়িক কালের জন্য হলেও বহুবিধ বিভ্রান্তিতে ভুগতে হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ের তৎপরতার ফলে অনেক বিষয়ই সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা ব্যতিরেকেও এত সংখ্যার কেন্দ্র থেকে একই সাথে প্রাথমিক প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। এজন্য উৎসব কমিটিকে বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়েছে। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেও একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে।

গ্রহণ বিভ্রাট

পূর্বঘোষিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সমস্ত কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে পালিত হলেও ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সূর্য গ্রহণের কথা উৎসব সংগঠকদের জানা ছিল না এমন নয়। কিন্তু যেটা জানা ছিলনা সেটা হলো—সরকারী ছুটির ঘোষণা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের অনু-মানের নামে সংবাদ পত্রগুলির প্রচার এবং শেষ মুহূর্তে



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজ মাঠে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ।

সরকারী ছুটি ঘোষণার ফলে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৬ তারিখের সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৭ই তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেডিও মারফৎ এই পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হলেও যানবাহন সমস্যা এবং সঠিক যোগাযোগের অভাবের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন প্রতিযোগী ঐদিনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি কলকাতা থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ একজন প্রতিযোগী শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দক্ষিণ বাংলার প্রতিযোগীরা ঐদিন সকালে যথাসময়ে শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হলেও উত্তরবাংলার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বন্ধ থাকার কারণে উত্তরবাংলার প্রতিযোগীদের বিরাট অংশের নিশ্চিত অনুপস্থিতিকে এড়াবার জন্যই ঐদিনের অনুষ্ঠান পরবর্তী দিনে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েক জন প্রতিযোগীর পক্ষে ১৬ তারিখের প্রতিযোগিতায় পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও সাধারণভাবে প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই মেনে নিয়েছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসনীয় ভূমিকা

স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিচারকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলেই এই বিরাট আয়তনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফল করা সম্ভব হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট অংশই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শিলিগুড়ি শহরের স্কুলগুলিতে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন দলে দলে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য উৎসব দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন তেমনি এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে।

কলকাতায় ইতিপূর্বে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও উত্তরবাংলার কেন্দ্রগুলিতে এজাতীয়

উদ্যোগ এই প্রথম। স্বভাবতই অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে তোলার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে—একটা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বেচ্ছাসেবকেরা এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাবার জন্য।

সর্বমোট ৫৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র অনুষ্ঠান (মূল উৎসব অনুষ্ঠানের বাইরে) পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৩ জন প্রস্তুতির শুরু থেকেই সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বিচারকেরা উৎসাহে এগিয়ে এসেছেন

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন। অনেকেই নিজস্ব পেশার ক্ষতি-স্বীকার করেও সংগঠকদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—সঙ্গীত শিল্পী শ্রী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ধীরেন মিত্র, ধীরেন বসু, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অংশুমান রায়, পূরবী দত্ত, অধ্যক্ষ কুমুদরঞ্জন ব্যানার্জী, ডাঃ শ্রী সুকুমার চ্যাটার্জী, গীতা চৌধুরী, সমরেশ ব্যানার্জী, নরেন মুখোপাধ্যায়, দীনেন চৌধুরী, আজিমুদ্দিন মিঞা, কঙ্কন ভট্টাচার্য্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, উৎপলা গোস্বামী প্রমুখ। নৃত্য জগতের প্রখ্যাত শিক্ষক এবং শিল্পী এন. শিবশঙ্করণ, গোবিন্দ, কুনি, ক্ষান্তমনি কুটি, বেলা অর্ণব, শান্তি বসু, স্নিগ্ধা ব্যানার্জী, শিবপদ ভৌমিক প্রমুখ। নাট্য জগতে শ্রী জ্ঞানেশ মুখার্জী, অনুপকুমার, বাসুদেব বসু, সুধী প্রধান, বিদ্যুৎ নাগ, অধ্যাপক দর্শণ চৌধুরী, বারিণ রায় প্রমুখ। আবৃত্তির আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রদীপ ঘোষ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, দীপঙ্কর মজুমদার, সৌমিত্র মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস গাঙ্গুলী প্রমুখ। কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অন্নদা চট্টোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, দিগ্‌বিজয় দে সরকার, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পজিত রায়, শ্যামসুন্দর দে প্রমুখ। চিত্র শিল্পী অধ্যক্ষ বিজন চৌধুরী, নির্মাল্য নাগ প্রমুখ। যন্ত্র শিল্পী শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বোডাস, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ। সর্বমোট ১৯৭ জন বিচারক বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিষয় সমূহের মধ্যে আবৃত্তি (চারটি), রবীন্দ্র, নজরুল, মার্গ, কাব্যসঙ্গীত, লোকগীতি এবং গণসঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, তবলা-লহরা, সেতার, একক নৃত্য, বার্ষিক পত্রিকা, প্রাচীর পত্রিকা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা রচনা, একাংক নাটক, চিত্রাঙ্কণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলিগুড়ি এবং মেদিনীপুর শহরে পৃথকভাবে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী মূল উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম স্থানাধিকারীদের সাধারণ মান থেকেই সমগ্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করা সম্ভব। সাধারণের মতে উচ্চমানের প্রতিযোগীরাই রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৯৯২ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কারের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এবং রাজ্য যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের স্বাক্ষরযুক্ত মানপত্রও প্রতিযোগীদের উপহার দেওয়া হয়েছে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এবং প্রতিযোগিতার সংগঠকেরা প্রতিযোগিতার আঙিনায় আগামী দিনের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করার তৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরেছেন। উচ্চমানের যে সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার আসরে সমবেত হয়েছিলেন, তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে চর্চা অব্যাহত রাখলে, অনেকেই সাধারণের কাছে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারবেন। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি জগতের ভবিষ্যতেরা সকলে আলোচ্য আসরে অংশ নিয়েছেন এমন কথা হলফ করে বলতে না পারলেও, নিঃসন্দেহেই বলা যায়—এদের অনেকেই আরো অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবেন। মূলতঃ যে বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেই বয়সটা হল—গড়ে ওঠার বয়স। এই বয়সে চাই অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্যোগ এবং ধৈর্য। এই তিনটি বিষয়েরই মিলন ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০) আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। সেদিক থেকে আলোচ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেকের মধ্যেই ভবিষ্যতের জন্য বাড়তি উৎসাহ নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিশাল উদ্যোগ সৃষ্টির উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সুস্থভাবে গড়ে তোলার কাজেও উৎসব কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান যথেষ্ট সফল ভূমিকা পালন করেছে।

যুব-ছাত্র উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অরুণ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব ১৯৭৯-৮০-এর অঙ্গ হিসাবে যুব কল্যাণ বিভাগ-এর তরফ থেকে রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। এটি এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কলকাতার রনজি স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল তারিখে। উল্লেখ্য, ঐ বছরেই কিউবার হাভানায় একাদশ বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং তারই সঙ্গে সংগতি রেখে যুবকল্যাণ বিভাগ ১ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলো।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমাদের আয়োজন এবার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারেনি। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অসুবিধার জন্য সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেননি এবং শিলিগুড়িতে বাসস্থানের অভাবের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয়ও অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছিলো।

প্রাসংগিক ভাবেই আমাদের যুবকল্যাণ বিভাগের রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক বিষয়ের কথা আসে, আর সেইজন্যই এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা এই বিভাগ আয়োজিত যুব-ছাত্র উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই তিনটি পর্যায় হ'ল ব্লক, জেলা ও রাজ্য। যেসব প্রতিযোগী ব্লক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সফল হ'ন তারাই জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আহূত হ'ন এবং জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীগণ রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে উপযুক্ত বিবেচিত হ'ন।

আগেই বলা হ'য়েছে এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হয়নি তার কারণ দু'টো। প্রথমতঃ, বিভিন্ন অসুবিধার জন্য আমরা কেবলমাত্র মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং এই চারটি জেলায় জেলা যুব-ছাত্র উৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি—ফলে বাকী জেলাগুলো প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি এবং স্থানাভাবের জন্য দলগত প্রতিযোগিতা সমূহ বাদ দিতে হ'য়েছে।

মহিলাদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো নিম্নোক্ত ৬টি :—

(১) ১০০ মিটার দৌড়,
(২) উচ্চ লম্ফন,
(৩) দীর্ঘ লম্ফন,
(৪) লৌহ গোলক নিক্ষেপ,
(৫) ডিস্কাস্ নিক্ষেপ,
ও
(৬) বর্শা নিক্ষেপ।

পুরুষ বিভাগে যে ৭টি বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো সেগুলো—

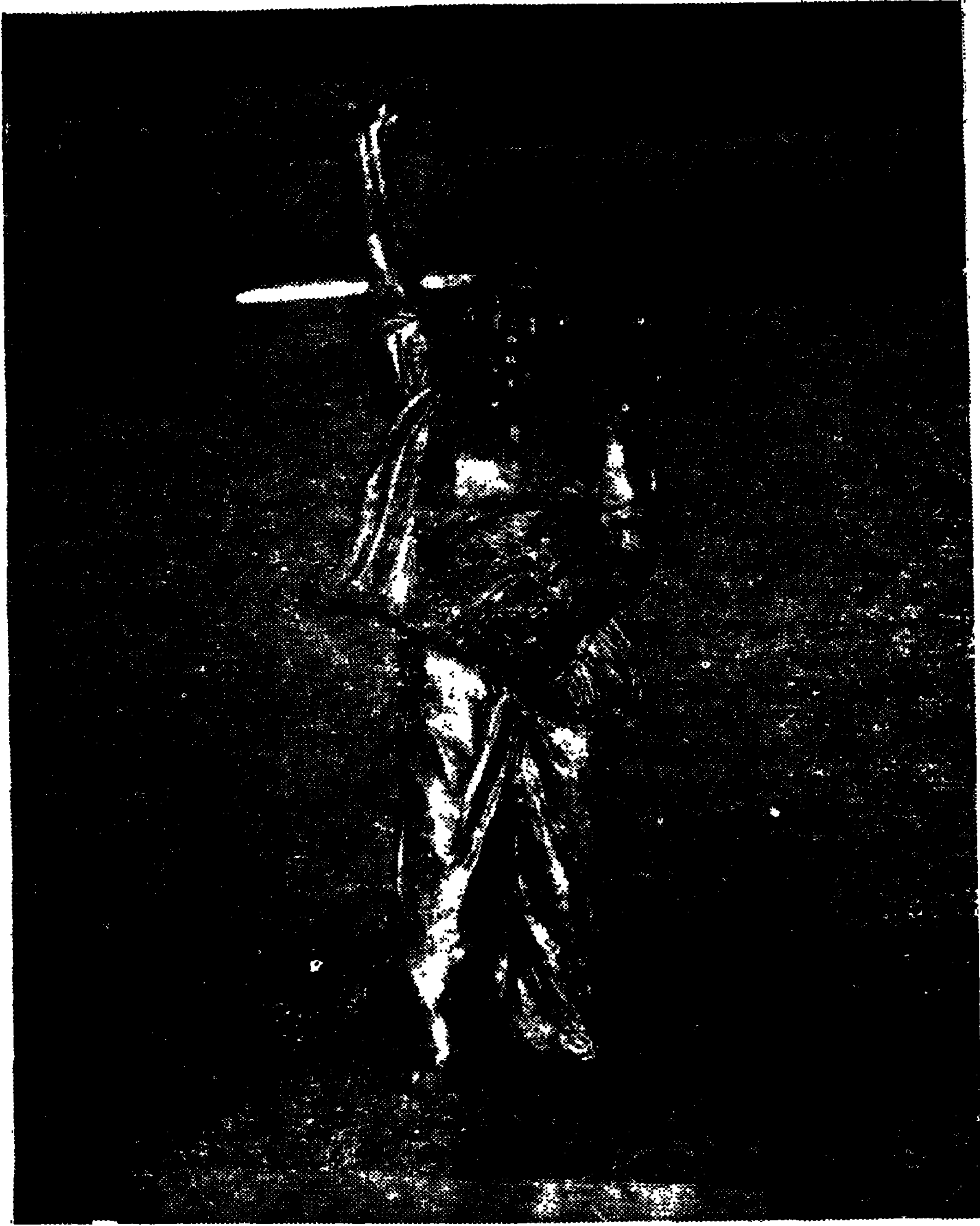
(১) ১০০ মিটার দৌড়,
(২) ৮০০ মিটার দৌড়,
(৩) উচ্চ লম্ফন,
(৪) দীর্ঘ লম্ফন,
(৫) লৌহ গোলক নিক্ষেপ,
(৬) বর্শা নিক্ষেপ,
(৭) ডিস্কাস্ নিক্ষেপ।

বিভিন্ন বিষয়ে ৪টি জেলার অংশ গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল :—

(ক) **বর্ধমান জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১৩
মহিলা প্রতিযোগী— ৫

(খ) **মেদিনীপুর জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১১
মহিলা প্রতিযোগী— ৭

(গ) **মুর্শিদাবাদ জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১৩
মহিলা প্রতিযোগী—১০



তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে পোড়ামাটির সুদৃশ্য মডেল।

(ঘ) দার্জিলিং জেলা

পুরুষ প্রতিযোগী—১২

মহিলা প্রতিযোগী— ৪

শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগীদের এক সুশৃংখল উদ্বোধনী কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার প্রসারে সীমিত আর্থিক সংগতির মধ্যে যুবকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহদান করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার প্রতিযোগীদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, এর শেষ হয় পুরুষদেরই ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে মেদিনীপুর ও মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদ বিশেষ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

শিলিগুড়িতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস।

পুরুষ ও মহিলা এই দুই বিভাগেরই অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ক্রীড়া শৈলী আশাব্যঞ্জকরূপে উন্নতমানের ছিলো এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে তাদের সুশৃঙ্খল আচরণ প্রশংসনীয় ছিলো সন্দেহাতীত ভাবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে স্থানীয় ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে আমাদের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ক'রেছেন। আমরা তাঁদের অকৃপণ সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।



তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে যুবকল্যাণ বিভাগের স্টল।

মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন

রথীন সেন

১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে ১৮৭১ সালের ৭২টি দিন। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে এই ৭২টি দিন আশ্চর্য প্রেরণার উৎস, শোষিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের জীবনে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত স্মৃতি।

১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করলেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম সংগ্রাম—প্যারী কমিউন।

১৮৬৯-এর ফ্রান্স। রাজতন্ত্রের তীব্র ভ্রূকুটি, প্রভাব ও প্রচারকে অগ্রাহ্য করে ত্রিশলক্ষ ভোট পড়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অসন্তোষ। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহে আলোড়িত হচ্ছে সারা দেশ। জাতীয় সম্মান রক্ষার অন্ধ মোহে জনচেতনাকে বিভ্রান্ত ক'রে হৃত মর্যাদা উদ্ধারের আশায় ১৮৭০ সালের ১৯শে জুলাই সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই পরাজিত ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বিজয়ী প্রুশিয়ানরা অবরোধ করল প্যারিস। শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রস্তুতি ও ঐক্যের অভাবের সুযোগে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করে গঠন করল জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার।

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী অবরুদ্ধ নগর রক্ষার জন্য নিজেরাই গঠন করল জাতীয় রক্ষী বাহিনী। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নাম লেখাল সশস্ত্র বাহিনীতে। মেহনতী মানুষের এই সংগ্রামী সশস্ত্র চেহারা দেখে আতঙ্কে শিহরিত বুর্জোয়ারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করল প্রুশিয়ানদের কাছে। নির্দেশ এল, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিশ্বাসঘাতক সরকারের হাতে তুলে দিতে। শ্রমিকরা এবার রুখে দাঁড়াল, অস্বীকার করল অস্ত্র সমর্পণে। ১৮৭১-এর ১৮ই মার্চ বুর্জোয়া সরকার সৈন্য পাঠাল অস্ত্র দখলের জন্য।

কিন্তু '১৮ই মার্চের সকালে কমিউন দীর্ঘজীবী হোক এই বজ্রধ্বনিতে জেগে উঠল প্যারিস' (মার্কস)। বুর্জোয়া সরকার প্যারিস থেকে ভের্সাইতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। অস্থায়ী সরকার হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব গ্রহণ করল জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি, ঘোষণা করল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতরা শাসক শ্রেণীগুলির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা দেখে এ কথাই অনুভব করেছে যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পরিচালনাভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে পরিস্থিতি ত্রাণের মুহূর্ত সমাগত।'

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও ইচ্ছানুসারে প্রত্যাহারযোগ্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হ'ল কমিউন। শুধু পৌর শাসন নয় রাষ্ট্র পরিচালিত সব উদ্যোগই অর্পিত হ'ল কমিউনের হাতে। শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সমর্থিত প্রতিনিধিরাই কমিউনে নির্বাচিত হলেন।

কমিউনের ঘোষণাবাণীতে ধ্বনিত হ'ল এতদিনের পরিচিত প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। 'কমিউন ছিল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধরূপ।' কমিউন ছিল এমন 'এক প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্টরূপ যা শ্রেণী-প্রভুত্বের রাজতান্ত্রিক রূপকেই শুধু নয় খোদ শ্রেণী প্রভুত্বকেই বরবাদ ক'রে দিত' (মার্কস)।

স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে কমিউন সেখানে নিয়োগ করল সশস্ত্র জনসাধারণকে। পুলিসকে সরকারের হাতিয়ার হিসাবে না রেখে তাকে পরিণত করা হ'ল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোন সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য রূপে। গরিবদের বকেয়া খাজনা মকুব করা হল, বন্ধ কারখানাগুলির উৎপাদন শুরুর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল শ্রমিক সংস্থাদের। রুটি তৈরির কারখানাগুলিতে রাতের কাজ বন্ধ করা হ'ল। কারখানাগুলিতে প্রচলিত জরিমানা প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাষ্ট্রের ওপর অবসান হ'ল গির্জার কর্তৃত্বের। ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ক'রে শিক্ষাকে ঘোষণা করা হ'ল অবৈতনিক। কমিউন ঘোষণা করলঃ কমিউনের সদস্য হ'তে একজন নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মীকে সাধারণ শ্রমিকের মজুরি নিয়ে কাজ করতে হবে। এই ঘোষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেনিন বলেছেন, 'এখানেই সবচেয়ে স্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে মোড় ঘুরেছে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র অত্যাচারিত শ্রেণী সমূহের গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রেণী বিশেষকে দমনের জন্য বিশেষ শক্তি স্বরূপ যে-রাষ্ট্র তার রূপান্তর ঘটেছে; এখানে জনগণের অধিকাংশের, মজুর ও কৃষকদের সাধারণ শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের দমন করা হচ্ছে।'

[শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায়]

মুন্সী প্রেমচাঁদ ও সাহিত্যে বাস্তববাদ

মহম্মদ আমিন

প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের অগ্রগতির একটি ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণে কোন সাহিত্যিক, কবি, লেখক বা নাট্যকারের মূল্যায়ন করতে গেলে এই বিষয়টা প্রধানত লক্ষ্য করতে হয় যে, শিল্প-সাহিত্যে বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার অবদান কতটুকু। তাছাড়া আরেকটা বিষয় মনেরাখা দরকার যে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবির রচনাকাল কোন্ সময়। তার কারণ হ'ল যে সাহিত্য যদি শুধুমাত্র কল্পনার ভিত্তিতে রচনা হয় তবে সে সাহিত্য মানুষকে ততটা অনুপ্রাণিত করতে পারেনা যতটা বাস্তববাদী সাহিত্য করে থাকে।

মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করবার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাঁকিয়ে বসে গিয়েছিল। মোগল রাজত্বের কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা জড়তা থেকে গিয়েছিল এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। যার ফলে মোগলরাজ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল, এবং এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে শুধু বাঁচিয়েই দিলনা, তাকে আরো পোক্ত করল এবং ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তম্ভরূপে গড়ে তুলল। ঠিক এই সময়ে উর্দু সাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ঘটল। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন উর্দুসাহিত্য আলিফলায়লা, আমির হাম্জা, হাতিম তায়ী গল্পে মেতেছিল এবং এগিয়ে যাওয়ার কোন সঠিক পথ পাচ্ছিলনা, তেমনি হিন্দী সাহিত্যও ঐ সময়ে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের গল্পের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলার একটি গ্রামে ৩১শে জুলাই ১৮৮০ সালে। প্রেমচাঁদের পিতার নাম ছিল মুন্সী আজায়েব লাল, তিনি পোস্ট অফিসের পিয়ন ছিলেন, চাকরী থেকে আংশিক উপার্জন হ'ত, অল্পকিছু জমিও ছিল। দুটি মিলিয়েই তাঁদের সংসার চলত। প্রেমচাঁদের আসল নাম হল ধনপত রায়, তাঁকে আদর করে নবাব বলে ডাকা হ'ত। যখন তাঁর বয়স আট বছর তখনই তাঁর মা মারা যান, মায়ের স্নেহের অভাব মুন্সী প্রেমচাঁদ সারাজীবনই অনুভব করলেন, এবং বোধহয় এই কারণেই তাঁর গল্প এবং সাহিত্যে মায়ের প্রতি এত ভালবাসা দেখা যেত। উনি তের বছর বয়সেই যাদু-টোনার উপন্যাস পড়ে সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৯৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে চুনারের লন্ডন মিশন স্কুলের শিক্ষক হয়ে যান এবং তারপরে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং বাহারাইচে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তার কয়েকমাস পরেই তিনি প্রতাপগড়ে বদলী হয়ে যান এবং সেইখানে মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেন, যার নাম "ইসরারে মা-আবিদ"। এই উপন্যাসটি ১৯০৩ সালে বেনারসের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিস্তীতে প্রকাশিত হয়। চারিদিকে যখন অত্যাচার, বিশেষ করে গ্রামে কৃষকদের উপরে জোতদার-জমিদার-মহাজনের অত্যাচার এবং সারাদেশের উপরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অত্যাচার, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের যোগ-সাজসে যখন সমাজে নানারকমের অধঃপতন এবং যখন শিল্প-সাহিত্যও কলুষিত হচ্ছিল তখন উর্দু-সাহিত্যে প্রেমচাঁদের প্রবেশে মনে হ'ল যেন দীর্ঘ-কালরাত্রির পরে সকালের প্রথম আলো দেখা দিল। কেননা উর্দুসাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ সর্বপ্রথম বাস্তব-বাদকে নিয়ে এলেন।

মুন্সী প্রেমচাঁদ নিজে কোনদিন ক্ষেতে লাঙ্গল ধরেননি, কিন্তু তাঁর গল্পে উত্তরপ্রদেশের গ্রাম-জীবনের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তুলনা করা যায়।

শরৎবাবু যেমন তাঁর সাহিত্যে গ্রামবাংলাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সোজা সাদামাটা কথায় গ্রামের মানুষের বর্ণনা করেছেন মুন্সী প্রেমচাঁদ হুবহু তাই করেছেন। মুন্সী প্রেমচাঁদ একটা গরু বা একটা কুকুর বা একটি কৃষকরমণী বা একজন জমিদার যে কোন একটি বিষয়কে বেছে নিতেন এবং তাকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজের অবস্থা বলে দিতেন। তার মধ্যে মানব চরিত্রের সমস্ত দিকই থাকত। ভয়ভীতি, লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, আপষকরা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কোন দিকই বাদ পড়তনা।

আমার একবার দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে ইকবাল, প্রেমচাঁদ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, টলস্টয় ও লেনিনের যতগুলি বই আমি পেয়েছি সেগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে আমি পড়েছি, এবং সেই পড়ার মধ্যদিয়ে মুন্সী প্রেমচাঁদ সম্পর্কে আমার ধারণা যে উনি উর্দুসাহিত্যে তখনকার সমাজের সত্য কথাকে যত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন তা আজও অনেক সাহাত্যিক পারেননি। তাঁর যে কোন

একটি গল্প একটি আয়নার মত তখনকার সমাজের প্রতিফলন করে। শুধু ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকেও।

মুন্সী প্রেমচাঁদ মারা গিয়েছিলেন ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৬ বছর। উনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন তাহলে হয়ত আজকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যেই তাঁর স্থান হ'ত। কিন্তু তাঁর গুনাগুন বুঝি এর চাইতেও বেশি এই কারণে যে তিনি বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লবের পরেও সেই সব কথার অর্থ আমাদের দেশে বোঝা যাচ্ছিলনা।

মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর যৌবনে গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একথা মনে করেছিলেন যে গ্রামের গরীবদের মুক্তি বোধহয় সেই পথেই আসবে। পরবর্তীকালে তিনি কিছু নতুন কথা বললেন, যেমন মহাজনী সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা এবং পঞ্চায়েতী রাজ্যের কথা। তিনি মনে করতেন যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরে সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চের হাতে চলে আসবে এবং পঞ্চের মাধ্যমে পরমেশ্বর নেমে আসবেন, আর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হবে। কিন্তু তা হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব উনি দিয়েছিলেন একথা বলে যে আমাদের কিষাণসভা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা মনে রাখা দরকার যে এই শব্দ "কিষাণসভা" কি অপারিসীম গুরুত্ব বহন করে।

সমালোচকদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা এই কথা বলার চেষ্টা করেন যে মুন্সী প্রেমচাঁদ আজকের যুগে অচল। এটা শুধু অসত্য নয় একটা উদ্ভট কথা; তার কারণ হ'ল যে মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, নতুন সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মানুষ এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেসব কাজ কি সম্পন্ন হয়েছে? হরিজনদের উপরে তথাকথিত উঁচু জাতের অত্যাচার কি বন্ধ হয়েছে? নারী জাতির মুক্তি কি এসেছে? না এসব কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়নি, এবং যতদিন এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবেনা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবেনা ততদিন পর্যন্ত প্রেমচাঁদের সাহিত্য তাজা থাকবে, এবং সংগ্রামরত মেহনতী মানুষের বুকে ভরসা যোগাবে।

[মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন : ৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজ সেদিন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করেছিল তার ধ্বংসের বজ্রগর্ভ মেঘ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছিল শোষক প্রভুরা। তাই শ্রমিকদের ধ্বংসের লড়াই-এ সাহায্য করতে প্রুশিয়ান সরকার সমস্ত বন্দী ফরাসী সৈনিকদের মুক্তি দিল। ভের্সাই আর জার্মান সরকারের সৈন্যরা আক্রমণ করল প্যারিস। অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে পথে পথে রক্তের আলপনা এঁকে দিল মৃত্যুঞ্জয়ী কমিউনার্ডরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৮শে মে পতন হ'ল বুর্জোয়াদের হাতে প্যারিসের। বর্বর প্রতিহিংসায় বুর্জোয়ারা সেদিন রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল প্যারিসকে। শুধু গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ত্রিশ হাজার মানুষকে।

কমিউনকে বিচার করতে গেলে বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে কমিউনকে প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার লড়াই এ ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীও সেদিন তার সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেনি। শ্রমিকদের নিজস্ব কোন পার্টি ছিলনা, ছিলনা অভিজ্ঞতা। বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার প্রভাবও ছিল তাদের ওপর গভীর। শোষণক্লিষ্ট কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ কমিউন স্থাপন করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছিল ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের মেহনতী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। দ্রুততার সঙ্গে ভের্সাই-এর বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানও সংগঠিত করতে পারেনি কমিউন। তাই কৌশলী বুর্জোয়ারা সেদিন ধ্বংস করতে পেরেছিল কমিউনকে। কিন্তু মৃত্যু হয়নি কমিউনের আদর্শের। কমিউনই প্রথম পথ দেখিয়েছিল শ্রমিকদের আর্থিক মুক্তির রাষ্ট্রব্যবস্থার।

কমিউনের মৃত্যুহীন আদর্শ সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে। সার্থক হ'ল চীন, ভিয়েতনাম আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তি যুদ্ধে।

কমিউনের অভিজ্ঞতা ভাবীকালের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—শ্রমিক শ্রেণীকে শুধু আগের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করলেই চলবেনা ঐ যন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে স্থাপন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র।

আজ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশে উড়ছে সমাজতন্ত্রের জয় পতাকা। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ছিন্ন করেছেন শোষণের শৃঙ্খল। গভীর থেকে গভীরতর সংকটে জর্জরিত হচ্ছে পুঁজিবাদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে উত্তাল এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা। দারিদ্র্য, নিপীড়ন ও অনাহারের বিরুদ্ধে লড়ছে দুনিয়ার শ্রমিক। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই জয়যাত্রার মুহূর্তে মেহনতী মানুষ বারবার স্মরণ করবে প্যারী কমিউনকে।

'কমিউনের আদর্শ হচ্ছে সমাজবিপ্লবের আদর্শ, শ্রমজীবী মানুষের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আদর্শ। এ হচ্ছে সারা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের আদর্শ। এই অর্থে কমিউনের মৃত্যু নেই' (লেনিন)।

শতবর্ষের আলোকে প্রেমচন্দ্

তপন চক্রবর্তী

যখন হিন্দী তথা উর্দু সাহিত্য বানানো কল্পকাহিনী আর অবাস্তব চরিত্রের আজগুবি কান্ড কারখানার ভোজবাজীতে মসগুল হয়েছিল তখন সেই কল্পনার ইউটোপিয়া থেকে রক্তমাংসের মানুষের বাস্তব জীবনের কাছাকাছি হিন্দি তথা উর্দু সাহিত্যকে টেনে নিয়ে আসেন মনীষী লেখক মুন্সী প্রেমচন্দ্। তাঁর জন্ম ১৮৮০ সালে বেনারসের কাছাকাছি লমহি গ্রামে। বাবা অজয়ব রায় ছিলেন একজন ডাক কর্মী। শৈশবে মাতৃহীন প্রেমচন্দ্ জীবনের নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে—দুঃখ কষ্টের ঘনিষ্ঠ রূপকে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

প্রেমচন্দ্ তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম ধনপত্ রায়। লেখার জন্য রাজরোষে তাঁকে পড়তে হয় এবং নিজেকে গোপন রাখার জন্য কখনো নবাব রায় কখনো প্রেমচন্দ্ নাম নিতে হয়। অবশেষে প্রেমচন্দ্ নামেই তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রেমচন্দ্ তাঁর লেখনী ধরে ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন (১৯৩৬ সাল) পর্যন্ত তাঁর কলম সক্রিয় ছিল। লেখক হিসেবে তিনি ৩৬ বছর ব্যাপী জীবন ও জগতের যে অবস্থা--দেশের যে অবস্থাকে দেখতে পেয়েছেন--তার ঘনিষ্ট বাস্তব রূপকে তাঁর কলমে সত্যনিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নে অস্থির সেই সময়ের গ্রামজীবন--শোষণে, নির্যাতনে, জরাজীর্ণ গ্রামীণ গরীব মানুষ তাঁর কলমে কেবল স্থির চিত্র হয়েই ফুটে ওঠেনি। নিজের সৃজনশীল প্রতিভায় এবং দূরদর্শী জীবনবোধের সাহায্যে তিনি নিপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদের সিংহদুয়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনবোধ এবং শ্রেণীসচেতনতা তৎকালে কেবল হিন্দি বা উর্দু সাহিত্যেই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই তুলনাহীন।

প্রেমচন্দ্ প্রায় ২৭৫টি ছোট গল্প এবং ১৫ খানি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া প্রবন্ধ, নাটক, শিশু সাহিত্যও রচনা করেছেন, এবং অনুবাদও করেছেন কয়েকটি বই। তবে সবকিছুর উপরে গল্পে ও উপন্যাসে তিনি সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বঙ্গভূমি, কর্মভূমি, সেবাসদন, গোদান, গবন এবং গল্প গ্রন্থের মধ্যে কাফন, সোজে বতন, সপ্ত সরোজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে একদিকে যেমন তিনি গ্রামের ও শহরের আর্থিক শোষণকে চিত্রিত করেছেন অন্যদিকে সমাজের নানা ব্যাধি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাঠককে সচেতন করেছেন। তাঁর রচনায় দরিদ্রের দুর্দশা, পতিতাবৃত্তি, সাম্প্রদায়িকতা, জাত পাত ইত্যাদির সমস্যাগুলি নগ্নরূপে ফুটে উঠেছে। এবং সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে এই সব সমস্যার মোকাবিলায় মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের কথা।

এবছর প্রেমচন্দের শতবর্ষ। এবং সেকারনেই প্রগতিশীল মানুষের কাছে এই শতবর্ষের এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। শতবর্ষের এই সুযোগে প্রেমচন্দের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গড়ে তোলা আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রেমচন্দ্ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্যাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন সেই সমস্যা আজও প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই আজকের জীবনেও প্রেমচান্দ্ সমান ক্রিয়াশীল।

আমাদের কাছে খুবই আনন্দের বিষয় যে প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতবর্ষের শুরুতেই কলকাতায় প্রেমচন্দের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিশির মঞ্চের সেই আলোচনা সভায় হিন্দি বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেমচন্দের উপর নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন যা প্রেমচন্দ্ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভার উদ্বোধন করে শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ্ বলেন—প্রেমচন্দ্ যে ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন সে ভাষা আমি জানিনা। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য পাঠ করেছি। এবং বন্ধু বান্ধবের মুখে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুনেছি। এতে আমার প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে মনে হয়েছে যে তাঁর মতন লেখক তৎকালীন যুগের ভারতীয় সাহিত্যে আর কেউ ছিলেন না। সেই যুগে যে বিষয়গুলিকে তিনি তাঁর সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়গুলি বহু বড় সাহিত্যিকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সমাজের আর্থিক শোষণ, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রেমচন্দ্ যেভাবে তাঁর কলম নিয়ে লড়াই করেছেন তেমনটা সে যুগে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয়না। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে যদি প্রেমচন্দের তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহলেই আমরা প্রেমচন্দের

গুরুত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। এই তুলনামূলক আলোচনা সমাজের অগ্রগতির স্বার্থেই এক মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেমচন্দ্ চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুবাদের মাধ্যমে প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। প্রথম দিনের সভার সভাপতি রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং প্রেমচন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি অল্পবয়সে তাঁর যে উষ্ণ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন এবং প্রেমচন্দের স্থায়ী স্মারক নির্মাণের জন্য তিনি আবেদন জানান।

দ্বিতীয় দিনে শ্রী কে. সি পাণ্ডে ও ডঃ সরোজমোহন মিত্র দুটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুজনেই প্রেমচন্দের সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেন। ঐ দিনের বিশিষ্ট বক্তা ডঃ নামওয়ার সিং প্রেমচন্দের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন যে প্রেমচন্দ্ গান্ধীবাদ থেকে ক্রমশঃ মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন এমন কথা বলাটা ঠিক নয়। এটা নিছক সরলীকরণ। আসলে গভীর মানবতাবাদী ছিলেন প্রেমচন্দ্। সেই মানবতাবাদী মনোভাবই তাঁকে গান্ধীজীর আন্দোলনের কাছাকাছি এনেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে সর্বশ্রী আলিখ লখনৌভি, নারায়ণ চৌধুরী, অর্তব নারায়ন সিং, শ্রীমতী চন্দ্রাপাণ্ডে প্রমুখ প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যে প্রেমচন্দের স্থান, প্রেমচন্দের উত্তরাধিকার, প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে নারী ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এই দিনের সভাপতি ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী মহঃ আমীন।

চতুর্থ দিনে এবং অন্যান্য দিনগুলিতে প্রেমচন্দের সাহিত্য নিয়ে তৈরী কয়েকটি নাটক ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

এই আলোচনা চক্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন প্রেমচন্দের পুত্র হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল শ্রী অমৃত রায়। তিনি প্রথম ও তৃতীয় দিনে আলোচনা করেন। প্রথম দিন তিনি প্রেমচন্দের সমকালীনত্ব বিষয়ে বললেন—প্রেমচন্দ্ যে সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে লিখেছেন, যে সব সংস্কার, দুর্নীতি, ও পশ্চাৎপদ মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন সেই সব সমস্যা, কুসংস্কার আজো আমাদের সমাজে বর্তমান। তাই প্রেমচন্দ্ সাহিত্য আজো সমান ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ দিনে তিনি প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর প্রশ্নে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যারা প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর অভাব আছে বলে মতামত রাখেন তারা আসলে সাহিত্যে শৈলী বা শিল্প সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা থেকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বিচার করেন। প্রেমচন্দ্ যে সব বিষয়গুলি সাহিত্যে নিয়ে এলেন তা তার পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাস্তব জীবন, দারিদ্র্য, শোষণ ইত্যাদির রূপকে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রচলিত ধারণায় ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন—একজন রাজকন্যা আর একজন দেহাতী রমণীর রূপ একরকম হয়না। দেহাতী রমণীর রূপকে উপলব্ধি করতে হলে যে সুস্থ সৌন্দর্যবোধ প্রয়োজন সেই বোধের আলোকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সেদিন চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনও বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সব মিলিয়ে আলোচনা চক্রটি প্রেমচন্দ্ সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলেই মনে হয়।

প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এমন একটি আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রেমচন্দের সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিশ্রুত পথে এগিয়ে যাবেন প্রেমচন্দ্ প্রেমীদের এটাই প্রত্যাশা।

আলোচনা

অলচিকি ও পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে পুরুলিয়ায় গণ-সম্বর্ধনা দিয়েছেন। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু উদ্ভাবিত সাঁওতালি ভাষার হরফ অলচিকিকেও এই সঙ্গে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, সঙ্গে অলচিকি লিপিকে সাঁওতাল জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির উপযোগী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও।

পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ সাঁওতাল আদিবাসী বসবাস করেন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়, বীরভূমে ও মালদহ জেলায় মূলত এরা বসবাস করেন। এছাড়াও পশ্চিমদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সাঁওতাল বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সাঁওতাল আদিবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিহারের চাইবাসা, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম প্রভৃতি জেলায়, উড়িষ্যায় ও আসামের কিছু কিছু অঞ্চলে। অর্থাৎ মূলত ভারতের চারটি প্রদেশে সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন।

সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। কিন্তু সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতিরও সুমহান ঐতিহ্য আছে। অতীতে সাঁওতালরা গভীর বনে জঙ্গলে বসবাস করত। এখনও তাদের অনেকে নগর সভ্যতার আলো দেখেনি, তারা নিজস্ব জীবন ধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী ছোট ছোট গোষ্ঠী করে বসবাস করছেন সুদূর গ্রামাঞ্চলে। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে নিজেদের একান্ত আপন জগতে তারা নিমগ্ন।

ভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন। প্রতিটি ভাষার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সাধারণ সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্ব সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ভাষার জন্ম দিয়েছে, ক্রম বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ যখন সভ্যতার আলো পায়নি, তখনও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। গুহাবাসী মানুষ নানা রকম চিহ্ন ও সংকেতের মাধ্যমে, চিত্রের মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমে ক্রমে মানুষের প্রয়োজনেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, বর্ণলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, ছাপাখানা সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সামান্য কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এমন উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছে যার ফলে সমস্ত ভাষারই ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, শব্দ ভাণ্ডার দ্রুত স্ফীত হয়েছে। নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবিত হয়েছে।

সাঁওতাল আদিবাসীরা দীর্ঘকাল অবহেলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁওতাল আদিবাসীরাও যখন বনে জঙ্গলে বসবাস করত, কখনও ভয়, সভা, যোগাযোগ করা প্রভৃতি বিষয় বোঝানোর জন্য তারা পাথরের গায়ে অথবা গাছের ডালে নানা রকম চিহ্ন ও সঙ্কেত এঁকে রাখত। শুধু চিহ্ন বা সঙ্কেতের এই সব ব্যবহারই নয়, সামনে কোন বিপদ বা ভয়ের আশংকা থাকলে তারা পশুর সিং দ্বারা নির্মিত নানারকম বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বিচিত্র শব্দের সাহায্যে সেই সব বিষয়ে সতর্কও করত। এসব ছাড়াও এখনও বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের গায়ে নানারকম দাগকেটে তারা মালিকানা নির্দ্ধারণ করে দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন এখনও রয়েছে। বাঁ হাতে পোড়া দাগ সাঁওতাল উপজাতির চিহ্ন বহন করে। সাঁওতাল উপজাতি রমণীদের শরীরে শিল্প সুষমামণ্ডিত নীল রঙের প্রিন্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রিন্টগুলি অবশ্যই অর্থবহ এবং এগুলি উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে নানা রকম চিহ্ন সঙ্কেত শব্দ ধ্বনির যে ব্যবহার প্রচলিত, ক্রমে সেইসব চিহ্ন সঙ্কেত শব্দ ধ্বনি ভাষার জন্ম দিয়েছে কিন্তু লিখিত কোন সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি, ছাপার হরফে বহু মানুষের সংযোগ সৃষ্টিকারী ভাষার জন্মও হয়নি, কারণ সাঁওতালী ভাষায় লেখার উপযোগী কোন হরফ ছিল না।

সাঁওতাল ভাষীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য এবং ভাষা প্রকাশ করার জন্য বাংলা লিপির ব্যবহার করা হত। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য সামনে রেখে মিশনারীরা বিভিন্ন জায়গায় সুনিপুনভাবে আস্তানা গাড়ে। ধর্ম প্রচার করার

অাছিলায় তারা সাঁওতালী জনগণকে রোমান হরফ ব্যবহার করার পথে ঠেলে দেয়। শিক্ষা ও ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ ব্যবহার করার জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু বিদেশী ভাষার হরফ ব্যবহার করে খুব একটা সুফল পাওয়া যায়নি, বরং সাঁওতালরা যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছেন।

অলচিকি লিপির উদ্ভাবক ও রূপকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে. সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি আধুনিক সভ্য সমাজে নিদারুণভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে যদি সাঁওতালী ভাষা তার একান্ত নিজস্ব হরফ উদ্ভাবন করতে না পারে। সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করার জন্য, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পরের সংগে যোগাযোগ করা এবং ছাপাখানার মাধ্যমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর জনগণের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পদগুলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপির প্রয়োজন।

খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে কেউ কেউ রোমান হরফ ব্যবহার করলেও রঘুনাথবাবু কিন্তু অনুভব করেন যে, রোমান হরফে বা বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষার একান্ত নিজস্ব যে উচ্চারণ ধ্বনি তা সার্থকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বস্তুত অন্য কোন ভাষার হরফে ঠিক ঠিক ভাবে সাঁওতালী ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী যারা রোমান হরফ ব্যবহার করতেন সাঁওতালী ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য. তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী জাতির তুলনায় অতি নগণ্য ছিল।

রঘুনাথবাবু কৌতূহলী মানুষ। এখন এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখে মুখে কৌতূহল, অজানাকে জানার আকাঙ্খা তীব্র। একজন আবিষ্কারকের মত



সস্ত্রীক পণ্ডিত মুর্মু, সংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্রশংসাপত্র

অপরিসীম ধৈর্য, প্রলোভন ভুলে আত্মত্যাগ করার স্পৃহা এবং অন্যমত সহনশীলতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে যুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে তা খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্জয় নিষ্ঠা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর আছে।

হালকা শীতের সকালে রোদের দিকে পীঠ দিয়ে বসেছিলেন পণ্ডিত মুর্মু। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় ধবধবে সাদা অবিন্যস্ত কেশ। চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে হরফ আবিষ্কার ও প্রচার করার কাজে। শুরু করে ছিলেন ১৯২৫ সালে। আজও সেই প্রতিভা সমান ভাবে উজ্জ্বল। বর্তমানে পণ্ডিত মুর্মু আছেন সিংভূম জেলার টাটানগরের করণ ডিহিতে ছেলের কাছে। ছেলে টিসকোতে চাকরী করেন। যুব মানস পত্রিকার প্রয়োজনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে সাঁওতালী ভাষা, সংস্কৃতি ও আদিবাসী জীবনের অনেক অজানা কথা টুকরো টুকরো করে জানতে পেরেছি।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম ১৯০৫ সালের ৫ই মে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম দাঁত-বোমে, বাবা নন্দলাল মুর্মু তাঁকে ম্যাট্রিককুলেশন পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। রঘুনাথবাবু বললেন—ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপাদা হাই স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে বারিপাদা পাওয়ার হাউসে শিক্ষানবীশ ছিলাম। কিন্তু শিক্ষা শেষ হ'লে কোন চাকরী করার ইচ্ছা হ'ল না। কুটির শিল্পে আগ্রহ দেখা দিল, বুনন শিল্পকে বেছে নিলাম।

কারপেট বুনন ও টুইস্টিং-এ অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন রঘুনাথ মুর্মু। বহু মানুষ তাঁর শিল্পী হাতের কাজ দেখতে আসতেন। একদিন ময়ূরভঞ্জ মহারাজার তৎকালীন দেওয়ান ডাঃ পি. কে. সেন এলেন দেখতে এবং মুগ্ধ হলেন। ফলে রঘুনাথজীকে প্রস্তাব দিলেন ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ যাওয়ার। রঘুনাথজী রাজী হয়ে গেলেন। কলকাতা শ্রীরামপুর ও গোসাবায় শিল্পের যান্ত্রিক কর্মকৌশল সম্পর্কে ট্রেনিংও নিলেন। তারপর বারিপাদা পূর্ণচন্দ্র ইনস্টিটিউটের ইনস্ট্রাক্টর। কিন্তু এখনেও মন বসলো না, স্থায়ী হ'তে পারলেন না। ছ'মাসের মধ্যে পিতা নন্দলাল মুর্মুর জীবনাবসান ঘটল, ফিরে যেতে বাধ্য হলেন রঘুনাথজী। দেওয়ান সাহেব আবার রঘুনাথজীকে তার বাড়ীর কাছাকাছি বাদামটালিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এখানেই রঘুনাথজীর জীবনে খানিকটা স্থায়ীত্ব এসেছিল।

রঘুনাথজী যখন বারিপাদায় শিক্ষানবীশ ছিলেন

[illegible]

রঘুনাথ মুর্মুর নিজের হাতে লেখা অলচিকি

তখন তাঁকে আদিবাসী ভাষার বিভিন্ন লিপি লিখতে হয়েছে। সমস্যাটি তখনই তাঁর মাথায় ঘুর-পাক খেতে থাকে। তিনি একান্ত নিজস্ব একটি বর্ণ-লিপির প্রয়োজনে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সমস্যার জট খুলতে গিয়েই জন্ম নিল ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্ত, জন্ম নিল সাঁওতাল ভাষা-ভাষীদের নিজস্ব বর্ণমালা। অল স্ক্রিপট। তখন রঘুনাথজী বাদামটালিয়ায়। বর্ণলিপি না হয় এলো, তার প্রচার কিভাবে হল? আদিবাসী জনগণ নতুন বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত কিভাবে হলেন? কেমন করেই বা তা জনপ্রিয়তা লাভ করল? অলচিকির রূপকার রঘুনাথ মুর্মু এরকম একঝাঁক প্রশ্নের জবাব দিলেন ধীরে ধীরে একটার পর একটা করে। দেখুন, যৌবনকালেই কতগুলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে দেখা দেয়। দেখতাম চোখের সামনে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেখাপড়া করে না, স্কুলে যেতে চায় না, অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে, সমগ্র সাঁওতাল জাত পিছিয়ে যাচ্ছে, সভ্য সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে ভাবনার জটও খুলতে লাগল। প্রশ্ন দেখা দিল আদিবাসী ভাষা 'Phonetically' অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে কতটা স্বতন্ত্র, কেন সাঁওতাল ছাত্ররা প্রচলিত বর্ণমালা গ্রহণ করছে না, কিভাবে বর্ণমালার উন্নতি করলে তা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ছাপা ও হাতের লেখার মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকবে এমন বর্ণমালার চেহারা কেমন হবে। কটা বর্ণের প্রয়োজন হবে, আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, মাহালি বিহরদের ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা, রোমান, দেবনাগরী হরফ উচ্চারণ ধ্বনি যথাযথভাবে আনতে পারছে না। এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেন বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করা হয়, এদের উদ্ভবের নেপথ্য কাহিনী কি? এই সব প্রশ্নই আমার হরফ আবিষ্কারের প্রেরণা, থামলেন রঘুনাথজী। "জন-সাধারণের প্রয়োজন পূরণ করার প্রচেষ্টাকেই প্রেরণা বলতে হয়। না হলে বাইরে থেকে অন্য কেউ আমাকে প্রেরণা দেয়নি।"

"অলচিকি তৈরী করার পর প্রশ্ন দেখাদিল প্রচার কিভাবে হবে। সবাইকে ধরে ধরে শেখান সম্ভব না। তার জন্য মুদ্রণ ব্যবস্থা চাই। বিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই একটা Hand Press তৈরী করলাম"।

হ্যাণ্ড প্রেস তৈরী করার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর। একটু থামলেন তিনি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস। "আজ অনেক মানুষ সময়ের অগ্রগমনের সাথে সাথে অল স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করছেন"। ঘটনাচক্রে রঘুনাথজীর তৈরী হরফ ও হ্যাণ্ড প্রেসের খবর পেয়েছিলেন শিক্ষা দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। তাঁরা রঘুনাথজীকে রাজ্য প্রদর্শনীতে অলচিকি দেখাতে বললেন, সেটা হচ্ছে ১৯৩৯ সাল। প্রদর্শনীতে অল-চিকি দারুণ আলোড়ন তোলে, প্রচার বাড়ে।

আদিবাসী সাঁওতালী জনগণ অলচিকি হরফ ব্যবহার একদিনে রপ্ত করেননি। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় এলাকায় প্রচার কাজ চালিয়েছেন। হ্যাণ্ড প্রেসে লিপি ছাপিয়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিলি করেছেন। বাধারও সম্মুখীন হয়েছেন। তবুও সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব বাক্‌রীতি উচ্চারণভঙ্গী ও ভাষা মাধুর্য রক্ষার জন্য একক উদ্যোগে অগ্রসর হয়েছেন। যুক্তি-পরামর্শও অনেক দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত সাঁওতাল হরফ আবিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা অলচিকি দেখার পর সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন, এবং এর উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

অলচিকি প্রায় চার দশক আগে পৃথিবীর আলো দেখেছে। জন্মের পর কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, দেশও স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু সরকারীভাবে অলচিকি লিপিকে মেনে নেওয়া হয়নি এতোদিন। রঘুনাথ মুর্মু পশ্চিমবাংলা, বিহার উড়িষ্যার সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে লিপির প্রয়োগ পদ্ধতি, ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ও শব্দ গঠন প্রণালী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে-ছিলেন।

হরফ আবিষ্কারের সময় সাঁওতালদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসকে ও পরিচিত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে লিপি দ্রুত রপ্ত করা যায়।

রঘুনাথবাবুর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপিতে ছয়টি স্বরবর্ণ ও চব্বিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে অর্থাৎ মোট তিরিশটি বর্ণ আছে। ডায়া ক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করার ফলে কেউ কেউ এই হরফকে অবৈজ্ঞানিক ও জটিল বলে মনে করেন, কিন্তু পণ্ডিত মুর্মু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন হরফ আবিষ্কার করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই এবং এগুলি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাঁওতাল ভাষার উচ্চারণ ধ্বনি সঠিকভাবে আনার জন্যই ডায়া ক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে সামান্য কয়েকটা ক্ষেত্রে। প্রত্যেক স্বরবর্ণের পর চারটি করে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, এই 'arrangenent' শিশুদের বর্ণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। কারণ একটি স্বরবর্ণ সামনে থাকায় বর্ণ পাঠে গতিশীল নিয়মের সৃষ্টি করেছে।

পণ্ডিত মুর্মু তাঁর লিপিতে অন্য কোন লিপির প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন না। রঘুনাথবাবু ও তাঁর পুত্র আমাকে বর্ণগুলির গঠন প্রণালী বোঝাবার জন্য বেশ কিছু উদাহরণ দিলেন। কিভাবে, কোন

ঘটনাকে মনে রেখে কত সহজ উপায়ে এই সব লিপির কাঠামো রচিত হয়েছে তাও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি সাঁওতালী ভাষার কোন জ্ঞান বা পূর্ব ধারণা না থাকায় তা সঠিকভাবে আমি বুঝতে পারিনি এবং তাই তার ব্যবহারও করলাম না।

নানারকম জটিল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাঁওতালী জনগণের নিজস্ব বর্ণমালা অলচিকি অগ্রসর হয়েছে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অলচিকির প্রচার কাজ সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কিছু কিছু সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ে কোন স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র্য আদিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অলচিকি সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ অগ্রসর হয়েছে। সম্পূর্ণ অলচিকিতে মাসিক পত্রিকা 'Sagen Sakam' ছাপাও হচ্ছে। আদিবাসী জনগণের অর্থ সাহায্যে কলকাতার 'স্বদেশী টাইপ ফাউন্ড্রি' থেকে রঘুনাথবাবু ছাপার অক্ষর বানিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেসও চালু করেছিলেন। কলকাতার 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' নানারকম বইপত্র, পুস্তিকা ও সাহিত্য পত্রিকা 'Jug Jarpa' প্রকাশ করছেন অলচিকিতে।

দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, গণডেপুটেশন মিছিল ও সভার মধ্যদিয়ে অলচিকিকে স্বীকৃতি দানের দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার জনতা সরকার সকলের কাছেই আবেদন পেশ করা হয়েছিল কিন্তু কেউ অলচিকিকে স্বীকৃতি দেননি। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারই অলচিকিকে স্বীকৃতি দেন। আদিবাসী ও তপশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মান্ডির সভাপতিত্বে গঠিত ক্যাবিনেট সাব কমিটি সুদীর্ঘ পর্যালোচনার পর আদিবাসী জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমতকে মর্যাদা দিয়ে বিগত জুন মাসে অলচিকিকে সাঁওতাল জনগণের লিখিত ভাষার বাহন বলে স্বীকার করে নেন। সেই স্বীকৃতিই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় গত ১৭ই নভেম্বর পুরুলিয়ার হাজার হাজার আদিবাসীর উপস্থিতির আনন্দঘন অনুষ্ঠানে রঘুনাথ মুর্মুকে সম্বর্ধনা দানের সভায়। রঘুনাথবাবুর ধারণা বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশের সরকারও অলচিকিকে ধীরে ধীরে মেনে নেবেন এবং কালক্রমে অলচিকিই হবে সাঁওতাল জনগণের নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্টের সূচক।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতাল জনগণের সামাজিক পশ্চাৎপদার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী। তাদের জীবনের নানা দিক নিয়ে শিক্ষমূলক কয়েকটা গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যেমন অলচেমেদ, এলখা পোতপ (অংকের বই), পার্শি পোহা (স্কুল পাঠ্য বই), দারেশ ধন (নাটক), Ronode (ব্যাকরণ), বিধুচন্দন (নাটক), খেরোওয়ার বীর (নাটক) প্রভৃতি।

রঘুনাথ মুর্মু নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছাড়াও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু খবর রাখেন। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি ব্যথিত, কেন্দ্রীয় সরকারের আরও তৎপরতা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি অবশ্য সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পাঠ করেই খবরাখবর জানতে পারেন।

সাঁওতালী ভাষার সৌন্দর্য ও নিজস্বতা রক্ষায় এবং তার অগ্রগমনে অলচিকি বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করবে বলে পণ্ডিত মুর্মু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। যারা এখন অলচিকির বিরোধীতা করছেন তারা অচিরেই তাদের ভুল ধরতে পারবেন কারণ এ কথা সবাই মানবেন যে একটি ভাষাকে আর একটি ভাষার লিপিতে প্রকাশ করলে ভাষা ক্রমশ দীন ও হতশ্রী হয়ে পড়ে। কেউ কি নিজের ভাষার ভগ্ন জীর্ণ চেহারা পছন্দ করেন দীর্ঘকাল। আমার ধারণা অলচিকির জয় ও স্থায়ীত্ব অনিবার্য।

নিজের ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ রঘুনাথবাবু গৌরবান্বিত বোধ করছেন। ভবিষ্যতে এর উন্নতির জন্য আরও অসংখ্য শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক এগিয়ে আসবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর শেষ জীবনের পাথেয়।

দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার সাক্ষাৎকার শেষ করে ফিরে আসছিলাম এক বিস্ময়াভিভূত অনুভূতি নিয়ে। মাঝে চা টোস্টের লৌকিকতা শেষ করেছি। ওঠার আগে তাঁর স্বহস্তে অলচিকি লিপিতে কিছু লিখে দিতে বললাম। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, তবু ধরে ধরে লিখে দিলেন—"পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়ে সাঁওতালি ভাষার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা আরও অনেক কাজ করবেন"।

—বিশেষ প্রতিনিধি

প্রতিবেদন

মানভূমে পৌষের ভিড়ে

জি এম আবুবকর

বাঙালীর কাছে মাস হিসেবে পৌষের কদরটাই আলাদা। পৌষে গৃহস্থের ঘর ভরে যায় ফসলের সম্ভারে, আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বাংলায় একটা চালু বাগধারা আছে—কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ। প্রিয় মাসটিকে ঠিক সর্বনাশের বিপরীত কোটিতে বসিয়ে পক্ষান্তরে তারই মহিমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুলিয়ার মানভূমী মানুষের কাছে পৌষের একই মর্যাদা।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে মকর সংক্রান্তি ও টুসুপরব উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা, মুরগী লড়াই ইত্যাদি আনন্দোপকরণের বিস্তর আয়োজন হয়। তবে এবছর খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসে কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবু উৎসবের এই মরশুমে মানুষ সামর্থ অনুযায়ী মেতে উঠেছে, তাও দেখেছি।

'আঘন সাকরাত' অর্থাৎ অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় টুসুপরব। টুসু আজ মানভূমের মানুষের কাছে লৌকিক দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা। গ্রামের ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর মানুষ এই উৎসব পালন করেন। টুসুপরবের জাঁক-জমক আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে একমাত্র বাঙালীর দুর্গোৎসবের তুলনা চলতে পারে। উৎসবের আগে ঘরে ঘরে নতুন কাপড়চোপড় কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। ঘর-দুয়ার ঝাড়পোছ হয়।

শোনা যায়, কাশীপুরের পঞ্চকোটরাজ টুসু ও ভাদু—এ'দুটি পরবের প্রবর্তন করেন। রাজদুহিতা টুসু ও ভাদুর অকালমৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে রাজা ভাদ্রমাসে ভাদুপরব ও পৌষমাসে টুসুপরব উদ্‌যাপন করেন এবং রাজ্যের প্রজাদেরও উৎসব পালন করতে উৎসাহিত করেন। তবে টুসুর নাকি মৃত্যু হয়েছিল বৈশাখমাসে। রাজ নির্দেশে পৌষমাসেই টুসু উৎসব শুরু হয়। মানভূম সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে এ'দুটি পরবের উৎসব সম্বন্ধে কথা পেড়েছিলাম। তিনি বলেছেন, রাজদুহিতা ভাদুর মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে ভাদু উৎসবের সূচনার ব্যাপারটি সঠিক। কিন্তু টুসু উৎসব মানভূমে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর সঙ্গে কোন রাজকুমারীর মৃত্যুকাহিনী যুক্ত নেই।

যাই হোক, 'আঘন সাকরাতের' দিন টুসুকে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওইদিন থেকে গ্রামের মেয়েরা টুসুগান শুরু করেন। টুসুগান আজ মানভূমী সংস্কৃতি তথা বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ। সহজ মোহনীয় পল্লীসুরে এগান গাওয়া হয়। সর্বত্র একই সুরের গান। মেয়েরা দলবেঁধে রাস্তায় চলতে চলতে, বনে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে করতে, ঘরে অবসর সময়ে আসর করে বসে টুসুগান করেন। গানের ভাষায় টুসুর মাহাত্ম, গ্রামজীবনের নানান কথা, প্রেমের কথাও থাকে। স্বভাব কবিদের মতো মুখে মুখে গানের কথা রচনা করা হয়। ইদানিং ছাপানো পুস্তিকায় টুসুগানের সংকলনও পাওয়া যায়। টুসুগান শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও করেন। তবে তাদের গানের কথায় আদি-রসের ছড়াছড়ি থাকে। সংক্রান্তির চারপাঁচ দিন পর থেকে গান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এরপর গান গাইলে নাকি মুখে খোশ পাঁচড়া হয়।

সাকরাতে অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির রাত্রে মেয়েরা সারারাত জেগে গান করেন। পরদিন টুসুর "চৌডোল" নিয়ে দলবেঁধে নিকটবর্তী জলাশয় কিম্বা নদীতে ভাসিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে মকর স্নান সেরে আসেন। মকর পরবে স্নানের রীতি এখানেও জনপ্রিয়। 'চকর দেখে মকর স্নান'—সূর্যোদয়ের সময় স্নান করলে বছরটা ভালো কাটবে। মকর স্নানে পুণ্যার্জনের ও পাপ স্খলনের প্রচলিত বিশ্বাস এখানে ততোটা পরিচিত নয়।

টুসুর 'চৌডোল' রঙিন কাগজ কেটে ও কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়। দেখতে খানিকটা শিয়া মুসলমানদের মহরম পরবের তাজিয়ার মতো। চৌডোল প্রতি পাড়ায় বা বাড়িতে তৈরী হয়। অধিকাংশের আয়তন বেশ ছোট, খেলনা রথের মতো।

পৌষ সংক্রান্তিতে পুরুলিয়ার সর্বত্র মেলা বসে। এর মধ্যে নামডাক আছে মাঠাপাহাড়ে মাঠাকুরুর মেলা, চাণ্ডিলের অদূরে সুবর্ণরেখার তীরে জয়দার মেলা, বীরগ্রামে সতী মেলা, হুড়ার শিলাই মেলা, পুরুলিয়ার

কাছে চাঁচড়া মেলা, সুবর্ণরেখার তীরে ঐতিহ্যবাহী সতীঘাটার মেলা।

সংক্রান্তির দিন বলরামপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি ছোট মেলায় গিয়েছিলাম। সকাল থেকে সেখানে মোরগ লড়াই চলছে। বাবুগৌরবের কলকাতায় এককালে বাবুরা টাকা ওড়াতো মুরগী লড়াই করে। পুরুলিয়ার দেহাতী মানুষের কাছে আজো মোরগ লড়াই দারুণ জনপ্রিয়। অঘ্রাণ-পৌষ-মাঘ মাসে সর্বত্র মোরগ লড়াইয়ের আখড়া বসে। লড়াইয়ের মোরগ কেনাবেচা হয় নানান জায়গার হাটে। এ'বছর এক একটি মোরগ ১৫ টাকা থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। তাগড়া চেহারা, দারুণ লড়তে পারে—এরকম মোরগের দাম পঞ্চাশ ষাটের কম নয়।

মেলায় লোক আর ধরেনা। তার মধ্যে শ'আড়াই লোক গোল করে দাঁড়িয়ে মোরগ লড়াই দেখছিল। মোরগের একপায়ে ধারালো ফলার মতো অস্ত্র বাঁধা। স্থানীয় ভাষায় একে 'কাইত' বলে। লড়াই হচ্ছে প্রায় সমান সাইজের মোরগের সঙ্গে। দুর্বলের সঙ্গে প্রবলের নয়। দুটো মোরগকে মুখোমুখি ধরে রেখে রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেড়ে দেওয়ামাত্র তারা ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে একে অপরের ওপর জাতশত্রুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঝুটোপুটি করতে করতে একের 'কাইতে' অন্যের বাজু বা পেট চিরে যাচ্ছে। আহত রক্তাক্ত পরাজিত মোরগ বিজয়ী মোরগের মালিকের পাওনা, রসনা তৃপ্তির আদিমতম রসদ। পরবের দিনে এইভাবে বহু নেশাগ্রস্ত লোককে মোরগ লড়াইয়ে টাকা ওড়াতে দেখলাম। অভাবী মনুষরাও বিরত নেই। অনেকে মোরগ লড়াই না করে শুধু লড়াইয়ের উপর টাকার বাজী ধরে জুয়া খেলছে। আজকাল আবার প্রাইজ দেবার চলন হয়েছে। নতুন জায়গায় লড়াইয়ের আখড়া বসানোর সময় লড়াইকে আকর্ষণীয় করার জন্য গেঞ্জী, ছাতা, বালতি ইত্যাদি গৃহস্থালী জিনিষপত্র উদ্যোক্তারা প্রাইজ হিসাবে ঘোষণা করেন। পুরুলিয়ার এই মোরগ লড়াই নামধেয় টাকার শ্রাদ্ধের ঐতিহ্য বহালতবিয়তে আছে, থাকবেও হয়ত দীর্ঘকাল এর জনপ্রিয়তার জন্য।

পৌষ সংক্রান্তির দিন বাঙালীর পিঠে পরব। পুরুলিয়াতেও এদিন সর্বত্র পিঠে খাওয়ার ও খাওয়ানোর প্রতিযোগিতা চলে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সকলে আন্তরিক অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হয়। আমিও বাদ গেলাম না। আমন্ত্রিত হলাম দুটি বন্ধু-গৃহে বাঙালী মেয়েদের কাছে পিঠে তৈরী—এ শিল্প বিশেষ। রসে ডুবু ডুবু পিঠে, চোবানো তেলে-ভাজা পিঠে, পিঠের পেটে নানানরকম পুর দিয়ে তৈরী পিঠে। ডালের, ছাতুর, সুগন্ধী মশলার, নারকোলের—নানান ধরণের পুর করতে বাঙালী মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী এসব পিঠে গরমজলের ভাপে সিদ্ধ করা হয়। খেলে রসনার পরিতৃপ্তি। তবে গরীবের অন্নব্যাঞ্জনে যেমন পদের বৈচিত্র্য থাকেনা, তেমনি পিঠে পরবেও তাদের রকমফের করার সুযোগ থাকেনা। পুরুলিয়ার দরিদ্রসাধারণের প্রিয় আস্‌কা পিঠে, গুড় পিঠে আর উন্দি পিঠে।

মকর সংক্রান্তিতে জয়দায় তিনদিনের বিরাট মেলা বসে। সংক্রান্তির পরদিন এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম মেলা দেখতে। বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিহারের চান্ডিল, সেখান থেকে চার কিলোমিটার ভিতরে জয়দা। স্থানটি প্রকৃতির রূপপাগলদের বিহার ক্ষেত্র। এখানে এলেই মন আপনহারা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। টাটা হয়ে পাকা রাস্তা এখানে সুবর্ণরেখার উপর দিয়ে রাঁচীর দিকে চলে গেছে। আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই পাহাড়ের গা ঘেঁসে সুবর্ণরেখা বাঁক নিয়েছে। সারা এলাকা সবুজ বনানীর চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে নদীর কিনারে শিবমন্দির। এইখানে প্রতিবছর মেলা বসে।

সকালবেলায় মেলায় গিয়ে দেখলাম মেঘলা আবহাওয়ার জন্য লোকজন বেশী আসেনি। সুবর্ণরেখার ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে মেলা উপলক্ষে জীবনবীমার স্টল, পরিবার কল্যাণ স্টল, অস্থায়ী থানা বসেছে। পরিবার কল্যাণ স্টলের মাইকে বাজছে পুরনো হিন্দী ফিল্মের গান। প্রচুর দোকান পশারী বসেছে রাস্তার ধারে। টাটা কান্ডিল থেকে মেলায় আসার জন্য বাস, মিনিবাস, লরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপর্যাপ্ত ব্যাবস্থা অব্যাবস্থার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলা যতো বাড়তে লাগলো, মেঘলা আবহাওয়া ততো কেটে যেতে লাগলো। মানুষের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। মেলাটি যদিও বিহারের মাটিতে, কিন্তু মেলার দর্শনার্থী প্রায় সকলে বাংলা ভাষী দেহাতী মানুষ।

গ্রামের মেয়েরা দলে দলে 'চৌডোল' নিয়ে আসতে লাগলো। কণ্ঠে তাদের টুসুগান। অনেকে চৌডোলের পরিবর্তে পদ্মাসীনা টুসুদেবীর প্রতিমা এনেছে বিসর্জন দিতে। প্রতিমা তৈরীর চলন ইদানিং শুরু হয়েছে। ছেলেদের টুসুদলও আসছে। তাদের সঙ্গের মাদলের 'গেদা ঘ্যান গেন্দে গুড়ুম' বোল অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করছে। তারা গাইছে—'বল্‌ সঙ্গাতি জয়দা কতদূর/ত'য় উন্দি পিঠা তিলের পুর।' বড়ো দলগুলোতে শুধু মাদল নয়, ধমসা, ফ্লুট বাঁশিও আছে। দলের অনেকের হাতে টাঙি উঁচু করে উপর দিকে তুলে ধরা। কারো কারো হাতে পাতাসুদ্ধু জ্যান্ত গাছের ডাল উঁচু করে ধরা। সবাই টুসুগান করতে করতে নাচতে নাচতে আসছে। এনাচের কোন জাত নেই। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ছেলেরা রাস্তায় যে উদ্দাম নাচ নাচে, তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে। গানের ভাষায় আদি রস, স্থূল রসিকতা। বোঝা যাচ্ছে অনেকেই 'দারু' পান করে 'মস্ত্‌' হয়ে আছে। দেহাতী

মানুষের কাছে পরবে 'দারু' পান করাটাই রেওয়াজ। অনেক মেয়েরা মেলার দর্শনার্থীর বিচিত্র পোষাক-আসাক, আচার আচরণ লক্ষ্য করে গান রচনা করে গাইছে।

নদীর তীরে বালির চড়ায় জমজমাট মেলা বসেছে। অস্থায়ী হোটেল, রকমারী খাবারের দোকান, খেলনা, ভেঁপু, ঘর-গৃহস্থালী জিনিষপত্র, শাঁখের জিনিষ, মোষের সিংয়ের বাহারী জিনিষের দোকান বসেছে। সর্বত্র ক্রেতা-বিক্রেতায় গিজগিজ করছে। পুতুল নাচ বসেছে মেলার একপ্রান্তে। ধমসা মাদল বাজিয়ে আরা লোক জড়ো করছে।

নদীর পাড়ে বালিভর্তি অঢেল জায়গা। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসেছেন। তারা সুবর্ণ-রেখার জলে ডুব দিচ্ছেন। তারপর শিবমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসছেন। মেয়েরাও নিঃসংকোচে স্নান করছেন। নদীতে হাঁটুজল, অল্প স্রোত। স্নান করতে পায়ে একটুও কাদা লাগেনা। পায়ের নীচে শুধু বালি। অনেকে দলবলসমেত রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে রন্ধনক্রিয়ায় রত। যেন পিকনিক করছে। স্থানটি পিকনিক বিলাসীদের পক্ষে আদর্শস্থান। শুনলাম অনেকেই ছুটির দিনে এখানে এসে পিকনিক করে এবং কয়েকঘন্টার জন্য জায়গাটি সরগরম করে আবার চলে যায়।

নদীর দক্ষিণধারে খাড়াই পাহাড় অকাশে মাথা তুলেছে। পাহাড়ের গায়ে শিবমন্দির। ভক্তরা নতুন মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। এইখানে আগে ছিল পাথরের পুরনো মন্দির। মন্দিরের নিজস্ব মাইকে চলতি ফিল্মের ভজনগান এবং হালকা গান দু-ই বাজছে। অনেককে দেখলাম ট্রানজিস্টারে টেস্ট ক্রিকেটের রিলে শুনছে, আবার মেলাও দেখছে। মন্দির চত্তরে সাধু ও ভিখারীরা ছাউনি ফেলেছে। দেহাতী মানুষদের সঙ্গে শহুরে ভক্তরাও মন্দিরে শ্রদ্ধাবনত হয়ে পুজো দিচ্ছেন। মন্দিরচত্তরে প্রাচীন পাথরের শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি। এগুলি নাকি পুরনো মন্দিরেই ছিল। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো প্রাচীন পাথরের একটি ময়ূরারূঢ় কার্তিকমূর্তি, দুটি হর-পার্বতীর যুগলমূর্তি ও হাল আমলের তৈরী একটি বিশালকায় ষাঁড়ের মূর্তি শিবের বাহন। পুরনো মন্দিরের ভগ্নাংশগুলো যাদুঘরে দর্শনীয় বস্তুর মতো করে বেদীর উপর রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় একটি পাথরে খোদাইকরা নিবিড় আলিঙ্গনে পিষ্ট ওষ্ঠাধর চুম্বনরত প্রেমিকযুগল মূর্তি দেখলাম। দেখে কোনা-রকের মিথুন মূর্তির কথা স্মরণে এলো। একটি প্রস্তর ফলকে দেখলাম আমার আজানা কোন লিপিতে অজ্ঞাত কোন বাণী উৎকীর্ণ আছে। এ লিপি না বাংলা —না হিন্দী, অথচ দু'টি লিপির সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

প্রস্তর ফলকটি আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে এক ভাগ্যবিশারদ সাধুজী বললেনঃ সিফ নেহরুজীনে এহি লিখাই পড়নে সকা। আমি সাধুকে জিজ্ঞেস করি নেহরুজী এখানে কবে এসেছিলেন। তাঁর জবাবঃ উন্নিশশো ছিয়াত্তর সালতক্'। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি, তখন নেহরুজী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সাধু আমাকে আরো এক বিচিত্রতর তথ্য পরিবেশন করলেনঃ বিশ্কর্মাজীনে এহি মন্দির ব্যানায়া। দুনিয়ামে তিনো চীজোঁ বিশ্কর্মাজীনে আপনা হাথসে বানায়া। জগন্নাথ দেবকী মন্দির, এহি শিউ মন্দির, অউর সোনেকী লঙ্কা।

স্থানীয় এক পুজোর প্রসাদবিক্রেতা দোকানদারের মুখে শুনলাম, শিব মন্দিরটি বহু কালের পুরনো, রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলের। আগে লোকে নৌকায় করে মন্দিরে পুজো দিতে আসতো। তবে মেলার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের নয়; ষাট সত্তর বছরের বেশী হবেনা। প্রথমে একদিনের জন্য মেলা বসতো। যখন সুবর্ণরেখার উপরে ব্রিজ হয়নি, তখন লোক বনপ্রান্তর পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মেলায় আসতো। তাঁর কাছে আরো শুনলাম, মন্দির থেকে এক ফার্লং দূরে নদীবক্ষে প্রসারিত পাহাড়ের পাথরের উপর একটি বেদী আছে। সেখানে বসে সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে পাশা খেলে-ছিলেন। ঔৎসুক্যবশে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গেলাম সেখানে। কিন্তু কোথাও কোন বেদী দেখতে পেলাম না। শুধু একটি স্থানে দেখলাম পাথরের একটি অসমান চাতাল। তার উপরে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে—'জয় রাম'।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার আগেই আস্তানায় ফেরার উদ্যোগ করলাম। সুবর্ণরেখার ব্রিজের উপর উঠে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম, মেলা দারুণ জমে উঠেছে। মাইকের কলতান, মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ, মানুষের কোলাহল প্রকৃতির এই নির্জন কোলকে মুখর করে তুলেছে।

গল্প

ফার্স্ট স্ট্রোক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

পৌষ মাসের শীতের ভোরে বাইরের উঠোনটায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল খোকা মড়ল। হাতে বালতি আর খড়ের নুটোটা নিয়ে "শালা" "শালা" বলতে বলতে টিউকলের দিকে গেল বঙ্কিম নন্দী। "খাক্ থু" "খাক্ থু" করে থুথু ফেলে বার কয়েক। হাত পা ঘসে ঘসে ধোয়। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে তেরে তেরে শোঁকে। এক খাবলা গোবর নিয়ে হাত-দুটো বারকয়েক ঘসে। কাঁপতে কাঁপতে আবার হড়হড় করে হাত পা ধুলো। তারপর ঠক্ ঠক্ করতে করতে হাত পা মুছে বিড়িটা ধরায়। খোকা মড়ল মাথামুখের চাদরটা একটু ফাঁক করে মুখ বার করে বলে—'না খুড়ো তোমার সিদিন বুঝেসুঝে অমন কান্ডটা করতে হোত।'

বঙ্কিম নন্দী গায়ে চাদরটা জড়িয়ে গুড়িসুড়ি মেরে বসে বলে—'বুঝে সুঝে কিরে! শালী এলো তোর রোদ উঠতে, ব্যাটার অসুখের ধানাইপানাই শুনোতে শুনোতে। মাঠে আমার ধান। তা বললুম তোকে আর খাটতে হর্বোন ঘর যা। তা বলে কি জানিস, গতকালের খাটুনির দামটা মিটিয়ে দাও।'

—'যা দিনকাল পড়েছে খুড়ো মিটিয়ে দিয়ে পাপ-যন্ত্রণা চুকিয়ে দিলেই ভাল হোত।'

—'থাম না! তা আমি বললুম, তোর জন্যি ট্যাঁকে টাকা লিয়ে ঘুরতে হবে না কি লো! আবার যেদিন ভোর ভোর আসবি সিদিন দুবো।'

—'ভালই তো বলেছিলে। কথায় কোন ম্যারপ্যাচ নাই।'

—'তা আমি বললুম তো শোনে কে। বলে ছেলের ওষুধ লাগবে আবার বারলিক লাগবে। তা রাগের মাথায় বলেছি খাটার গতর নাই, ছেলে তো বিয়োচ্ছিস পিল পিল করে।'

—'বেশ বলেছো খুড়ো'—খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল।

—'তা তাতেই মহারানীর মানে লেদনা পড়ে গেল। তা জবাব কি জানিস, ট্যাঁকে পয়সা নাই তো মুনিস ডাকা কেনে!'

—'ইকি অনাছিষ্টি কথা। কোন শালা বলে বঙ্কিম নন্দীর পয়সা নাই। এমন গাছ পালুই কার ওঠে!' বেশ রাগ রাগ করে বলে খোকা মড়ল। গলাটা নামিয়ে তারপর বলে—'খুড়ির আমার বার ভরির বিছে—'

—'আর বুঝলি কিনা আমার মাথায় ঝাঁ করে রক্ত উঠে গেল; এমন কথা আমার মুখের সামনে আজ পর্যন্তি কেউ বলতে সাহস করেনি। রাগের মাথায় ঝাঁ করে মেরেদিলুম ব্যাঁতে এক চড়।'

—'ইখিনটিতেই তো ভুল করলে খুড়ো।' বিড়িতে একটা টান দিয়ে চাদরে ভাল করে টাঁকটা ঢেকে বলে খোকা মড়ল।—'হাজার হোক মেয়ে মানুষ। এক-বারে দল বেঁধে পঞ্চায়েতে চলেগেল। আর সি শালারাও তো ই-সব দেখতে বসে আছে। শালা চাটার ইয়ে চিয়ারে উঠেছে। তার উপর ডোমপাড়ার মাগী মরদ-গুলোর সি কি বিতিকিচ্ছিরি গালবাখান! তোমাকেই তো দোষ দিল।'

—'দিল বললেই মানলুম নাকি। বললুম গাল দিয়েছে তাই চড় মেরেছি। দোষ মানব কার কাছে! যা পারিস করে লিবি, কত হাতি গেল তল—'

—'আর সি জনিাই তো ই কিত্তি খুড়ো'। আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল। 'মাঠে পাকা ধান তাও সয় সারা দেয়ালে গুল্যাপা!'

—'শালা শালীদের পেলে'—কথাটা বলতে বলতে হাত টা আর একবার শোঁকে বঙ্কিম নন্দী। 'শালা শুধু দিয়ালে চৌকাঠ পর্যন্তি।'

—'কি আর করবে খুড়ো'—সান্ত্বনা দেয় খোকা মড়ল। 'কলিকাল। গালমন্দ দিয়েই কি করবে। লোকে হাসবে গু ল্যাপার খপর শুনে। তার উপর মাঠে সত্তর বিঘে পাকা ধান। তোমার ঘরে খাটে না এলে তোমারই লোসকান।'

—'তা তোরা সবাই মিলে তুলে দিবি। মাথা নুয়োবো কিরে!'

—'তা তো বুঝলুম কিন্তু আবার একটা ধর গিয়ে যদি গজড় লাগায়। সব চাষীরা কি আর আসবে এক্ষুনি যদি সব মুনিসগুলো বলে খাটতে যাবনি।'

—'বললিই হোল। পেটে জ্বালা ধরবেনি!'

—'পেত্নির আবার শাকচুন্নির ভয় খুড়ো! এমনিতে

জনুটোনি আর দুদিন খাবেনি। কিন্তু দেবতা একবার নামলে পাকা ধানে কি ক্ষেতিটা হবে ভেবে দেখো দিকিনি। তাইসই খুড়ো কিন্তু আবার যদি ল্যাপে—'

—'লেপলেই হোল'—গর্জে ওঠে বঙ্কিম নন্দী। 'হাত ভেঙে দুবো—আমিও শালা বঙ্কিম নন্দী।'

—'তা তো হোল খুড়ো কিন্তু রেতের বেলা লিপলে ক'রাত জেগে কাটাবে। তা ছাড়া যা দিনকাল রেতের বেলা পেছন থেকে তোমার গায়েই ঢেলে দিল এক খোলা।'

"থাক্ থু" "থাক থু" করে আর খানিক থুথু ফেলে বঙ্কিম নন্দী। গন্ধটা এখনও চারদিক ছড়াচ্ছে। মনে মনে গায়ে ঢাললে কি বিতিকিচ্ছির হবে ভাবতে ভাবতে গাটা গুলিয়ে ওঠে। আবার খানিক থুথু ফেলে। তার উপর পাড়াপড়শী দুচারজনের সঙ্গে মন কষাকষি আছে। মরাই পালুয়ের গতর দেখলে, সনে সনে মা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র বাড়লে অমন দু চার জনের রাগ হয়। আর সকাল হলেই তারা এক্ষুনি চারদিক চাউর করে দিবে। পাঁচজন এখন ব্যাঁত ফেড়ে দাঁত বার করে জিজ্ঞেস করবে ল্যাপা লেপির কথা। অন্যের কাছে শুনলেও জিজ্ঞেস করবে। একবার শুনলেও আরো পাঁচবার তেরে তেরে জিজ্ঞেস করবে। ভাবতে ভাবতে একটা বিড়ি ধরায় বঙ্কিম নন্দী। খানিক পরে বলে —"তা কি করা যায় বল্ দিকি মড়ল।"

খোকা মড়ল সামনের অবশিষ্ট দুটি লড়া দাঁত জিব দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে—"আমি বলি খুড়ো এই ভোররেতে মাগীটার কাছে একবার যাও। ওর ব্যাটাটার হাতে একটা আধুলি দিয়ে বোলো মকরে মিষ্টি খাবি।"

—"সি কি রে বাবু—ই তোর যে বেশ কথা। ল্যাপাকে ল্যাপা আট আনা গচ্ছা।"

—"আহা হাতে দিলে বলে কি একবারে দিয়ে দিলে। পাঁচদিন কাজ করুক ধানটা উঠে যাক। তার-পর ঝাড়া হয়ে গেলে তো তোমার দিন। মুনিস তখন ফ্যা ফ্যা, শেষদিন আটআনা কেটে লিবে। আর ইদিক দিয়ে তোমার খপরটিও চেপে গেল।"

—"তোর মাথা বড় ভালো খেলে রে"—বেশ মোলায়েম করে বলে বঙ্কিম নন্দী। "আমার সব চুলগুলো পেকে গেল তবু তোর মত বুঝতে পারিনি।"

—"আমার থাকলিই তোমার থাকা খুড়ো।"—খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে খুব খুশী হয়ে নিজের মাথাটাতে একবার হাত বুলোয় মড়ল। তারপর আবার বলে—"তবে একটু মোলায়েম করে বলো আরকি। তোর শ্বশুর আমার ঘরে খাটত। কত্তা বলতে অজ্ঞান। আর প্যালাটাকে বাইরে ডেকে হাতে একটা বিড়ির তাড়া দিয়ে দিও আরকি। নুলো হোক কুঠে হোক ভাতার তো বটে। ও বললে শুনবে।"

—'তাই করি বল্। তবে শালা ধান ঝাড়াটা হয়ে গেলে আমার একদিন কি ওদের একদিন। শালা তখন দেখে লুবো ডোম পাড়ার মাগী-মরদগুলোর কত তেল।'

—'তা তো দেখে লিবেই খুড়ো। শুধু পূর্ণ সুয্যি-গ্রেহণটা যেতে দাও। বোশেখ-জেষ্টি পড়ুক।'

—'হ্যাঁ দাঁড়ালা। এমন দিন চলবেনি! উপরে ভগ-বান আছে যেমুখে গাল দিয়েচে গলে গলে পড়বে। আর এক মাঘেতে কি শীত পালাইরে! আবার ভোট হবে চিরকালের গাঁয়ের মাথা বঙ্কিম নন্দী আবার মাথা হবে।'

—'তা হবে বইকি খুড়ো। তোমার মত গুণী লোক গাঁয়ে ক'টা আছে। গাঁয়ের লোকে আজও কি সম্মান দেয়। তা হারলেই কি মানুষের দাম কমে! তা যাক খুড়ো ঝুককো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়। আবার পাঁচজনের চোখে পড়বে। হাজার হোক কলিকাল।'

টর্চটা ইচ্ছা করেই হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল বঙ্কিম নন্দী। একটু ঝুককো ঝুককো আছে দুদিক ভালো করে দেখে যেতে হবে। হ্যাঁ যা ভেবেছিলো তাই। যে রাস্তা দিয়ে নাক খুলে এগোনো যেত না একবারে তক্ তক্ করছে। সব শালাশালীরা ভাঙা খোলায় কুড়িয়ে তার গাং দিয়ালিতে লেপে দিয়ে এসেছে। খোকা মড়লের কথাশুনে মাথাটা খানিক ঠাণ্ডা হয়ে-ছিল আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শালারা এত-দিন তার দুয়োর নিকিয়েছে আজ তাতে ল্যাপা! আজ এক চড়ে অত লাফানি তোদের বাপ দাদুদের যে পিঠে ঘা খেয়ে কালসিটে পড়ে গেসলরে! রাগে গরগর করতে করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্যালার ঘরের দিকে এগোয় নন্দী। প্যালার দুয়োরে উঠে শ্বাস ফেলে। শালা ওর বোয়ের জন্যে যত কেলেংকারি। আগড়টা ঠেলে চড়চড় করে খোলে নন্দী। প্যালাকে হাঁক পাড়তে পাড়তে তোলে। প্যালা খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে "কত্তা যে" বলে উঠে বসে। সামনে পেয়ে খানিকটা তাকেই ঝেড়ে দেয় নন্দী—'শালা তোর বৌ আমার গাংদিয়ালিতে ইয়ে লেপে দিয়ে এয়চে। তোর বৌকে—' খানিক হাঁক ডাকে প্যালার বৌ লক্ষ্মী ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় বঙ্কিম নন্দীকে দেখে বলে—"কত্তা যে।" "হুঁ" করতে গিয়ে নন্দী ধ্যাৎ করে ওঠে। ঘরের এককোণে পাঁঠি ছাগলটা বাঁধা। তিনটে বাচ্ছা হয়েছে। সেগুলো লিড়বিড় করে। লক্ষ্মী উঠে বলে—"কত্তা একটু পেছন ফিরো দিকি।"

ধক্ করে ওঠে নন্দীর বুকটা। খোকা মড়ল এমন একটা কথা বলেছিলো বটে। পিছন থেকে ঢেলে দিতে পারে। শালা ছোটলোকের রাজত্বি কিচ্ছু বলা যায়নি। নন্দী এদিক ওদিক চেয়ে বলে—'কেন লো?'

—'না ফিরলে রেতের কাপড় কি তোমার মুখের উপর ঠিক করবো?'

—"অ"—বলে পেছন ফিরে নন্দী। পরে কি বলবে মনে মনে ঠিক করে।

—"হয়চে। ঘুরো"—বলে প্যালার বৌ।

ধাঁ করে ঘুরে নন্দী। তারপর বেশ চড়া গলায় বলে—'তুই যত নষ্টের গোড়া। শালা তোরাই আমার গাং দিয়ালি—'

ব্যা-ব্যা করে বার দুই ভ্যাবাই ছাগলটা। 'থাম থাম' করে ধমকায় নন্দী। কে শোনে কার কথা! প্যালার বৌ গায়ে হায়ে হাত বুলোতে তবে থামে। বেশ তোয়াজ করে হাতবুলোয় প্যালার বৌ। প্যালা নন্দীকে হাত নেড়ে বলে—'না-না কত্তা। লক্ষ্মী সারা রেতে পাশটি ফিরেনি। আমি বলছি কত্তা আমার দিকে পাশ ফিরে ছেলো। লক্ষ্মী আমার অমন লয়—'

—'কৈ গন্ধ দেখাও দিকি'—হাতটা সট করে নন্দীর নাকের ডগায় আনে লক্ষ্মী। গাটা গুলিয়ে ওঠে নন্দীর। ছাগলের বটকা গন্ধ।

—"হাঁ লিপেছিস।"—এতক্ষণে জোর ধরে নন্দী। 'আমিও শালা বঙ্কিম নন্দী সব থানায় ঢুকোবো। ভেবেছিস কি এখনও থানায় গেলে দারোগা আমায় সেলাম ঠুকে।' তড়াক করে একটু সরে যায় নন্দী। প্যালা বলে—"ও কিছু লয় ছাগল ছেনা।" লক্ষ্মী ততক্ষণে কোমরে কাপড়টা জড়িয়েছে। বলে "ঢুকোও না কেনে। তোমার ঘরে লোকে খাটতে যাচ্ছেনি, তোমার গাং দিয়ালিতে কে কি লিপবে তা সব দোষ পারা লক্ষ্মীর। কাল তোমার মাথায় রেতে কে কি ঢালবে তাও লক্ষ্মী। কাল তোমার মাঠ থেকে ধান যাবে তাও পারা লক্ষী।'

মাথাটা পাঁই করে ঘুরে যায় নন্দীর। খোকা মড়লের সংগে একেবারে কথায় কথায় মিলে যাচ্ছে। এখনও সত্তর বিঘে ধান মাঠে পড়ে আছে। আবার যদি ঢেলেই দেয় মাথায় লোকে কত হাসাহাসি করবে। দিন ঠিক আসবে এখন শুধু একটু বুঝেসুঝে চলতে হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা করে নন্দী। বলে—'তা কি আর পারি—তোদের সংগে এমন করতে পারি?' ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির তাড়াটা বার করে একটা ধরায়। একটা প্যালার হাতে দেয়। বাকি তাড়াটা চুপিসাড়ে চাদরের ভিতর দিয়ে প্যালার দিকে ঠেলে দেয়। প্যালা বৌয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়। অনেক দিন বিড়ি জুটছেনি। বৌ দিন গেলে গোনা পাঁচটি কিনে দেয়। বলে—"ভাত জুটোনি বিড়ি।" প্যালা ভাবে নেশা তো করোনি—মেয়ে মানুষ ইর আর কি বুঝবে! যাক কাল এখন একটু মৌজ করে খাবে। নন্দী এবার বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বলে—"তা তোরা তো জানিস বাবু আমার মাথাটা মাঝে মাঝে গরম হয়ে যায়। তা লইলে তোর ব্যাটার অসুখ আর আমি অমন বলতে পারি। আর ধমকে দিতে গিয়ে বুঝলি না কি অসাড়ে হাতটা উঠেগেল।"

—"তা বলে গায়ে হাত তুলবে না কি?" ঝেঁঝিয়ে বলে লক্ষ্মী।

—"সি টি কিন্তু অন্যায় হয়েচে"—মাথা নেড়ে হাত ঝাকিয়ে বলে প্যালা। "গায়ে হাত কি! মেয়ে ছেলে মা লক্ষ্মী! আমার বৌ হাজার দোষ করুক তবু কেউ বলতে পারবে কোনোদিন প্যালা বৌকে এক ঘা দিয়েচে।"

—"আহা তোর বৌ আমার মেয়ের বয়সি।" গলাটা বেশ নরম নরম করে বলে নন্দী। 'ইকি আর মারব বলে মারা। আমার বড় বেটিটা তিন ছেলের মা কথা না শুনলে এখনও দুচার ঘা মারি। বিধবা আদরের বুন —সি দিন দুঘা বসিয়ে দিলুম। আহা মায়ামমতা কার্য বলিই তো অমন জোর করতে পারি। তা লইতো কি আর লোকের ঘরে গিয়ে মারতে যাচ্ছি! দূর শালা—' হাতটা ঝিনকোর নন্দী। ছাগলটা জিব দিয়ে নন্দীর পিছন দিকে নন্দীর ঘাড়টা চাটছে। নন্দী একটু সরে বসে আবার বলে—"তা বুঝলি কিনা বাছা আমার ঘরে খাটবি চ। আর যে ব্যাপারটা বললুম সেই ল্যাপার কথা চেপে যাবি বুঝলি। নোংরা জিনিস যত রটে তত খরাপ। চ খাটবি চ—রাগ করে কি হবে বাবু। তোর শ্বশুর—বুঝলি লক্ষ্মী—আমাদের ঘরে বাঁধা মান্দার ছিল। কি ভালবাসতো আমাকে। ছোটবেলায় কোলে করত—কত কিল চড় মেরেছি। তা ছাড়া প্যালা খোঁড়া মানুষ আবার তুইও যদি না খাটিস্"—

—"সি কথা বেলোনি কত্তা"—চটে বলে প্যালা। "আমি যা ইদিক উদিক থেকে যোগাড় করি একটা মরদ পারবেনি। তবে তুমি ঘর বয়ে এয়েচ—যাবেতো লইলে অমন অনিল কুণ্ডু হাতে পারে ধরে বলে গেল খাটতে গেলনি।" নন্দী আবার গরম হয়ে যায়। মনে মনে বলে—"বড় কথা তো শালার হাতে পায়ে ধরে। দাঁড়া শালা ধান টা উঠুক আর গেহণটা যাক তারপর দেখব শালা তোদের কি আমাদের এক দিন।" মুখ ফুটে বলে—"তা ওঠ—সকাল হয়ে গেছে।" পয়সা আট আনা কোঁচ্চ থেকে আর বার করে না। বাইরে এসে সারা ডোম পাড়াটার দিকে আগুন-দৃষ্টিতে একবার তাকায়। তারপর কাছা খুলতে খুলতে পুকুর পাড় দিয়ে চলে যায়।

খানিক পরে পুকুর পাড় সেরে ঘরে ঢুকেই নন্দীর মেজাজটা একেবারে তিরখে হয়ে যায়। লক্ষ্মী দুয়োরে বসে পা মিলে কলাইয়ের কাপে চা খাচ্ছে। আবার বলছে—"গুড়ের চায়ে একটুন আদা দিলে যা লাগেনি!" "মাঠ যা"—"মাঠ যা" বলতে বলতে গুয়োল ঘরের দিকে যায় নন্দী। মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করে। "গাজ্বলুনে কথা শোনো—আদা দিলে চা ভালো লাগেনি!" রাগে রি-রি করতে করতে গরুর দাঁড় খোলে। নিজের মনেই বলে—"দাঁড়া শালার তেল মিটোবো। বোশেখ-জৈষ্টি আসুক। দিনকালটা একটু পালটাক।" চড়াক করে ওঠে চাদরটা। গরুর শিঙে লেগে ছিঁড়ে গেল। লাফাতে লাফাতে ডাংটা নিয়ে ফটাফট ফটাফট করে ঘা কতক বসিয়ে দেয় নন্দী। এই শীতে গায়ে ঘাম ঝরছে। হাজার হোক ষাট-প'য়ষট্টি বয়েস হয়েছে তার উপর ভোর থেকে সারা

দেওয়াল লাতা দেওয়া, এত ঝগড়াঝাটি, গা জ্বলুনে কথা—মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে কতক্ষণ। ওদিকে আবার কানে ঢুকছে লক্ষ্মীর কথা—'আমাদের তো চারকাল জুটোন ইকালে আর কি বাড়বে খুড়ি! তবে শুনছি কানাঘুষো দিনে আট টাকা বেতন লিয়ে সব এক চোট লাগবে। গমের দাম বেড়েছে, ধানের দাম বেড়েছে—খাটুনির দাম বাড়াতে হবেনি—গতর কি সস্তা!" ডাংটা হাতে নিয়ে নন্দীর মনে হয় গোদা গতরটা আগাদে দিয়ে আসে। আবার সেদিনের চড় চাপড়ের কথা মনে পড়াতে অনেক কষ্টে চেপে যায়। লক্ষ্মীর কথা আবার কানে ঢুকে—'কাল রেতে নিমাই বামুন এয়েছিলো। বলে গেলো কলকেতায় মিছিল করে যেতে হবে। আমাকেও যেতে বলে গেল। মন্ত্রী-দের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো!' নন্দী ডাংটা এক-বার ঠোকে একবার 'মারবো' মারবো' বলে নামতে যায়। ঘামতে থাকে দরদর করে। ডাংটা দনে ঠোকে—ফোকলা মাড়ি দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। একা গোয়াল ঘরে মাথা নাড়ে। ভিতরটা হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠে। উল্টে দনের ভিতর পড়ে যায় নন্দী।

খানিক পরে চাকরটা চিৎকার করে গোয়াল থেকে লোক ডাকে। সবাই মিলে ছুটে এসে তোলে। একে-বারে অসাড়। কেউ বলে "ভূতে পেয়েছে গো" কেউ বলে "ঠাকুর পেয়েছে।" তুলে এনে দুয়োরে মাদুর পেতে বালিশ দিয়ে শোয়ায়। মুখে জলের ঝাপটা দেয়—মাথায় পাখা করে। বিনোদের পিসী গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাত করে বলে—"কি দোষ করেছি মা—বল মা কালী। মুখ ফুটে বল মা।" তবু মুখ ফোটে না। সব টিপ্ টিপ্ করে গড় হচ্ছে। হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বড় বেটা নরহরি বাপকে জড়িয়ে ধরে। ধরলেই কি হবে চোখ বন্ধ মুখ বন্ধ। দেহে প্রাণ নেই। নরহরির বৌ উঠে গিয়ে কত্তার বিছানার তলা হাতড়িয়ে চাবিটা নিয়ে আচলে বাঁধে। মেজ বৌ চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে কত্তার ছোট টিনের বাক্সটা নিজের ঘরে ঢুকিয়ে কাঁথা চাপা দেয়। ছোট বেটা খানিক কেঁদে ঘরে ঢুকে মায়ের বাক্স হাতড়ায়। ছুটতে ছুটতে আসে খোকা মড়ল। চোখ মুছতে মুছতে বলে—"খুড়ো আমায় পেছনে ফেলে স্বর্গে গেলো যে গো! এই ভোরবেলায় খুড়াকে যে ঠাকুর নাম করতে করতে গাং দিয়ালিতে গোবর লাতা দিতে দেখলুম গো! এই খানিক আগে বলছিলো গো লক্ষ্মীবার চারদিক পরিষ্কার করতে হয়!" সব্বাই ক'কিয়ে কেঁদে ওঠে। নন্দীর বিধবা দিদি "হ্যাঁ গো আমি কি করে বাঁচবো গো—দাদা যে আমার নেই গো" বলতে বলতে ঘর থেকে একটা ছেঁড়া বালিশ-এনে মাথার নিচে দিয়ে নতুন মাথার বালিশ আর পাশ বালিশটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে। এতক্ষণে হোমিও-প্যাথ ডাক্তার আসে। আর দেখেই কি হবে! ডাক্তার নাকে খানিক তুলো শোঁকায়। বুকে স্টেথেস্কোপ বসায়। নাড়ী দেখে বলে—"বেঁচে আছে। এক্ষুনি জ্ঞান ফিরবে। তিনবারের বেলা বাঁচেনা। এই তো সবে ফার্স্ট স্ট্রোক।" আবার চোখ মেলে বঙ্কিম নন্দী।

নাটকের সুখ-দুঃখ এবং কজল আলি আসছে

[৬২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নাটকের প্রাণবায়ু। সমীরণের ভীরুতা এবং হীন-মন্যতাকে স্পষ্ট ক'রেছেন হারু বসু। এ ছাড়া অবিশ্যি কারো অভিনয়ই মনে দাগ কাটে না। মন্দার বাবা এবং ফ্যাক্টরীর মালিক চরিত্রের অভিনেতা জড় জিহ্বায় অজস্র ইংরেজী সংলাপ বললেও তা তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে সক্ষম হন না। এমনকি, তার উদ্দেশে দর্শকাসন থেকে কয়েকবার 'লাউডার' শব্দটি ছুঁড়তে শোনা যায়। তার আরেকটু সরব হওয়া দরকার। মন্দার একাকিত্ব, বিষণ্ণতা এবং বুদ্ধির ছাপ উপন্যাসে যেরকম ছোঁয়া গিয়েছিল, এখানে অভিনয় ত্রুটিতে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং তাকে কেমন রঙিন সোসাইটি গার্ল মনে হয়। ঠিক তেমনই বোধায়নের কবিত্ব এবং সরলতার বদলে এখানে সে যেন একটি হাবাগোবা বয়স্ক বালক। সুব্রত কিম্বা বলু দুজনেই অভিনয় ক'রেছেন আস্ত থিয়েট্রিকাল ভাঁড়ের মত। বরং সে তুলনায় বৌদি চরিত্রের অভিনেত্রী অনেক সাবলীল।

এই নাটকের মঞ্চসজ্জা একেবারেই প্রয়োজনহীন বাহুল্য হ'য়ে থাকে। জোন-বিভক্ত মঞ্চ নাটকের বাইরের ব্যাপার মনে হয়। গানগুলি শুনতে মন্দ না লাগলেও, তা আসলে নাটকের অন্যান্য দুর্বলতা ঢাকার প্রয়াসে মোহন প্রলেপের মত ব্যবহৃত। বিশেষত শেষ দৃশ্যে বেমক্কা ব্যাক-জোন থেকে যাত্রার ঢঙে গান গেয়ে ওঠা যথেষ্ট বিসদৃশ।

আসলে এই নাটকের যাবতীয় দুর্বলতার জন্যে দায়ী নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায়। এরকম একটি তীক্ষ্ণ থিমেটিক উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদানের ব্যাপারে তিনি কেন মূলের সর্বগ্রাসিতার কাছে এ্যাত নতজানু র'য়ে গেলেন, বোঝা গ্যাল না। বস্তুত, সে কারণেই নাটকটি উপন্যাসের জলছবি হ'য়েই রইলো, আমাদের নতুন কোথাও পৌঁছে দিতে পারলো না। অথচ, সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

—গৌতম ঘোষ দস্তিদার

কবিতা

দিন বদ্‌লায়

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন বদ্‌লায়
ফিরে আসছি
দিন বদ্‌লায়
দিন।

চোখের পাতায় উথালপাথাল
যেন আচম্বিতে
উঁচিয়ে ফণা ছুটে আসছে
অবাধ্য কৈশোর
ছোবল দিলো বুকে আমার
কখন হোলো ভোর—
তাকিয়ে দেখি হাসছো তুমি
উদ্ধত সঙীন।

দিন চলে যায়
দিন বদ্‌লায়
দিন চলে যায়
দিন।

তবুও ঝড় ধমক দেয়
মাটিতে মেশে ঘর
পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে যায় ভিড়ে—
দুহাত ভরে ধরতে যাই
যা-ইচ্ছে-তাই খুশী
বুকের মধ্যে কোন্ চেনা মুখ
রাখছে আমায় ঘিরে!

আকাশে চোখ। কাঁপছে মাটি।
আগুনে-মেঘ ছোটে।
হতোদ্যম বুকে মেদুর
স্মৃতির মৃদু চাপ—
তবু কখন উঠে দাঁড়াই
শরীর টান টান
শিরায় ছোটে রক্ত, মনে
কিসের উত্তাপ?

বুঝতে হাতে হাত মেলাই
ঘৃণায় বাঁধি ভয়—
পাঞ্চজন্য গর্জে ওঠে
ভাঙতে দুর্দিন

দিন বদ্‌লায়
ফিরে আসছি
দিন বদ্‌লায়
দিন।

নতুন সূর্য নতুন দিন

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যহ রক্তের মধ্যে ক্রোধ জমে ধারালো অশ্রুর মধ্যে ঘৃণা
এই ভাবে লালিত দুঃখ গুলি এক সময় গর্জে ওঠে নিজস্ব তাগিদে
পুড়ে ভালবাসা, পুড়ে সৌখীন সুখের শিল্প, পাতার প্রতিমা
রক্তাক্ত ভয়ংকর মানুষের ইতিহাস এই ভাবে মানুষকে
রোজ শিক্ষা দেয়, জ্ঞান দেয়, যুদ্ধের পদ্ধতি প্রক্রিয়া
সহজে শিখিয়ে দেয় পৃথিবীর ভূগোল পাল্টায়।

স্বভাবের গুপ্ত কক্ষে দাবানল জ্বলতে থাকে জ্বলায় শরীর..

দেশের পুরানো ত্বক দগ্ধ করে, লাল চামড়া ঝলসে যায় অবিনাশী তেজে:
সমাজ সভ্যতা পুড়ে স্বয়ংক্রিয় চুল্লির আগুনে
সমস্ত ঘৃণা ও ক্রোধ দুঃখ গুলি জোট বেঁধে প্রশস্ত রাজপথে
শোভাযাত্রা বের করে, বুকে সাঁটে কালো ব্যাজ
দুহাতে ফেস্টুন, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে
গ্রেনেডের মুখে মুখে ঢালে তপ্ত খুন।

এই ভাবে শাসনের ছড়ি ভেঙ্গে প্রতিদিন এক একটা মানুষ
পাল্টে দেয় সিংহাসন মানচিত্র এবং মুকুট
নূতন সাম্রাজ্য এক জন্ম নেয় যুদ্ধরত সৈনিকের অস্ত্রের ডগায়
লাল সূর্য ঝলকে ওঠে, পৃথিবীর স্পর্ধিত যৌবন
সবুজ শস্যের সুরে ভূমিষ্ট দিনকে সুখে স্বাগত জানায়।

রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্‌তাহার

সুবোধ চৌধুরী

এখন বস্তুত আগ্নেয় প্রস্তুতির কাল
কেননা অভিজ্ঞতার নখ-দর্পণে
শত্রুর ভয়াল মুখ আমি দেখেছি—
একদিন নিশ্চিত তার স্বার্থে
ভীষণ মারণাস্ত্র নিয়ে
আমাকে তোমাকে
মুখোমুখি হতে হবে।

কল্যাণী মাসিমা পানিহাটির
সোনারপুরের গীতা-বউদি
কিংবা সাত ভাই চম্পার এক বোন পারুল
মিয়াবাগানের অসীমা—
ওদের সকলের অশ্রুকে
বারুদে রূপান্তরিত করার চিন্তায়
মগ্ন ছিলাম আমি এতকাল
অনেককাল......।

এতদিন মূঢ় আমি
মোমের আলোয় করেছি শুধু পাঠ
জালিম জমানার সাগ্নিক সংকেত
অস্তিত্বের জীর্ণ দীর্ণ ভূর্জপত্রে।
এবার, বন্ধু, জেনেছি খবরঃ
মালতী মায়ের বুকে-বাঁধা মাইন
—শত্রুর নিশ্চিত কবর!

তখন তাই আগ্নেয় প্রস্তুতির কাল।
সাথী,
এখন তাই
রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্‌তাহার
নিঃশব্দ হাত-বদল করে কে।

জীবন সন্ধানে

কৃষ্ণপদ কুণ্ডু

দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির দেশ
এই তরাইয়ের বুকে জমা আছে
কতো নিরন্ন মানুষের না-বলা ইতিহাস,
আশা হতাশার ব্যথাদীর্ণ বেদনা
জীবনযন্ত্রণায় আছে শরীরী উত্তাপ......
চা-গাছের তৃষ্ণা মেটায় রক্তক্ষরা স্বেদ
চা-শ্রমিকের ক্ষুধাতুর চোখে থাকে
নোতুন পাতা ও কুঁড়ির প্রসববেদনা।
রোলার পেশনীতে সবুজ রসটুকু
নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে
প্যাকিং বাক্সবন্দী হয় তার বিবর্ণ রূপ—
বাণিজ্যিক মার্কে ঢাকা পড়ে থাকে
নেপথ্য ভূমিকায় শ্রেণীস্বার্থের
উলঙ্গ শোষণ অথবা
ফোস্‌কা পড়া আঙুলের ছাপঃ
অলস নিদ্রায় ভোরের বিছানায়
জোটায় দৈনিক নেশার খোরাক।
অধিক মুনাফায় সভ্যতার উল্টোপিঠে
মালিকের বিছানো অন্ধকারে
লেখা হয় কালের ইতিহাস।
কিম্বা ভাটিখানার নেশাখোর কাটে
ওদের ব্যস্ত পেশীর শংকিত সময়
লাল ঝাণ্ডার ডাক শুনেছে শোষিত মজুর
কাস্তের শাণিত ফলা আর হাতুড়িপেটা শব্দ
চিনিয়ে দিয়েছে ওদের মুক্তির লাল পথ......
পালা বদলের দিনে অগ্রপথিক
ওরাই নেমেছে পথে সংগ্রামী চেতনায়;
মুক্তির মাদল বাজাতে ওরাই আমাকে
রাজপথে টেনে আনলো রাজনৈতিক বোধিতে;
ওদের নিরন্ন পেটের বস্তুবাদী বাণী
আমার উদ্বুদ্ধ করে জীবনে বাঁচার
সবুজ ফসল তোলার জীবন সন্ধানে
কেননা ওরাই তরাই-সভ্যতার
বিস্তৃতি॥

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে

তপনকান্তি মণ্ডল

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে
চারণের ক্ষেতে ঝর্ণার ধারে
শিকারীর শেষ তীরে
সমবেত অন্ধকারে অরণ্য নদী পার হয়ে
জ্যোৎস্না রোদ্দুর আসে ঃ স্বগত উজানে হাঁটে
উৎসবের আয়োজনে বেজে ওঠে ঘন্টাধ্বনি

একদা এই চারণের ক্ষেতে
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির দিনে
শাবকেরা মেতেছিল ক্রীড়া-মাধুরীতে
দূরে ময়ূরীর সংগীতে
বনভূমি উঠেছিল নেচে
অথচ দিনের আলো নিভে না যেতে
রাত্রি নেমেছিল এই ভিজে মাটির বুকে

যখন আকাশের মেঘ ছিঁড়ে
নেমে এসেছিল তীর বর্শার গতিতে
ঝলমলে মিঠে সোনালি রোদ্দুর
সহসা তখন শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ হ'ল নিরীহ মানুষ

মহাকলরোলে আজ বনভূমি কাঁপে
একে একে
মৃত হরিণেরা
ওঠে জেগে।

সত্যটা থাকবেই

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরবেই
সত্যটা থাকছে থাকবেই।
সূর্যটা উঠছে
ফুলগুলো ফুটছে
মৌমাছি জুটছে জুটবেই
বায়ুগুলো ছুটছে ছুটবেই।

মিথ্যেরা মরছে মরবেই
অন্যায় ঝরছে ঝরবেই।
হিংসেটা পড়ছে
পাপগুলো দৌড়ছে
ভয় ঠাঁই ছাড়ছে ছাড়বেই—
সত্যটা বাড়ছে বাড়বেই ॥

মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও

সুজয় চক্রবর্তী

মিছিলের প্রাতনিধি—আমিও
দেখি, এগিয়ে আসছে মিছিল
সমুদ্রের তীরঘেঁষা আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর মত
দুরন্ত আক্রোশে;
অগ্নিশিখার মত বুক চিতিয়ে
মনে সূর্যের তেজ নিয়ে
এগিয়ে আসছে বুভুক্ষু জনতার ঐ মিছিল
রাস্তার দুপাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দরজায়
ঐ ঢেউগুলো পড়ছে আছড়ে
ঐ বড় বড় দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
অযুত কণ্ঠের সম্মিলিত স্বর
ওরা এগিয়ে আসছে
বারুদগন্ধ রাজপথ দিয়ে
মৃত শবের পাশ কাটিয়ে—ধ্বংসস্তূপে
ওদের হাত ঊর্ধ্বমুখী, বজ্রমুষ্টি
মুখে দাবী-দাওয়া, আর ধিক্কারের
ফুলঝুরি, পরণে ছেঁড়া কাপড় আর বুকে সূর্যবহ্নি—
ওদেরকে অহর্নিশি এই মিছিলের প্রতিনিধি
করেছে।

ওদের হাতগুলো চায় আকাশ ছুঁতে—চায় বুঝি
ঈশ্বরকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনতে
ওদের এই সংগ্রামী রাজ্যে
স্বাধীনতার উদগ্র ক্ষুধা ওদেরকে দিয়েছে উৎসাহ
দিয়েছে প্রাণ, বলেছে, "তোমাদের বাঁচতে হবেই
তোমরাই ভবিষ্যৎ।" সংঘাতের কষ্টিপাথরে
নিজেদের যাচাই করে ওরা এখন সংগ্রামী—যোগ্যতার
উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবার বাসনায়
ওদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর—
সামনে দাঁড়িয়ে "ঝুট্" কে "ঝুট" বলতে দেখে
আমার ভালো লাগল ওদেরকে
আমি সঙ্গ নিলাম ওদের অন্তহীন মিছিলে
মুখে দাবি-দাওয়া, ধিক্কার নিয়ে হাত ঊর্ধ্বমুখী,
বজ্রমুষ্টি করে
আমরা হেঁটে চলেছি—অন্তহীন সুদূরপ্রসারী
পথে।

জ্বলে উঠল আলো-

আকৃতি-প্রকৃতি দোষ-গুণের কথা ভুলে গিয়েও একথা সবার আগে নির্দ্বিধায়, নির্ভয়ে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের অতি প্রিয়, অতি কাজের অতি প্রয়োজনের সঙ্গী ইলেকট্রিক বাল্বের জন্মশতবর্ষের কথা আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি।

অথচ গত একশ' বছরে মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া যতগুলি সুযোগ-সুবিধা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে কাজের, সবচেয়ে বেশীভাবে ব্যবহৃত বস্তুটির নাম ইলেকট্রিক বাল্ব। ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগেও ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলত, তবে তা ভাস্বর ছিল না, তার জীবনীশক্তি ছিল অতি সামান্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী নামে জনৈক ইংল্যাণ্ডবাসী কার্বণ আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। ব্যাপারটা ছিল খুবই সাধারণ। দু-খণ্ড কার্বণ দণ্ডকে দু'টি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের প্রান্তে জুড়ে দিয়ে তারপর কার্বণ দণ্ড দু'টিকে একবার ছুঁয়ে দিলেই তার মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং কার্বণ দণ্ড দু'টি যে বিন্দুতে একত্রিত হয় সেখানে সাদা উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। আজকের দিনে স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছাত্ররা এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখিয়ে থাকে। তার আগে অবশ্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই জানা গেছিল যে কোন ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ বিদ্যুৎ পাঠালে ও তাতে ধাতব পদার্থের তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের উপর গেলেই ধাতব পদার্থ থেকে সাদা আলোর বিকিরণ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল যে এমন কোন ধাতু খুঁজে পাওয়া সেযুগে এতই দুষ্কর ছিল যা এই কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে। শুধু সেযুগ কেন আজকের দিনেও এমন ধাতুর সংখ্যা অত্যন্ত কম যা ২০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডেও গলে যায় না। যদি সেরকম কোন ধাতু খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেই ভাস্বর ইলেকট্রিক ল্যাম্প আবিষ্কৃত হ'ত। কারণ, ঐ বছর ফ্রান্সের ডি-লা-রুই নামে এক ভদ্রলোক সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালাতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্বের সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া যাক। ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব হ'ল সেই ধরণের বাতি যা বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ আলো দিতে সক্ষম। আমরা সাধারণত এই ধরণের ইলেকট্রিক ল্যাম্পই ব্যবহার করে থাকি। এছাড়াও আরও এক ধরনের ইলেকট্রিক ল্যাম্প আছে যা সাধারণত ফোটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের বাতির জীবনীশক্তি খুবই সামান্য।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ফার্মার ও ওয়ালেস নামে দুই ব্যক্তি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদক যন্ত্র বা ডায়নামো আবিষ্কার করলেন। বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডায়নামোর উদ্ভাবকরা চালালেন তাঁদের যন্ত্র। ডায়নামো চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চিন্তা ফার্মার মাথায় খেলে গেল যে একটা দারুণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই স্রেফ বাহবা জানিয়ে বাড়ী চলে গেলেও সেদিনের সেই ঘটনা একজনের মাথায় অন্য এক চিন্তার জন্ম দিল। ব্যক্তিটি হলেন টমাস আলভা এডিসন আর চিন্তাটি হ'ল,—কিভাবে একটানা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে বাতি জ্বালানো যায়। কারণ, ফার্মার ও ওয়ালেস তাঁদের উদ্ভাবিত ডায়নামোর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ডায়নামো উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে একটি আর্ক-বাতি জ্বালিয়েছিলেন। একথা আগেই বলেছি যে, আর্ক-বাতি বেশীক্ষণ জ্বলে না। তার জীবনীশক্তি বড়ই ক্ষীণ। সুতরাং এডিসন চিন্তা শুরু করলেন।

এবং যেহেতু শুধু চিন্তায় পেট ভরে না, অথবা ফাঁকা চিন্তার রাজপ্রাসাদ গড়েও লাভ নেই অতএব কোমর বেঁধে কাজে নেমে লড়াই শ্রেয় মনে করলেন এডিসন। কিন্তু, তাতে আবার অর্থ প্রয়োজন। সুতরাং শুরু হ'ল অর্থ সংগ্রহের পালা। নিউ-ইয়র্ক শহরে থাকতেন এডিসনের বন্ধু গ্রসভেনর লাউরী। ভদ্রলোক পেশায় উকিল। ব্যবসায় সবেমাত্র পসার জমাতে শুরু করেছেন। এমন সময় এডিসন তাঁর বিচিত্র ইচ্ছা নিয়ে হাজির হলেন লাউরীর কাছে। বললেন কি তাঁর করার ইচ্ছা। এবার মাঠে নামলেন লাউরী নিজে। অর্থ সংগ্রহের কাজ ভালভাবেই এগিয়ে

চলল। তারপর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হল "দি এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" স্থান নিউ জার্সির মেনলো পার্কে অবস্থিত এডিসনের বাড়ী। নামেই ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক ল্যাম্প তখনও দূরে অস্ত্। প্রধান যন্ত্র ডায়নামো কেনা হ'ল। কেনা হ'ল আরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। সেযুগে প্রাপ্য সূক্ষ্মতম যন্ত্রাদিও এল এডিসনের পরীক্ষাগারে। এল বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত পৃথিবীর যাবতীয় বহু পুস্তক। সংগৃহীত হ'ল তাবৎ পত্র-পত্রিকা। সে এক সাংঘাতিক হৈ হৈ ব্যাপার। আর আনা হ'ল একশ' জন সুদক্ষ কর্মীকে। তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন জন অটো, জন ক্রুমেদী, চার্লস্ ব্যাচিলর এর মত সুনিপুণ কারিগরবৃন্দ। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যার সুপন্ডিত ফ্রান্সিস্ আপটন ও যোগদান করলেন এডিসনের পরীক্ষাগারে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার ডলার নিয়োজিত হ'ল এই প্রকল্পে।

এবার শুরু হ'ল পরীক্ষা। উচ্চ তাপমাত্রায় অবিকৃত থাকতে পারে এমন একটি পদার্থ খুঁজে বার করতে প্রায় দু-হাজার জিনিষকে কাজে লাগানো হ'ল। কাগজ, বাঁশ, কার্ডবোর্ড, থেকে শুরু করে অত্যন্ত দামী ধাতু পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না এই পরীক্ষায়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন এডিসন মন দিলেন অন্য দিকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র ডায়নামোকে আরও উন্নত করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। বিদ্যুৎ মাপার বিভিন্ন যন্ত্রাদি যেমন গ্যালভানোমিটার, ভোল্টামিটার, আমমিটার প্রভৃতিকে তিনি উন্নত করলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হ'ল না।

তারপর অবশেষে এল সেই আলোকসঞ্চারী চমকপ্রদ দিন। যেদিনের সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাকে পরদিনের নিউ-ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় 'ইয়াঙ্কী ব্লাফ্' বলে মন্তব্য করা হ'ল। সেদিনের ঘটনা সত্যি সত্যি মানবসভ্যতাকে নিয়ে এল আলোকময় যুগে। সমাজ-সভ্যতাকে হঠাৎ যেন এক ধাক্কায় এগিয়ে দিল অনেকটা পথ। যদিও সেই ঘটনার ফলাফলকে কাজে লাগাতে লন্ডন শহরেরও লেগেছিল আরও ৪০ বছর। তবু ঘটনাটি স্মরণীয়।

তারিখটা ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান আমেরিকার নিউ জার্সির মেনলো পার্কের এডিসনের বাড়ী বা "দি এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" সেদিন সত্যিকারের ৬০টি ইলেকট্রিক বাল্ব লাগানো হয়েছিল এই বাড়ীটির প্রাঙ্গণে বৃক্ষ-শাখায়। বহু প্রতীক্ষা নিয়ে প্রায় হাজার তিনেক মানুষ হাজির হয়েছিলেন ওখানে। রীতিমত বিশেষ ট্রেনের আয়োজন করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। কাঁচের গোলকের মধ্যে সাধারণ সুতোকে কার্বনাইজড করে রাখা হয়েছিল। আর তার বাইরের দুই প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সঙ্গে। আজকের উন্নত বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক বাল্বের সেই ছিল প্রথম সংস্করণ। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ অনেক কিছুর মত বৈদ্যুতিক বাতি সম্পূর্ণ নিজের জন্য এক সুন্দর সাজানো গোছানো একাধারে শৈল্পিক আধুনিক জগত গড়ে নিয়েছে সত্যি; কিন্তু তার জন্মকালের দীর্ণ চেহারার কথা ভুললে চলবে না আর যাই হোক পরমায়ু ছিল মাত্র ৪৫ ঘণ্টা। আমরা আবার ফিরে যাই সেই সাংঘাতিক উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দিনটিতে।

এটাই অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। আশা-আশঙ্কায় অন্য অনেকের মত এডিসন নিজেও কিছুটা চিন্তান্বিত। যদিও কিছুদিন আগেই পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন কিন্তু জনসমক্ষে এই হবে তাঁর প্রথম পরীক্ষা। যোগাড়যন্ত্র সব প্রস্তুত। সমস্ত যন্ত্রপাতি একবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হ'ল। চলল ডায়নামো। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলো হঠাৎ যেন প্রাণ পেল। আর তারপর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল নিয়ে সমস্ত আশা-আশঙ্কা অপেক্ষা-প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, জ্বলে উঠলো আলো।

শিল্প-সংস্কৃতি

নাটকের সুখদুঃখ এবং 'ফজল আলি আসছে'

নাটক শেষ হওয়ার পর মুক্তাঙ্গনের বাইরে আলোকিত রাজপথে বেরিয়ে সিগারেট ধরাতেই একটি সোনালি থালায় কিছুটা শুভ্র ভাতের কথা খুব বেশি মনে হয়। এবং খালি পেটে সিগারেট টানতে টানতে ক্রমশই শরীরের মধ্যে ওই অমোঘ ক্ষিধের প্রবল টান অনুভব ক'রতে পারি। আর তখন, হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত কয়েক মুহূর্ত, নিজেকে নাটকে দ্যাখা ফজল আলি ভ্রম হয়। যদিও, তিন মুহূর্ত পরেই, নিজের কাছে, স্ফটিকের চেয়েও স্বচ্ছভাবে, নাটকের ফজল আলির সাথে আমাদের শ্রেণীগত পার্থক্যটা খুব প্রকট হ'য়ে ওঠে।

তফাৎটা এইরকম যে, তখন, রাতদুপুরে শহরতলীর একটি নিরাপদ ছাদের তলায় ক্ষুধার্ত আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে র'য়েছেন এক সহাস্য ভাতের থালা। আর আপাতত আমার লড়াই, লড়াই শব্দটি এখানে খুব সৌখিন অর্থে ব্যবহৃত বোঝাই যায়, নাটক নিয়ে সবান্ধবে কিছুকাল আঁতলেমো ক'রে, ট্রাম-বাস হাঁকড়ে সেই প্রতীক্ষারত ভাতের কাছে পৌঁছনোর জন্যে। তারপর ভরপেটে মৌরী চিবুতে চিবুতে ওই ফজল আলির মত মানুষদের জন্যে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, শীতল বাতাসে গা এলিয়ে কিছুক্ষণ, গভীর কুম্ভিরাশ্রু মোচন ক'রবো। এবং তখন, যখন আমি এইভাবে মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে দ্রব হ'চ্ছি, ঠিক তখনই মধ্যরাতে অবিকল মানুষের মত দেখতে কিছু বিজাতীয় প্রাণীর, যাদের দেখে আমরা, বাবুরা প্রায়ই নাকে রুমাল দিয়ে থাকি, তাদের ক্ষিধে ও সঙ্গম একাকার হ'য়ে যাচ্ছে কী নিবিড় অসহায়তায়! স্তব্ধ রাতে শূন্য খাবারের পাত্র হাতে তারা ক্রমশই কেমন পাষাণ হ'য়ে যাচ্ছে। হায়, এই বিপরীত সহাবস্থানের চেয়ে চরম অশ্লীলতা আর কীই বা হ'তে পারে।

হল থেকে বেরিয়ে অন্য কেউ কিম্বা আমিই হয়তো বলেছিলাম, 'আহ্, কী অভিনয়, ফজল আলির'! কথাটা হঠাৎ আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করে। যদিও, হয়তো কোন কারণ ছিল না। আমরা তো যথার্থই একটি 'নাটক' দেখতে এসেছিলাম। সুতরাং অভিনয়, নাট্যরূপ, প্রয়োগকৌশল, সংলাপ, আলোকপাত, সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জা, পোষাক-আষাক ইত্যাদি কিছু শৈল্পিক শর্তাবলী তো খুব অনিবার্যভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি ক'রবেই—নাটক এবং নাট্য ক্রিয়াকৌশল নিয়ে স্বভাবতই ভাবিত হবো। তবু, হঠাৎ কীরকম খট্‌কা লাগে। ওইরকম একটি শ্বাসরোধী অবস্থা দু'-আড়াই ঘণ্টা ধ'রে প্রত্যক্ষ করার পর, আমরা শুধু তার সূক্ষ্ম নান্দনিক দিকটি নিয়েই ভাবিত হবো, ওই ফজল আলিদের যন্ত্রণার আঁচ আমাদের নধর শরীরে একটুও স্পর্শ ক'রবে না? নাট্যশিল্পের সাথে যে সামাজিক, মানুষিক সচেতনতার প্রশ্ন খুব নিবিড়ভাবে ওতপ্রোত, শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে তার সাথে এরকম গভীর ব্যবধান গড়ে উঠবে? শিল্প কি জীবনের চেয়ে তত মহান? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বন্যাক্লিষ্ট মানুষের ছবি দেখে আঁতকে না উঠে ক্যামেরাকৌশল বিষয়ে ভাবিত হওয়া তো বস্তুতই কোন কাজের কথা নয়। তাহ'লে কি পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে পাউডার দিয়ে নিখুঁত পোষাকে বিলোল প্রেমিকা সহ ক্ষিধের নাটক, বিপ্লবের নাটক দ্যাখা একধরনের বিশুদ্ধ ফ্যাশানে পরিণত হ'য়েছে?—এইসব জ্বলন্ত প্রশ্ন আমাকে তখন যুগপৎ অসহায় এবং বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে তোলে।

কিন্তু এখন তো একথা আমরা সকলেই জেনে গেছি যে, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি মূলতই একটি বিপ্লবী কার্যক্রম এবং তা অবশ্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত সেইসব অধিকাংশ অসহায়, বোবা, ক্রন্দনরত মানুষের উজ্জ্বল অস্ত্র হিসেবে। অর্থাৎ মাও-ৎ-সেতুং যাকে বৈপ্লবিক যন্ত্রের অংশবিশেষ রূপে উল্লেখ ক'রেছিলেন এবং যে মেসিনের উৎপাদিত ফলাফল ব্যবহার ক'রবেন সেইসব শোষিত শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই ব্যবহারিক যোগ্যতাই শিল্পসাহিত্যের সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি। কেননা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কলাকৈবল্য তো সোনার পাথর বাটি ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্যহীন শিল্পবিলাস এই সমাজে বিশুদ্ধ যুক্তিহীনতারই নামান্তর। অথচ, শিল্প সংস্কৃতি আমাদের কাছে প্রায়ই একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। আর সেজন্য, আমাদের নান্দনিক দৃষ্টি

এ্যাতই একচক্ষু হরিণের মত যে, আমরা কেউ হিন্দী ফিল্মকেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মনে করি, আর কেউ মাঝেমধ্যে চীনা খাবার খাওয়ার মত বিপ্লব-টিপ্লবের নাটক দেখে স্বাদ বদল করি! ব্যস্, এর বেশি কিছু নয়।

কিছুদিন আগে আমরা, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃত দর্শক মেট্রো সিনেমার নরম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামে ব'সে রঙিন পর্দায় একটি শক্তিশালী ছবি দেখেছিলাম। সেই ছবিটিতে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের স্পষ্ট ভূমিকা বিষয়ে আপোষহীন, জোরালো বক্তব্য রাখা হ'য়েছিল। অথচ, সেইসব তুচ্ছ ক'রে প্রতিষ্ঠান-পালিত জনৈক সিনে-আঁতেল আলোচ্য ছবিটির শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে একটি-মাত্র মহার্ঘ দৃশ্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রেছিলেন, যেখানে দ্যাখানো হ'য়েছে নায়িকার নগ্ন, নিটোল পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে একবিন্দু টলটলে জল! এবং লেখাই অতিরিক্ত, এই দৃশ্যটি ছবির মূল বক্তব্যের সাথে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট নয়। অথচ, সেই প্রাজ্ঞ সমালোচকের কাছে তা খুব জরুরী ব্যাপার—শিল্পের খাতিরে! আর এই স্বেচ্ছামূঢ়তা থেকে ছবির মূল অভিঘাতটিই মাঠে মারা যায়। আসলে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সামগ্রিক ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। কেননা, বুর্জোয়া-প্রতিষ্ঠান চিরকালই শিল্প-সাহিত্যকে ভয় পেয়ে এসেছে, যেহেতু তা খুব বিস্ফোরক ব্যাপার। তাই তারা আমাদের স্বচ্ছ দ্যাখাকে বিভ্রান্ত ক'রে দিতে সক্রিয়। এবং অনিবার্যভাবে, ধনতন্ত্রের ঢাক ঢোল বাজনা অবিরত শুনতে শুনতে, আমরাও তার শিকার হ'য়ে পড়ছি। তাই আমরাও এখন যেন শিল্প থেকে কোনরূপ গভীর এবং আদর্শিক শিক্ষার্জনে তীব্রভাবে বীতস্পৃহ।

সেজন্যেই, শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক আমরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও এই পরিষ্কার, লক্ষ্যস্থির ছবিটির স্বারা কতটুকু প্রভাবিত, প্ররোচিত হ'য়েছি, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অর্থাৎ এ-কথা আক্ষরিক ভাবেই সত্য যে, এখনো শিল্পের মনোরঞ্জক ক্ষমতা যতটা ব্যাপক, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে তার ব্যর্থতা ঠিক ততটাই। আমাদের শিল্প-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাই এর জন্যে দায়ী। শিল্পের সংজ্ঞাকে জীবনের কাছাকাছি আনতে গেলেই শিল্প-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যেমন আতংক হয় (সম্প্রতি অশ্লীল নাট্য প্রচারের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আনন্দবাজার কোম্পানীর যেমন হ'য়েছিল), তেমনই আমরাও শিল্পকে রাংতার মোড়কে সুগন্ধী সাবানের মত পেতে আগ্রহী এবং অভ্যস্থ। তাহ'লে এখানে ব্যর্থতা কার—শিল্পের, শিল্পীর, দর্শকের না সমূহ ব্যবস্থার?

যদিও, আধুনিক বাংলা নাটক তার ঊষাকাল থেকেই সামাজিকক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হ'য়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রূপটি স্পষ্টতর ক'রে দ্যাখাবার, আন্দোলনের গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের সচেতন করার কাজে নাটক একটি বিশেষ হাতিয়ার রূপে বিবেচিত। আমাদের নাট্যজগৎ (উত্তর কলকাতার ক্যাবারেকাম থিয়েটারের কথা এখানে অবশ্যই ধরা হচ্ছে না।) একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে আপোষহীনভাবে, সাবধানে এবং অবশ্যই শিল্পিত প্রক্রিয়ায়। সামাজিক আবহে, সুস্থ চেতনায়, গভীরতম অনুভূতির ছোঁয়ায় এ এক মনোরম দৃশ্যপট, যা আগামী সূর্যের স্বপ্নে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। আর এইটাই আমাদের কাছে আশা এবং আনন্দের কথা যে, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত নাটক এখনো সংস্কৃতি-বণিকদের থেকে কেরিয়ার ঘুষ নিতে-নিতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হ'য়ে যায়নি। বহু উজ্জ্বল প্রলোভন তুচ্ছ ক'রে তা এখনো একটি স্থির ইডিওলজির প্রতি অবিচল, আস্থাশীল র'য়ে গ্যাছে। এবং তা সম্ভব হ'য়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যেই। অবিশ্যি, অনেকে রাজনীতি এবং শিল্পকে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন এবং সযত্নে রাজনীতিকে শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে সক্রিয় হন। তাঁরা সম্ভবত মনে করেন, প্রেমিক কবি লম্পট মাতাল জুয়ারী বোহেমিয়ান বেশ্যা সকলকে নিয়েই শিল্পসৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু কেউ যদি রাজনীতি করে, সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে না নিয়ে যদি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, তাহ'লেই আমাদের পোষা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তা থেকে সাত হাত দূরে ছিটকে আসেন। আসলে, এরা সেই আদিমকাল থেকেই রাজার সিংহাসনের পাশে বীণা বাজিয়ে আসছেন, রাজাকে সিংহাসনে সমারূঢ় রাখবার জন্য তাদের বাদ্যি-বাজনার প্রয়োজন আছে। তাই চামচে-জীবী না হ'য়ে এদের উপায় নেই, নইলে প্রভুর রক্তচক্ষু তাকে গোল-গোল সুখ এবং খ্যাতির মিনার থেকে এক লাথিতে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। সেটা নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত নয়! তাই রাজনীতির নামেই তারা আঁতকে ওঠেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত নেই। রাজনৈতিক সচেতনতাই সৎ শিল্প সৃষ্টির একমাত্র উপাদান। শিল্পী যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, অসাড়তা বিষয়ে তাঁকে সচেতন থাকতেই হবে, এবং তার প্রতিফলন ঘটবে শিল্পকর্মে। কেননা, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পীকে অবশ্যই কোন কল্যাণময় দ্বান্দ্বিক মতাদর্শের বিশ্বাসে অটল থেকে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রতে হবে। দরবারী শিল্প থেকে কিছু নগদ বিদায় জুটলেও তার কোন স্থায়ী মূল্য নেই, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

'৪০-এর দশকে বাংলা নাটক এই রাজনৈতিক

বিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছিল, যার জন্যে দায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই ঐতিহ্য, যা তৎকালীন বুর্জোয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিত অনেকটাই কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হ'য়েছিল, আজো আমাদের গ্রুপ-থিয়েটারগুলি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই রক্ষা ক'রে যাচ্ছে। তবে দুঃখের ব্যাপার এই যে, নাটক দর্শকের অনেক কাছাকাছি নেমে এলেও, দর্শকেরা নাটকের দিকে ঠিক ততটাই উঠে যেতে পারেনি। নাটক এখনো আমাদের অনেকের কাছে নিছক অবসর বিনোদন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অনেকেই (আঁ) তেল-(আঁ) তেল মুখে নাটক দেখতে যাই এবং নাটক শেষে তা কতখানি 'প্রতিক্রিয়াশীল' কিম্বা তার সেট-কম্পোজিশান কতটা ভঙ্গুর সেই আলোচনায় আত্মতৃপ্ত অনুভব করি। (অর্থাৎ আমরা একদল 'অতি বিপ্লবী', আরেকদল গাড়ল। গাড়লদের কিছু বলার না থাকলেও কাগুজে বিপ্লবীদের জন্যে এইটুকুই বলা যায়, নাটক আর পোস্টার যে এক নয়, ব্রেখ্‌ট কিম্বা স্ট্যানিসলোভস্কির এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটু ধৈর্য সহ শিল্পবিচার করুন। এবং জেনে রাখুন, অ্যাকাডেমির ঠাণ্ডা ঘর থেকে বিপ্লব হঠাৎ মোয়া হ'য়ে হাতে চলে আসবে না।) এবং খুব অনিবার্যভাবে বাড়ি গিয়ে নাটকটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে সক্ষম হই। নাটকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন হই না। অবিশ্যি এরজন্যে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, ভণ্ড দর্শকেরা একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই আমড়া পাতা খসার মত ঝ'রে গিয়ে সৎ দর্শকেরা নিজস্ব প্রয়োজনেই ঠিক নাটকের জন্যে রক্ত ঢেলে দেবে বীরের মত, প্রবীরের (দত্ত) মত।

এইসব কথা নতুন ক'রে মনে হ'ল সাম্প্রতিক কালে অভিনীত একটি নাটক দেখে—'নটরঙ্গ' প্রযোজিত এই নাটকটির নাম 'ফজল আলি আসছে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য নাটকটি যে উপন্যাসের নাট্যরূপ তা প্রকাশিত হ'য়েছিল বঙ্গসংস্কৃতির পালকপিতা আনন্দবাজারকোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শারদ-কীর্তি রূপে। প্রতিষ্ঠানিক শাসনের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ ঈষৎ বিদ্রোহ ক'রে থাকেন, এবং শীর্ষেন্দুও এখানে তাই ক'রেছেন। অন্তত চেষ্টা ক'রেছেন। সেকারণেই এই উপন্যাসটি অনায়াসেই সমসময়ের একটি মহার্ঘ রচনা রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। কী ঝরঝরে এবং জলতরঙ্গের মত অনায়াস শিল্পকর্ম শীর্ষেন্দুর করায়ত্ব, যা সাবলীল পদচারণার শেষে পাঠককে এক অনিবার্য স্থানুত্বের দিকে, যা কিনা অতল খাদের মত, ঠেলে দ্যায়। সমকালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এই একটি উপন্যাস সরাসরি তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে। এই আপাতপরিচ্ছন্ন বেঁচে থাকার যাবতীয় অসহায়তা, নষ্টামো, ক্রূরতা, ভণ্ডামী সবকিছু উজ্জ্বল ফুটে ওঠে শীর্ষেন্দুর অস্থির ক্যানভাসে।

রুবি ফ্যাক্টরির একজন অনশনরত শ্রমিক ফজল আলি। ১৪৫ দিন অনশনের পর কঙ্কালপ্রতিম এই মানুষটিকে আর ততো মানুষরূপে সনাক্ত করা যায় না। জ্বলন্ত ক্ষিধেকে গলা টিপে মারার চেষ্টায় তখন তার কোটরাগত চক্ষু দুটো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত জ্বলজ্বল করে। কেননা, সে তখন এই সরল সত্যে পৌঁছে গ্যাছে যে, ক্ষিধে ব্যাপারটা একটা শারীরিক অভ্যেস ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই অভ্যেসকে জয় করার জন্যেই তার লড়াই। প্রাথমিকভাবে তার লড়াই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে হ'লেও, ক্রমশই তা রূপান্তরিত হ'য়েছে নিজের সাথে অবিরাম সংগ্রামে। সে স্বপ্ন দেখেছে—একদিন, তার এই নতুন যুদ্ধের শেষে যে চরমপ্রাপ্তি আসবে, তা সে পৌঁছে দেবে পৃথিবীর সমূহ মানুষের কাছে—কি করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সে বিষয়ে সে সমস্ত ক্ষুৎকাতর মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তুলবে। তার কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের এই-ই একমাত্র বাঁচার পথ। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর মধ্যে একটা নঞর্থক চেতনা আভাসিত হ'লেও, এর ব্যাঙ্গাত্মক আবেদন অনেক বেশি তীব্র। এবং সেই তীব্রতাই আমাদের ক্রমশ একরূপ সদর্থকতার দিকে নিয়ে যায়। আর ওই অ-মানুষিক, প্রায় প্রতীকী চরিত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে যে নাটকীয় বিন্যাস গড়ে উঠেছে, তার মানবিক দিকটিও কিছু কম স্বাস্থ্যকর নয়। তাছাড়া ফজল আলিকে আপাত চোখে সমাজ থেকে, একটি পূর্ণাঙ্গ লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়া ব্যক্তি মনে হ'লেও অমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ হবে যে, ফজল আলি আসলে একটি বৃহৎ লড়াইয়ে সামীল এবং তার চিন্তাচেতনা সবই নিবেদিত উত্তরকালের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে। যদিও, তার লড়াই অনেকটাই প্রতীকী, রোমান্টিক; তাসত্ত্বেও তার মহত্ব এবং ব্যাঘ্র-মনস্কতার কারণেই সে একটি উজ্জ্বল চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

এই নাটকের অভিনয়িক শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষত, ফজল আলির চরিত্রে সুব্রত বসু আক্ষরিক অর্থেই অসাধারণ অভিনয় ক'রেছেন। এরকম একটি রক্তমাংসহীন প্রতীকী, প্রায় অবিশ্বাস্য চরিত্রে তিনি কোনরকম ক্রিয়াত্মক ভূমিকা ছাড়াই (চরিত্রটি আগাগোড়া একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল।), শুধুমাত্র সংলাপ অবলম্বন ক'রে যে শক্তিশালী অভিনয় ক'রে গ্যাছেন, তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। তাছাড়া দোলগোবিন্দ উকিলের চরিত্রে সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাপটের সাথে অভিনয় ক'রেছেন। তবে চরিত্রটির পরিকল্পনার ত্রুটিতে তাকে প্রায়ই এই নাটকের বিবেক বলে মনে হয়। তবু তিনিই এই

[শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়]

সজল রায়ের তুলিতে—



নাই নাই ভয়.........!

শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা। মহাশ্বেতা দেবী

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬-তে প্রকাশিত।

"বাঢ়া গ্রামের ম্যানগ্রাফে তপশীলীদের অস্তিত্ব একেবারে গৌণ ও প্রয়োজনীয়। গৌণ তারা। মুখ্য এখানে রাজপুত সমাজ। প্রয়োজনীয় তারা সমাজের মুখ্য জীবগুলির বিবিধ কাজ করার জন্য। যেহেতু গ্রামটি মেদিনী সিং সদৃশ রাজপুতদের সৃষ্ট, সেই-হেতু এখানকার নয়ভাগ জমি তাদের দখলে। অন্যেরা, অর্থাৎ সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জমি চষে।" চল্লিশ বছরের ধারাবাহিক মধ্য প্রাচ্যের এই ক্লোজআপ্ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' উপন্যাসে। মূলত দুটি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে একটি পরিবারের দু'পুরুষের নিটোল কাহিনীর মাধ্যমে। কাহিনীর সূত্রপাত বৃটিশ শাসন থেকে, শেষ হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত। আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শাসক ও শোষিতের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন লেখিকা ভাঙ্গী ও দুসাদ অধ্যুষিত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। বস্তুত যে অঞ্চলে সমস্ত জমির মালিকানা মাত্র কয়েকটি রাজপুত পরিবারের হাতে। এবং তাই রাজপুতেরা নিজেদের সমস্ত বিভেদ ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে থাকে ভাঙ্গী ও দুসাদদের কব্জা করতে। সরল হিসেবে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়, আর দিনকে দিন ভূমিদাস ও ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। "বান্দা বা দাসপ্রথা আছে কি নেই তা বান্দাদের কেউ জানায়নি। তাদের বংশধরদের বেলা মালিকদের সুবিধে বেড়ে যায় আরো।" শুধু তাই নয় এইসব মধ্যযুগীয় প্রায় দাসদের জীবনের অত্যন্ত ন্যায্য ও সামান্য সুখগুলি এইসব 'মালিক' শ্রেণী যে রকম স্বাধীকারে প্রমত্ত হয়ে নষ্ট করে দেয় তারই সত্যনিষ্ঠ জীবনমুখী সাহিত্যরূপ এই উপন্যাস।

উপন্যাস শুরু হয়েছে গণেশের জন্ম থেকে। তার-পর সেই জন্মকে কেন্দ্র করে মেদিনী সিং-এর পরি-বার এবং তারপর সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে বাঢ়া গ্রাম তথা সমগ্র সমাজটাই উপস্থিত হয়েছে উপন্যাসের পটভূমিকায়। উপস্থিত হয়েছে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যানুযায়ী গণেশ সিং-এর অবিচার অত্যাচার ও ব্যাভিচারের কাহিনী। উপস্থিত হয়েছে ভাঙ্গীদের লোকসংস্কৃতি সং-এর গান। এই সময়, সমাজ ও সামাজিকতার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গণেশ সিং নামক একটি চরিত্রের কিংবা একটি শ্রেণী চরিত্রের তথা একটি যুগের [যা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক] পতন ফুটে উঠেছে।

আর এই পতনকে ফুটিয়ে তুলতে লেখিকা নিপুণ-ভাবে অত্যাচারিত চরিত্রগুলির Development ঘটিয়েছেন। লছিমা জীবনের স্বপ্ন ও সাধকে বিসর্জন দিয়ে, পিতার রক্ষিতা ও পুত্রের ধাত্রীরূপে স্বৈত জীবন যাপন করে, দীর্ঘ জীবনে নির্মম দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আর তারই ফলস্বরূপ দেখতে পাই গণেশ সিংকে হত্যার হোতা হিসেবে স্তনদায়িনী সেই লছিমাকেই। সেই একই কারণে গান্ধী মিশনভুক্ত তপশীলীদের নেতা উভয়ের নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। সর্বহারাদের কোন জাত থাকতে পারে না—ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ভাঙ্গী ও দুসাদরা এক হয়েছে বাঁচার তাগিদে সেই অভিজ্ঞতাতেই। আর এই-সব কিছুর নিয়ামক হিসাবে যিনি আছেন, সেই দেবাংশী পুরুষকে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা ব্যঙ্গ করে নাম ভূমিকায়।

সর্বশেষে লেখিকাকে সাধুবাদ জানাতে হয় এই উপন্যাসে তাঁর ভাষা ব্যবহারে। নাটকের মত তিনি চরিত্রগুলির মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন উক্ত অঞ্চলের কথ্যভাষা থেকে। কিন্তু যেখানে লেখিকা স্বয়ং উপস্থিত, উপন্যাস যেখানে বর্ণনাত্মক—তা হয়েছে প্রাঞ্জল বাংলা প্রবন্ধের ভাষা। তাঁর অন্যান্য মহতী সৃষ্টিগুলির মত এই উপন্যাসটির মধ্যেও লেখিকার আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' অচিরেই নিজের আসন করে নেবে আশা করি।

—দুর্গা ঘোষাল

বিভাগীয় সংবাদ

বাঁকুড়া জেলা :

শালতোড়া ব্লক যুব-করণ—শালতোড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ফুটবল প্রতিযোগিতা কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা ২২শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে মোট ৩৪টি স্থানীয় দল অংশ গ্রহণ করে। যুব কল্যাণ বিভাগ থেকে ব্লকে এই প্রথম ক্রীড়া সামগ্রী সাহায্য দেওয়ার ফলে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুব সংস্থাগুলির মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়। ব্লকের ৩৪টি যুব সংস্থার ৪০৮ জন তরুণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় তিলুড়ি মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট ও শিরপুরা উদয়ন সংঘ যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

গত ৭ই ডিসেম্বর শালতোড়া ব্লকের রঘুনাথচক গ্রামে শালতোড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও রঘুনাথচক মহিলা সমিতির পরিচালনায় সেলাই শিল্পের উপর মহিলাদের একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সূচী প্রাথমিকভাবে নয় মাস স্থায়ী হবে। পরবর্তী কালে এর কাজ পর্যালোচনা করে এর স্থায়ীত্বকে বাড়ান হতে পারে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে ৫৩ জন শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলা প্রশিক্ষণরত।

চলতি বছরে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্লক যুব-করণ পাঠ্যপুস্তক ঋণ দিয়েছেন। মোট তেত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্লক যুব-করণের পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার থেকে এই সাহায্য পাচ্ছেন। পাঠশেষে তারা পুস্তকগুলি ফেরত দেবেন।

স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই ব্লক প্রায় সাতটি প্রকল্প অনুমোদন করে ব্যাঙ্কের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে দুটি প্রকল্প আশাকরা যায় বর্তমান মাসে ব্যাঙ্কের অনুমোদন পাবে এবং কাজে রূপায়িত হবে।

বনজ সম্পদে পূর্ণ এই ব্লকে নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যুব-করণ 'অভোজ্য তেল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণের' একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বহু সংখ্যক অশিক্ষিত তরুণের নতুন আয়ের রাস্তা খুলে যাবে বলে আশা করা যায়।

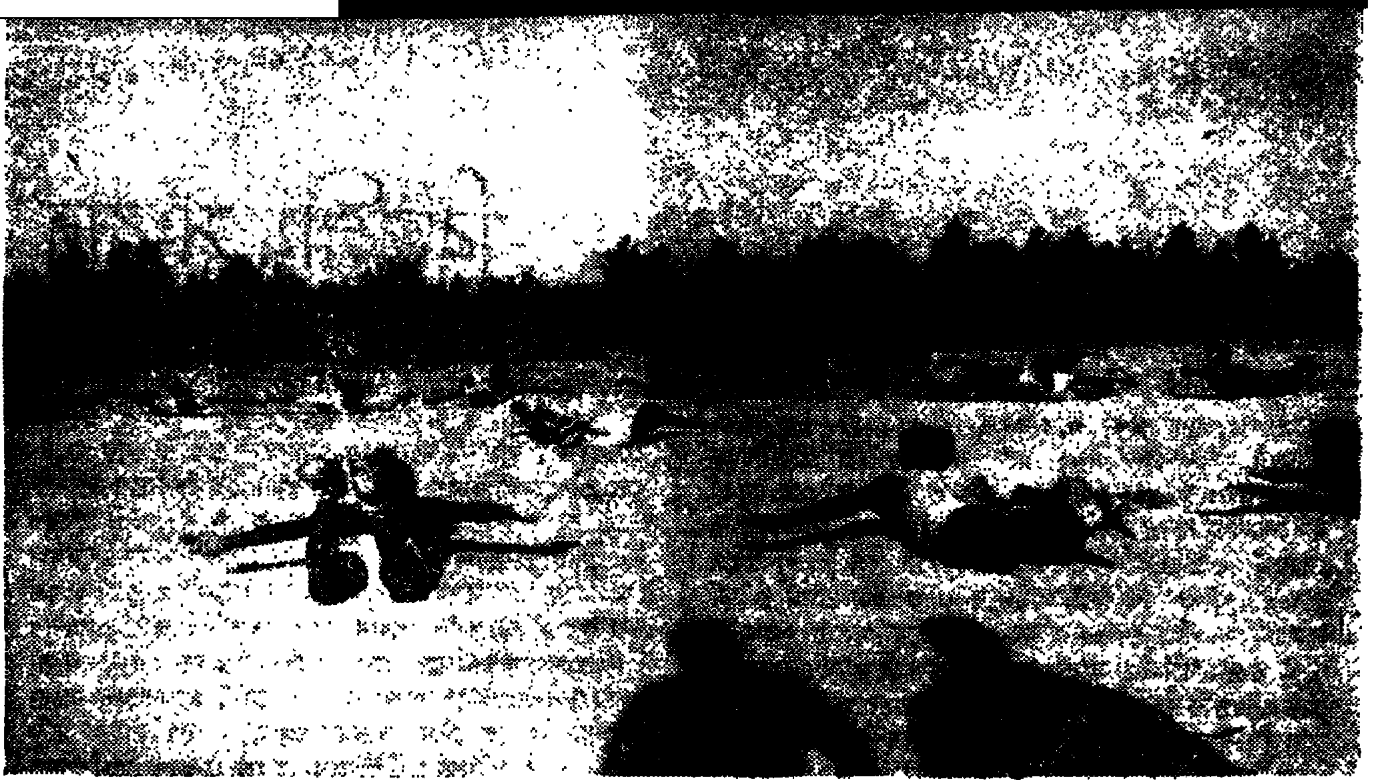
মেদিনীপুর জেলা :

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—বিনপুর ১নং ব্লকের যুব সমাজের ফুটবল খেলায় মান-উন্নয়নে এবং উৎসাহিত করার জন্য বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লালগড় ময়দানে ১৫ দিনের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে দৈনিক গড়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন যুবক অংশ গ্রহণ করে। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন অতীতের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় স্যামুয়েল অ্যান্টনী, যিনি পূর্বে বেশ কয়েকবার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুবকদের মধ্যে বিশেষকরে আদিবাসী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনেকে দশ মাইল দূর থেকে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। প্রশিক্ষক অ্যান্টনীর সুন্দর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি প্রভৃত সাহায্য করেছে। মনে হয় এই অঞ্চলে প্রথম এজাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। আগামী দিনে বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের লোহবল, বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছে আছে বলে ব্লক-যুব আধিকারীক জানিয়েছেন। এছাড়া যোগাসন শিক্ষা দেবার শিবিরের ব্যবস্থা করার চেষ্টাও চলছে। মার্চ মাসে যুব উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা :

মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ—মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ৩১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মাদারীহাট বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য সুনীল কুজুরকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ব্লক যুব আধিকারীক শ্রীকুজুরকে যুব কল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে সুনীল কুজুর এই ধরণের অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিভিন্ন উদ্যোগকে যুব কল্যাণ বিভাগ কাজে রূপ দেবে, এই আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শ' যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

যুব সংগঠনগুলিকে আর্থিক অনুদান কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্প্রতি মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ স্থানীয় কুড়িটি যুব সংগঠনকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। খেলাধূলার সম্প্রসারণের জন্যও কুড়িটি সংগঠনকে বিনামূল্যে নেট ও ভলিবল দেওয়া



স্যামুয়েল অ্যান্টনীর তত্ত্বাবধানে বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের ফুটবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

হয়েছে। এই ব্লকে ব্লক স্তরে কাবাডি প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা ও ব্লক স্পোর্টস করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি ও যুব সংগঠনগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানগুলি শুরু হ'তে চলেছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ বীরপাড়াতে একটি টায়ার রিসোলিং ইউনিট, একটি মুদি দোকান ও একটি ক্ষুদ্র দেশলাই বিক্রয় ইউনিট চালু করেছে। তিনটি প্রকল্প বাবদ স্থানীয় ব্যাঙ্ক মোট ২৯,০৭০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে আর যুব কল্যাণ বিভাগ প্রান্তিক অর্থ বাবদ ২,৯০৭ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। প্রকল্পগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ মাদারীহাট ও বীরপাড়া দু'টি গ্রামে দু'টি মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কেন্দ্র দু'টির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা সত্তর জন। মাদারীহাট শিক্ষণ কেন্দ্রের দশজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে ঋণ দেবার প্রস্তাব স্থানীয় ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে যাতে করে তাঁরা এই ঋণের সাহায্যে সেলাই মেশিন এবং প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে ব্যক্তিগত ইউনিট গড়তে পারেন। আশাকরা যায় খুব তাড়াতাড়ি এই ইউনিটগুলি চালু হবে। এছাড়া উল নিটিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ছ'হাজার টাকা ঋণের প্রস্তাবও ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে। মেসিনে সোয়েটার বোনার এই প্রকল্পটিও শীঘ্রই চালু করা যাবে।

১৯৮০-র ব্লক যুব উৎসবের প্রস্তুতিও এগিয়ে চলেছে।

ফালাকাটা ব্লক যুব-করণ—ফালাকাটা ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে স্থানীয় যুবকদের জন্য ১২ কি. মি. দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় যেমন অনেক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন তেমনি বহু সংখ্যায় সাধারণ মানুষ দর্শক হিসাবে যুবকদের দৌড় উপভোগ করেন। উৎসাহ দেন। দশজন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও সরকারী অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। মোট একানব্বই জন যুবক অংশ নেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাইশটি যুব সংগঠনকে গৃহ নির্মাণ, খেলাধুলোর সরঞ্জাম কেনা ইত্যাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয় এবং ভলিবল ও নেট বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে নরসিংহপুর গ্রামে আদিবাসী উৎসব পালনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উৎসবে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের নাচ, গান ও খেলাধুলোর কর্মসূচী থাকছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মসূচীতে ফালাকাটা ব্লকে জানুয়ারী মাসে একটি আটা চাকী ইউনিট খোলা হয়েছে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির জন্য ৯,৯৮৫ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং যুব-কল্যাণ

বিভাগ প্রান্তিক ঋণ বাবদ ১৯৮ টাকা মঞ্জুর করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ছ'জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে।

এছাড়াও এই ব্লক তৈরী পোষাকের দোকান, রেডিও দোকান এবং পরিবহণ ইউনিট (ট্রাক) প্রকল্পের জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে মহিলাদের সেলাই শেখানোর কাজ চলছে। বারজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে।

***আলিপুরদুয়ার*:** অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই ব্লকে তিনটি মিনিবাস, দুটি মৎস চাষ প্রকল্প, একটি বেকারি, তৈরী পোষাকের দোকান এবং শাঁখার গহনার দোকান গত আগষ্ট মাস থেকে চলছে। এতে মোট বিনিয়োগ ৫,৩০,০০০ টাকা, প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৩,০০০ টাকা। কাজ পেয়েছে কুড়ি জন যুবক।

এই ব্লকের অন্তর্গত শিলবাড়ীহাট গ্রামে মেয়েদের সেলাই শেখানোর কাজ সাফল্যের সঙ্গে এগোচ্ছে। এবং আলিপুরদুয়ার জংশনে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে একটি সেলাই সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে চলেছে। এ'দের প্রশিক্ষণের কাজ ইতি-মধ্যে শেষ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার কলেজে গত নভেম্বর মাসে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার মহকুমা অফিসের সহযোগিতায় 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নাথ' এবং সোনারপুর গ্রামে 'শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক দুটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দুটি আলোচনার উচ্চমানে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশে দারুণ সাফল্য লাভ করে। আকাশবাণী শিলিগুড়ি দুটি অনুষ্ঠানকেই সম্প্রসারিত করে।

ব্লক ভিত্তিক ফুটবল ও ভলিবল খেলা তিনশো'রও বেশী যুবকের অংশ গ্রহণে জমে ওঠে। অংশ গ্রহণ-কারী প্রতিটি ব্লককে বিনামূল্যে খেলাধুলোর সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে বারটি ক্লাবকে আর্থিক অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণোৎসব এই অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষ উৎসাহের খোরাক হয়েছিল। এব্যাপারে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত সমাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে তাঁদের সচেতনতার পরিচয় দেন। একটি স্মারক গ্রন্থও বের করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্লক যুব-করণ ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন। বিপুল উৎসাহ এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠান হয় আলিপুর-দুয়ার মহকুমা গ্রন্থাগারে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন অধ্যাপক-শিক্ষকেরা এসে-ছেন, এসেছেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তেমনি অনেক সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছেন শহীদ শিল্পী সোমেন চন্দকে জানতে এই অনুষ্ঠানে। 'নবীন শিল্পী সোমেন চন্দ' এবং 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সোমেন চন্দ' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সোমেনের 'রাজপথ' কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার আয়োজনে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া 'সোমেন চন্দ এবং সমকালীন সাহিত্য' আলো-চনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যাপক শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মিহির রঞ্জন লাহিড়ী এবং শ্রীদীনেন রায়। অনুষ্ঠান কক্ষে 'সোমেনের জীবন ও কর্মে'র উপর একটি প্রদর্শনী দর্শকদের ভীষণ আকৃষ্ট করে।

দার্জিলিং জেলা :

মিরিক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের আর্থিক আনুকূল্যে এলাকার দুঃস্থ স্বল্প শিক্ষিত এবং নেপালী মহিলাদের সেলাই শিক্ষাদেবার ব্যাপারে মিরিক ব্লক যুব-করণ উদ্যোগ নেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষার্থী অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজ শিখছেন। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস এবং উপ-সচিব শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রীমহাশয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা উপলব্ধি করেন এবং পাঁচ হাজার চল্লিশ টাকা টিফিন খরচ বাবদ অনুমোদন করেন।

মালদহ জেলা :

পুরাতন মালদা ব্লক যুব-করণ—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরাতন মালদা ব্লক স্পোর্টস কমিটি এবং ব্লক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদা কালাচাঁদ হাই-স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় পুরাতন মালদা ব্লকের ছটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, সমিতি ও সংগঠনের মোট একশ' আশি জন যুবক-যুবতী অংশ নেয়।

এদের মধ্যে তিরানব্বই জন যুবক এবং সাতাশি জন যুবতী। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় এবং ব্লক স্পোর্টস কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ক্লাব ও আটটি স্কুলের প্রায় একশ' পঞ্চাশ জন প্রতি-যোগী অংশ নেয় এবং পাঁচশোরও বেশী মানুষ এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন যুবককে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঠান হয়।

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল

॥ রবীন্দ্র সংগীত ॥

প্রথম ঃ—রিংকু করঞ্জাই, কলিকাতা-১
দ্বিতীয় ঃ—শ্যামলী দাস, নদীয়া।
তৃতীয় ঃ—বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।

॥ নজরুল গীতি ॥

প্রথম ঃ—রীতা গাঙ্গুলী, কলিকাতা-১৯।
দ্বিতীয় ঃ—নন্দা চক্রবর্তী, কলিকাতা-৪২।
তৃতীয় ঃ—পুলক ভদ্র।

॥ মার্গ সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পিয়াল ব্যানার্জী, কলিকাতা-২৬।
দ্বিতীয় ঃ—পার্থ রায়,
তৃতীয় ঃ—কৃষ্ণা রায়, ২৪ পরগনা।

॥ লোকগীতি (একক) ॥

প্রথম ঃ—বকুল রায়,
দ্বিতীয় ঃ—যুধিষ্ঠির রায়,
তৃতীয় ঃ—তুহিন দত্ত, ২৪ পরগনা।

॥ লোকগীতি (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—তাপস বসুনিয়া ও সম্প্রদায়, দিনহাটা।
দ্বিতীয় ঃ—মালতি সরকার ও সম্প্রদায়, কোচবিহার।
তৃতীয় ঃ—শ্রীমতি কাবেরী ও সম্প্রদায়, শিলিগুড়ি।

॥ গণসংগীত (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—সঙ্গীতাংকুর,
দ্বিতীয় ঃ—কর্ণিক,
তৃতীয় ঃ—দমদম ৬নং ইউনিট, কলিকাতা-৩০।

॥ কাব্য সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পার্থ কুমার রায়
দ্বিতীয় ঃ—অর্পণা চক্রবর্তী
তৃতীয় ঃ—তপতী বিশ্বাস

॥ আবৃত্তি—অগ্নিকোণ ॥

প্রথম ঃ—সুমিত্রা দিব্যশ্রী মজুমদার, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।
তৃতীয় ঃ—জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আসানসোল।
তৃতীয় ঃ—চন্দন সাহা, ইসলামপুর।

॥ আবৃত্তি—মৃত্যুঞ্জয় ॥

প্রথম ঃ—পৃথা দত্ত, হুগলী।
দ্বিতীয় ঃ—সুস্মিতা গুপ্ত, নদীয়া।
তৃতীয় ঃ—স্বস্তিকা ঘোষ, জলপাইগুড়ি।

॥ আবৃত্তি—প্রিয়তমাসু ॥

প্রথম ঃ—অমিতরঞ্জন ব্যানার্জী,
দ্বিতীয় ঃ—তুষার গাঙ্গুলী, বর্ধমান।
তৃতীয় ঃ—সংঘমিত্রা তরফদার, পঃ দিনাজপুর।

॥ আবৃত্তি—আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাস ॥

প্রথম ঃ—মধুমিতা ভট্টাচার্য, কলিকাতা-৫।
দ্বিতীয় ঃ—স্নিগ্ধা বিশ্বাস, হাওড়া।
তৃতীয় ঃ—শ্রীপর্ণা দত্ত,

॥ স্বরচিত কবিতা (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—কেয়া সেন, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় ঃ—মনোমিতা দত্তগুপ্ত, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—ছন্দা দে, শিলিগুড়ি।

॥ স্বরচিত কবিতা (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—আশীস বোস, নদীয়া।
দ্বিতীয় ঃ এম. আফসার আলি, কুচবিহার।
তৃতীয় ঃ—পিনাকী চৌধুরী, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—দেবাশীষ মিশ্র, বীরভূম।

॥ ছোট গল্প (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—জয় বসু, কলিকাতা-৩।
দ্বিতীয় ঃ—হীরালাল ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান।
তৃতীয় ঃ—সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-১৪।
তৃতীয় ঃ—শর্মিষ্ঠা দত্ত মজুমদার, শিলিগুড়ি।

॥ ছোটগল্প (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ—প্রবীর রুদ্র, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—সন্তোষ সাহা, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—শুভংকর চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৯।
তৃতীয় ঃ—গৌতম রায়, ২৪ পরগনা।

॥ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (স্কুল বিভাগ) ॥

প্রথম ঃ—জাতিস্মর ভারতী, উত্তর বাংলা
দ্বিতীয় ঃ—বিসব ভাওয়াল, উত্তর বাংলা
তৃতীয় ঃ—অনুপকুমার চ্যাটার্জী, উত্তর বাংলা

॥ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (কলেজ বিভাগ) ॥

প্রথম ঃ—গৌতম সেন, বহরমপুর।
দ্বিতীয় ঃ—বিষ্ণুপ্রসাদ ধর, উত্তর বাংলা

॥ চিত্রাঙ্কন (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—সুপর্ণা সাহা, কলিকাতা-৫৩।
দ্বিতীয় ঃ—রঞ্জিত সরকার, কুচবিহার
তৃতীয় ঃ—গোপাল সাহা, কুচবিহার

॥ চিত্রাঙ্কন (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম :—গৌতম সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৬৪।
দ্বিতীয় :—অমরেন্দ্র মজুমদার, শিলিগুড়ি
তৃতীয় :—জয়ন্ত সরকার, শিলিগুড়ি

॥ নৃত্য ॥

প্রথম :—শ্রাবনী হালদার, আসানসোল।
দ্বিতীয় :—রজা দত্ত, শিলিগুড়ি
তৃতীয় :—বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, শিলিগুড়ি
তৃতীয় :- সঙ্গীতা পাল, শিলিগুড়ি

॥ সেতার ॥

প্রথম :—সঞ্জয় গুহ, কলিকাতা-৭০০০২৫।
প্রথম :—অনন্য দে, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় :—শান্তিরঞ্জন কর্মকার

॥ তবলা লহরা (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম :—শিবশংকর রায়, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় :—বিকাশ দে.
তৃতীয় :—দীপংকর রায়,

॥ তবলা লহরা (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম :—শ্যামল কাঞ্জিলাল, কলিকাতা-৬৭।
দ্বিতীয় :—দেবাশীষ বসু, শিলিগুড়ি
তৃতীয় :—বিরেশ সরকার, কুচবিহার।

॥ প্রবন্ধ (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম :—ভাস্কর সরকার, কুচবিহার।
দ্বিতীয় :—অনুপম কুমার চ্যাটার্জী, জলপাইগুড়ি।
তৃতীয় :- কস্তুরি বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।

॥ প্রবন্ধ (১৮—২০ বৎসর) ॥

প্রথম :—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৭৩।
দ্বিতীয় :—অসীম কুমার কর্মকার,
তৃতীয় :—মনীন্দ্র মাইতি, কলিকাতা-৬।

॥ বার্ষিক পত্রিকা, স্কুল বিভাগ ॥

প্রথম :—রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়।
দ্বিতীয় :—বিষ্ণুপুর সার রমেশ ইন্স্টিটিউশন।
তৃতীয় :—জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল।

॥ বার্ষিক পত্রিকা, কলেজ বিভাগ ॥

প্রথম :—মালদহ কলেজ
দ্বিতীয় :—মালদহ কলেজ (বাণিজ্য)
। :—হেরম্ব চন্দ্র কলেজ।

॥ একাংক নাটক প্রতিযোগিতা ॥

প্রযোজনা—
প্রথম :—সুর্বাবর্ত, নাটক সেইসুর, কলিকাতা-৫৯।

দ্বিতীয় :—বিপ্লবী সংঘ, নাটক—ইতিহাস কাঁদে, ইসলামপুর।

তৃতীয় :—শিল্পীসংসদ, নাটক—চলো সাগরে, জলপাইগুড়ি।

পরিচালনা—

প্রথম :—অর্জুন ভট্টাচার্য, নাটক—সেইসুর।
দ্বিতীয় :—সত্যজিত্ রায়, নাটক—চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ, জলপাইগুড়ি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—বলাই চট্টোপাধ্যায়, 'যুবক', সেইসুর।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সংঘমিত্রা তরফদার, 'মেয়েটি', ইতিহাস কাঁদে, বিপ্লবী সংঘ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—অশোক ভট্টাচার্য, 'ডাক্তার', চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—তপতী বিশ্বাস, কাকদ্বীপের এক মা, মিলেমিশে, শিলিগুড়ি।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা—দিলীপ চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত সংবাদ, সংকেত, বালুরঘাট।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী—শ্রাবণী দাশগুপ্তা, ইতিহাসের পাতা থেকে, নিউ আলিপুর কলেজ।

॥ আদিবাসী নৃত্য (সমবেত) ॥

প্রথম :—সেন্ট মেরী গার্লস হাই স্কুল, গয়াগঙ্গা।
দ্বিতীয় :—বিজলীমাটি টি এস্টেট, কমলবাগান।
তৃতীয় :—পুটিং বাড়ী চা বাগান, পুটিং বাড়ী।

॥ বিতর্ক ॥

প্রথম :—পক্ষে—জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল,
শ্রী কমলেশ শাও, শ্রীমতি সুমিত্রা মিশ্র, শ্রী সুব্রত সান্যাল।

বিপক্ষে—শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়,
শ্রী বিপ্লব ভাওয়াল, শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী, শ্রীসন্দীপন চন্দ।

॥ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ॥

পুরুষ বিভাগ—

১০০ মিটার দৌড়

পরমেশ্বর জানা	মেদিনীপুর	১ম
সুমন সরকার	মুর্শিদাবাদ	২য়
প্রদীপ মজুমদার	মুর্শিদাবাদ	৩য়

পুরুষ বিভাগঃ—

শট পুট

গৌতম চ্যাটার্জী	মেদিনীপুর	১ম
দেবপ্রসাদ চন্দ্র	মুর্শিদাবাদ	২য়
দিলীপ শিকারী	মুর্শিদাবাদ	৩য়

ব্রড জাম্প

সাধনকুমার দাস	মেদিনীপুর	১ম
অসিত সরকার	মুর্শিদাবাদ	২য়
নীলোৎপল কিস্কু	মেদিনীপুর	৩য়

ডিসকাস থ্রো

নির্মল ব্যানার্জী	বর্ধমান	১ম
দিলীপ শিকারী	মুর্শিদাবাদ	২য়
পি. মজুমদার	বর্ধমান	৩য়

হাই জাম্প

ইলিয়াস আলি মণ্ডল	বর্ধমান	১ম
বলরাম মাইতি	মেদিনীপুর	২য়
মহঃ মহসিন	বর্ধমান	৩য়

বর্শা ছোড়া

গৌতম চ্যাটার্জী	মেদিনীপুর	১ম
সতীশ মাথুর	বর্ধমান	২য়
আবদুস সালাম	মুর্শিদাবাদ	৩য়

৮০০ মিটার দৌড়

মোহনানন্দ ঘোষ	মেদিনীপুর	১ম
তাপস ভট্টাচার্য	দার্জিলিং	২য়
সুজিত চৌধুরী	বর্ধমান	৩য়

মহিলা বিভাগঃ—

১০০ মিটার দৌড়

নিয়তি সিনহা	মুর্শিদাবাদ	১ম
হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
রূপালী তরফদার	বর্ধমান	৩য়

হাই জাম্প

মালা ঘোষ	বর্ধমান	১ম
সুষমা সাহা	মুর্শিদাবাদ	২য়
বুলা মণ্ডল	বর্ধমান	৩য়

শট পুট

প্রভাতী শীল	মুর্শিদাবাদ	১ম
ঝরনা দাস	মুর্শিদাবাদ	২য়
মিনতি সিনহা	মেদিনীপুর	৩য়

ডিসকাস থ্রো

ঝরনা দাস	মুর্শিদাবাদ	১ম
বনানী দাস	মুর্শিদাবাদ	২য়
সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

ব্রড জাম্প

মালা ঘোষ	বর্ধমান	১ম
হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
বুলা মণ্ডল	বর্ধমান	৩য়

বর্শা ছোড়া

প্রভাতী শীল	মুর্শিদাবাদ	১ম
পুতুল দাস	মেদিনীপুর	২য়
সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

[পাঠকের ভাবনাঃ ৭২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মহাশয়,

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত যুব-উৎসবে (২৩—২৯ ফেব্রুয়ারী) আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। দীর্ঘদিনের অবহেলিত উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য বিভাগে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে গর্বিত। বিভিন্ন শাখায় আমাদের প্রগতি এবার সরকারীভাবেই প্রমাণিত হল। উত্তরবঙ্গেই বেশীরভাগ পুরস্কার এসেছে। ৮০তে এমন একটি যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা প্রস্তুতি কমিটি ও জনপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে জানাই সাধুবাদ ও সংগ্রামী উষ্ণ অভিনন্দন।

আমাদের এখানে একটা সায়েন্স ক্লাব আছে। সন্ধানী বিজ্ঞানচক্র বানারহাট। স্থাপিত ২-৮-৭৬।

যুবকদের মুখপত্র 'যুব মানস' দশ কপির এজেন্সী নিতে হলে কী করতে হবে দয়াকরে জানাবেন। কিছু কিছু পত্রিকা এইসাথে (পুরনো কপি) পাঠালে উপকৃত হবো। ইতি—

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ
কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, শিক্ষাকর্মী
বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

পাঠকের ভাবনা

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

'যুব মানস' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে আপনাদের কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

আমরা গ্রাম বাংলার যুব সমাজ 'যুব মানস' পাঠ করে বর্তমান সমাজের অন্তর্গত নানা সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ও যুক্তিনিষ্ঠ পথের সন্ধান পাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে জটিল বিষয়বস্তুগুলিকে আরও সরল ভাষায় উপস্থিত করতে পারলে গ্রামাঞ্চলের যুব সমাজ মূল বক্তব্যগুলি সঠিকভাবে ধরতে পারবেন। আপনাদের পত্রিকার বিষয়বস্তুগুলি সব সময় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হচ্ছে না বলে মনে হয়।

যুব জীবন যদিও মূল জনসাধারণের জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তবু যুব জীবনের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। যুব জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি যেমন খেলাধূলা করা, গান-বাজনা চর্চা করা, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা ঘটলেও অসীম ধৈর্য্য নিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা ইত্যাদি। যুব সমাজের এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি বর্তমান সমাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিভা স্ফুরণের যথার্থ পরিবেশ নেই। 'যুব মানসে'র পাতায় যুব সমাজের এই যন্ত্রণার ছবি বিশেষ পাইনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ এই বিষয়গুলিকে ফিচার, আর্টিকেল ও তথ্যের মাধ্যমে 'যুব মানসে' হাজির করুন।

যুব কল্যাণ বিভাগের 'আমরা-প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা' নামক পুস্তিকাটি সম্প্রতি আমরা পাঠ করে ঐ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। 'যুব মানসে' বিভিন্ন ব্লক যুব কল্যাণ করণের কিছু কিছু কাজের বাসি সংবাদ পড়েছি। আপনাদের পত্রিকায় নিয়মিত যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মধারার পরিচয় সংবাদ হিসাবে শুধু নয়, ব্যাখ্যামূলকভাবেও প্রকাশ করা যায় না কি? মফস্বলের যুবকরা অনেক অনেক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ পরিচালনার অভাবে সঠিক পথ অনেক সময় বেছে নিতে পারে না। 'যুব মানস' পত্রিকায় কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা, খেলাধূলার বৃহত্তর অঙ্গণে প্রবেশ করার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় ছোট ছোট আর্টিকেলের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে অনেকে লাভবান হতে পারেন। আপনারা তার ব্যবস্থা করুন না, তাতে পত্রিকাটি আরও মূল্যবান হয়ে উঠবে।

মফস্বলের যুবকরা প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আলোচনাসভা, বিতর্ক, নাটক, গান, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে এই লড়াই সংগঠিত করা হয়। যদি কখনও লিটিল ম্যাগাজিনগুলির পাতায় নজর দেন তাহলে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, বিষয়বস্তু ও মুন্সী কলমের সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন। এ সবই নির্মমভাবে সীমাবদ্ধ প্রচারে আবদ্ধ থাকে। তাদের বিশাল পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন। আপনারা লেখক তালিকার গণ্ডীটা আরও প্রসারিত করুন না, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

আমার পত্রটিতে আমাদের একান্ত আপনজন 'যুব মানস'কে সমৃদ্ধ করার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিলাম। আপনারা বিচার করবেন। গ্রহণ করতে পারলে পত্রিকাটি যুব-জনের প্রকৃত মুখপত্র হয়ে উঠতে আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নমস্কারান্তে
সরল বিশ্বাস
মালদহ।

'যুব মানস' পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত জানিয়ে আমাদের দপ্তরে অনেক চিঠি আসছে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে 'যুব মানস'-কে আরও উন্নত করার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের মূল্যবান পরামর্শ আগামী সংখ্যাগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করবে।

আমরা যুব মানসে নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের মতামত 'পাঠকের ভাবনাচিন্তা' বিভাগে প্রকাশ করছি। আপনাদের সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে আশাকরি।

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর যে স্পর্ধা নিয়ে 'যুব মানস' পত্রিকা প্রকাশ করেন তা বাঙালী যুব সমাজের কাছে শ্রদ্ধা ও গর্বের বস্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবুও আমার দৃষ্টি ভঙ্গীতে 'যুব মানস' পত্রিকাটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রকাশ পেলে খুবই ভাল হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে

পড়াশুনা করে তারুণ্যের দোহাই দিয়ে। এই তারুণ্যকে শতধারায় ফুটিয়ে তুলতে আমাদের সরকারের খুব কম সংখ্যক পত্র-পত্রিকা এগিয়ে এসেছে। তাই 'যুব মানস' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন স্কুল জীবনে উর্ধ্ব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যৎ যৌবনের কর্মপন্থা কি হবে, তাদের উচ্চাশা ও নবীন স্বপ্ন কিভাবে যৌবনে পদার্পণ করে দেশের ও দশের কাজে উৎসর্গীকৃত হবে, তার একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা 'যুব মানস' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করেন 'তরুণের স্বপ্ন' নাম দিয়ে, তবে বঙ্গবাসী যুবসমাজ তথা তরুণ-তরুণীরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে অধিক আগ্রহে সচেষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'যুব মানস' পত্রিকা দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

শ্রীদিলীপ কুমার গিরি
গ্রামঃ কৃষ্ণনগর
পোঃ গড়-কৃষ্ণনগর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

মাননীয় সম্পাদক,

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। বিগত দুই বছরে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই ব্যক্তিগত সংগ্রহে সুরক্ষিত রয়েছে। পত্রিকাটি সংগ্রহ করার উৎসাহে অবশ্য মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। কারণ আপনারা ভীষণ অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। অনিয়মিত প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কোন দিন কোন পত্রিকা পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা উদ্যোগী হলে পত্রিকা নিয়মিত হবে। আর 'যুব মানস' নিয়মিত হলে আমার মত আরও অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বভাবতই সুস্থ জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী সংস্কৃতিবান মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে এই বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন। 'যুব মানস' সুস্থ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুব জীবনের সমস্যাবলীই শুধু নয়, সমগ্র সংস্কৃতির জগৎ সম্পর্কে 'যুব মানস' সচেতন রয়েছে বলে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুস্থ জীবন ভাবনার বিশ্বাসী পত্র-পত্রিকার ভীষণ অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। সেই অভাব পূরণে 'যুব মানস' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কিছুটা করছেও নিশ্চয়। এ রকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যখন 'যুব মানসে'র ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন তার নিয়মিত প্রকাশন ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী নয় কি? আশাকরি আপনারা বিষয়টি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

ধন্যবাদান্তে
সুদীপ্ত গায়েন
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়ায় যুব-ছাত্র সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আপনারা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করছেন না। 'যুব মানস' পত্রিকার পাতায় নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আমরা দেখতে চাই।

আর একটা অনুরোধ করব। প্রবন্ধমূলক রচনার পাশাপাশি প্রগতিশীল গল্প, কবিতা আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করুন। প্রগতিশীল লেখকের অভাব নেই, অভাব তাদের প্রকাশ মাধ্যমের। আপনারা নতুন ও সম্ভাবনাময় লেখকদের আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের গর্ব অনুভব করতে পারবেন।

অভিনন্দনসহ—
রঞ্জন রায়,
সেওড়াফুলী, হুগলী।

প্রিয় মহাশয়,

প্রতি সংখ্যায় মূল্যবান চিন্তার খোরাক দেওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ।

আপনাদের পত্রিকাটি সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য হলেও কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে না। কোন নিয়মিত বিভাগ নেই। অথচ এ ধরণের প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই কিছু নিয়মিত বিভাগ থাকে যেমন পাঠকের কলম, পুস্তক সমালোচনা, জানবার কথা, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ, মাসিক সংবাদ পর্যালোচনা, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ইত্যাদি। সব বিভাগ হয়ত একসঙ্গে চালু করতে পারবেন না। অন্তত কয়েকটি করা কি খুবই শক্ত কাজ!

ধন্যবাদান্তে
সব্যসাচী বাগচী
রামধন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪

[শেষাংশ ৭০ পৃষ্ঠায়]

আমরা করব জয়—



সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে যুবক-যুবতীদের দৃপ্ত মিছিল।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে—



'জাতীয় সংহতির সমস্যা' আলোচনা চক্রে গীতা মুখার্জী আলোচনারত। মঞ্চে বাঁদিকে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মে '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ: খালেদ চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরাও দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করছি ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রক্ত নিংড়ানো সম্পদে মালিকশ্রেণী মুনাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ সৃষ্টি কর্তা শ্রমিক দু-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দীর্ঘ-ক্ষণ ধরে হাড়ভাঙা খাটুনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বস্তির খুপরির মধ্যে দিনের অব-শিষ্ট সময়টুকু অর্ধমৃতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রুত-লয়ে বেড়ে ওঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানার শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল ৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দুনিয়ার কষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চিকাগো শহরের হে মার্কেটে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে সুশৃংখল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড় তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধূসর-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং সুদূর প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সৃষ্টি করল।

তারপর আরও গুলি চলল—আরও শ্রমিককে আত্মা-হুতি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। কিন্তু যে দুর্জয় ঝড়ের সৃষ্টি হোল তাকে আমেরিকার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙ্গে ভর করে তামাম "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও"—কার্ল মার্ক্স-এর এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির হোল বিশ্বব্যাপী ১লা মে তারিখটি "মে-দিবস" হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিনটিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

সেই থেকে ৯০টি বৎসর ধরে পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন করে আসছেন। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগুলি সমস্ত প্রকার দমন-পীড়নের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিক-শ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জুলিয়াস ফুচীক মে-দিবস পালন করার, লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বস্ত্র নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দুহাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, পুঁজি-বাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করে-ছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন করছি তখন পুঁজিবাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন মতে টিঁকে থাকার জন্য পুঁজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপাবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকছে। ফলে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রমিক সংকোচন নীতি অনুসরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্য-মূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বঞ্চিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক মুনাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের দাম খুসি মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুঃখ কষ্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও মুখ বুজে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা একদিকে যেমন পেশাগত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদায় করার জন্য আরও সংগঠিতভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বেশি বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছেন যে জীবনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা হতে স্থায়ীভাবে নিষ্কৃতি পেতে হলে ঘুন ধরা, পুঁজ পড়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার সমাধির উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মাত্রায় অনুভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মুক্তির সংগ্রামকে যদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একান্ত ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাড়বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর, পুঁজিপতি-শ্রেণীর আক্রমণ তত প্রখর হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণটুকু তত দ্রুত অপসারিত হয়ে তার বীভৎস নগ্ন মূর্তি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির চক্রান্তকে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাজে শ্রমিক-শ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অঙ্গ হিসাবে তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের বাকী অংশের শ্রমজীবী মানুষ মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁড়িয়ে তারা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে। নতুন করে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুনিয়া।

[শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়]

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রায় এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গুরুতর সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা করেছেন। দু' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদুরাই, আলিগড়, সিমলা, ভুবনেশ্বর, ত্রিপুরা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদ, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভার্গিস, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাড়াও অন্নদাশংকর রায়, অমলেন্দু গুহর মত বুদ্ধিজীবীরা যেমন তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন, অন্যদিকে জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, সৌরীন ভট্টাচার্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, ভোলা সেন, সত্যসাধন চক্রবর্তী, সাইফুদ্দিন চৌধুরী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁদের বক্তব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হীরেন গোগই এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উদ্বোধন করে সুদীর্ঘ ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বলেন—

আসামের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। শুধু-মাত্র প্রশাসন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। চাই রাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত কয়েকটি বিষয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়িমসি করবার সময় নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাদেরও ডাকা হোক।

আসামের আন্দোলন জাতীয় অর্থনীতিরও যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ছ' হাজার উদ্বাস্তু পরিবার এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আসামের জন্য—অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙলার কয়লা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙলার জন্য তাহলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয়নি। তারা ঐক্যবদ্ধ-ভাবে সাধারণ শত্রু—পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই আলোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এক-যোগে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে পারে।

সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী গোবিন্দ মুখোটী বলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শুরু করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভার্গিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রশ্নটিই বিভ্রান্তিকর। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিভ্রান্তি দূর করে একটা সুষ্ঠু সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিৎ রায় বলেন, নাগরিক প্রশ্নে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে

আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ দুই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছাত্রনেতা হীরেন গোগই বলেন—আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার কৌশল হিসাবে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশী শক্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপাণ্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, ভ্রাতৃঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী তাঁর ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধুয়া তুলে মঙ্গলদইতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে। পরে তার পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দেয়। এই আন্দোলনের পেছনে সিয়া টাকা ঢালছে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে জাতীয় স্তরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শুরুতেই বলতে ওঠেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যের মধ্যে আসামের সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরিচালিত আন্দোলন দানা বাঁধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীয়া ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নষ্ট করে দেবে, এই আশংকা অমূলক। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসলে গোটা দেশ জুড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে দূর করতে আন্দোলন করতে হবে এবং তা হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলতে পারে না। কিন্তু আসামে তা না হয়ে অন্দোলনকারীরা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বামপন্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিচ্ছে সেখানকার একচেটিয়া পুঁজিপতি-গোষ্ঠী। এই রকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও আসামের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

দুদিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চল্লিশ জন বক্তা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বক্তব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একাত্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহরু-লিয়াকত এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সেমিনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখার্জী আলোচনা সভাতে 'আসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

[সম্পাদকীয় : ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় সমস্ত স্তরের লড়াকু সাধারণ মানুষ। যে দেশে ক্রমবর্দ্ধমান বিভীষিকাময় বেকারীর তীব্র দংশনে যুব জীবন নষ্ট হতে থাকে, যেখানে সৃজনশীল শক্তিমান যুব সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে জীবনটা এক দুর্বিসহ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে দেশের যুব শক্তির প্রতিভার যথোপযুক্ত স্ফুরণের সুযোগ অকল্পনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ—সেখানে মে-দিবস যুব-সম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সমাধানের সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মে-দিবসকে স্বাগত জানাই, বরণডালা সাজিয়ে আমরাও মে-দিবসকে বন্দনা করি। সু-স্বাগতম মে-দিবস! জয়তু মে-দিবস।

রবীন্দ্রনাথ : বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি সর্বপ্রতিম দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বলতম-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—সারা দেশে তখন জাতীয়তার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দু-ঐতিহ্যের পুনরুত্থানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন। কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাই অগ্রজদের উদ্দেশে বললেন :

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি পুরোমাত্রায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবন্ধে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মগ্ন, অধিকতর ব্যস্ত।

'এবার ফিরাও মোরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের ভারতবর্ষের প্রার্থনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব খবর জানা এবং সেগুলির তাৎপর্য বুঝে উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, প্রবলের অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য জাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ মুখর।

বালগঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বঙ্গভঙ্গ, ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা, আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা, বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির দ্বিধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সমকালের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মুক্ত থাকতে দেখি। স্বদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের দ্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝোঁকটা ছিল দেশের শতকরা নব্বইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ পল্লীসমাজ পল্লীপ্রকৃতি এবং সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্র ও সংকল্পবাক্য রচনা কেবল দেশকর্মী রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। তিনি বস্তুত স্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। কিন্তু তখনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের কবি এবং কবি-সার্বভৌম। অখণ্ড বাংলা ও ভারতের সব সামাজিক অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কৃষকবিদ্রোহ, মোপলাবিদ্রোহ, অসহযোগ, বয়কট-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশ্চর্যরকম প্রগতিশীল। তাঁর দৃষ্টি যে কত দূরপ্রসারী তার কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।



স্কেচ—সজল রায়

স্বদেশী যুগের ভাবপ্লাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকখানি ছিল। তাই কবিকণ্ঠে ধিক্কার শোনা যায়ঃ 'দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। ......ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।' 'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সায় ছিল। বস্তুত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' 'জাতি-নির্মাণ' এবং স্বদেশী শিক্ষার ভিত্তিনির্মাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি'—এ উক্তি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসব কথা কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু কেন তিনি এই অসহযোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির সৃষ্টি-কল্পনা কর্মযজ্ঞের তাড়নায় ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের 'নীল-নির্জনে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আসল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদস্তি, বোম্বাই-আমেদাবাদের কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পীড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মনের পাত্রে বরাবর ঢালতে চেষ্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্তুতি ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি রক্তপাত হতনা। ইংরেজী শিক্ষিত কয়েকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যে বিভেদ—এ সবই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা যথার্থঃ 'বিলাতীদ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু নাই।'

পূর্বে আমরা যে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগুলির গঠনতন্ত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কবির সতর্ক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) স্বদেশী সমাজ

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাপন্ন হইব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরাজীতে পত্র লিখিবনা।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি, ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

(২) পল্লীসমাজ

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্যবিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মতো নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সার-নীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদির পালন দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১৩। পল্লীর তত্ত্বসংগ্রহঃ অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

(৩) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

আমরা চাই

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুপণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। সমস্ত

দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়েকটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিবনা।

আমাদের কাজ

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবা বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।......এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটামুটি এইরূপ

১। পল্লীসেবা

(ক) কেন্দ্রীয়সভার অধীনে সুবিধামতো অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

(খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তৎপ্রসঙ্গে নিজ গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা। দুর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েৎ, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মুষ্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিষ্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

২। আবাসিক শিক্ষা

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কর্মী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্যের পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সংস্কার সমিতির শাখা স্থাপন। তদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে যে-সকল অন্তরায় আছে, তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি।...

এই সংস্কার সমিতি বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত আবেদন (১৫ই অঘ্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩২) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—'Proceeds from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্পৃশ্যতা, হরিজনদের ওপর অত্যাচার, গান্ধীর অনশন সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ এই পুস্তিকার বিষয়। বলা বাহুল্য, অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে গান্ধী-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমাত্রায় জোর দিলে যদি গান্ধী-অনুমিত ৫০,০০০ টাকার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কৃষকের অধিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্র্য ও সামাজিক নিপীড়নও দূর হচ্ছে না। প্রতি বছর কয়েকদিন ভাঙ্গি-কলোনিতে বাস করলেই সমস্যার সমাধান হয়না। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, কৃষিজীবী জনগণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক বিচ্ছেদের সমস্যাকে প্রায়-আধুনিক সমাজবিদের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলিও অনেকাংশে 'ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পৌঁচেছিলেন। অতদূর আর কোন দেশনেতার দৃষ্টি পড়েনি। যৌথখামার, ধর্মগোলা, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবায় ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা যথার্থ আধুনিক সমাজকল্যাণ পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের পুনরুত্থানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাজ-উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নৈশ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষেও কার্যকর। লক্ষণীয় যে, সমবায়ের দ্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা ভাবতে পারেননি। 'কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিবনা বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না।'—এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনর্জিত।

সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের শুচি, স্নান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী, প্রথম পূজা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগুলি পরিচিত, তাই এখানে উদ্ধৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কী প্রবল গণমুখী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'একজন লোক' কবিতার অংশ উদ্ধার করা হল।

আধ বুড়ো হিন্দুস্থানি
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ
সেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো
যেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দুই শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'অস্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড নয়; কিন্তু নতুন মূল্যবোধের বিশিষ্ট নিদর্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মুক্তির জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন যুবসমাজকে।

'আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভ চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করছে।

'এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাৎ।

'আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তরুণদের নব জীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'



বিষ্ণুপুর ১নং ব্লক যুব উৎসবে পুরুষদের উচ্চ-লম্ফন প্রতিযোগিতায় লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার

নবীন পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছে, এটা খুবই বিপজ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রচারাভিযানে নেমেছে, তাকে সিদ্ধ করতে গিয়ে ভারতের কয়েকটি সংবাদপত্র ও স্বার্থান্বেষী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিশে মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যন্ত লিখেছে, বামফ্রন্ট সরকারকে যদি কেন্দ্র যে কোন অজুহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্ত্রিক। সরকার ভেঙে দিতে না পারাটাই অগণতান্ত্রিক। একমাত্র জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যায় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। সুকৌশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাস্তব জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশ্নের আজ সন্দেহাতীতভাবে উত্তর মিলে গেছে যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি জনগণের সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পুঁজিবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করতে গেলে আধুনিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে তারা পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতন্ত্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। গণতন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওখানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামন্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। যে দাসত্বের সর্তই জমিদার সামন্ত প্রভু ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মানুষ, দাস কিংবা কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নের যুগ শুরু হল, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা আরেক ধরণের শোষণ সৃষ্টি করল। সামন্ত প্রভুদের সাথে শিল্পপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিল্পপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিল্পপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা যাবে; আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে যখন আইনসিদ্ধ, সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করা হল, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীব্রতা বেড়ে যায়। নিপুণভাবে গোটা সমাজের ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি যার থেকে একক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক এবং সর্বনাশ সমাজের বাকি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য যাতে শোষিত মানুষকে সমাজের এইসব শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে না পারে তার জন্য গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানবাধিকার ইত্যাদি আওড়ানো হয়। যেমন শিশুর কান্নাকে রোধ করতে চকোলেট দেওয়া হয়। গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ তার অসারত্ব বুঝে সত্যিই যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত পুলিস মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র। এই শিল্পপতি বড়লোকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম যুগে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্রশাসকদের হাতে ছিল সবকিছু। গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে অধিকারও সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বা না-থেকে শিল্পপতিদের অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন গণতান্ত্রিক উপায়েই জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল বা গোষ্ঠী শত্রুদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তখনই 'গণতন্ত্রপ্রেমী' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জঙ্গী। গণতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় অথৈ জলে। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি জাগতিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথেষ্ট অভাব থেকে যাওয়ায় এখনও বড়লোকদের দলগুলি মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে, গণতন্ত্রের মূল্য সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতন্ত্রের শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বড়লোকদের দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং তাদের সম-মনোভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। চরণ সিং, মোরারজী দেশাই বা ইন্দিরা গান্ধী সবারই এক রা। জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ নিয়ে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমাদের দেশে একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মানুষকে শোষণে সর্বস্বান্ত করেই বড়লোকদের এত সম্পত্তি। সমস্ত অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে পুঁজিপতি পরিবারগুলি মানুষের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়, মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বড়লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ যুগ ধরে পুষ্ট যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। আমাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত্র এত প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই অর্থে সেই ধরণের গণতন্ত্রের কোন প্রয়োজনই নেই। সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বড়লোক গরিব বলে কিছু থাকছে না, একজন অপরকে শোষণও করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ করেই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। যে দেশে বেকারী নেই, সেখানে বেকার যুবকদের কাজের অধিকারের

জন্য আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই, সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্ত্রেরও প্রয়োজন কি? মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির যেখানে সমাধান হয়নি, গণতন্ত্র দরকার সেইসব ধনতান্ত্রিক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার, সেই কারণগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে দূর হয়ে যায়। উপরন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতন্ত্রের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান গণতন্ত্রের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থ,—শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এটুকু গণতন্ত্রও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতন্ত্রও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জঙ্গী হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার সময় জঙ্গী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জঙ্গী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জঙ্গী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপদ্ধতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। বড়লোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফুলঝুরিও নয়, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমালোচক, তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে তার চৌহদ্দির বাইরে কোনকিছু চিন্তা করতে শেখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো ইত্যাদি হয় না; পুলিস লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালায় না, মিথ্যা মামলায় পুলিস প্রতিবাদী মানুষ ও সমালোচকদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতন্ত্র হল কি করে? তাদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ, খুনোখুনি মারামারি তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে বড়জোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা ভাবতেও পারে না, ধনতান্ত্রিক দেশের মত সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শত্রু নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের বক্তব্য, সমালোচনা ও পরামর্শ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজন্যই সেখানে তুলকালাম কান্ড করার কথা মানুষের চিন্তার মধ্যেই নেই। এই বুর্জোয়া প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বস্তু যা জনগণকে পিষে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে পুলিস লেলিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট মানে জনগণ যা চাইবে, তার বিরুদ্ধে দমনপীড়নমূলক কাজ করা। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার যেহেতু জনগণের বক্তব্য ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে এবং সেজন্য যখন কোন সংঘর্ষ হয় না, তখন সেই সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে প্রচার করে। অথচ জনগণের সমালোচনা ও পরামর্শের মর্যাদা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে দেওয়া হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত হয় একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজন্য সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবারাত্র গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে বুকফাটা চিৎকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি মূল্যবান দিক হ'ল বিরোধীপক্ষ নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রয়োজন, যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের মত যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবরণ রয়েছে, সেই দেশে মানুষের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবন-মরণের। মানুষের দাবি ন্যূনতম, যেটুকু পেলে সে জীবনধারণটুকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মানুষ অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগুলিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক দেশে কোথায়? ওখানে চাকরি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথায়? কেন বিরোধীপক্ষ? কিসের বিরোধিতা করবে? বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার ভুলপথে চললে তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের ভুলপথে চলার অর্থ তো এই নয় যে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা সৃষ্টি হবে? ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ সদস্য সমালোচনা আত্মসমালোচনা করে। এই লক্ষ লক্ষ সদস্য পার্টির ভেতরে যা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বক্তব্যই তুলে ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নির্বাচিত গণসংগঠন। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত হ'ল, শ্রমজীবী মানুষের ডেপুটিদের সোভিয়েত। এই সোভিয়েতগুলি গণসংস্থা। সাধারণ মানুষরা এদের নির্বাচিত করেন এবং সাধারণ মানুষের কথামতই তা চলে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে সুপ্রিম সোভিয়েত পর্যন্ত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপুটি সরকার চালায়। এর সাথে রয়েছে ২৫ লক্ষ সক্রিয় সোভিয়েত কর্মী। কাজেই জনগণের বক্তব্যকে এভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে হয় না জনগণকে। এই কারণেই বিরোধীপক্ষ গঠনের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মানুষের বিক্ষোভ থেকে

যায়, তাঁরা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই বিরোধীপক্ষ গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিয়মেই হবে। সোভিয়েতে বিপ্লবের পর গত তেষট্টি বছরের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। অন্যদিকে জঙ্গী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় মানুষের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হয়। পৃথিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জঙ্গী শাসনের উত্থান-পতনের অজস্র ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না যেখানে জঙ্গীশাহী মানুষের বিদ্রোহের চাপে পর্যুদস্ত হয়নি। স্পেনে একনায়কতন্ত্রী জঙ্গীশাসক ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা ও বিতর্ক যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জঙ্গীশাহী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎখাত করে ধনতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনিৎসিন প্রমুখদের আলাদা ব্যাপার। এদের আগেই তাড়ানো হল না কেন বুঝি না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথাই গোটা অংশের মানুষ বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত্র যেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে বুর্জোয়া প্রচারকরা জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মানুষকে শিক্ষা দেয়। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, সেখানে ভাত কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্ত্রের কথা, যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাইদের মতো বুর্জোয়া শাসকরাও সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বলে। কারণ সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন এক আস্থা গেঁথে দিয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের কথা না বললে মানুষ আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজতন্ত্রেরই জয়ের একটা পরিচয়। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই শত্রুরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিটি কর্মীরই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

গণতন্ত্র শব্দটির চেয়ে এত বেশি বলাৎকার অন্য কোন শব্দের ওপর হয় না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কলকারখানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকে এবং তারা যদি অবাধে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করে, তাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যায়? বুর্জোয়া শাসকরা শুধু মুখের কথায় বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরাই সেসবের হন্তা। সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়। সংবাদপত্রগুলি আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানায় রয়েছে। কাজেই পুঁজিপতিদের প্রচারটাই এসব সংবাদপত্রের মূলধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের হুকুমে। জনগণের কথা তাতে স্থান পায় না। গণতন্ত্রের পালিস রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া হয়। ঘুষে বিচারকদের রায় পর্যন্ত পাল্টে যায়। জনগণ বিচার কোথায় পাবে? এটা গোপন রাখার কিছু নেই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রচার মাধ্যমে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রচার করতে দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বক্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তখন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচারযন্ত্রে এমন কিছু প্রচার করতে দেওয়া হবে না যা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করবে এবং ধনতন্ত্রের জয়গান গাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ভাল—এই জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই গণতন্ত্র জনগণের চরম শত্রু। সমাজতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র একটি নয়, অসংখ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষায় ১৪ হাজার সংবাদপত্র ও সাময়িক প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার সরকারের অন্যায় অবিচারের সমর্থন করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো যায়। তার বিরুদ্ধেও আইন আছে বটে। কিন্তু আইনের নিয়ন্ত্রক সরকার ও তার প্রশাসন-পুলিস সেইসব সমাজবিরোধীদের মাথায় তুলে রাখে। এরই নাম বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে গণতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রগতির জন্য যা কিছু করা হোক, সবটুকুকে সমাদর দেওয়া হয়। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও তিরোহিত। এর নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন্‌টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করার প্রবণতাই লোপ পায়। সেই প্রবণতার সামান্যতম কিছু দেখা দিলেও কঠোর হস্তে তা দমন করা হয়। তাহলে দেখা যায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কোন্‌টি ভাল—স্বৈরতন্ত্র বা জঙ্গীশাহী না বুর্জোয়া গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—বুর্জোয়া গণতন্ত্র না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র? তবে এটা তো নিশ্চিত যে, টাটা বিড়লার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশ। আবার জনগণ যাকে ভাল মনে করবে, টাটা বিড়লারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিড়লারা চায় ভারতে এখন যে ব্যবস্থা সেটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়ায়ের জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার জনগণেরই।

নিঙা ভাই মরিনি

প্রণব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। অথচ শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটা।

গ্রামটা ছোট। সবে সন্ধ্যার মজলিস মণ্ডপতলায় জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁয়ের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। ওখানেই বসেছিল ও। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে র‍্যা?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কানা-ঘুষায় একটু আধটু শুনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। ওকে বলেওছিল রমজান চাচা—"দ্যাখ ভাই আমরা হ্যলাম ছোট জাত—মুখ্যু নোক—মজুর খাটি—বাল-বাচ্চা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সথে আবাদ বিবাদ মানায় র‍্যা।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দেয়—"চাচা ইসব কথা ঠিক লয়। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি? উকি আমদের কিনি রাখছে? উদের পয়সা আছে বলি যা খুশী তাই করবি?—ইসব কেমুন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেয়েছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজুর খেটেই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিন্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চাচা। অন্যায্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হলু—যা খুশী তাই করবি?"

আর কিছু না বলে—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাৎ পালেদের সাথে নিঙার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগুলো। একলাফে কামার দোকান থেকে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপর র‍্যা?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। যেটুকু রমজান চাচার কানে গ্যাল তাতে বুঝতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে খুন করেছে। তবে মরার আগে অবধি নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মণ্ডপতলায়। ছেলে ছোকরার দল বয়স্কদের ধমকানি এড়িয়েও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিয়ে মাথাব্যাথা সেরকম নয়। সবার মুখে কথা একটাই—

"নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল।" কেউ হয়তো ভাসা গলায় বলল—"উদের পয়সা কত উরা তু মারবিই।" কেউ আফসোস করল—

"ধাঃ, নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল র‍্যা!" ভূতো খুড়োই একমাত্র আইনের কথাটা তুলল। থানা পুলিস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে কেউ বলল—"আরি উসব তো পয়সার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ ঘরের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শুরু করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা আর দু' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথা নেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে বসে আছে। ওদিকে হাতুড়ির ঘায়ে তার ইস্পাত ক্রমশ হাঁসুর আকার নিচ্ছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার যাবার দরকার। ছুড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগুলা না খেতি পেয়ি মারা পড়বি?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজান চাচা।

বিলপারে যেখানটায় ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যখন সেখানে গ্যাল তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপাশের সুইজগেটের উপর বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কেমন থমথমে—হাঁ চাঁ নাই একটুও। একটু একটু করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে নিঙা! না নিশ্চিন্তে নয়। ওর মুখের মধ্যে বিরক্তির ছাপ—ভ্রূকুটি। মাটিতে হাঁটুগেড়ে রমজান চাচা আল্লার কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাল—শ্রদ্ধা জানাল এই একগুয়ে—জেদী—চওড়া বুক ছোঁড়াটার জন্যে। যে দুবেলা পেটভরে খেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগুন ছিল কে জানত?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আত্মীয় পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগুলোই একথেকে আট বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। বুঝবে আর কে কতটা? ঐ বড়ছেলে কানু আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে শাপশাপান্ত দিচ্ছে। কাঁদছে গলা ছেড়ে-"ওগু আমর কি হলু গা—আমর কি হবি? মর মর সব মর। আমর মরদকে যারা মারেছিল তাদের নিব্বংশ হবে। আল্লা তুমি

বিচার করু—আল্লা—আমর মরদকে যারা মারিছে তাদের যেন নিব্বংশ হয়—মুখ দিয়ি গলগল করি অক্ত উঠে।" খুকিনি পিসি, অচুখেপী যে যার মত সান্ত্বনাও দিচ্ছে। দুঃখ করছে। কেউ শুনছে। কেউ কিছু বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কুলুপ আঁটা। কিছু একটা করা দরকার।

ফিসফিস গুঞ্জনটা ক্রমশ একটু চাপা উত্তেজনার দিকে মোড় নিতে শুরু করল। কয়েকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষুব্ধ। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল এসে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শুরু করল—

"যখন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি ?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চায়নি পরে দারোগা আবার হাঁকতে যেদিকটায় উত্তেজনা বেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেঁটে শীর্ণকায় লোক বেরিয়ে এল—

—"আমি ছিলম বটে"

বলেই দারোগার সামনে মাথার মাথালিটা ছুড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল এক পলক। শুধাল—

—"তোর নাম কি ?"

—"দীনু বটে।"

—"কোন গায়ে থাকিস ?"

—"ঐ হোথা, উ গায়ে"—বলে পুবের দিকে আঙ্গুল দেখাল।

—"আরে নামটা বলবিতো"—বলে মাটিতে বুটটা ঘষে নিল।

—"শুশুনপুর বটে।"

—"তা তুই দেখেছিলি নিঙাকে কারা মারল ?"

—"কারা কি গু ? পালিদির লেঠিল আবর কারা ? উরা তু ইর আ্যাগেও দু' সাতটা নোকিক কুপাই কাটিছে—যে উদের মুখির উপর লাঠি ঘুরাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে—ভাড়া করা লেঠিল দিয়ি। কিন্তু এবারে নিঙাকি মারাটা......"

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনস্টেবলকে ডাক দিল। ভীড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশান্ত হোল। সবার চোখ একবার দারোগার দিকে একবার দীনুর দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকাল কি সব হয়—বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। একসময় ছিল যখন এরকম খুনগুলো কিছুই ছিল না। আসবার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছু বলতে দারোগা শুধু মাথা নাড়ল।

দারোগা ও দীনুর কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাষ করে আসছে। কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ পালেদের এ জমির প্রতি নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অবশ্য পালেদের পুকুরটা সাইজ করার জন্যে এ জমিটার খুব দরকার। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খুচখাচ চলছিল। নিঙা আবার এমনিতেই একটু একগুঁয়ে, গোঁয়ার। দীনুর কথায়—"উ অলায্য কাজ করতুও না দেখতিও পারতু না।" বলাই মোড়ল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খুলল। "আরে চুপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল,—"যা হয় করুন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। সর্ব তাতে বড় বড় কথা।"

কিন্তু দীনু সব কথাই বলবে। "কেনে বুলবুনা। উ যা বলিছি যা করিছি সব বুলবু।"

"সন্ধ্যের দিকে পালিদির বড় ছেলি লেঠিল নিয়ি এসে জমিতি নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ খবরটা পেতিই লাঠি নিয়ি ছুটি আসে। তখনো পালিদির লেঠিল জমিতি নামিনি। জমিতি বুক সমান পাট। চোখ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হুংকার ছাড়ল—"যে শালা জমিতি নামবি আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লেঠিল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গেলি পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাঙ্গির কোপ বসিয়ি দেয়। উ একা আর কতুখণ লড়বি ?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একটু চঞ্চল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুধুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিন্তু চাপা গুঞ্জনটা এবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা দেখল...... বিপত্তি......। বলাই মোড়ল ও ভূতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাবু আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দারোগা প্রথমে হুংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিভ। "না নিঙা ভাই কি আমরা কারুর হাতি দিবনা। যা করবার আমরাই করবু।" দারোগা বুঝতে পারল আজ আর সুবিধে হবে না। হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছু হয় কিনা ? শুধু বুট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা এবারে জোর গলায় বলে উঠল—"ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিয়ি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আমরা বড়নোকদের লাল-চোখকে ভয় পাবু না। ভাইসব, আজ সব থেকি দুঃখের কথা আমদের মতই মজুর তারা পালিদির কিনা গুলাম হয়ি সামন্য পয়সার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খুন করলু।"

রমজান চাচার কণ্ঠস্বর প্রায় ভেঙে এসেছিল, কান্নায়—ক্ষোভে—দুঃখে, তবুও কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুষলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মতো শেষ বোশেখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে বড় দারোগা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

কবিতা

বসন্ত

অসীম মুখোপাধ্যায়

দিগন্তবৃত্তের মধ্যে ডুবে গেছে সূর্য ও পাখীরা।

অর্ধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছায়ার বিমান
চরাচর শিস্ মাথা স্তব্ধ প্রায় সাঁতালী পর্বত
আহ্নিকের কাল শেষ......তারাদের গগনবিহার ঃ
সপ্তর্ষির দীপ্তি নিয়ে অকাশ ভ্রূকুটি করে, হাসে
বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোয়ারা অখিল ভুবন!

খাবারের ঘণ্টা হলে এইসব রেখে যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ

ইরা সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশুকেই দিই তোমার শৈশব
সোনার বাংলার গন্ধে স্বচ্ছল স্বচ্ছন্দ এক বিস্ময় আরক
লেখাপড়া গানশেখা বাবার সঙ্গে ঘোরা
ডালহৌসী পাহাড়ে পাহাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশুদের হাতে তুলে দিই
এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি
সদর স্ট্রীটের বাড়ী খুললে তারা ফিরে পাবে
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মস্ত খামে পৃথিবীর চিঠি প্রতিদিন
যে অক্ষরে লেখা থাকে শিশুরা তা বোঝে, তুমিও বুঝতে,
সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি, কিন্তু সবাই মানুষ হবে
ছড়ানো জীবন ধারা বহুদূর নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পন্দন আকুল
তোমার বাঁচার রস ছড়িয়েছ শিশুদের শিকড়ে শিকড়ে
যেমন অবুঝ মাকে ওপারের অবু মনে করে
রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গভীরে॥

আগামী সকাল পর্যন্ত

চন্দন কুমার বসু

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কলম
স্থির
নিশ্চুপ...
সম্মুখে প্রস্তুত আগ্নেয়
ত্রস্ত
স্পন্দিত।
ডুবে যাবে মুহূর্ত পরেই
পশ্চিমে
নির্জনে—
তবু লাল, অনেক—অনেক লাল

মাথার আকাশ
আর
দিগন্ত রক্তিম।
নিংড়ে দেবেই রসদ
বাঁচতে
সারাটা রাত......
আগামী সকাল পর্যন্ত।

ব্রাহ্মস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে

কল্যাণ দে

ইপ্সিত ঘাসের ডগায় প্রণয় ছড়িয়ে আছে হৈমন্তিকার ভোরে
দোর খোলেনা কেন স্বজন বকুল?
কাকের চোখের 'পরে স্বপ্ন যে ডিম ভেঙে স্নেহ ছড়ায়
মেঘের জাজিম লেপ এখনো বুকে জড়িয়ে
নিস্পৃহ সন্ন্যাস নিয়ে আত্মমগ্ন মাটির মানুষ......
বুক গুলো চিরে ফেল কলজেয় দেখ গাঁথা আছে
কালের শরীর
নগ্ন হলে নিজেকে বড় সহজেই চেনা যায়—

উর্ণনাভ বিছিয়ে রেখে গার্হস্থ্য মাঠের দাওয়ায়
নষ্ট বটের ছায়ার মত পাশা খেলা
বিধি বহির্ভূত গ্লানিকর
এত সব বাক্য শুধু নিষ্ফলা বীজ—ভেবোনা ঃ
জবান দিয়েছ যা নদীর দলিলে
এখন ব্রাহ্মস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে ঘোমটা খুলে হও
অরণ্যের সরল বর্গীয় উদ্ভিদ!

জনান্তিকে

কেতকী বিশ্বাস

কাস্তের ফলার মত পঞ্চমীর শিশু চাঁদ
থিক থিক করে কাঁপে
ঘুমন্ত আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে,
অনাহূত, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে
অস্পষ্ট তারায়, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে
কেটে ফেলা অশত্থের নরম পাতায়,
এখানে এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
ছোট্ট ফাটলধরা চাতালে
পৌষের শীতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বপ্নের দানবিক যন্ত্রণার কাছে
অতিরিক্ত, তাৎপর্যহীন,
ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই, ঘুমালে—
যন্ত্রণা চাপা পড়ে যায়
এক বুক কুয়াশার নিচে।
পাশের বস্তিতে সেই মেয়েটাও
ঘুমায় না আজ ক'দিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য বেদনায়,
ঘুমাতে পারে না আরো অনেকে
যারা মেয়েটাকে পাহারা দেয়
এবং রাত্রিকেও।

পঞ্চমীর শিশুচাঁদ উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে
টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের
করুণ প্রতিধ্বনি,
অভিজ্ঞ মায়েদের ফিস্‌ফিসে গলায়
সতর্ক প্রহর গোনা
এবং
আরো অনেকের সাথে আমার
ফুসফুসের দ্রুত উঠা নামা।

ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই; ঘুমালে, স্বপ্নের অশ্লীলতায়
স্বপ্নের সত্যটা মরে যায়!
তাই জেগে থাকি—
এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চরম যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিনব বলে।

চন্দ্রিমা

পরিতোষ দত্ত

দেখো চন্দ্রিমা—
চাঁদের তৈরী পাহাড়ের গপ্পো, আমি
শুনেছি অনেক,
দেখেছি কিন্তর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই বুড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে পুরে
কোন ঐ আদ্যিকাল থেকে
শুধু চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষয় সুতো
ধমণীতে অমর পোষ্টার
দেবত্বের উত্তরাধিকার।

চন্দ্রিমা—
তোমার তৈরী পাহাড়ের গপ্পো আমার জানা নেই
শুনেছি বলে মনে পড়ে না
দেখেছি শুধু আমার অন্ধকারে
তবে—ভুল নি কিছুই।
হয়তো বুঝেছিলাম—
তোমার নিঃশ্বাসে উষ্ণতা আছে,
রক্তের ফোঁটাগুলো এখনো দুধের মতো হয়নি
তোমার যৌবন পল্লবিত কুঞ্জ
পুরুষ্ট ন্যাকামির খোলসমুক্ত।
গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ—
আজও আমি জানি না,
ঘ্রাণের তীব্রতা—
জিজ্ঞেস করলে নির্ভুল উত্তর
আজ হয়তো তুমি আর পাবে না।
তবে ফুটপাথে বিছানো ছেঁড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর,
সিক্ত কাঁথার মাদকীয় ঘ্রাণ
কুশলী ছুঁচের নিপুণ টান
চন্দ্রা—
আজও আমি ভুলি নি।
চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন,
কুসুমিত কুঞ্জ—
অনন্ত সমুদ্রে, সময় মন্থনে ভাসিয়ে রাখো।
তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি মুহূর্ত,
মূর্ত হোক চিরবসন্তে।
শাশ্বত তন্ত্রীর ঝংকৃত বন্দনায়
ধরা থাক এক মলিন সত্য॥

আলোচনা

লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন : এক পরম সত্য

ঋতীশ চক্রবর্তী

তরুণ মানসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিল্প জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য মুনাফা লোটাই শুধু নয়, এ'দের কেনা শিল্পী-সাহিত্যিক দিয়ে সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সোচ্চারিত শব্দে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

বাঙ্গালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছু কিছু শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য। তাঁরা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য হন। যে শিল্প মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার পুরো চিত্রটাকে তুলে ধরতে পারে, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যাঁরা, তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন কিভাবে তরুণের প্রাণোচ্ছলতাকে বিকৃত মানসিকতার পরিধির মধ্যে চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের, তাঁরা শেষপর্যন্ত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার। এই জীবন বিকেন্দ্রিক পরি-মণ্ডলেই গড়ে ওঠে 'জীবনের জন্য শিল্প' মনোভাব। তারুণ্যের দীপ্ততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বেশীর ভাগ লিট্‌ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবাহে তরুণ মানস দৃপ্ত হয়ে ওঠে। গুটিকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আত্মবিক্রীত সাহিত্যিককে যদি তাঁরা অনু-করণ করবার চেষ্টা করেন, দুটো কি বড়জোর তিনটে সংখ্যা অনিয়মিতভাবে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উচ্ছ্বাসের ধারার মধ্যে ভাটা আসে কারুর। আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-তাকে ধরে দুই একটা লেখা বাজারী সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেও তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—যখন একটা সুচিন্তিত মানসিকতা নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধ্যম হিসেবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগুলো বেশ কিছুদিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোক্তারা জানেন পথটা সহজ নয়। লড়াই-ই একমাত্র পথ। স্বভাবতঃই দমে যাবার কোন ইঙ্গিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেতু দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তাঁরা আগ্রহী, পত্রিকার জীবনে আরও বেশ কিছু আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেন। আস্তে আস্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছু নতুন মুখ যেমন জোটে, আবার কিছু পুরোন মুখও সরে পড়ে। সঠিক আদর্শ থাকে বলে বন্ধু বা শত্রু চিনতে উদ্যোক্তাদের অসুবিধা হয় না। ফলে আগাছার সৃষ্টিও কম হয় সেখানে।

আর একটা গোষ্ঠী আছে যেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জীবনের অধ্যায় দিয়ে কিছু লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পত্রিকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রবন্ধ, তাঁর প্রকাশিত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। মূলতঃ কিছু ছেলেকে পরিষ্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আত্ম-প্রচার। এ প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাচ্ছে। সম্পাদক যিনি থাকেন, তাঁর মূল লক্ষ্য পত্রিকার মধ্যে কতবার কতকায়দায় তাঁর নামটা ছাপান যেতে পারে। এ ধরণের পত্রিকার আয়ুও খুবই সীমিত।

মোটামুটিভাবে লিট্‌ল ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁরা আমার কথার সঙ্গে আশাকরি একমত হবেন—যে সমস্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিন সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়ে, সে ধরনের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দৃপ্ত। এবং তারা ক্ষণজীবীও নয়।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনায় উজ্জ্বল দলিল এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এখনও এমন সম্পাদক-শিল্পী-সাহিত্যিক

রয়েছেন যাঁরা কোনকিছুর বিনিময়েও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নিজেরা উৎসর্গীকৃত। বস্তুতঃ এ'দের তপস্যার ফসলই জাতির মানস সঞ্চয়ে সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্পাদনা যে শ্রমনিষ্ঠ ভালবাসা এবং সুস্থ মানসিকতা নির্ভর শিল্প, এ'দের লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ যেমন এই পত্রিকায় থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পত্র পত্রিকাগুলি এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের মূল লক্ষ্য সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, মুনাফার পাহাড় বাড়ানো। সঙ্গতকারণেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা চলে। সঠিকভাবেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেঁড়া করে পরীক্ষা করবার সুযোগ থাকে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর পাতায়।

জাতীর সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা শুরু করা দরকার। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অকালমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered পত্রিকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রাজ্যসরকারী বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। একটা পত্রিকায় রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বড়জোর একটা কি দুটো মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিন্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্ছলতা এই সব ম্যাগাজিনের থাকে না। স্বভাবতঃই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম বাবদ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকে একটু অন্যভাবে দেখে। করুণার দৃষ্টিতে তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিনগুলো প্রথমে কিছু টাকা নিজেদের পকেট থেকে প্রেসকে দেন। যদি কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছু দিয়ে প্রেসের পুরো টাকা শোধ করে দেন। যেহেতু ছোট পত্রিকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওয়া হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অনুকম্পার মনোভাব। যেন তারা কৃতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা খরচ করে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাজ করে দিচ্ছেন। যে টাকা কবে পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই, সেই কোম্পানীর যে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা করেন তাকে এ ছাড়াও আবার সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কিছু প্রেসের মালিককে দিতে হয়। সুতরাং প্রিন্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধাক্কা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে আসা যাক। শুধুমাত্র রাজ্যসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করলে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনের স্রোতধারাকে সাবলীল করা সম্ভব নয়। ধরুন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জন্য কোন সম্পাদক গেলেন। সেখানে দেখা যায় যতটা গুরুত্ব এঁকে দিচ্ছেন তার থেকেও বেশী গুরুত্ব পাচ্ছেন কোন বাজারী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত পত্রিকা বা কোনও বন্ধু সম্পাদকের জন্য হয়ত তিনি গেছেন। তাঁদের আদর্শ সেই তথাকথিত আত্মবিক্রীত শিল্পীসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়োজন হয়েছিল কোন এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইস্টার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগীয় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পত্রিকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। ক'দিন পরে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। বললেন, ডি. এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আত্মবিক্রীত শিল্পী সাহিত্যিকদের এমন কিছু পত্রিকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনায় সেই সব শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এইসব সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও গা ভাসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই সুস্থ জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো এর সপক্ষে সৃষ্টির প্রভাত থেকেই দৃপ্ত পদচারণা শুরু করেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই না করতে পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। তাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব পুঁজিপতি গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকার কর্মকর্তাদের। সুস্থ জীবনমুখী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ—বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে পুরস্কৃত করুন। কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা করুন। যাতে এই সব পত্রিকা থেকে ফুল ফুটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসত্য হয়ে উঠবেই।

আরো আরো দাও প্রাণ

সুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদযাত্রা। এই কলকাতারই কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে যারা সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই স্টুডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অসুখ থেকে সুখের পথে চলার আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদযাত্রায় অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বলতে দ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্মম উদাসীনতার সন্ধান পেয়ে, আমরা আজ সত্যিই লজ্জিত। সেইজন্যই বিগত দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা যায়, "সুন্দর স্বাস্থ্যের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শ নাগরিক।" কথাটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ হয়, মনের প্রসারতা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগুণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক এবং ঐ সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গড়ার মূল উৎস, তাদের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই করুণ—ঠিক যেন ডানা ঝাপটানো পাখির মতো, অসুখের তাপ বুকে নিয়েও স্বপ্নোত্থিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেখে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু, আজকের শিশুর এই উৎসাহের জোয়ারে পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সন্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব, বাল্য বা কৈশোরকালে মানুষ তার ক্ষুধার সাথে সঙ্গতি রেখে ঠিক মতো পুষ্টিকর খাদ্য না পেলে অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হয়। অল্পবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তখন অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বরূপ পরিণত বয়সে চরম শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়। যদিও আমরা জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সন্তানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া খুবই দুষ্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশু বা অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ অন্ধকার। সেইজন্যই বড় হওয়ার উৎসাহে মগ্ন শিশুরা একদিন পরিণত বয়সে ব্যর্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট খেতে খেতে বিচ্ছিন্নতার প্রতিভূ হ'য়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উন্নয়নশীল সভ্যতার মাঝে বিন্দুর মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই অসংলগ্ন পরিবেশকে কখনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আমূল অর্থনৈতিক পরি-বর্তনের আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বল্প সামর্থকে পুঁজি করেই তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই নব প্রচেষ্টা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটা সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলগুলিতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছু বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধ'রে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খুব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুলি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসঙ্গটির উপর বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে সরকার থেকে পুষ্টিকর টিফিন বিতরণের ব্যবস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশ্নে ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সুতরাং, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকার ইচ্ছা করলেই হাত দিতে পারেন না। বহু কষ্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা খাটিয়ে এইসমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের সংস্থান করতে হয়। সেইজন্যই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার

ভাতা, বৈধব্যভাতা, বৃদ্ধ কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উন্নত মননশীল চিন্তার পরিচয় রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নয়, ধীরে ধীরে জনচেতনার তাগিদেই এগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্কুলেই বিনাখরচায় ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবস্থাকে চালু ক'রে সরকার সাধারণ মানুষের গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিস্বার্থ-বাদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগী হ'য়ে সরকার এই পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেন।

শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়, বাসস্থান এবং স্কুলের অবস্থান প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীরা রোগে আক্রান্ত হয়। কলকাতা শহরে বিশেষত, বস্তি অঞ্চলে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে একেবারেই আলোবাতাস ঢোকে না, তাছাড়া স্কুলবাড়ীর অবস্থিতিও খুব খারাপ। পাশেই হয়তো কোনো খাটাল বা পচা নর্দমার বিষাক্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সেইমুহূর্তে সমগ্র বস্তি উন্নয়ন সম্ভব না হ'লেও, ঐ স্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি স্বাভাবিক আলো-বাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যাগুলি সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে আরও বেশী করে প্রতিভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্ঘাটনের জন্য আমরা তাই আজ নতুন করে কিছু ভাবারও অবকাশ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রোগ বিনাশের জন্য প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তাকে ধ্বংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগুলি বিভিন্ন পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্টুডেনথ হেলথ হোম বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য রোগ পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাছাড়া ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। তাই রোগের শুরুতেই কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকসন্, অথবা প্রতিরোধক ওষুধপত্র ব্যবহার একান্ত অবশ্যক। স্টুডেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সেইজন্যই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বিশেষ জরুরী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন ক'রে তার মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দু'বার, অন্তত শরীর চেকআপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি মাসে ডাক্তারসহ কোনো ভ্রাম্যমান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ওষুধগুলো বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও স্টুডেনথ হেলথ হোমকে নিতে হবে। এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির এবং অন্যান্য কলেজ বা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একসংগে স্টুডেনথ হেলথ হোমের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এলে এই ব্যাপক সমস্যাকে সমাধান করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

এ-তো গেল শহর অঞ্চলের কথা। গ্রাম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িয়ে আছে। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে দুবেলা পেটভরানোর তাগিদে সারাদিনের পরিশ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাঞ্চল বা কলকাতার বাইরে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-অধ্যুষিত কলোনি-গুলির ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। সুতরাং, বর্তমানে শুধু শহরমুখী চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্টুডেনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাখাকে ঐ-সমস্ত গ্রাম ও কলোনি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে বাজেট থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পারে। তাতেও পুরোপুরি আর্থিক ঘাটতি না মিটলে, স্টুডেনথ হেলথ হোম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সরবরাহের জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতুক পৃষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচারের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগুলি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। সুতরাং, বর্তমানে গ্রাম-শহর-বস্তি-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমস্ত স্কুল, স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই সুযোগটুকুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টুডেনথ হেলথ হোমের বক্তব্য এখন খুবই পরিষ্কারঃ ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সুযোগকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই আজকের বা আগামীদিনের এইসমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভিভাবকের স্থান নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মোচনের খুব সামান্য এই রাস্তাটুকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, ছাত্রছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়; সমগ্র মানুষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অসুখ থেকে সুখের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্টুডেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশ্যজনক ঝিমিয়ে যাওয়া ভাবটিকে কাটিয়ে উঠে আজ যে ভাবে নব-প্রচেষ্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধুবাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বল্প বাতাবরণকে মূলধন করেই ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হবেন। কলকাতার কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে তারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কখনই নষ্ট হ'তে দেবেন না—বরঞ্চ, ঐ শিকড়টিকে স্বপ্নের আরো গভীরে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শক্তির উৎস

গোটা বিশ্বজুড়ে এখন শক্তি সংকট চলছে। সংগে সংগে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস চলেছে শক্তির উৎস সন্ধানে। জিজ্ঞাসু পাঠক মনের কাছে এই কর্মকাণ্ডের কিছু তথ্যাভিত্তিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাবনা। লেখাটি কয়েকটি কিস্তিতে বেরোবে। এই সংখ্যার বিষয় সৌরশক্তি।

—সম্পাদকমণ্ডলী

সৌরশক্তি/সূর্য্য—প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সূর্য্য। সূর্য্য থেকে বেরিয়ে আশা তাপশক্তি ও আলোকশক্তিকে মানুষ যেমন ভয়ও পেয়েছে তেমনি শ্রদ্ধাও জানিয়েছে। আবার সূর্য্য-নির্গত তাপশক্তি ও আলোকশক্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সৌর-শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে মানুষ সভ্যতার সেই আদিযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শুকানোর কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল যেদিন থেকে মানুষ ফসল উৎপাদন করতে শিখেছে। আজও এই কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের কথা বলতে প্রথমেই মনে আশে আর্কিমিডিসের কথা। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দেই যিনি সূর্য্যালোক ব্যবহার করে আগুন জ্বালতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশক্তিকে সমাজ-সভ্যতার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। এ প্রসংগে সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মৌচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সৌরশক্তি ব্যবহার করে একটি পাম্প চালান। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্রাঙ্ক শ্যুমান (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন যার আয়তন ছিল ২৩০০০ বর্গফুট। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর সূর্য্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি ৫৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন। তার চেয়েও উন্নতভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সৌরশক্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্য-কারী বিদ্যুৎশক্তি কিন্তু সরাসরি সূর্য্য থেকে পাওয়া যায় না। তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি অথবা জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য তেমনি কিছু বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা যায়। যেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাখার জন্য সৌরশক্তির ব্যবহার চালু করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশুজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হচ্ছে। লবন উৎপাদনে সৌর-শক্তির ব্যবহার বহুকাল থেকেই চালু আছে। সৌরশক্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল সূর্য্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগৃহীত করা। ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ সৌরশক্তি প্রতিদিন এসে পৌঁছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত এই বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তির সবটুকু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছুটা অন্ততঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগানো যায়।

প্রতিফলক পদ্ধতি ও ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে সৌর-শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পদ্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আয়না অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর সূর্য্যরশ্মি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর সূর্য্যকিরণ পড়লে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এবার সেই তাপ কাজে লাগিয়ে জল গরম করা হয়। জল ফুটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতিরিক্ত চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন ঘোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘুরলে তার সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘুরবে। আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বহু কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎশক্তি। এই হল সংক্ষেপে প্রতিফলক পদ্ধতিতে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কার্য-পদ্ধতি। সৌরশক্তির প্রতিফলকগুলির বৈজ্ঞানিক নাম তাপ সংগ্রাহক বা থার্মাল কালেক্টর। সূর্য্যরশ্মি প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপকে কাজে লাগিয়ে পাশের ট্যাঙ্কের জল গরম করে বাষ্পে পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর বাকী থাকে শুধুমাত্র জেনারেটর সংযুক্তিকরণের কাজ। এবার আসা যাক ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে। ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতি হল সংক্ষেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-পাশি রাখলে তাদের মিলনমূলে যদি অতি-বেগুনী রশ্মি পড়ে তাহলে তড়িৎ-চালক বল সৃষ্টি হয়। সূর্য্য রশ্মিতে অতি-বেগুনী রশ্মি আছে। এখন এমন একটি ব্যবস্থা করা হল যার

মধ্যে দুটো বিসদৃশ পদার্থ পাশাপাশি সংযুক্ত আছে এবং যার মিলনস্থলে সূর্য্যরশ্মি পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িৎ-চালক বল পাব। আর তড়িৎ-চালক বল হল বিদ্যুৎশক্তির আঠাল। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। আর এই ব্যবস্থাটির নাম হল ফোটো-ভোল্টাইক সেল। এর সুবিধা হল যে এর সমস্ত অংশগুলি স্থায়ী (কোনপ্রকার নড়াচড়া করে না), আলাদা কোন শক্তি ব্যবহার করে একে উজ্জীবিত করতে হয় না। সর্বোপরি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ভীষণ কম। ফোটোভোল্টাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চালু হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সোলার সেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সামুদ্রিক বয়া, লাইট হাউস, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মাইক্রোওয়েভ রিলে স্টেশন, বন প্রভৃতি কার্যে সোলার সেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

সৌরশক্তির ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয়ে গেছে। জাপানে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সৌরশক্তি পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে এখন গবেষণ চলছে। আশা করা যায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এটি চালু হবে। ফ্রান্সের ওডেলিওতে একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমেরিকার নিও মেক্সিকোয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা সবদেশেই চলছে।

ভারতবর্ষেও সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়নি।

পরিশেষে একথা নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সৌরশক্তি আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অনুকূলে কাজ করবে।

(ক্রমশঃ)



বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে কত্থক নৃত্যরত শিশুশিল্পী।



ব্লক যুব উৎসবে বালিকাদের কবাডি প্রতিযোগিতা

দিলীপ ভট্টাচার্যের তুলিতে—



এসো মুক্ত কর..

দু'টি মেলা তিনটি উৎসব

কলকাতা বইমেলা

কলকাতা ময়দানে গত ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের উদ্যোগে পঞ্চম বইমেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম যখন এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়, তখন থেকেই কলকাতার গ্রন্থ-প্রেমিক মানুষ এই মেলার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব ক'রেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমাত্র যদিচ্ছ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই প্রথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই সূত্রেই কলকাতা বইমেলা প্রথম আবির্ভাবেই বই-প্রেমিকদের হৃদয় জিতে নেয়। বইমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভ্যাস তৈরী করা। বস্তুত, আমাদের যখন সত্যই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তেল-নুনের হিসেব ক'রে ফের বই কেনাটা সত্যিই একধরণের বিলাসিতা হ'য়ে পড়ে। তাই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মানুষের কাছে এই বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত। সে কারণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকেরা স্বভাবতই ঈষৎ বিষন্ন ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা যে ওই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি, সেজন্য রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা সাজিয়ে ব'সেছিলেন। ক'দিনের জন্য সারা কলেজস্ট্রীট পাড়াটাই যেন উঠে এসেছিল এই ময়দানে। শুধু আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানই নয়, কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাবৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের বিস্তৃত তালিকা থেকে প্রত্যেকেই নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগুলি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নিজস্ব স্টল। একমাত্র এঁরাই দোকানদারীর শ্বাসরুদ্ধতার মধ্যে অনেকটা খোলাবাতাস খেলতে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলায় মিনি বই প্রকাশনার একটি অদ্ভুত প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধুসূদন, সুকুমার রায় গরম কেকের মত বিকিয়েছে। আশ্চর্য এরই পাশাপাশি সাঁইবাবা প্রকাশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্টলেও মন্দ ভিড় ছিল না।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লোক সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, অংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ নয়ন-সুখকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভঙ্গুর। কেননা, এতে কিছু মুষ্টিমেয় বই-ব্যবসায়ীর আখেরে কিছু লাভ হ'য়ে থাকলেও, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মানুষের কাছে এটা তেমন কোন আহামরি সার্থকতা আনে না। এই মেলার যতটুকু সাফল্য তা আসলে নির্ভরশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শুধু দোকান সাজিয়ে বসা ছাড়া আর তেমন কোন উজ্জ্বল উদ্যোগ নেই, যা গ্রন্থ পিপাসুদের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাঙ্গণে টেনে আনতে পারে। আসলে এঁরা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি অপার ভালোবাসায় এবং কৌতূহলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মণ্ডপগুলিতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না আছে পুস্তক তালিকা সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোখে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন সুশৃঙ্খল সুষমা, না আছে তেমন কোন দুর্লভ গ্রন্থের সমারোহ এবং সর্বোপরি নেই সুলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আবশ্যিক উদ্যোগ।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের কাছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের ব্যাপার তা হ'ল, এখানকার ডিস্‌কাউন্টের কৃপণতা। কলেজ-স্ট্রীট পাড়ায় পাবলিসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজী বইয়ে ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদূরে থেকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে ধুলো-খেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার! অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তা হ'ল বই বাজার। ছাই ঘেঁটে সেখানে হঠাৎই পেয়ে যাওয়া যেত অনেক দুর্লভ বই। কিন্তু কোন দুরূহ কারণে এবার ক্রেতারা বই বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লেন, বোঝা গেল না।

বস্তুত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছু শহুরে বাবুর ইন্টেলেক্‌চুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খুব-বেশি গুরুত্ব নেই।

শিল্পমেলা

শিল্পকলাকে জনমুখী করার জন্য, শিল্পী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়, শিল্পকলা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে

মার্চ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পমেলার আয়োজন হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিংকর, গোপাল ঘোষ প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীদের শিল্পসম্ভারের পাশাপাশি অনেক তরুণ শক্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া ছিল কিছু প্রখ্যাত বিদেশী শিল্পীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশাপাশি মুক্তমঞ্চে প্রতিদিন শিল্প সমালোচকদের বিদগ্ধ আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সম্বর্ধিত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অসুস্থতার কারণে তা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

চলচ্চিত্র উৎসব '৮০

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'য়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। একসাথে এতগুলো সৎ ছবি দেখার সুযোগ ক'রে দিয়ে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শুভ সংকেত রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরমুলা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আমাদের স্মৃতিতে রয়ে যাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে তোলা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে শুরু করে ১৯৮০-এর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশব অবস্থা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্শ করে। ছবিগুলির নির্বাচনেও ছিল একরূপ দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা—শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগুলি নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, যা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেয়ে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগুলি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। তবে এই ব্যাপারে একটু অভিযোগ থেকেই যায়—বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনেকগুলি চিত্ররূপ উৎসবে প্রদর্শিত হ'লেও শরৎচন্দ্রের কোন ছবি উৎসবে দেখা গেল না। অথচ একসময়, এবং হয়তো আজো, শরৎচন্দ্রের গল্পের জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বক্স-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরৎচন্দ্রকে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই।

'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি উৎসবে দেখানো হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী' যতবার দেখা যায় ততো যেন আয়ু বাড়ে, পুণ্যি হয়। সত্যজিতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গুটিকয়েক ছাব নির্বাচন করা খুব দুরূহ ব্যাপার হ'লেও তাঁর 'দেবী', 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ', 'জলসাঘর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'কে উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। কেননা, এগুলি সাম্প্রতিককালে বহুবার প্রদর্শিত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজন্মের দর্শকেরা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার' ইত্যাদি ছবিগুলো এই উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়ক হ'য়েছিল। তাছাড়া পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' বারীণ সাহার 'তের নদীর পারে', নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দিবারাত্রির কাব্য', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন সূর্য', শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়', মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দত্তের 'ঝড়' একটি সেলুলয়েডের যাত্রা হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। দারিদ্র্যের এই রকম ডকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির অভিনায়িক দৃঢ়তা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' রাজনৈতিক ভ্রষ্টতার একটি সাহসিক দলিল হিসেবে স্মরণীয়।

বাংলাছবি ছাড়া ২০টি মারাঠি, মালয়ালম, কানাড়ী, তামিল, উর্দু, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগুলিও দর্শক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়িয়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগুলি অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বত্থমা', 'আমপু', 'চিতেগু চিন্তি', 'গহণ', 'সর্বপ্রাথা মা ভূমি', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষর মাইলস্টোন হ'য়ে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য বিষয়। ছবির মূল দু'টি চরিত্র যমুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃদ্বয় অভিনয় নৈপুণ্যে বুকের মধ্যে তীব্র মোচড় দিয়ে যায়। এই যমুনা নামে যুবতীটি এবং মানী নামে চালকটিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপু, দুর্গাকে মনে পড়ে যায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিঘর' (কাহিনী বুদ্ধদেব গুহ) স্বচ্ছ কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও যে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা স্পষ্ট হয় সৈয়দ মির্জার দু'টি ছবি 'অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শন' এবং 'আলবার্ট পিন্টো ক গোস্যা কিউ আয়া' বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কন্দুর', বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগুলি দেখে। 'অ্যালবার্ট

পিল্টো'র শেষদৃশ্যে পর্দায় মশালের, রক্ত পতাকার লাল আগুন লাগা একটি স্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি। 'শোধ' ছবিটি এবছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য পুরস্কৃত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটোগ্রাফিক অসাধারণতা এবং বক্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খুব অনিবার্যভাবে ছুঁয়ে যায়। বেনেগালের 'কন্দুরা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিথোলজিকাল আখ্যান অবলম্বনে সত্তর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অনুভব করা গেল না।

উৎসবে কাহিনী চিত্রগুলি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিস্ট্রি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথ্যচিত্রগুলিও যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোতদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপাদ্য ব্যাপার। এর কয়েকটি দৃশ্যে যথাক্রমে জোতদারের ধান লুঠ করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগুন লাগানো এক নয়া দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পঙ্গু যুবক ডোমনের ক্লান্ত, উদ্দীপ্ত চোখ স্মরণীয় শিল্পকাজ। ছবিটি এই মুহূর্তে কলকাতার ঠান্ডা প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুক্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র ছাড়াও যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে সৎ চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব এবং তা যে যথেষ্ট দর্শক আনুকূল্যও পেতে পারে এই উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাত্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে প্রেক্ষাগৃহে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু যে আর্ট ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শুধুমাত্র একটি মিনার হ'য়েই থাকবে না, সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে তা হবে একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

গণনাট্য উৎসব

বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞাত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গণনাট্য উৎসব প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ্ হোমের সাহায্যার্থে উৎসবটি সংগঠিত হয়।

কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্প-সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর শম্ভু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'কল অফ দ্য ড্রামস' প্রতীক নৃত্যানুষ্ঠান শ্রোতাদের আনন্দিত করে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগীত। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেক্ষা ৩০/৪০ দশকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। সলিল চৌধুরীর গান এখনো শ্রোতাদের সঞ্চারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল। এবং একক সঙ্গীতে সুচিত্রা মিত্রের তুলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবান্ন, নীলদর্পণ এবং কিমলিসের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় তৎকালীন নাট্য আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তৎকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিল্পীরা আজ যে নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

পঁচিশে বৈশাখ

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাখের পবিত্র সকালে বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'য়েছিলেন রবীন্দ্রসদন এবং জোড়াসাঁকোর মুক্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাখের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধ'রে বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা যেন এই কথায় প্রমাণ করে যে, ২৫শে বৈশাখ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই জন্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জন্মদিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির পাশাপাশি দুর্বিনীত চ্যালেঞ্জের মত, এইসব লিটল্ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, এ-কথা কে-না জানে যে, এইসব পত্র-পত্রিকাগুলিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি যার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের ন্যুব্জ মেরুদন্ডকে, ক্ষয়া-খর্বুটে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে পক্ষকাল ব্যাপী ফুলে, গানে, পদ্যে, পুরোহিতে রবীন্দ্র পুজোর তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মানুষের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাখের প্রখর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায়

মস্কো অলিম্পিক : সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক অশোক

বিশ্বের সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ থেকে ছ' বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার সরকারগুলি এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধুলাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রথম থেকেই সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে মস্কোর অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বানচাল করা যায়। কথায় আছে দুর্জনের সুযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনাকে তারা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে প্রচারে নেমে গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। আজ যখন দুনিয়ার সর্বত্র ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তখনই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার এই নেতারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মস্কো অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা—এই প্রশ্ন আজ ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা নিশ্চয়ই করতে পারেন।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রথমেই যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদদের বিস্ময়কর সাফল্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সাফল্যকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই বরদাস্ত করতে পারে না। পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের ধাপ্পা দেবার জন্য প্রচার করে যে খেলাধুলায় রাজনীতির কোনও স্থান নেই, খেলাধুলার জন্যই খেলাধুলা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাকেও নিছক মুনাফা সৃষ্টিকারী একটি পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় খেলাধুলা শাসকশ্রেণী ও শোষকশ্রেণীর রাজনীতির উর্ধ্বে কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ পুঁজিবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব দেশে অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাও পরিচালিত হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবকিছু করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক মালিকানায় চালানো হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য গঠনের সংগে সংগে শৃংখলা সৃষ্টির জন্য শিশু থেকে শুরু করে সকলের জন্য খেলাধুলার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাধুলারও নিয়ন্ত্রণ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে খেলাধুলাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না। এখানে প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্যান্য কাজের মত খেলাধুলাও অবশ্য করণীয় একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে খেলাধুলার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ার সকল ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুনিয়ায় যেমন

বিশেষ স্থান দখল করেছে তেমনই খেলাধূলার জগতেও নিজেদের শক্তির জোরেই বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কর্ণধারেরা অলিম্পিক আসর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরে রাখার চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না। ১৯৫২ সালে অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বাস্থ্যচর্চার আশ্চর্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুবশক্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাধূলার অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদেরা একের পর এক বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সকলের সামনে আদর্শবোধের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন থেকে শুরু করে ছোট দেশ কিউবা, উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়াবিদেরা খেলাধূলার আসরেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা ও খেলাধূলার ব্যবসায়ীরা এ জিনিষ কি করে সহ্য করবে? খুব স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এদের ক্ষিপ্ত করছে।

অলিম্পিক অনুষ্ঠান: সোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দৃষ্টিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। অলিম্পিক কোনও মামুলী অনুষ্ঠান নয়। বিশ্ব মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়াবিদ্, ক্রীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মস্কোতে সমবেত হবেন। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পরস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাড়ে তিন বছর প্রস্তুতিপর্বে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখতে মস্কো গেছেন। তারা সকলেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখার জন্য কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

মন্ট্রিল বা মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যত খরচ হয়েছিল তার মধ্যে একটি বড় অংশ হয়েছে নতুন করে স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি তৈরী করার জন্য। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধূলার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল বলে ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতুন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে মন্ট্রিল ও মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মস্কো অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মস্কোতে। লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও মিনস্ক এই তিনটি শহরে ফুটবলের তিনটি গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলাগুলি হবে মস্কোতে। পাল তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীরবর্তী শহর তাল্লিনে। এতগুলি জায়গা জুড়ে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্রীড়াবিদ্, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, কোনও বিদেশী পর্যটকের যাতে এতটুকু সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খুঁটিনাটি সব দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে প্রচুর কর্মী প্রয়োজন। দেড় লক্ষ কর্মীর নাম ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে যারা কাজ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থক্য যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য বিমানসেবিকা, বিমানবন্দরের কর্মী মিনিশিয়া, পর্যটন বিভাগ, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ট্রাঙ্ক টেলিফোন ও টেলেক্স বিভাগের কর্মী, গাড়ীর চালক, হোটেলের কর্মী, দোকানের কর্মী এবং খেলাধূলার সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধুম পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কেবলমাত্র মস্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অলিম্পিক ভিলেজ। মস্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হয়েছে একটি হাসপাতাল। নতুন করে তৈরী এই বাড়ীগুলি অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অলিম্পিকে যে প্রেসবক্সের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে একসঙ্গে ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির বেশী টেবিলে টেলিভিসন ও টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকবে। অলিম্পিক ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এক বিশাল প্রমোদ কর্মসূচীও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে বিদেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান, ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাৎকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Preparatoins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view, you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two qualities that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (অলিম্পিয়ান-৮০ অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নবম সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নততর পরিবেশের মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে। অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি দেশের সরকার কিভাবে দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার করতে পারে। অলিম্পিকের আসর যে যুদ্ধবিরোধী শান্তির মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মস্কো অলিম্পিকে। বিশ্ব শান্তির পয়লা নম্বরের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিষ কিভাবে বরদাস্ত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক বন্ধ করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রোশের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ: মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতন্ত্রের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় অলিম্পিক কমিটিগুলি রাজনৈতিক বা ব্যবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সময়ে সুবিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মানীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুষ্ঠানকে বর্জন করার কথা চিন্তা করেনি। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে ও বর্ণবিদ্বেষীদের অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাষ্ট্র যখন মন্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জন্য আহ্বান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের নির্যাতিত অবস্থার প্রতি বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিগ্রো ক্রীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিকে রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিন্তু আজ যখন মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পরাজয় এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সর্ববিষয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতির পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিপ্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে।

মস্কো অলিম্পিক বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আসরে নেমেছেন স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানোর সময় কার্টার জানতেন যে একাজ খুব সহজ নয়। তাই তিনি নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। মস্কো থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন যদি আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মস্কো অলিম্পিক বর্জনের পক্ষে মত সৃষ্টির জন্য কার্টার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচটি দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মস্কো অলিম্পিকে অংশগ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য এই সব নেতার আহ্বানে ক্রীড়াবিদরা সাড়া দিচ্ছেন কি? এই আহ্বান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে?

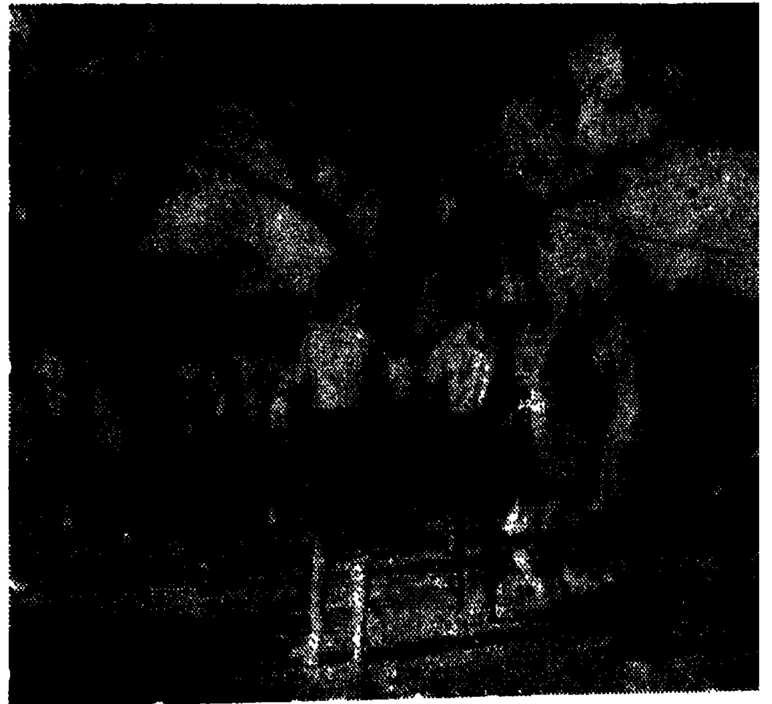
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা কি ভাবছেন?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পরিষ্কার ঘোষণা করেছে যে, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পূর্ব সিদ্ধান্ত মত এই অনুষ্ঠান মস্কোতেই হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিল্লানিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে আইনগত ও নীতিগত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্রহণ করেছিল সেই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিকভাবেই লঙ্ঘন করা যায় না। এছাড়াও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খেলাধূলাকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ত' দূরের কথা বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন ক্রীড়াবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিম্পিকের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। বেশ কয়েক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীড়াবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীড়াবিদ যর জিওর্দারি ক্কোভের সঙ্গে বলেছেন, "১৯৮০ সালে অলিম্পিককে সামনে রেখে আমি দশ বছর ধরে অনুশীলন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি ক্রীড়াবিদদের মত মত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মত দেবেন।" ১৯৩৬ সালে অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদকজয়ী অ্যাথেলেটিকসের কিংবদন্তী পুরুষ প্রয়াত জেমি ওয়েনল রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহ্বানকে গর্হিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। গত বছর যে ক্রীড়াবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বৃটেনের সেই ক্রীড়াবিদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের মূল্য আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মস্কোতে যাবই।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে বৃটেনের প্রতিযোগী ক্রীড়াবিদরা বলেছেন যে সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মস্কো অলিম্পিকে যোগদান বন্ধ করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দূত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অনুকূলে যায় নি। মহম্মদ আলি বলেছেন, "মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতি কার্টার অন্যায় করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী সরকার সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই ওয়াশিংটন সরকারের বিরোধী। যদি আমি আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগে জানতাম তাহলে আমি রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আফ্রিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসতাম না।"

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার তাবড় নেতারা মস্কো অলিম্পিক বর্জনের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা নৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যন্ত যদি কয়েকটি দেশ মস্কো অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। অলিম্পিককে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাস্ত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবেন। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর শুভেচ্ছা নিয়েই মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে--এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত সুশৃংখল জনগণের সহযোগিতা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।



কালনা ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভলিবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

বইপত্র

নাগপাশ। সাধন চট্টোপাধ্যায়

ক্রান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প 'নাগপাশ,' দ্বিতীয় 'খোলস', তৃতীয় 'তিনপুরুষ' এবং চতুর্থ 'জ্বালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চব্বিশ পরগণার এক ছোট্ট গ্রামের যাত্রা উৎসব নিয়ে শুরু হয়েছে। এই যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূল চরিত্রগুলির সাথে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রগুলির সনাতন রহস্য উদ্ঘাটন লেখকের উপজীব্য নয়—সমাজ পারিপার্শ্বিকতায় তারা ফুটে উঠেছে। পালা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দূর-দূরান্ত হ'তে মানুষের মিছিল এগিয়ে আসে। এই মিছিলের খোশগল্পের মধ্যদিয়ে আদিবাসী, মাঝি, মালো, চাষী এই সব শ্রমজীবী মানুষের টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে দেশকাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই আশংকা ধান কাটার মরশুমে বেশ কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং এই ক'টি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যে দ্বন্দ্ব তার পূর্বাভাস স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই আসরেই আমাদের পরিচয়ঘটে পুণ্ড্র সমাজের গরীব চাষীর ছেলে 'কালপাথরে খোদাই দেহ' নকুলের সাথে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই বাদায় বসতি পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল অন্যতম। আর এই বাদার অধিকারের প্রশ্নে লেখক তাই সেই ঐতিহাসিক সূত্রটাকে ছুঁয়ে গেছেন। 'এযেন অর্জিত অধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত্র-গুলি হোল যদুপতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরো-মণি মন্মথ শিকদার।

কাহিনীর মধ্যে মন্মথ শিকদার এবং নকুল ও সবহারানো মানুষের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। মন্মথ শিকদারের অবাধ শোষণের সামান্য একটু বাধা নকুল। সে বাধাকে যখন মিষ্টি কথায় সরানো গেলোনা তখন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধু এক ফরেস্ট অফিসারের মাধ্যমে। নকুল এবং এই গরীব মানুষদের যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগ চূড়ান্ত রূপ নিল। কিন্তু মন্মথ শিকদার তাদের বশে আনতে পারলনা। শেষ করতে পারলনা। মানুষের প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। এবার মন্মথ শিকদারের কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। বুর্জোয়া নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করল। মানুষকে ছলচাতুরী দিয়ে সে বশ করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী দিল। তাকে বিচ্ছিন্ন করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ছাঁটাই করল। কাহিনীর নায়ক নকুল বাইরের জগতে ফিরে দেখল তার পায়ের নিচে মাটি নেই। সে বিধ্বস্ত—চূড়ান্ত ট্রাজেডির নায়কের মত আত্মযন্ত্রণার হাহাকারে অসহায়। গজেন, চাঁপা নেই যে তাকে সান্ত্বনা দেয়। পদ্ম তাকে ভালবাসত সেও আজ তার কাছ থেকে বহুদূরে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিঙি খুলেদেয়। দক্ষিণে অথৈ সমুদ্র। মাঝনদীতে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় পদ্ম, গজেন, চাঁপার সঙ্গে। নকুলের মনেহয় এই বৈঠার টানেই সে সমুদ্রে চলে যেতে পারে। 'সশব্দে তার বৈঠার জল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল।'

এই গল্পটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সমাজ ও জনজীবনের সাথে নিবিড় সংযোগ এইসব কারণে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে মূল্য পাবে। কিন্তু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগুলির ভিতর এবং বাইরের জগৎকে বিশ্লেষণ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গল্প হলে এ আলোচনা আসত না কিন্তু লেখক যেখানে বড় গল্পের পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশ্লেষিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হয়ে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে সবদিক দিয়ে ছোট গল্প। 'খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক পরি-বারমুখী সতীশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। গল্পটির পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না ভেবেও কে যেন ভিতর থেকে চিৎকার করে ডাকল সুধাবাবু? ও সুধাবাবু"। সুধাবাবু নামের মানুষ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারেনি কারণ এদের সাথে মিশলে অনের কাছ হতে সে আঘাত আসার ভয় করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিষয় অদ্ভুত কিছু শব্দের ব্যবহার—'আঠা আঠা চোখের সামনে', 'চোরা টাক', 'ল্যাম্পপোস্টটা অভাবী রঙয়ের চোখের তারার মত মিট্‌মিট করছে', 'সুখের খুদ' ইত্যাদি। এই ছোট গল্পটির মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভাবে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

'তিন পুরুষ' গল্পটির মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। যুগ পাল্টাচ্ছে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাচ্ছে এবং শোষণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে কিন্তু শোষণ ব্যবস্থা যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে তা রসো-ত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন।

'জ্বালা' কারখানার এক শ্রমিক কেষ্টনের দুঃখ এবং রাগ এবং এসবকিছুর মধ্যদিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের যে জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে অনেক উত্তোরণ ঘটেছে তা আগের গল্পগুলি (যেগুলি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষ-দিকে লিখেছেন) হতে স্পষ্ট হয়।

—রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় সংবাদ

সারা রাজ্যজুড়ে আমাদের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে যুব উৎসব কোথাও চলছে, আবার কোথাও শেষ হয়েছে। এপর্যন্ত আমাদের দপ্তরে যে সমস্ত সংবাদ পৌঁছেছে তাই দিয়েই এবারের বিভাগীয় সংবাদ।

বীরভূম জেলা:

রাজনগর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে এবং রাজনগর ব্লক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনায় ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিন-দিন ব্যাপী যুব উৎসব চলেছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২৫ জন শিশুসহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় ছ'টি দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য 'লোকনৃত্যে'-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাকা উত্তোলন এবং শিশুদের মার্চপাস্টের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সম্মিলিত রিলে রেস, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিদ্যা-লয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের জন্য ছিল কবাডি, খো-খো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। দ্বিতীয় গার্গী গোষ্ঠীর 'সূচীপত্র'। কবাডি ও খো-খো প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

বোলপুর ব্লক যুব-করণ—গত ১৫ই-১৭ই মার্চ বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মার্চ সকালে উদ্বোধনী মিছিল শুরু হয় উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে। মিছিলে অংশ নেয় গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ, যুব-ছাত্র, মহিলা, আদি-বাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরদীস রায় এম. পি. ও জ্যোৎস্না গুপ্ত এম. এল. এ.। খেলাধুলায় বালক বালিকাদের দৌড়, হাই-জাম্প, লং-জাম্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওতালদের তীর ধনুক ছোঁড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দলের মধ্যে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কবিতাগুলি ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে', নজরুলের 'কুলিমজুর' এবং সুকান্তের 'চিল'। কবিগান ও ম্যাজিকের আসরও বসে। উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপুর) 'মুচীক মঙ্গল কাব্য' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত পরি-বেশিত 'রায়বেশে' একটি সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন চাঁদের বজ্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মানুষ' যাত্রানুষ্ঠান দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া উচিত। প্রতিযোগীরা এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হুল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেখ-যোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

তিনদিনে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ এই উৎসব উপভোগ করে।

নানুর ব্লক যুব-করণ—নানুর ব্লকে তিনদিন পৃথকভাবে তিন জায়গায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খুজুটি পাড়া চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকালে শুরু হয় হা-ডু-ডু ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্রও দেখান হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় পাপুড়ি ইউনিট কর্তৃক 'রায়বেশে' এবং কির্ণাহার সুরঙ্গমা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নানুর ইউকো ব্যাঙ্ক মাঠে সকালের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতালী সংগীত, চণ্ডীদাস পদাবলী পরিবেশিত হয়। তারপর শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দুপুরের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং ভাদুগান প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চণ্ডীপুর নবনাট্য আলোড়ন গ্রুপের যাত্রাভিনয় 'সবুজের অভিযান' দিয়ে।

পুরস্কার বিতরণ করেন নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সভা-পতি জিতেন মিত্র।

লাভপুর ব্লক যুব-করণ—গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ তিন-দিন ধরে যুব উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন পুলিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় ব্লক ও যুবসংগঠনের অনেক যুবক-যুবতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচীতে ছিল—আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষয় ছিল

—'আমূল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সকলের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

চব্বিশপরগনা জেলা :

সোনারপুর ব্লক যুব-করণ—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোনারপুর ব্লক যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল। গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদমারীর মাঠে খো খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ফুটবল, রাজপুর ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোনারপুরে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বোসপুকুর ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন চৌধুরী এম. পি., সত্যসাধন চক্রবর্তী এম. পি. এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দক্ষিণ চব্বিশপরগনার যুব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—কাকদ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাঙ্গণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিধান সভার সদস্য হৃষিকেশ মাইতি।

বর্ধমান জেলা :

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় এবং যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চ। উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য গুরুপ্রসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ পুরস্কার বিতরণ করেন। উৎসবের ৪ দিন ব্লকের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামন্দির আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপুর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপুর ব্লক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এতে মোট ২৭ জন যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবন-শিল্পের উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আশা করা যায় এ থেকে এ'রা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব প্রতি বৎসরের মত এবারও প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত লোকনৃত্য ও ক্রিসেন ক্লাবের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস-টিক, জুডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া নৃত্যনাট্যটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে।

নদীয়া জেলা :

চাকদহ ব্লক যুব-করণ—গত ২১ থেকে ২৩শে মার্চ চাকদহ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অন্যান্য বক্তারা যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া ব্লক যুব-করণ—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসবের আসর বসে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন







নদীয়া জেলায় চাপড়া ব্লক যুব উৎসবে কবাডি প্রতিযোগিতা।

করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা ও হস্তশিল্পের উপর অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নানান বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। যুবমেলার উদ্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাবুদ্দীন মণ্ডল। সদর মহকুমা শাসক সুবল মার্ণ্ডি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

নাকাশীপাড়া ব্লক যুব-করণ—গত ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির সহযোগিতায় বেথুয়াডহরী জে. সি. বিদ্যালয় ময়দানে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিনের ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি প্রতিযোগিতা, মহিলা খো-খো প্রদর্শনী, লাঠিখেলা, ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, ব্যায়াম ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি, কথন, কৌতুকাভিনয় ও আল্পনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। এরপরও ছিল দলগত লোকগীতি, সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়সূচী ছিল "আমূল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।" এবং আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল—"গণতন্ত্রের সুরক্ষায় ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভূমিকা।"

এই যুব উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

কাকসা ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী যুবকদের তীর ছোঁড়া ও যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিপুর ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫০০ জন প্রতিযোগী সেমিনার, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ব্রতচারী ও লোকনৃত্য, স্বরচিত গল্প ও কবিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম. এল. এ. বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়'এর সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতিযোগীদের মানপত্র ও পুরস্কার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

কৃষ্ণনগর ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় যে যুব উৎসব (২৩-২৫শে মার্চ) অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচ্চিত্র দেখান হয় এবং দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৪৪২ ও ৩৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার সভাধিপতি পরিমল বাগচী ও সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ সুরেশ চন্দ্র সরকার।

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—এই ব্লকের যুব উৎসব উদ্বোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যদ্বয় সুকুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্য বিমল চৌধুরী ও পঞ্চায়েত সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নেন। সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী যোগ দেয়। এরপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

নবদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বসুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দুটি উপসমিতি গঠন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল চিত্রাঙ্কণ, হস্তশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল, বিতর্ক, সঙ্গীত, নৃত্য, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি ও খো-খো। এই দুটি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন। পুরস্কার বিতরণী সভায় বসন্ত কুমার পাল, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও দীপঙ্কর সাহা, বি. ডি. ও. যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা:

বহরমপুর ব্লক যুব-করণ—এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২য় ভাগে ছিল গ্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল



বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী।

বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, বাউল সংগীত, বসে আঁকো, যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক যুব-করণ—এই যুব করণের পরিচালনায় ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দুটি ভাগ ছিল। অ্যাথলেটিকস্ ও খো-খো প্রতিযোগিতায় ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-



মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুব উৎসবে একাঙ্ক নাটক প্রাতযোগিতায় 'অশান্ত বিবর' নাটকে একটি দৃশ্য।

বালিকা অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, তবলা বাদ্য ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৮৮ জন তরুণ-তরুণী এতে অংশ নেয়।

মালদহ জেলাঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক যুব-করণ—হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের ময়দানে গত ২৩শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, তাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা ও ক্লাবগুলিরও ছিল কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উক্ত মেলায় ২৩শে মার্চ কৃষি দিবস, ২৪শে মার্চ পরিবার কল্যাণ দিবস, ২৫শে মার্চ শিল্প দিবস, ২৬শে মার্চ পঞ্চায়েত দিবস এবং ২৭শে মার্চ ছাত্র-যুব দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন চৌধুরী মহাশয়। মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী প্রত্যহ বেলা ২টা হতে খোলা থাকত এবং প্রত্যহ দিবস অনুযায়ী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য উক্ত ব্লকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকায় কলিকাতার গণনাট্য সংঘ কর্তৃক গণসংগীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বেতার শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী কর্তৃক পল্লীসংগীত, ২৬শে মার্চ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া গীতিনাট্য পরি-বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টায় ক্লাবের পতাকাসহ শোভাযাত্রাসহকারে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয় ক্লাবের সদস্যরা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আন্তঃ ক্লাব ভলিবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটি হয় ভিঙ্গল সবুজ সংঘ বনাম হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ভিঙ্গল সবুজ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে ছাত্র-যুবকের সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতীর সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভলিবল প্রতিযোগিতার পর কৃষি, শিল্প ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীল্ড ও খেলোয়াড়দের গেঞ্জি দেওয়া হয়। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। পুরস্কার বিতরণীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার পুরুষ ও মহিলা মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মঙ্গলবাড়ী পি. ডাব্লু. ডি. অফিসের সম্মুখস্থ ময়দানে গত ২২শে মার্চ হতে ২৪শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রীদিব্যেন্দু মুখার্জী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পুরাতন মালদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুঃ মালদা ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ও সংঘের সদস্য-সদস্যারা নিজ নিজ সংস্থার পতাকা নিয়ে

অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান, গম্ভীরা, দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী ও কোরাসের সংগীতাভিনয় "সাম্যের গান" আয়োজন করা হয়েছিল। যুব উৎসবের ১ম দিন প্রায় ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু নাটক "সাত বন্ধু খুকুমণি" (পরিচালনায় মালদা ড্রামা-লীগ) সংগীত, নৃত্য, নাটক ও মূকাভিনয়ের (পরিবেশনায় পঃ কালচারাল ইউনিট) আয়োজন করা হয়। ২য় দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের তৃতীয় দিন পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পুঃ মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহর্তা মহাশয়, শ্রী আর. কে. প্রসন্ন। এবং তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণীর পর গম্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দো-কড়ি চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত (পরিবেশনায় গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি নাটক (পরিবেশনায় কিশোর ভারতী পরিষদ, মঙ্গলবাড়ী) আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন।

কোচবিহার জেলা :

কোচবিহার ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাবুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ৫ই থেকে ৭ই এপ্রিল '৮০ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে কোচবিহার ১নং ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহোদয়। সবুজের দলের ছোট ছোট শিশুমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানায়। ৫ই এপ্রিল যুব-ছাত্র দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার ও শ্রীঅমিতোষ দত্ত রায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আলোচনা চক্র বন্ধ রাখা হয়।

৬ই এপ্রিল শ্রমিক কৃষক মৈত্রী দিবসে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীপ্রদীপ নাথ, শ্রীসুনীল-কুমার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত।

৭ই এপ্রিল জাতীয় সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসবে প্রত্যহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সংস্থা কর্তৃক নাট্যা-নুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে যেমন যুব-ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আবার শ্রমিক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং ব্লকের ১৪ জন তরুণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রথম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা, ডাওয়া-গুড়ি শাখা, ত্রিফুলরায় ও সম্প্রদায় ও পিন্টু দত্তের গিটার খুব আকর্ষণীয় ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্য দর্শকরা খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর নাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তরুণ সংঘ, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ডাওয়াগুড়ি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত শ্রমিক ইউ-নিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'অমলের স্বপ্ন ভঙ্গ', বাণীতীর্থের 'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ' নাটক দুটি উচ্চ মানের ছিল। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তাঁরা হলেন—আবৃত্তি (নবম/দশম) : শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ানহাট হাইস্কুল। আবৃত্তি (সর্বসাধারণ) : শ্রীবিজয় ঘোষ, বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীত : শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ান-হাট হাইস্কুল। নজরুল গীতি : শ্রীপ্রবীর কুমার রায়, হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া : শ্রীমতী অঞ্জনা রায়, কোচবিহার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা : শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত, পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধুরী, হেলথ্‌ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অঙ্কন : শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগুড়ি।

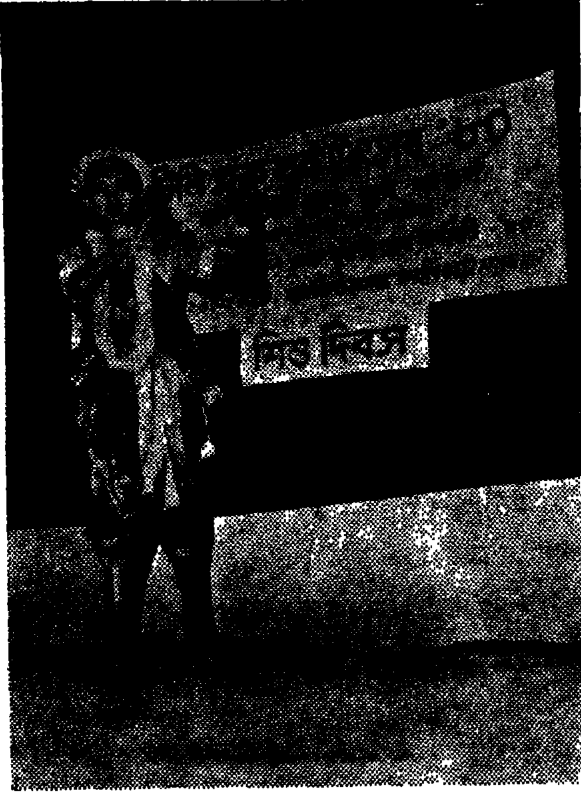
জলপাইগুড়ি জেলা :

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে মার্চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুখেন্দু রায়। এবং পুরস্কার বিতরণ করেন আলিপুরদুয়ার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধুরী। উৎসবের দিন-গুলিতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ 'শ্রমিক কৃষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'যুব-ছাত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিনি ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক যুব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনায় হ্যামিলটন-গঞ্জ কালীবাড়ী ময়দান ও কালচিনি থানা ময়দানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত যুব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঐ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উত্তোলন করে যুব উৎসবের শুরু ঘোষণা করেন অঞ্জন রায়, যুব সংযোজক, নেহরু যুবক কেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশুদের বসে আঁকো প্রতি-যোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, বিতর্ক, রচনা, স্বরচিত কবিতা, একাংক নাটক ও নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া সাঁওতালী নৃত্য, বোরো নৃত্য, নেপালী নৃত্য, ব্রতচারী ও তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

দ্বিতীয় বিভাগে মোট ৩০০ যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন স্টলের আয়োজন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির স্টলদুটি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দর্শক এই উৎসব উপভোগ করেন। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন অংশ থেকে যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই অঞ্চলে সরকারী সহযোগিতায় এই ধরণের উৎসব দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।



কালচিনি ব্লক যুব উৎসবে শিশুদিবসে নৃত্যের ভঙ্গিতে জনৈক শিশু শিল্পী।

মেদিনীপুর জেলা ঃ

সবং ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তিনদিনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীন বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মার্চ সারা ব্লকের যুবকবৃন্দ ও জনসাধারণ এবং স্থানীয় স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রী ও মেদিনীপুরের পুলিস লাইনের ব্যাণ্ড সহযোগে সারা লালগড় অঞ্চলটি পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেষে নেহরু যুবক কেন্দ্রের যুব সংযোজক সুশান্তকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর যুব উৎসব ও মেলা শুরু হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিতর্কে ২৮ জন, আবৃত্তিতে ১১৫ জন, প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই ব্লক মেলা ও যুব উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় প্রতিযোগী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪২০ জন, একক সংগীতে ১৮ জন, তীর নিক্ষেপ এ ৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী স্টল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র, মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্তৃক যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। যেভাবে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষ এই ব্লক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্লকেরই উৎসব। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সুধীর কুমার পাণ্ডে।

তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় চনশ্বরপুর উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

যুব উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকনৃত্য, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি, সংগীত, গণসংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, নাটক। বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই যুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরহিত্য করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধানসভার সদস্য পুলক বেরা।

পুরুলিয়া জেলাঃ

রঘুনাথপুর ব্লক যুব-করণ—বিগত ২৯শে এবং ৩০শে মার্চ এবং ৪, ৫, ৬ই এপ্রিল '৮০ দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে রঘুনাথপুর ১নং ব্লক 'যুব-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রস্তুতি পর্বে ১নং ব্লকে-র অন্তর্গত সমস্ত ক্লাবগুলি, পঞ্চায়ত সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা যুব সংগঠনগুলিকে নিয়ে 'যুব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়। শ্রী রঙ্গনাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চায়ত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক যথাক্রমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধুরী ও শ্রী চণ্ডীচরণ গুপ্তকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি ক্রীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী পার্থ সারথি ঘোষকে আহ্বায়ক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দুদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের ৩৩টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা শতাধিক। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় 'তীর ছোঁড়া' এবং 'যেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেষেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদত্ত মোট ৪৬টি পুরস্কারের মধ্যে 'পল্লী-শ্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাঁকা অঞ্চল) এবং রঘুনাথপুর গার্লস্ হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডস্ ক্লাব' (আদ্রা) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অঞ্চল) এবং 'আমরা সবাই' (রঘুনাথপুর) প্রত্যেকের চারটি করে পুরস্কার দখল সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যুব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড্ জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। রঘুনাথপুর শহর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই উৎসবানুষ্ঠান যে এক অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করতে পেরেছে তার মধ্যদিয়েই এর সার্থকতা ও সাফল্য পরিস্ফুট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী ও শ্রোতাদের কাছে। বালক-বালিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা এই প্রতিযোগিতায় সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশেষ কোনো গান নির্দিষ্ট করে না দেওয়াতে প্রতিযোগীরা যেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের বৈচিত্রভাব ও ঐশ্বর্য নানা রূপে রসে ও বৈচিত্র্যে ফুটে উঠতে পেরেছিল।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সঙ্গে সুকান্তের কবিতাও শিশু বা কিশোর প্রতিযোগীদের কণ্ঠে সুচারু পারদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথাক্রমে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব-সাধারণের জন্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিৎ'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দুটি (ক) পুরুলিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আঞ্চলিকতা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা এবং বক্তৃতায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতিযোগীরা তা শুধুই যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নয়—ছিল যথেষ্ট শিক্ষামূলকও উৎসাহব্যঞ্জক। সমকালীন সমাজের মানব জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সন্ধান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। বিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রী তপন লাহিড়ীর সুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তব্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয় প্রতিযোগিতা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিষ্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত এই উন্নত রুচির ও মানের নাটকগুলি পরম আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। এই অঞ্চলের যুবকেরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও। বিষয় বৈচিত্র্যের এবং বক্তব্যের দিক্ থেকে সমুন্নত আদর্শের এইসব নাটকাভিনয় আঞ্চলিক যুব সমাজের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরৎ-নজরুল-স্মৃতি পাঠচক্র, রঘুনাথপুর), স্কিৎস (ডাবর অরুণোদয় ক্লাব, চোর পাহাড়ী), কিংবা 'চন্দ্রালোকের যাত্রী' (আমরা সবাই, রঘুনাথপুর)-র অভিনয় তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো বুন্দলা খাজুরা অঞ্চল কর্তৃক সাঁওতাল ভাষার নাটক 'মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রঙ্গনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোষ্ঠী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জাতীয় উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রঘুনাথপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের যুব-সমাজের ক্রীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ও সহানুভূতিই এই যুব উৎসবকে সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদক সমীপেষু,

'যুবমানস' কবে বেরোবে—আশা নিয়ে দারুণ আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শুরু করেছি। গত সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকটি নতুন বিভাগের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগুলিতে 'যুবমানস' আরও সমৃদ্ধ হবে।

শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে গৌতম ঘোষদস্তিদারের 'নাটকের কিছু কথা এবং ফজল আলী আসছে' একটি বলিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। লেখার ভঙ্গিটিও সুন্দর। গৌতমবাবু শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বিচারের মানদণ্ড অন্যত্র অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে যাওয়া ঠিক কি? পত্রিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

শ্রদ্ধাসহ—

নমিতা ঘোষ।

বসিরহাট। ২৪-পরগনা।

প্রিয় সম্পাদক,

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষণের সম্পাদিত রূপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের যুবক-যুবতীরা বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধিরা যা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপত্রগুলিতে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংবাদ সামান্যই ছাপা হয়। যদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হই।

যুবমানসের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'যুবমানস' আমাদের মত গাঁয়ের মানুষদের অনেক অজানা কথাকে জানতে সাহায্য করেছেন। যুবমানসের সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—কামাল আমেদ

গ্রাম—থানারপাড়া। নদীয়া।

সহ-সম্পাদক,

যুবমানস।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হয়ে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্শ'-কে মূল্য দেন জানিয়েছেন। সেই ভরসায় আমার প্রথম পরামর্শ—যুবমানস নিয়মিতভাবে প্রকাশ করুন। মাঝে মাঝে হঠাৎ শেয়ালদা' ষ্টেশনের হকারের হাতে 'যুবমানস' দেখতে পাই। আবার অনেক সময় অনেক খোঁজাখুজি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধারণের কাছে পৌঁছুতে না পারলে এর মূল্য কমে যেতে বাধ্য। অথচ পত্রিকাটির চাহিদা আছে।

জানিনা আমার পরামর্শে আপনাদের অথবা আমাদের পত্রিকা কতখানি 'প্রাণবন্ত' হয়ে উঠবে। তবে উঠুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

নমস্কার জানবেন।

—নিতাই বড়াল

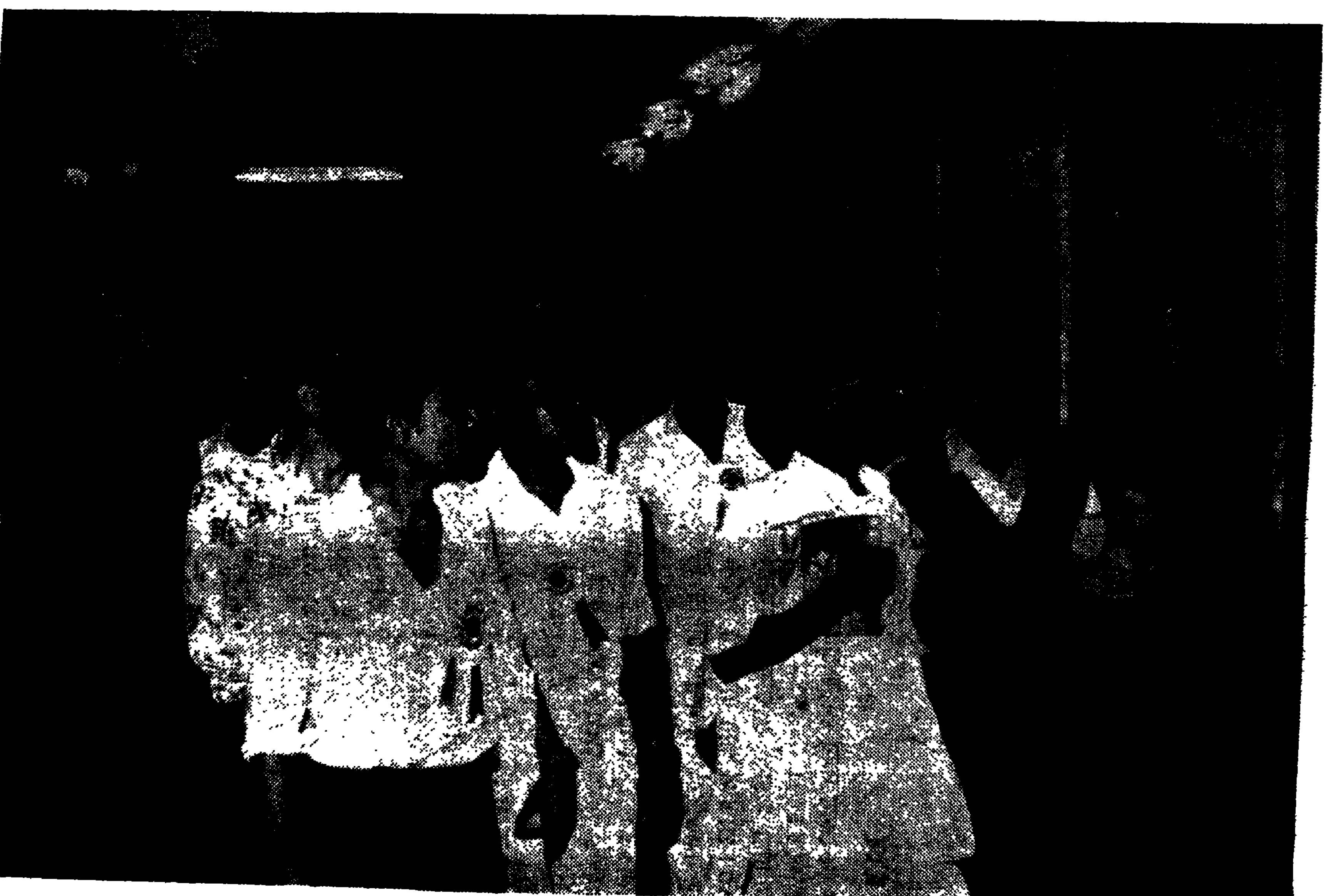
কুশমোড়। বীরভূম

শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী,

মাসিক 'যুবমানস' কাগজের আমি নিয়মিত পাঠক। তা কট্টর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম লুপ্ত বাংলার লোকসাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে গ্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে শিশু প্রবন্ধ ছাপতে চাই। বেশ কয়েক-বছর গ্রামগঞ্জ-এ মানুষের সাথে মিশে আত্যন্তিক প্রতিকূলতার মধ্যে রাত কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আঞ্চলিক একান্ত নিজস্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহামূল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগুলিকে সুস্থভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানালুম আমার কথা। মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে একথা ভাবতে কষ্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বক্তব্য। উত্তরের অপেক্ষায় থাকলুম। নমস্কার।

গৌতম ঘোষ

শক্তিগড়। বনগ্রাম। ২৪ পরগনা।



রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের প্রদর্শনী মণ্ডপে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র



গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

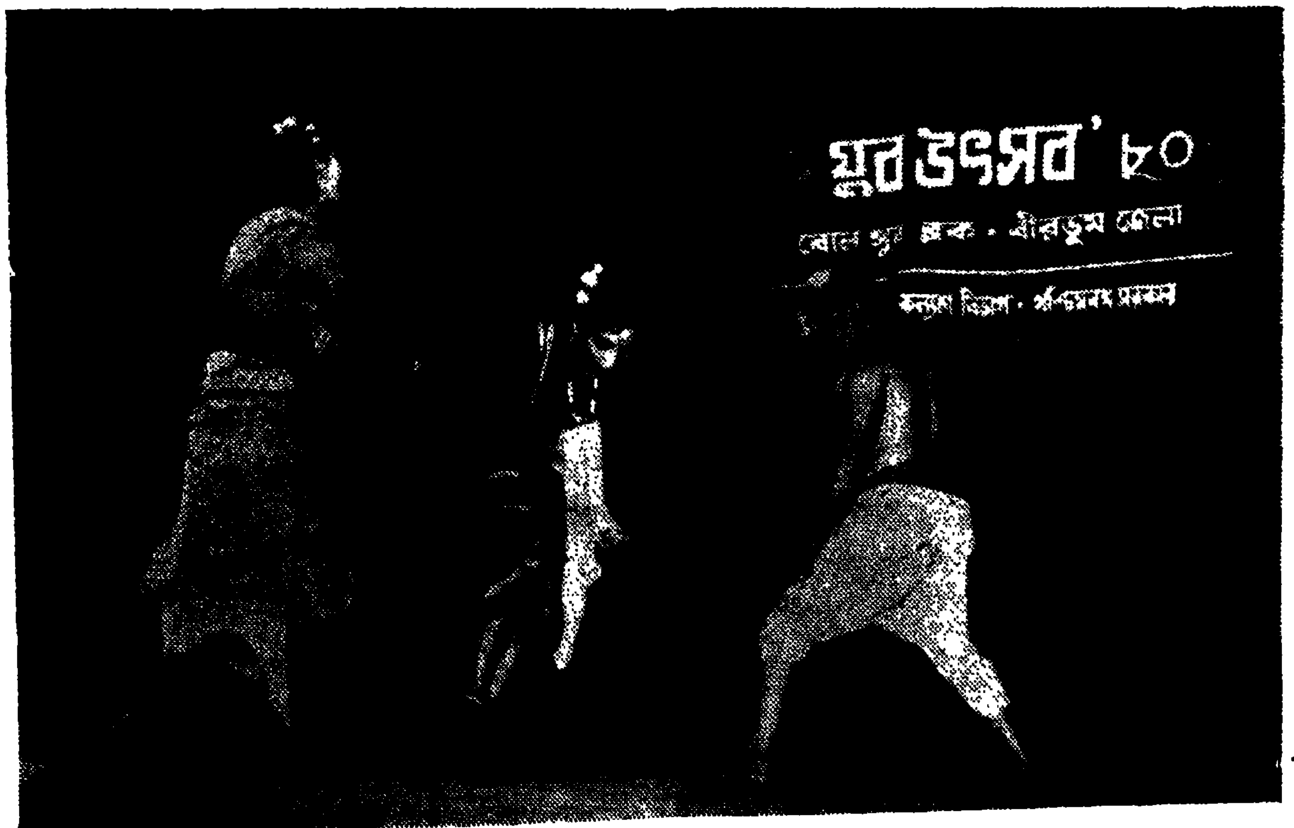
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।





বীরভূমের বোলপুর ব্লক যুব উৎসবে সাঁওতাল ‘বিদ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্র শাখার ব্যালে ‘হুল’-এর দু'টি বিশেষ মুহূর্ত।

খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে, ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে তা কলকাতার খেলার মাঠে অভাবনীয়। খেলার মাঠের বাইরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এ এক ন্যক্কারজনক উচ্ছৃঙ্খলতা। খেলার মাঠের ভেতরে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ঘুষি মারামারি করতে দেখা গেছে, দর্শকরা খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছে, মাঠের ফেন্সিং লাইনের ধারে একদল লোক জটলা করেছে। এসব কিছুই কলকাতা ফুটবলের ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিষয়টি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করেছেন। গত ৯ই মে মহাকরণে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন—

ফেডারেশন কাপ ফাইন্যাল খেলার মাঠে যে সব ঘটনা ঘটেছে এই ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-যুবকদের প্রচার আন্দোলনে নামা উচিত। ফুটবল খেলা যদিও আই. এফ. এ.'র ব্যাপার, কিন্তু খেলার মাঠের প্রতিক্রিয়া বাইরেও পড়ে বলে রাজ্য সরকারও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বড় দু'টি ক্লাবের এই যদি খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব হয়, তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। অথচ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এসব ঘটনার নিন্দা করে দু'টি বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের কেউ কোন বিবৃতি দেননি। যেসব খেলোয়াড় খেলার মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করা উচিত। আমাদের সময় দেখেছি খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে মারামারি হলে রেফারী তাদের মাঠ থেকে বের করে দিত।

ইডেনের মাঠের মধ্যে লাইনে এত লোক বসবে কেন? মাঠের ভেতরে যারা ঢুকবে তাদের বের করে দিতে হবে। তার জন্য গোলমাল হয়ে খেলা যদি বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যাবে। এসব কথা দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে।

খেলার মাঠ অসভ্যতা করার জায়গা নয়। কিছু ক্লাবের সমর্থক ব্লেড, ক্ষুর নিয়ে মাঠে ঢুকবে। এসব উচ্ছৃঙ্খলতা তো সমাজ বিরোধী কাজ। আশি হাজার দর্শক খেলা দেখতে গেলে এসব কাজ করে মাত্র হাজার দুই লোক। সাধারণ মানুষ এ জিনিষ কখনই বরদাস্ত করবেন না। ছাত্র-যুবদের এই গোঁয়ার্তুমির বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জুন-জুলাই '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ/চন্দন বসু

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিণ্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঞ্চাশ পয়সা

সম্পাদকীয়

কোন কিছু ধ্বংস করিতে তিন বৎসর যথেষ্ট সময় কিন্তু কোন বিষয় বা বস্তু গঠন করিতে এই সময়কাল নিতান্তই নগণ্য। তিন বৎসর আরও তুচ্ছ সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—যদি ঐ নির্মাণকাণ্ডের সহিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে স্পর্শ করিবার প্রশ্ন বিদ্যমান থাকে। বলিলে বোধ করি এতটুকু বাড়াইয়া বলা হইবে না যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামজোট সরকার তাহার শাসনকালের এই স্বল্প তিন বৎসরের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মানুষের সমস্যা জর্জরিত রাজ্যের নির্মাণ কার্যে এক অভূতপূর্ব গতিবেগ এক অদৃষ্টপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

যে পরিস্থিতির মধ্যে এই সরকারের হাতে শাসন ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই অবস্থার কথা এই সময়ের মধ্যে তো কেহই ভুলিয়া যায় নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পঠন-পাঠনের পরিবেশকে প্রায় নির্মূল করা হইয়াছিল—পরীক্ষা ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃংখলতা বিরাজ করিতেছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সমস্ত প্রচলিত নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটি'র উপর প্রার্থী বাছাই করার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছিল—বিরাট সংখ্যক বেকার যুবকের নির্মম অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের নিকট নতজানু হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল—যৌবন জনোচিত দৃঢ়তাকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে দুর্নীতির পঙ্কে ডুবাইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার যাবতীয় বন্দোবস্ত সুকৌশলে করা হইয়াছিল। অপ-সংস্কৃতির প্লাবন সৃষ্টি করিয়া, যৌনতা নগ্নতা দিয়া যুব মানসিকতাকে বিকৃত করিয়া, 'হিরোইন', 'এল. এস. ডি' ইত্যাদি নেশা করা দ্রব্য সম্ভারে যুব মনকে পঙ্গু করিবার কতই না ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিয়া দেবার জন্য সকল-প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-পরিবহণ এমনকি তৃষ্ণার জলটুকুর সমস্যার কোন সমাধান দূরে থাকুক তাহা হ্রাস করিবার নিমিত্ত বাস্তব পরিকল্পনার কোন লেশমাত্র ছিল না। দূরদর্শিতার অভাব, প্রকল্প সমূহকে বাস্তবায়িত করার আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অভাব, ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের সেবা করিবার জন্য অকল্পনীয় লিপ্সা, আত্মকলহে নিমগ্ন শাসকগোষ্ঠীর কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যুত সহ সকল মৌল সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি, প্রশাসনের সকল স্তরে দুর্নীতির দাপট—এই সবই ছিল সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য। আর এই অসহ অবস্থার প্রতিবাদে টু শব্দটি যাহাতে কোথাও উচ্চারিত না হইতে পারে তাহার জন্য আধা-ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়া একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করিয়া গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করিবার আনুষঙ্গিক সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল।

সেই সময় রাজ্যের সাধারণ মানুষ অনেক বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া, নীরবে-নিঃশব্দে ভোটের মাধ্যমে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়া সুকঠোর কর্তব্যের মুকুট মাথায় পরাইয়া কাঁটার সিংহাসনে এই সরকারকে বসাইয়াছিলেন।

ভারতের সংবিধানের বিধান অনুসারে একটি অঙ্গ রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই সীমাবদ্ধ, ততোধিক সীমিত তাহার প্রশাসনিক অধিকার। অর্থের জন্য, অনুমতির জন্য দিল্লীর দিকে তাকাইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ও অনিশ্চয়তার সহিত প্রহর গুনিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়াই রাজ্যের জনগণের জীবনের কতকগুলি মৌলিক দিক যথা—কৃষি, সেচ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই পালন করিতে হয়। দায়িত্ব পালনের উপাদান ও সুযোগের অভাব যতই থাকুক না কেন কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধাও এই রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভাগ্যে জুটিয়াছে। অগণিত মানুষের আস্থা, সকল স্তরের সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্তের একনিষ্ঠ সমর্থন ইহার পূর্বে আর কোন্ সরকারের অদৃষ্টে ছিল ?

দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর এই সরকার জনগণের ভালবাসাকে পাথেয় করিয়া প্রত্যয়-সিদ্ধ মনোভাব লইয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া হাজার বৎসরের দৃষ্টান্ত বিহীন বন্যার ধ্বংস স্তূপ হইতে রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে আবার এত কম সময়ের মধ্যে চাঙ্গা করিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য ক্ষতিগ্রস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুয়াইয়া হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া শত্রুর মুখে ছাই দিয়া শহরের রাজপথে ভিক্ষুকের মিছিলে সামিল হয় নাই। সেই জন্যই গণনাতীত ঐতিহ্যের সৃষ্টিকারী ছাত্র-যুবকেরা দেহের রক্ত বিক্রি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনর্গঠনের কাজে এই ভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। আবার তাহার পরের বৎসরেই অভূতপূর্ব খরায় রাজ্যের ব্যাপক এলাকায় নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই সরকারের সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থার ফলে মানুষ গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নিন্দুকে যাহাই বলুক না কেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দিল্লীর সরকার মারফত খরা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য সাধুবাদ জানাইয়াছেন।

ক্ষমতায় বসার একবৎসরের মধ্যে দেড়যুগ ধরিয়া স্থগিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই সরকার গ্রামীণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—গ্রামের মানুষকে দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া একদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়াছেন, অন্যদিকে চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁস হইতে গ্রামীণ কর্মধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত করিয়াছেন। পঞ্চায়েতগুলির হাতে পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি কর্মসূচীর ফলে সেই জন্য প্রায় ছয় কোটি কাজের দিন সৃষ্টি করিয়া গ্রামীণ বেকারীকে কিছুটা পরিমাণে লাঘব করিতে পারিয়াছে।

প্রায় নয় লক্ষ একর খাস জমি দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বণ্টন করিয়া, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বর্গাদার আধিয়ারের নাম নথিভুক্ত করিয়া, ব্যাঙ্ক হইতে পাট্টাদার ও বর্গাদারকে সামান্য সুদে বা বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করিয়া, ষাট বৎসরের বেশি বয়স্ক দীন-দরিদ্র ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষককে ষাট টাকা করিয়া মাসিক পেনসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিধবা ভাতা, এবং প্রায় তিন লক্ষ বেকার যুবককে বেকার-ভাতা প্রদান করিয়া গোটা ভারতের জনগণের নিকট এই সরকার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই—সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গণতন্ত্রীকরণ ও সার্বজনীন করিবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে—সমাজের অবহেলিত নির্যাতিত স্তরের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।

একমাত্র কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই রেজিস্ট্রীকৃত বেকারদের বয়সের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার একটি পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া এবং তিন বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার যুবককে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়া গোটা দেশের মানুষের বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট এই সরকার ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। ৩৫টি বন্ধ কারখানা খুলিয়া চাঙ্গা করিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিকের কাজের সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিবার ফলে এই তিন বৎসরে মালিকের নিকট হইতে রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণী প্রায় কুড়ি কোটি টাকার অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিতে পারিয়াছেন—শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সাবলীল গতিময়তা আনা সম্ভব হইয়াছে।

রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরীর নিরাপত্তা, কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির শুধু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাই নহে তাহাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করিবার পূর্ণ অধিকার গোটা দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্য সরকার প্রদান করিয়া সাম্রাজ্যবাদী আমলের একটি ধারাকে লুপ্ত করিয়া ভারতের শ্রমজীবী মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন, খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি, যুব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়া—নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্য সরকার এক অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বৎসরে এই রাজ্যের বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭০০ কোটি টাকার কিছু বেশি সেইখানে বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য সরকার সেই পরিমাণকে দ্বিগুণ করিয়া ১৪০০ কোটি টাকার উপর ধার্য করিয়াছেন। রাজ্য যোজনার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব বৎসরে বরাদ্দ করা হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা আর বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য সরকার যোজনা খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন ৪৮০ কোটি টাকা। রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য স্বল্প তিন বৎসরে একটি রাজ্য সরকারের সমতুল আন্তরিকতার নজীর ত্রিপুরা ও কেরালা ব্যাতীত আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত

[শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়]

বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর : গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে গতিপ্রবাহের সূচনা করেছে

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

একটা বিনম্র ন্যূনতম কর্মসূচী সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই কর্মসূচীতে রাজ্যের শ্রমবিষয়ক, ভূমিসংস্কার, কৃষিসমস্যা, শিক্ষা সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের ঘোষিত কর্মসূচী রূপ দেবার সাধ্যমত প্রচেষ্টা নিচ্ছেন।

আমাদের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। কৃষিজীবী পরিবারগুলির বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূমিহারা হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটান। ফসলের চড়া ভাগ, মহাজনী জুলুম, নিদারুণ বেকারী, ট্যাক্সের বোঝা ও ধনতান্ত্রিক শোষণের জুলুম কৃষককে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত করছে। কৃষক জমি রাখতে পারছেনা। পরিণতিতে জমি হারিয়ে ভিড় করছে খেতমজুরদের দলে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চিত্র হল কর্মাভাব, বুভুক্ষা, ঋণভার আর দুঃস্থতার বিষাদময় পশ্চাৎপদতা। শাসক শ্রেণীগুলি স্বাধীনতার পর বিগত তিরিশ বছর ধরে জমিদারী ব্যবস্থার আমূল অবসান ঘটিয়ে কৃষকের স্বার্থে প্রকৃত ভূমি সংস্কার করতে অস্বীকার করেছে। কৃষি ব্যবস্থায় এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি সম্পর্কের ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শৃংখল ভেঙে ফেলে মধ্যযুগীয় বর্বর নিপীড়নের অবশেষগুলির বিলোপ ঘটানো না গেলে প্রকৃত ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত হতে পারেনা, সামাজিক অগ্রগতি কথার কথা থেকে যায়। ভূমি সংস্কার ও কৃষি সমস্যার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

চতুর্থ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন, 'যেহেতু বর্তমান অবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয় তাই জনগণের সাময়িক দুর্গতি মোচনের জন্য এবং আগামী সংগ্রামের জন্য তাদের মনে বিশ্বাস ও শক্তি এনে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সংবিধানের বেড়াজালে একটা অঙ্গ রাজ্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সমস্যার মৌলিক সমাধান করা যায় না। এই সরকার পারবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুটা প্রসার ঘটিয়ে জনগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে এবং আশু সমস্যাগুলির ওপর নজর দিয়ে জনগণের ওপর চাপানো বোঝা কিছুটা হালকা করতে। বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী কর্মসূচী জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজ সহজতর হবে। আশু দাবির সাফল্য গণসমাবেশ ব্যাপকতর করে এবং শাসক শ্রেণীগুলি সম্পর্কে মোহমুক্তির প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ও কর্মসূচী এই ব্যাপারে কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে গণতান্ত্রিক শক্তির সেটাই হল প্রধান বিবেচনার বিষয়।

আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে একটা নিশ্ছিদ্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর। সমস্ত ক্ষমতা ওপরতলায় কেন্দ্রীভূত। শাসক শ্রেণী ও তাদের অনুগত আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামোর মধ্যে যথার্থ গণতন্ত্রের কোন জায়গা নেই। নিচের তলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো সম্ভব। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রমের বিকাশের সাথে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের সোপান হল এটি।

শুধু মাত্র বিনাবিচারে আটক, সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সমস্ত ধরণের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং জনগণের ওপর অত্যাচারের তদন্তের ব্যবস্থা করাই নয়, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা হাতে নেবার সময় থেকেই আমলাতন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার পদ্ধতি না নিয়ে গণসংগঠনগুলির পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করছেন এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির ওপর অধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নজির সৃষ্টি করেছেন। গ্রাম্য জীবনের অগ্রগতিতে বামফ্রন্ট সরকারের এই অবদান উল্লেখ করার মত।

গ্রামের পঞ্চায়েতগুলি ছিল জোতদার কায়েমীস্বার্থের স্থানীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রের ঘাটি, প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের আখড়া। নিচের তলায় প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বাস্তুঘুঘুদের হঠিয়ে দিয়ে গরিবের প্রতিনিধিরাই অধিকাংশ পঞ্চায়েতে এখন নির্বাচিত। বামফ্রন্ট সরকার পূর্বের ঘুণধরা পঞ্চায়েতগুলিতে কাজের প্রবাহ সৃষ্টি করতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ব্যাপক দায়িত্ব তুলে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রামাঞ্চলে গরিবদের দিকে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রামোন্নয়ণ ও পুনর্গঠন প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচলনে গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর, গরিব চাষী ও কর্মচ্যুত কারিগরদের কাজের সংস্থান বৃদ্ধি পাবার অনিবার্য ফল হিসেবে ঋণ সরবরাহকারী পরগাছা মহাজনের ওপর নির্ভরতা কমানো গিয়েছে। শ্রমনির্ভর এই কাজগুলি বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করছে এবং অভাবের তাড়নায় শেষ সম্বল হিসেবে ঘরের থালা-বাটি, বাস্তুভিটা বা জমিখণ্ডটুকু বন্ধক রেখে অথবা মরশুমে খেটে শোধ দেবার কড়ারে বড় জমির মালিক ও মহাজনের দরজায় ধর্ণা দেবার দীর্ঘ দিনের অবস্থাটার এক নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। গরিবের হাতে সম্পদকে ঠেলে দেবার ফলে, টাকার হাতফেরতা

নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রুগ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের এই গতিবেগ, পরিবর্তনের একটা সূচনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান, গরিব জনগণের আর্থিক সংস্থানের কিছুটা সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। দুঃখ কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টায় অথবা গ্রামীণ সম্পদ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পঞ্চায়েত-গুলির উদ্যোগ গৌরব করার মত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল বামফ্রন্ট সরকারের ব্যবস্থাবলী ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক কর্মকান্ড জনগণের চেতনা ও সমাবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে কতটা, বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপলব্ধি গড়ে উঠছে কিনা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীশত্রুদের কতদূর বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করা গেল। দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষ পশ্চিমবঙ্গের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতগুলির ওপর বিরাট দায়িত্ব দিয়ে এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করতে সাহায্য করেছে।

কৃষক সাধারণ ও গ্রামের গরিব জনগণের ওপর শোষণ নির্যাতনের নায়ক জোতদার-কায়েমীস্বার্থই হল স্বৈরাচারী শক্তির গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ভিত্তি। গ্রাম্য সমাজজীবন থেকে জমিদারী শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলতে না পারলে স্বৈরাচার বারে বারেই তার বিষদাঁত ফোটাতে চাইবে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে জমিদারী শোষণকে কতটা আঘাত দেওয়া গেল, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সচেতন গণউদ্যোগ ও জনসমাবেশ গড়ে উঠছে কেমন এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এটাই হল বামপন্থী শক্তির মূলে বিবেচনার বিষয়। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম এই সম্ভাবনার দিক খুলে দিতে সাহায্য করেছে।

যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, বর্তমান ভূমি সম্পর্কের মূলে কাঠামোকে বজায় রেখে সংবিধান ও আইনগত পরিধির মধ্যে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ফলাফল সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে বর্তমান সীমাবদ্ধ সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে ব্যাপক অংশের গ্রামের গরিব মানুষের আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা হালকা করা যাবে এবং এই কর্মসূচীর সাফল্য গ্রামাঞ্চলে জোতদার কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে গরিব মানুষদের উৎসাহের সৃষ্টি করবে। শাসক শ্রেণীর তৈরী সংবিধান যে গ্রামাঞ্চলে জমিদার সম্পত্তিবানদের স্বার্থের পাহারাদার সেই উপলব্ধিতে গ্রামের জনগণ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের প্রসারিত অধিকার, সিলিং বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ ও বন্টন, অভাবের কারণে হস্তান্তরিত জমি ফেরতের ব্যবস্থা, ভাগচাষী ও খাস জমির পাট্টাপ্রাপ্ত গরিব কৃষককে ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদির সাফল্য গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে এবং মালিক ও মহাজনের সাথে ব্যবধান সৃষ্টি করতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন আংশিক দাবি-গুলি নিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীতে 'ভূমি-সংস্কার ও কৃষক' সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিরলসভাবে তা কার্যকরী করে চলেছেন। আংশিক দাবির সাফল্য জনগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে, চেতনার বিকাশ ঘটে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি সামনে এসে হাজির হয় এবং শত্রুরা দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার প্রশ্নে, জোত-দার কায়েমীস্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করতে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে গৌরবের।

জোতদার বাস্তুঘুঘুদের আঘাত না দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর রূপায়ন সার্থক হতে পারে না, আবার কায়েমীস্বার্থের বাধা অতিক্রম করতে না পারলে বামফ্রন্টের কর্মসূচীর সাফল্যের অগ্রগতি হতে পারে না। জোতদার মহাজনেরা তাই আজ মরিয়া।

আমাদের লক্ষ লক্ষ যুবকরা এক অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের আশংকায় নিরুদ্দম জীবন কাটাতে বাধ্য হন। বেকারী ও অর্ধবেকারীর জ্বালায় তাঁরা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েন। গ্রাম্য জীবনের কোটি কোটি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে গেলে শিল্পের বাজারে অনিবার্য সংকট দেখা দেয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। বেকারী ভয়াবহ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার সংকট, সংস্কৃতির সংকট, দেশের সকল ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রবাহ আনার প্রথম সর্ত হল কৃষকের হাতে জমি এবং কাজ। সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কারের সাফল্য ও কর্মসংস্থানের বর্ধিত সুযোগ গরিব কৃষকের চাষের নিরাপত্তা ও অগণিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে তুলে পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবলতা আনার সূচনা ঘটিয়েছে। গোটা সমাজের বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে এই সম্ভাবনাময় দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণের জগদ্দল পাথরকে চূর্ণ করে উৎপাদনের উৎসমুখ খুলে দেওয়া না গেলে নতুন পুঁজি সৃষ্টির জায়গা কোথায়? বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী ও গৃহীত পদক্ষেপগুলি জমিদারী শোষণের শেকড়কে আলগা করতে সাহায্য করছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তাই ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতবহ।

জমিদারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে উন্নত চাষের প্রচলনের অনিবার্য পরিণতিতে কৃষক আজ মরতে বসেছে। কৃষক চাষের উৎপাদনে উপকরণ সংগ্রহের বাজারদরে মার খাচ্ছে, উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ে মার খাচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি গ্রামাঞ্চলে ক্রমেই তার থাবা বিস্তার করছে। কায়েমী-স্বার্থের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক সাধারণকে সংগঠিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ অপূর্ণ থেকে যায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন ও আংশিক হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ওপর চাপানো বোঝা হালকা করতে সাধারণ কৃষকের জমি নিস্কর, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সেচকর হ্রাস, ব্যাপক কৃষিঋণ সরবরাহ, মিনিকিট বন্টন, ভর্তুকি দিয়ে চাষের উপকরণ সরবরাহ, বার্ধক্যভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়েছেন। কৃষককে রক্ষা করতে এই আংশিক দাবিগুলির

স্বীকৃতি দিয়ে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মাত্র তিন বছরের কার্যক্রম কৃষকের জমি হারাবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করতে পেরেছে। সারা দেশের কাছে এটা একটা নতুন দিক।

জন্মের প্রথম দিনটি থেকে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের মূল রণধ্বনী হল কৃষকের জমি এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তি। মূল লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তীব্রতর আংশিক দাবির সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামে রূপ নিয়ে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে একটা বিশেষ পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিতে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নে, গ্রামাঞ্চলের আশু সমস্যাগুলি সমাধান করতে, বিশেষতঃ জমিতে চাষের অধিকার ও বন্ধন নিপীড়ন থেকে কৃষক সাধারণকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার কতটা ভূমিকা পালন করল, সেটাই হল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরম বিচার।

গ্রামাঞ্চলের গরিব জনগণ মাথা তুলে চলতে শুরু করেছেন। অনেক পথ বাকি। কিন্তু অগণিত গরিব মানুষ, মেহনতি কৃষক মর্যাদাবোধে সচেতন হয়ে আজ সিদ্ধান্তকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। বামফ্রন্ট সরকারের পদক্ষেপ গ্রামের গরিব জনগণ ও কৃষক সাধারণের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ সহজতর করেছে। স্বৈরাচারী শক্তির আতঙ্কের কারণ এখানেই। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর সফল রূপায়ন ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে।

[সম্পাদকীয় : ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করিয়াছে, বিনা রক্তপাতে সকল মতের সকল পদের মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ কিম্বা তারও বেশি সংখ্যক মানুষ এই সরকারের আমলে একাধিকবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাইয়া নিরপেক্ষ ও দক্ষ সরকারী প্রশাসনের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত প্রকারের দুর্নীতি মুক্ত একটি সুষ্ঠু ও জনমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহারা সুবিচার হইতে বঞ্চিত থাকিয়াছেন—অপমানিত হইয়াছেন—শোষিত নিপীড়িত হইয়াছেন—তাহারা অন্ততঃ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইয়াছেন—মাত্র তিন বৎসরে এহেন কৃতিত্বের দাবী নিশ্চিতভাবে বর্তমান রাজ্য সরকার করিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, হরিজন নিগ্রহ, ভাষাগত অসহিষ্ণুতার মত সর্বনাশা ব্যাধি হইতে এই রাজ্য বলা যাইতে পারে প্রায় মুক্ত—জনগণের সাথে সাথে রাজ্য সরকারও ইহার জন্য প্রশংসিত হইতে পারে।

গোটা উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতে বিচ্ছিন্নতা কামী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে সারা দেশের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছে, আর সেই সুরে সুর মিলাইতে ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ড ও গোর্খাখণ্ডের পাণ্ডারা মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় তৎপরতার সাথে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া চক্রান্তকারীদের জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "খণ্ড" আন্দোলনকারীদের দুর্বুদ্ধিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যেকোন দেশপ্রেমিক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

বাধা বিপত্তি অনেক, ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর সরকারের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে—সরকারকে উৎখাত করিতে। কিন্তু সহায় যাহারা জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা শুধু এ রাজ্যের নয় তাবৎ ভারতের, আদর্শ যখন অভ্রান্ত, নিশানা যেখানে সঠিক, নিষ্ঠা যেখানে চালিকা শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও দৃঢ়তা যেখানে হাতিয়ার, সংগ্রামী সাথী যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব তখন সকল বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করিয়া এই সরকার তাহার লক্ষ্য পথে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইবে—সকলের সাথে আমরাও কায়মনবাক্যে সেই আশাই করিব। জয়তু পশ্চিমবাঙলার বামজোট সরকার।

শিক্ষার পক্ষে তিনটি বছর

আশিস চ্যাটার্জী

আজকাল বেশী বেশী করে শিক্ষানীতিকে সমাজনীতির সাথে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। এটা একটা সুলক্ষণ। কেননা অন্য অনেক ধরনের মতবাদ আছে, যা শিক্ষাকে সমাজ, তার কাঠামো, শাসন পদ্ধতি, শাসক ইত্যাদি থেকে আলাদা করে ভাবাতে চায়। এই মতামতের প্রবক্তারা সেইজন্য অনেক সময়ে বলেছেন শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সব আলাদা থাকবেন সমাজে যা কিছু হচ্ছে তার থেকে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজদর্শন ভাবতে হবে না কিছু। সে বাধা আর টিকলো না। বেঁচে থাকার ব্যবস্থাটার নড়াচড়ার সাথে সাথে ছাত্র-সমাজ, শিক্ষকমহাশয়রা নড়লেন চড়লেন, পথে নামলেন। ভাবতে লাগলেন বেশী বেশী করে এরা আর সব মানুষের সাথে—ব্যাপারখানা কি? শিক্ষিত হয়েও যেন অনেকেই শিক্ষিত নন, যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত হবার কথা ছিল শিক্ষা পেয়ে, সে অঙ্কটা আর মিলছে না। দেখা গেল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটি আর নেই, ছাত্রদের পড়ার থেকে পাশের দিকে নজর বেশী, তার জন্য অনেকে সবসময় সৎ উপায়ও অবলম্বন করছেন না, অনেক শিক্ষকও ভুলে যাচ্ছেন তার সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যেন প্রচণ্ড অসুস্থতায় ভুগছে, সে রোগের অনেক লক্ষণ—গণটোকা-টুকি, অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, শিক্ষণের অনুপযুক্ত মান, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও একটা ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল—তা হচ্ছে গণ-অশিক্ষা। দেশের বেশীর ভাগ মানুষই নিরক্ষর। শহর বা মফঃস্বলে শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, সেখানে নিরক্ষরতা সর্বব্যাপী।

কেন এমন হল? ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল রাজত্ব করতে—তারা তাদের শাসনের স্বার্থে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সময়ে, আধুনিক স্কুল কলেজও গড়ে উঠল, ব্রিটেনের ধাঁচে শিক্ষিত করা হচ্ছিল কিছু মানুষকে। এসব শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশ ভারতে আমলাতন্ত্রের কাঠামো তৈরীর জন্য। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা বড় বড় প্রশাসনিক পদে আসীন হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজ জমিদারের যোগ্য পারিষদ হয়েছিল।

পরাধীন ভারতেই বিপুল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার সমস্যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষীরা এই দাবীকে সামনে নিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশের মানুষ স্বভাবতঃই আশা করেছিল শিক্ষার সমস্যাগুলি দূর হবে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষার সমস্যা ছিল অনেক। কিন্তু মূল সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নিরক্ষরতার সমস্যা। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী তখন দেশে ১৯·২৬% মানুষ স্বাক্ষর ছিল। স্বভাবতঃই ব্যাপক জনগণের কল্যাণে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল যা দ্রুত দেশের সমস্ত মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস লেখা হল অন্যভাবে। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি যেভাবে সাজানো হ'ল তাতে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক রয়ে গেল জমিদার-জোতদার, কারখানার মালিক এবং সাম্রাজ্যবাদীরা। দেশীয় বাজারকে ব্যবহার করে বড় পুঁজিপতিরা শীঘ্র এক-চেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হলেন। এখন পুঁজিবাদের নিয়মই হলো টাকা খাটিয়ে মুনাফা করা, সেই মুনাফা পুঁজিতে যোগ করা, বেশী পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশী উৎপাদন করা, এই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করে মুনাফা করা এবং আবার তা পুঁজির সঙ্গে যোগ করা। এইভাবে উৎপাদন সীমাহীন-ভাবে বাড়তে থাকে কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না, এক-সময় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারের ধারণক্ষমতার বেশী হয়ে যায়, পুঁজিবাদ থমকে দাঁড়ায়। যতদিন উৎপাদন বাড়তে থাকে, ততদিন এবং সেই পরিমাণে প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিক, অফিসের কেরাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থা তদারকির জন্য উচ্চশিক্ষিত লোক-জন। ততদিন এবং সেই পরিমাণেই শিক্ষার প্রসার ঘটে। কিন্তু যেদিনই নূতন নূতন দক্ষ শ্রমিক ও উচ্চশিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন পুঁজিবাদের কাছে ফুরিয়ে যায়, সেদিন থেকেই শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনও তাদের কাছে ফুরোয়। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এবং বেশীর ভাগ রাজ্য-সরকারগুলির ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস বা জনতা দল যা পুঁজি-পতি-জমিদারদের প্রতিনিধি। এই সরকার দেশে পুঁজিবাদের বৃদ্ধির স্বার্থেই কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু যেদিন পুঁজিবাদের বাড়বার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল, সেদিন থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাটাকেও সংকুচিত করার চেষ্টা শুরু হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে ক্রমাগতঃ শিক্ষাখাতে কমানো হয়েছে; যেমন প্রথম পরিকল্পনায়—মোট বরাদ্দের ৪·৯% শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনায় এ হিসেব ১·৩%। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল ইচ্ছা করলেই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে যেমন ইচ্ছে সংকুচিত করতে পুঁজিপতিরা বা তাদের সরকার পারে না, কেননা জনগণ শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, শিক্ষা-সঙ্কোচনের যেকোন পদক্ষেপকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের চাকরীর ব্যবস্থা হ'ল না, শিক্ষিত বেকারের মিছিল দিন দিন লম্বা হয়েই চলেছে। যাই হোক, স্বাধীনতার পর প্রায় ২০% স্বাক্ষরতাকে ৩০% এর বেশী বাড়ানো হল না এবং আজও দেশের প্রায় ৭০% মানুষ নিরক্ষর। আবার যে শিক্ষার কাঠামোটা ছিল, তাও সকলের জন্য সমান নয়। আমাদের সমাজে শিক্ষা কিনতে হয়। যে বেশী দাম দিতে পারবে তার জন্য বেশী চকচকে শিক্ষার ব্যবস্থা, চাকরী-বাকরীতে তারই সুযোগ বেশী। খুব অল্প-সংখ্যক স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা পাবলিক স্কুল বা ঐ জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বে, আর বাকীরা যে কোন স্কুলে যেমন তেমন পড়ে পাশ করবে।

এরকম পটভূমিকায় ১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু কংগ্রেস সরকারগুলি থেকে মৌলিকভাবেই আলাদা। শোষিত নিপীড়িত অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং তাদের ঘরের সন্তান ছাত্র-যুবকের প্রতিনিধিত্ব করে এই সরকার। কিন্তু মজাটা হলো এই যে বামফ্রন্ট সরকারকে বর্তমান পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই কাজ চালাতে হচ্ছে। তাই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন এই সরকারের ক্ষমতার বাইরে। তার উপরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগটাই কেন্দ্রের হাতে, রাজ্যের হাতে রয়েছে ছিটেফোঁটা। এই সীমাবদ্ধতাকে গণনার মধ্যে রেখেই বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম দেখতে হবে।

বেশীরভাগ নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি বাম সরকারের কাছে প্রথম কর্তব্য অবশ্যই ছিল শিক্ষার বিস্তার। এখন, গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের আয় এত কম যে বেতন দিয়ে তাদের ঘরের সন্তানদের পড়ানো অসম্ভব। তাই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাকে অবৈতনিক করা প্রয়োজন। সরকার ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী অবধি শিক্ষা অবৈতনিক করলেন এবং আগামী ১৯৮১ সাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা চালানোর ব্যবস্থা করলেন। নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যা পশ্চিমবাংলার মানুষ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পায়নি মাত্র তিন বছরে বামফ্রন্ট সরকার তাই করলেন। শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে কাজ হাতে নিলেন, এবং ৩,৪০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০,২০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পদ অনুমোদিত হল। ৩৪১টি নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩,৫০০ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে জুনিয়ার হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য। আবার গ্রামাঞ্চলে বা দরিদ্র শ্রমিক বস্তিতে শুধু বিনা বেতনে পড়তে দেওয়াই যথেষ্ট হয় না। যে বালককে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কথা, সে তার বাবার সাথে মাঠে গিয়ে চাষের কাজে সাহায্য করলে বা শহরাঞ্চলে মোটর গ্যারেজ বা চায়ের দোকানে কাজ করলে তার নিজের খাদ্যটুকু হয়তো সংগ্রহ করতে পারে। তাই সেই বালকটিকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হলে দুপুরে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে হয় তার জন্য। বাম সরকার কলকাতায় ২,৫০,০০০, কলকাতা ছাড়া শহরাঞ্চলে ৫,০০,০০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২৬,২১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুকে "শিশুপুষ্টি" প্রকল্পের আওতায় এনে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা বিরাট অঙ্কে বেড়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে ৮৪% ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং ৭৯-৮০ সালে তা বেড়ে ৮৬% হয়। ১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ৪,৮৯,৫৭১ জন বেশী ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নথিভুক্ত হয়েছে। ৭৯-৮০ সালে এই বৃদ্ধির হিসেব ধরা হয়েছে ২,০০,০০০ জন। সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের স্কুলের পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রীদের ৪০% কে এই পোশাক দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নিয়মিত উপস্থিতির জন্য সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের এবং অন্যান্য ছাত্রীদের ২০% কে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এছাড়া প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্লেট, পেনসিল ও খাতা দিচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। এসবের সাথে আছে ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার প্রকল্প। সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযানে নেমেছেন।

এখন, শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক করলেই ত' চলবে না, একটি শিশু বা কিশোর যাতে তা গ্রহণ করতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া চাই। এর জন্য প্রথমেই যা করা প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে—শুধুমাত্র মাতৃভাষা পড়ানো, সিলেবাসকে নূতন করে সাজিয়ে—এই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজে বামফ্রন্ট সরকার বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বভাবতঃই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরে আসে উচ্চ-শিক্ষার কথা। উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝাব স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কথা। এসমস্ত স্তরে শিক্ষার সমস্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির ও জটিল। কিন্তু তারও মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের দায়িত্ব নিলেন। অতীতের অবস্থাটা নিশ্চয় আমাদের সকলের জানা। মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীর দেয় বেতন ও কিছু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হোতো শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের। ফলে প্রতি মাসে বেতন তো' জুটতোই না, দু-তিন মাস অন্তর কিছু টাকা হয়তো পাওয়া যেত। বাম সরকারের 'পে-প্যাকেট' এই সমস্যার সমাধান করেছে। এছাড়া নূতন নূতন কলেজ তৈরী করা, মেদিনীপুরে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি উচ্চ-শিক্ষার জগতে যুগান্তকারী।

আমরা বলেছি উচ্চ-শিক্ষার সমস্যাটা জটিল, যেমন, একটি ছাত্র স্নাতক স্তরে কোন কোন বিষয় নিয়ে পড়বে, তা ঠিক করায় ছাত্র-ছাত্রীকে আরও অধিকার দেওয়া। এসব আগে ছিল না। তখন যে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে পড়ত, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী ও বাংলা পড়তে হোত। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী কখনোই ভাষা-সাহিত্যকে পাঠক্রমে রাখতে পারতনা। নূতন নিয়মে সমস্ত বিষয়গুলোকে কয়েকটি শৃঙ্খলায় (Discipline) ভাগ করা হয়েছে। যেমন কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন, যে ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে সে বিজ্ঞানের দুটি বিষয়ের সাথে অন্য যে কোন শৃঙ্খলার একটি বিষয় নিতে পারবে। যেমন, কোন ছাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইতিহাস নিয়ে পড়তে পারবে। সে যদি দুটি কলার বিষয়, যথা ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা এবং একটি বিজ্ঞানের বিষয় যথা অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়তে চায়, তাও পারবে, শুধু সে তখন কলাবিভাগের ছাত্র হবে। ভাষা-সাহিত্য পড়বার ক্ষেত্রেও এরকম। অর্থাৎ একজন ছাত্র-ছাত্রী নিজের খুশীমত বিষয় নিতে পারবে।

এরই সঙ্গে চলে আসে স্নাতক স্তর ক-বছরের হবে। পুরানো ব্যবস্থায় পাস ও অনার্স সব স্নাতকস্তরের ছাত্রকেই তিন বছর পড়তে হোত। এখন যারা পাস পড়বে, তাদের দু বছর আবার যারা অনার্স পড়বে তাদের তিন বছর। যারা পাস নিয়ে ভর্তি হবে তারাও যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাবে সেই বিষয়ে এক বছর পড়তে পারবে সাম্মানিক স্নাতক হবার জন্য। অন্যরা দু-বছর পরেই স্নাতক হবে। এইসব ব্যবস্থা উচ্চ-শিক্ষাকে আরও উপযোগী ও বৈজ্ঞানিক করেছে।

আমরা এ কথা বলে শুরু করেছিলাম যে গোটা শিক্ষা [শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়]

সুস্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা হল আপন স্বদেশকে শোষণ-মুক্ত ও মহীয়ান করে তোলা। দুনিয়ার ইতিহাসে মানুষই যেদিন থেকে মানুষকে শোষণ করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে তাকে আর সূক্ষ্ম বিচারে সভ্যতার ইতিহাস বলা যায় না। প্রায়শই মনে হতে থাকে—এ কেমন সভ্যতা, যেখানে মানুষ মানুষকে মনে করে পণ্য, তার রক্ত, শ্রম, ঘাম শোষণ করে বেঁচে থাকে। একাজটা কি ধরনের সভ্যতা?

শোষণহীন এমন ঈপ্সিত জন্মভূমি গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হল একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শন, তার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী ও কর্মনীতি এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন। শ্রেণী দ্বন্দ্বের পূর্ণ অবসান ঘটানো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা করার জন্য শোষক আর শোষিতে বিভক্ত বর্তমান সমাজটা বদলে অন্য এক সমাজে উত্তরিত হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো তার কাজ। আপনা থেকে বা সংগ্রাম না করে এ কাজ করা অসম্ভব। সমাজ বদলের এই সংগ্রামের ধারণাটা বহু ব্যাপ্ত এবং ব্যাপক। শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রাম এই লড়াই-এর মূল শক্তি, কিন্তু তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের অতৃপ্তিজনিত ক্ষোভ, ব্যথা, বেদনা। শেষ পর্যন্ত বঞ্চনার এই সুবিশাল স্তূপ ক্রোধে ফেটে পড়ে, প্রধান সংগ্রামের ধারার সঙ্গে মিশে যায়।

সংগ্রামের হাতিয়ার সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হল এই সংগ্রামের উপাদানগুলিকে পুষ্ট করে তোলার এক অনিবার্য ও তাৎপর্যময় হাতিয়ার। পুঁজিবাদী সমাজে ধনিক শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর তাদের মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং উৎপাদন সম্পর্কটিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে কোন ধরনের ছল, বল বা কৌশল প্রয়োগ করে। শ্রেণী স্বার্থের কারণেই তারা সর্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় বোধকে বিসর্জন দেয়। পুঁজিবাদী সমাজ সমস্ত কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে এবং সেই পণ্যের চাহিদা, চরিত্র ও বাজার পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সংস্কৃতিও তাই পুঁজিবাদী সভ্যতায় তাদের চোখে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ভাড়াটে ও ক্রীতদাস বুদ্ধিজীবী নিযুক্ত করে। এরাই তাদের হয়ে সমগ্র সামাজিক আবহাওয়াটি কলুষিত করার কাজটি সম্পন্ন করে। স্বভাবতই সাংস্কৃতিক ফসল নির্মাণের সময় মূলতঃ এরা যেটা দেখে তা হল—কোন্ ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্য বাজারে বিকোবে বেশী। মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এরা কলম ধরে না। এমনকি মানুষের চাহিদাটাও যাতে বিকৃত হয়ে ওঠে সে ব্যাপারেও এরা সচেতন। প্রশ্ন উঠলে জবাব আসে—মানুষ চাইছে, তাই আমরা এসব সৃষ্টি করছি। সত্যটা গোপন করে যায়।

প্রতিক্রিয়ার ফাঁদ

সমাজ বদলের লড়াই-এর জন্য ক্ষুধার্ত, ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ মানুষই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ। এটা জানে বলেই তারা সমাজে এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়, যাতে বঞ্চিত মানুষ সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত না হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং বিকাশ ঠেকিয়ে রেখে প্রাণপণে তারা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে চায়। নানা মিথ্যার আড়ালে শোষণের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চায় বা তাকে আড়াল করে রাখে এবং এই সব কাজ করতে গিয়ে তারা যে সংস্কৃতির প্রচার ও গুণগান করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি নাম দিয়েছি। এর বাইরের দিকে কিছু চাকচিক্য থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জিনিস অন্তঃসারশূন্য। এতে চোখ হয়ত ধাঁধে, কিন্তু মন ভরে না।

সংস্কৃতি কি

সংস্কৃতি হল সামগ্রিক জীবনচর্চা। মানুষকে সুস্থ, প্রাণবন্ত ও শুভবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ করা তার কাজ। অপসংস্কৃতি বলতে আমরা তাকেই বুঝছি যার পরিমণ্ডলে এবং আবহাওয়ায় গোটা জাতির মানসিক স্বাস্থ্য পীড়িত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে অজস্র সভাসমিতি, সেমিনার বা লেখা হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ শুনতে আসছেন এই সব অনুষ্ঠান। আলোচনা হচ্ছে। পক্ষে বিপক্ষে নানা মত বেরিয়ে আসছে। এই লক্ষণটা সমাজে সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন ঘটছে বলেই একথা কেউ যেন মনে না করি যে শোষকদের এই প্রয়াস ও তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগে কখনও হয়নি। সভ্যতার ইতিহাস আমাদের স্পষ্টই দেখিয়ে দেয় যে শাসকশ্রেণীর অনুসৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সংকট একটা তীব্র মাত্রায় পৌঁছলেই এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা অপসংস্কৃতির বেনো জলে মানুষের মনকে ভাসিয়ে দিতে মরিয়া চেষ্টা চালায়, সমগ্র প্রজন্মকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চায়। জীবনের শত্রু মিত্র অভিজ্ঞতায় চিনে নিয়ে আপন দুঃখ কষ্ট নিরসনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠার আগেই মানুষকে তাৎক্ষণিক মোহগ্রস্ততায় মাতিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

দুটি সংজ্ঞা

সংস্কৃতি কি? আগেই বলেছি মানুষের গোটা জীবনচর্চাই হল সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। একজন মানুষ কি ভাবে, কেমনভাবে কথা বলে, তার কাজ, ভঙ্গী, সারাদিনের মেলামেশা, চিন্তার প্রক্রিয়া, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, এক কথায় তার সমগ্র জীবনচর্চাই হল তার সাংস্কৃতিকবোধের পরিচায়ক। অপসংস্কৃতি বলতেও তেমনি আমরা শুধু যৌনতা, অশ্লীলতা, বা নিছক নোংরামি বুঝব না। এর মূল আরো গভীরে। এবং এই দুইয়েরই শিকড় সমাজ-অর্থনীতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে।

রোগলক্ষণ ও রোগ

মানুষের শরীরে একটা ব্যাধির প্রকাশ তার লক্ষণগুলির মাধ্যমে। লক্ষণগুলো ব্যাধি নয়। ডাক্তাররা লক্ষণগুলো সারান না, রোগলক্ষণ বুঝে তাঁরা সেগুলির কারণ স্বরূপ ব্যাধিটির চিকিৎসা করেন। আজকের দিনে যাঁরা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তাঁদের তাই বুঝতে হবে, যৌনবিকার বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, রিরংসা বা হীনমন্যতা শুধু এগুলিই অপসংস্কৃতি নয়। এরা সেই মূল ব্যাধির নানাবিধ প্রকাশ মাত্র।

শিল্প ভাবনার উৎস

মানুষের সমাজে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে —সভ্যতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে কখনও প্রকৃতির সঙ্গে, কখনও বা অন্যশ্রেণীভুক্ত মানুষের সঙ্গে মানুষ যে অসংখ্য সংগ্রাম করছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যে ইতিহাস—এই সব ঘটনাই হল মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, এসব থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তাই শিল্পী বা বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক নতুন নতুন শিল্পচিন্তা, তত্ত্বের, ভাবনার জন্ম দেয়। মানব সমাজ ও সভ্যতা প্রায় গোড়া থেকেই যেহেতু দুটি মূল ভাগে বিভক্ত, মোটা দাগে এই দুভাগ হল শোষক ও শোষিত—তাদের সমস্ত কার্যকলাপ যেহেতু পরস্পর বিরোধী ধরনের, ইতিহাসে যেহেতু একই সঙ্গে চিন্তার ও জীবনযাত্রার দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, মস্তিষ্ক তাই প্রায় শুরু থেকেই ভাবনার ক্ষেত্রে দু'ধরনের সামাজিক রসদ পেয়ে এসেছে। এক ধরনের শক্তি পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে সক্রিয়, যার স্বরূপ হল যেমন করে পারি আমার ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য আমি অপরকে শোষণ করব, অন্যরা যাতে তাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তার জন্য গড়ে তুলব সব রকমের দমন পীড়নের ব্যবস্থা। এই কাজের যারা নেতা, তারা হল জমিদার, মালিক, পুঁজিপতি ও তাদের দালালরা। তাদের কার্যকলাপের এক ধারাবাহিক প্রবাহ চলছে আদি যুগ থেকে—এই সব কাজের সমর্থনে। এই সব কাজকে মহিমান্বিত করে দেখাতে একদল স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী, আদর্শচ্যুত মস্তিষ্কজীবী সদাব্যাপৃত। অন্যদিকে রয়েছে অগণিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই—প্রথম দলের আঘাত প্রত্যাহৃত করতে মরণপণ প্রতিজ্ঞা। এদিকে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, অন্যান্য মেহনতী মানুষ এবং তাদের দরদী বুদ্ধিজীবীরা। দু'ধরনের জীবনযাত্রা, দু'ধরনের চিন্তা-প্রবণতা—অন্তহীনকাল ধরে মস্তিষ্কের কাছে তাই দু'ধরনের কাঁচামাল সরবরাহ হচ্ছে। দুটি পরস্পরবিরোধী ধরনের চিন্তা-ভাবনা শিল্প ও তত্ত্বের জন্ম হওয়া তাই স্বাভাবিক। প্রথম দলের শিল্প প্রচেষ্টাটা শেষ বিচারে হল অসংখ্য মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা, মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা। শোষণ, দমন ও পীড়নের জন্য শিল্প, সত্যের সূর্যকে ঢেকে দেবার জন্য শিল্প, শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বিভ্রান্ত করার শিল্প,—যে কেউ বুঝতে পারবেন এমন ধরনের প্রচেষ্টা শুভ হয়ে উঠতে পারে না। এই যে অশুভ প্রয়াস, সংস্কৃতির নাম করে এই যে কাণ্ডকারখানা, এটার জন্য ব্যাকরণসিদ্ধ একটি শব্দের অস্তিত্ব যদি না থাকে, আমরা এটাকে "অপসংস্কৃতি" বলছি, বলবো এবং সমাজের মাটি থেকে শিকড়শুদ্ধ একে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চালাবো।

বামফ্রন্টের সীমাবদ্ধতা

পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্য কয়েকটি রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের একটি বিশেষ স্তরে বামফ্রন্ট সরকারগুলির ক্ষমতালাভ আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। বামফ্রন্ট সরকারগুলি সম্পর্কে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কথাটি হল এই যে, সমাজ বদল করে মানুষের জীবনে যে মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেই কাজটা এই সরকার সমাধা করতে পারেন না। কিন্তু সেই মূল লক্ষ্যে পেঁছবার ক্ষেত্রে এই সরকারকে একটি বিশিষ্ট ধাপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেভাবে তাকে ব্যবহার করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ৩৬ দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করেছিলেন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন তাঁরা হয়ত করতে পারবেন না—কিন্তু এর মধ্যেও, সদিচ্ছা থাকলে, একটা দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষের দুঃখদুর্দশার যে কিছুটা লাঘব করা যায়, সেই কথা স্মরণে রেখেই ঐ কর্মসূচী। মানুষের জীবনকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে যদি নাও পারি, কেন তা বিকশিত হয়ে উঠছে না, তার উন্নয়নের পথে বাধা কি, এটুকু অন্তত যদি স্পষ্ট করে খুলে বলতে পারি, এবং মানুষকে তার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলার আহ্বান জানাতে পারি, সেটাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত

গোটা ভারতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট যখন ঘনীভূত, ঠিক যখন প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা সাংস্কৃতিক জগতে এক অসুস্থ নৈতিবাদী পরিমণ্ডল তৈরী করতে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে, তখনই পশ্চিমবঙ্গ ও আর কয়েকটি রাজ্যে দ্বান্দ্বিক কারণেই বামফ্রন্ট সরকারগুলির আবির্ভাব। ওরা অবিরাম চেষ্টা চালাবে এক জীবনবিমুখ ভোগলালসা-রিরংসাময় বিকৃত সংস্কৃতির স্রোত বইয়ে দেবার। এই সব নৈতিবাদী বিষয়গুলিকে মানুষের মনের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার জন্য তারা খুঁজে খুঁজে নিযুক্ত করবে আদর্শহীন একদল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিল্পী। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের চরিত্র, মত, দৃষ্টিভঙ্গী ও গোটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সুবিধামত গড়ে তোলবার

চেষ্টা করবে তারাই—সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, গান, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে।

সার্বজনীন দায়িত্ব

সংক্ষ্ম বিচারে শুধু এই নোংরা নাটক, গান, সিনেমা বা সাহিত্যই অপসংস্কৃতি নয়, তার মূল অনেক গভীরে। তার বিরুদ্ধে লড়াই দীর্ঘকালীন কঠিন লড়াই, একথা আমরা আগেই বলেছি। তবু যেহেতু ব্যাপক অর্থে জনগণের এই চিত্ত বিনোদন ও বিকাশের ক্ষেত্রটিকে ঘিরেই ঘনায়মান সংকট, তাই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা সৃষ্টির ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অসীম। তাত্ত্বিক বিতর্ক চালাতে হবে. প্রতিবাদী জনমত গঠন করতে হবে। সমাজ বদলের সংগ্রামে যথাযথ সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করতে হবে—কিন্তু সাথে সাথে পাল্টা সৃষ্টিতে মাতিয়ে দিতে হবে গ্রাম শহর, ক্ষেতকারখানা। পাল্টা সৃষ্টির বাস্তব অবস্থা ও সুযোগ তৈরী করতে হবে, এটাও কম কথা নয়। যেহেতু সামগ্রিক সংগ্রামেরই এটা একটা অংশ তাই সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষকেই এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র. যুবক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা তাঁদের নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, আংশিকভাবে দাবী আদায়ও করতে পারেন, তার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর লড়াইতে সামিল হবার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। এগুলি শাসকরা কোনভাবেই রুদ্ধ করে দিতে পারে না। চেষ্টা করলেও, অত্যাচার নিপীড়ন চালালেও তাকে অতিক্রম করতে হয়—কারণ নান্য পন্থা। কিন্তু সংস্কৃতির জায়গাটা ফাঁক থেকে গেলে বিপদ। এইখানে ওরা যখন সতর্ক জাল ফেলে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বলে দিই, ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বা ওটা আমাদের বোঝার ব্যাপার নয়, তাহলে বিপদের আশঙ্কা। শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন কৃষক সমস্যা বুঝতে হবে, কৃষককে বুঝতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি, ছাত্র যুবক বা মধ্যবিত্তকেও যেমন বুঝে নিতে হবে শ্রমিক কৃষকের সমস্যা, রাজনীতি ও মুক্তির পথ, তেমনি সবাইকেই বুঝতে হবে সংস্কৃতির সংকট, বিপদ ও তার প্রতিরোধের কথা। এ কাজটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখলে চলবে না, শুরু করতে হবে এখন থেকেই। শত্রুরা জানে সচেতন মানুষকে এই বিষ দিয়ে পঙ্গু করা যাবে না, তাই মুখ্যত তাদের লক্ষ্য হল অসচেতন মানুষ ও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা। জীবনের সঠিক পথ চিনে, আন্দোলনে সামিল হবার আগেই যদি ব্যাপক মানুষকে চিন্তার ক্ষেত্রে পঙ্গু করে তোলা যায় তাতে ভবিষ্যতের লড়াইতে এ পক্ষের সৈনিক কমে যাবে এই পরিকল্পনায় তারা ফাঁদ পাতে। সতর্কভাবে আমাদের তা এড়াতে হবে।

দায়িত্বশীল সরকারের ঘোষণা

এবং পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সক্রিয়ভাবে সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তাঁরা ইতিমধ্যেই বিরাট কিছু করেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রকাশিত হয়েছে। তিন বছরের কার্যকলাপে মানুষ তা ক্রমে উপলব্ধি করছেন। সরকার গঠন করার অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করেছিলেন। এবং এমন ঘটনা ভারতবর্ষে তেত্রিশ বছরে এই প্রথম। তিনি বলেছিলেন, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। বলেছিলেন, "কোন দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।" বুদ্ধির বিচারে এটা লজ্জার, যে এই প্রশ্নও উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রী কি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রের মানুষ? না—মুখ্যমন্ত্রী জীবনের সপক্ষের মানুষ। সংস্কৃতি চর্চা মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ—তাই মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ঐ আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সংস্কৃতির নামে যাঁরা জীবনের অগ্রগতিকেই রুদ্ধ করে দিতে চাইছেন তাঁরাই মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকে অনধিকার চর্চা বলে বালকোচিত সমালোচনা করছেন।

প্রাক পরিস্থিতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

তিন বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। তবু একটা সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পক্ষে সময়টা কমও নয়। এ রাজ্যে এই সরকার গঠনের সময়ে সমগ্র রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন ছিল তা কেউই বিস্মৃত হন নি। সেই থমথমে অবস্থা কাটিয়ে একটা সুস্থ, ভয়হীন, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা এই সরকারের প্রথম সাফল্য। শিক্ষার বিস্তার সংস্কৃতি চর্চার ও সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ৭৭ সালের আগে প্রায় সাত আট বছর ধরে এই রাজ্যে শিক্ষা বিষয়ক প্রতিটি দিক নিদারুণভাবে অবহেলিত ও আক্রান্ত হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধ টোকাটুকি করা এক শ্রেণীর ছাত্র নিজেদের অধিকার বলে ভাবতে শুরু করেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যে আমাদের ঐতিহ্যময় শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে একটা থমথমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাকে কাটিয়ে তুলে এখন সেখানে পড়াশোনার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা এবং সময়মত পরীক্ষা নিয়ে, তার ফল প্রকাশে এই সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। সিলেবাসগুলি পরীক্ষামূলকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে, শিক্ষার আলো বহুতর মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য এঁরা নানা ব্যবস্থা নিচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। সেগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগ করা যাচ্ছে। এঁরা স্কুল পর্যায়ের সমস্ত ক্লাসগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সমস্ত খরচ চালানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রও এঁদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই রাজ্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা এর আগে অন্য কোন সরকার করেন নি।

মাতৃভাষা ও সংখ্যালঘুদের সম্মান

রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সহজ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আর সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা—এগুলি বামফ্রন্ট সরকারের সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের জন্য তাঁদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর

প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দিক। রাজ্যসরকার যুগপৎ অন্ততঃ ৬টি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। সেগুলির সাফল্য অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবনা ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ এতে থাকছে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু মূল্যবান সৃজনমূলক রচনা। প্রথিতযশা বহু লেখক এই সব কাগজে লিখছেন। বিগত সরকারের আমলেও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে দেখেছি—তখন এই কাগজ কেউ নিয়মিত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন বলে শুনিনি। এর প্রচার সংখ্যা ছিল খুব বেশী হলে হাজার তিনেক। বর্তমান সরকারের প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা প্রায় লক্ষের ঘরে পৌঁছতে যাচ্ছে। সরকারী কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা ভাষাকে পুরোপুরি চালু করেছেন। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, চিন্তা করেন—তাঁরা যদি কাজ করার জন্য এমন একটি ভাষা ব্যবহার করেন, যার আশ্রয়ে তাঁরা বেড়ে ওঠেন নি, তাহলে কাজের গতি ও পারিপাট্য কমে যায়। অন্য ভাষাগুলি তা বলে অবহেলিত হয়নি। বরঞ্চ প্রতিটি আঞ্চলিক উপভাষা ও অন্যান্য ভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অলচিকি ও নেপালীভাষাকে এঁরা সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। নেপালী শিল্প আঙ্গিক ও সাহিত্যকে উৎসাহদানের জন্য একটি নেপালী একাডেমী স্থাপন বামফ্রন্ট সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিগুলি বিকশিত হয়ে না উঠলে, গোটা রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সেদিকে নজর রেখেই তাঁরা এই সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। একটি রাজ্যে একটি বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যায় বেশী বলে সেই মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকেই একমাত্র বলে চালাতে হবে, বুদ্ধির এমন মারাত্মক বিকার আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি—সংখ্যালঘুর ভাষাকে প্রয়োজনীয় ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন সেইসব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ।

আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা নয়

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এই সরকার নানাবিধ কর্মসূচী নিয়েছেন। নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা বা সাহিত্য কোনটিতেই তাঁরা অবহেলা করছেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে তা হল ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এখানে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতার অভ্যাসবর্জন। এই সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র গতিশীলতার বিরোধী। তাঁরা যে পালটাতে পারেন না, এমন নয়, কিন্তু দীর্ঘকালের গতানুগতিক চরিত্র বজায় রেখে চলতেই তাঁরা অভ্যস্ত। বামফ্রন্ট গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে সেখানে গ্রামোন্নয়নের কাজটি আমলাতন্ত্রের হাত এড়িয়ে সরাসরি গ্রামের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় Municipal Act চালু হতে যাচ্ছে, কর্পোরেশনের কাজকর্মের বিবিধ পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর নির্ভরশীলতা তাতেও অনেকটা হ্রাস পাবে। সংস্কৃতি দপ্তরের কাজকর্মেও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে। শিল্পচর্চার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনাগুলি এখন আর সরকারী অফিসারদের মর্জিমাফিক হচ্ছে না—কি করা হবে সেটা ঠিক করছেন বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ শিল্পী এবং বোদ্ধা মানুষেরা। সরকার এঁদের নিয়ে অনেকগুলি কমিটি করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংস্কৃতিক কাজকর্মে নিঃসন্দেহে নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করবে। অপসংস্কৃতির বিষাক্ত প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে প্রগতিশীল চিন্তার লেখকশিল্পীরা বিগত কয়েক বছর ধরে নানা আন্দোলন ও সৃজনমূলক প্রয়াস চালাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে তা প্রভূত সাড়া এনেছে। "অপসংস্কৃতি কাকে বলে—কেন তা খারাপ—কেমন করে তা রোখা যাবে", শুধু এবিষয়ে আলোচনা শোনার জন্য গ্রামে শহরে নানা সভাসমিতি হচ্ছে এবং তা শুনতে আসছেন অসংখ্য মানুষ। এই রকম সমস্ত প্রয়াসকে আন্তরিক মদত দিচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। কোথাও বা সৎ সংস্কৃতির প্রয়াসে আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সরকারী আনুকূল্যে এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে আমরা বহুবিধ অন্যায় ও নৈতিবাদী কাজ হতে দেখেছি। বহু সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি সম্পর্কে শোনা গেছে বহু নোংরা অভিযোগ। লম্পট, গুণ্ডা বা সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্য মদত পেয়েছে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কাছে। স্বাধীনতা-উত্তর তিরিশ বছরে সবার মধ্যে একটা ধারণা তিলে তিলে তৈরী হয়েছে, যে অসৎ পথ অবলম্বন না করলে, ঘুষ না দিলে, ব্যক্তিস্বার্থে নিজেকে ব্যবহৃত হতে না দিলে এদেশে প্রায় কোথাও কোন কাজ হবার নয়। জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে এমন ধারণা জাতির মধ্যেই তৈরী হলে ভয়ানক বিপদের কথা।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র হল শিল্প সংস্কৃতির জগতে সবচেয়ে জনচিত্তজয়ী ও ব্যাপকতম মাধ্যম। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, যে এই শিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমাণ টাকা ঢেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নিজেদের মুনাফা অর্জনের চেয়ে মানুষের চরিত্রগঠন ও জীবনমুখী হয়ে ওঠাকে বড় করে দেখবেন না। সমাজে সংকট যত বাড়বে, সেই সংকট সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা হবে, মানুষ সেই ভার বহন করতে চাইবে না—অত্যাচার, নিপীড়ন হবে এবং তা প্রতিরোধও হবে। একই সঙ্গে চেষ্টা হবে এই সব সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার। স্বভাবতই এই জনপ্রিয়তম মাধ্যমটিকে সে কাজে ব্যবহার করা হবে। এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সমস্যা বা তা থেকে উত্তরণের পথের কোন হদিশ নেই। বদলে কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা, তাৎক্ষণিক মোহগ্রস্ততা, উদ্ভট কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক ভাবালুতা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব চলচ্চিত্র। বহু গবেষণায় এসব তৈরী করে মানুষের মনের ক্ষিধে মেটানো হবে, তাকে অভ্যাস করানো হবে এই বিষ পান করতে এবং বলা হবে মানুষ চাইছে বলেই এসব তৈরী হচ্ছে। অথচ জীবনের প্রসারিত অন্য দিক পড়ে আছে। সেই জীবনের ছবি সম্পর্কে এরা চোখ বুজে থাকবে। বামফ্রন্ট সরকার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এসেছেন এই অন্য জীবন, অন্য ছবির শিল্পায়নের সাহায্যে। তাঁদের ক্ষমতা কম। একচেটিয়া বাজারে অনুপ্রবেশ করা কঠিন, তবু তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতি বছর অন্ততঃ

২০টি দলিল চিত্র তুলবেন—পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে মানুষের অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই কিভাবে চলছে, দেশগঠনে নতুন উদ্যমে গ্রামের মানুষ কেমনভাবে নেমেছেন পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে, তা দেখানো হবে। দেখানো হবে, যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মানুষ নবচেতনার মন্ত্রে কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সরকার শিশুদের জন্য ছবি তুলছেন, প্রযোজনা করছেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র। ছবি তোলার জন্য বিশিষ্ট পরিচালকদের অনুদান দিচ্ছেন, যাতে তাঁরা আর্থিক বাধাটা অন্ততঃ আংশিকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন। ছবি রিলিজের সমস্যাটা এখনও রয়েছে—ছবি তোলার পর যাতে তা দীর্ঘকাল বাক্সবন্দী পড়ে না থাকে, সেটা দেখা খুব জরুরী। প্রযোজক পরিবেশকদের দীর্ঘকালের তৈরী করা বেড়াজাল, তাকে ছিন্ন করা কঠিন, সময় সাপেক্ষ। বাইরে থেকেও এ রাজ্যে প্রসিদ্ধ ও উন্নতমানের পরিচালকরা ছবি তুলতে আসছেন। তাতে পশ্চিমবাংলায় তোলা ছবি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আসন পাবে, প্রচার লাভ করবে। সম্মান ও আর্থিক প্রশ্ন দুটোই এতে জড়িত। আমাদের ষ্টুডিয়ো ও লেবরেটরীগুলি উন্নত মানের যন্ত্রের অভাবে বহু সময়েই কাজের পারিপাট্য বজায় রাখতে পারে না, বা বহুসময়েই সেখানে কাজের অগ্রগতি হয় অত্যন্ত শ্লথ। সরকার উন্নতমানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছেন। ষ্টুডিয়োয় ব্যবহারের উপযোগী উন্নতমানের ক্যামেরা কিনেছেন, যাতে পরিচালকরা কম ভাড়ায় তা পেতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা মৃতপ্রায় টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিয়োর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সল্ট লেকে রঙ্গীন ফিল্ম লেবরেটরী তৈরীর কাজও প্রাথমিকভাবে শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রসদনের পেছনের জমিতে করেছেন আর্ট থিয়েটার। সারা রাজ্যে ফিল্ম থিয়েটার স্থাপনের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি ফিল্ম ডিভিশন স্থাপনের। গত তিন বছরের মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার ৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। ৩টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের শিশুচিত্র এবং ২৮টি তথ্যচিত্র-ও এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রগৃহে মানুষ সেগুলি দেখছেন। চলচ্চিত্র হিসাবে সেগুলির বিচার হবে ইতিহাসের গতিধারায়। আপাতত আমরা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে দাঁড়াচ্ছি।

নাটক

নাটক হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ আর একটি দিক। আমাদের এখানে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার একটা সুস্থ চিন্তার নাট্য আন্দোলনের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা অসুবিধা, মতাদর্শগত সুক্ষ্ম পার্থক্য, আর্থিক অসংগতি, হলের সমস্যা সত্ত্বেও তাঁরা থামেন নি। সাম্প্রতিককালে কলকাতার থিয়েটারে সংস্কৃতির নামে যে অবাধ চূড়ান্ত নোংরামি চলছে তা আমাদের সমস্ত ঐতিহ্যের কলঙ্ক। তাকে বাধা দেওয়া এঁদের আর একটা কাজ। নতুন নতুন নাট্যচর্চার মাধ্যমেই তাঁরা তা করছেন। দায়িত্বশীল ও সৎ কিন্তু বিচ্ছিন্ন এই প্রতিবাদী প্রচেষ্টাগুলির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই সরকার। ৭৮ সালে সরকারী উদ্যোগে নাট্যোৎসব করে প্রগতি নাট্যচর্চার প্রতি তাঁরা তাঁদের সংহতি জানিয়েছিলেন। ৭৯-তে নিয়েছিলেন জেলায় জেলায় নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা। এখন শুরু হয়েছে নতুন নতুন মঞ্চ নির্মাণ, জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবনগুলির সংস্কার। টাউন হলগুলি মেরামত করা হচ্ছে। অপেশাদার নাট্যদলগুলি কম ভাড়ায় এগুলি পেলে তাঁদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটবে। কয়েকদিন আগে শ্রীজ্যোতি বসু উত্তর কলকাতার গিরীশ মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নাট্যমোদীদের বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। প্রবীন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীমন্মথ রায় আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আশীর্বাদ জানিয়েছেন এই পদক্ষেপকে। সরকার আর্ট গ্যালারীর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছেন, গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে নানাবিধ করদান থেকে রেহাই ও আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। দুঃস্থ শিল্পীদের এককালীন সাহায্য ও পেনশন দিচ্ছেন। অনেক ব্যক্তি-শিল্পী-প্রতিভাও এই রকম সাহায্য পাবেন। কেন্দ্রীয় ও জেলাস্তরে তাঁরা আয়োজন করেছেন নাট্য প্রতিযোগিতার। সব মিলিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এ এক নতুন যুগ। সরকার এগিয়ে এসেছেন। যৌথ ঐক্যবদ্ধ বেসরকারী প্রচেষ্টার পাশে দাঁড়াচ্ছেন—প্রতিক্রিয়ার শক্তি থেমে থাকবে না। নতুন নতুন উদ্যমে তারা বাধা সৃষ্টি করবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে যখন এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার একটি নাট্যমঞ্চে সকল স্তরের লেখক-শিল্পীদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তার জন্য আবেদন জানালেন, তার অব্যবহিত পরেই সেখানেই শুরু হল নাটকের নামে বেলেল্লাপনা। সচেতন জনমত গড়ে তুলে মুখর প্রতিবাদে এই হীন চক্রান্তকে দমাতে হবে।

চিত্রকলা

চিত্রকলার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু এবার সেদিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু ছাপা Poster Set বেরিয়েছে—লেখা ও রেখায় যা সহজেই মানুষের মন স্পর্শ করে। বক্তব্য ও অলংকরণে সমৃদ্ধ এই Set গুলিকে বহু সংগঠন বিনা খরচে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করছেন। জাতীয় মিউজিয়াম ও গ্যালারী তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের অতীত দিনের শিল্পীদের কিছু উন্নত মানের কাজ যথাযোগ্য মর্যাদায় চিরকালের জন্য যাতে সংরক্ষিত হতে পারে সেটা দেখা একটা বিরাট কাজ।

সাহিত্যচর্চা

সাহিত্যের নানা দিকে নানা ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের ক্রমশই উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রপুরস্কার পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সেবীদের কাছে অন্যতম প্রধান সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ এই পুরস্কারকে ঘিরে কয়েকবছর আগেও যেসব নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক। রবীন্দ্রপুরস্কারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে তুলে এনে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে বামফ্রণ্ট সরকার তাকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি পুরস্কার পুনরায় প্রবর্তন করে সাহিত্যিক সমাজে সঞ্চার করেছেন নতুন উৎসাহের। সেই সঙ্গে নতুন

কয়েকটা পুরস্কার দেওয়ার কথাও তাঁরা ভাবছেন। এগুলির অর্থমূল্য নেহাৎ কম নয়, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। সমাজগঠনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সাহিত্যিকদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও উৎসাহিত করার যে দৃষ্টিভঙ্গী এ থেকে বেরিয়ে আসছে, সেটাই আসল কথা।

বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিয়ে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্র রচনাবলী। প্রকাশ করার কথা ভাবছেন শরৎচন্দ্র, নজরুল, মানিকের সমস্ত লেখা। আরও কিছু চিরায়ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রনের কথাও তাঁরা ভাবছেন। যে ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে সভ্যতা ও সমাজ আজকের স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এক মহান দায়িত্ব। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে ভারতবর্ষের মহান সন্তানদের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাজ্ঞব্যক্তিদের আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা পালন করেছেন ইকবাল ও প্রেমচাঁদ জন্মশতবার্ষিকী। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে "আলোর ফুলকি" নাম দিয়ে যে শিশু সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কোন কোন মহল থেকে তার অর্থহীন সমালোচনা করা হচ্ছে, এটা আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু তাতে এই প্রয়াসের গৌরব কমে নি। নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করার কথা তাঁরা ভাবছেন। ভাবছেন দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পেনশন দেওয়া যায় কিনা। সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক বিনয় ঘোষের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বহন করে বামফ্রন্ট সরকার গোটা দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্করকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে অবহেলিত এই শিল্পীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এঁরাই। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাই।

বিবিধ প্রয়াস

সমগ্র এশিয়ার অসংখ্য জাতি ও বৈচিত্রময় জীবনচর্চার মানুষের সাংস্কৃতিক বোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্য Netaji Institute for Asian Studies তৈরী হচ্ছে। দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতে দুটি নতুন তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে, চা বাগান ও কয়লাখনি অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে শ্রম তথ্যকেন্দ্র। রাজ্যসরকারের তথ্য দপ্তরের কাজ এখন আর শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্লকস্তর পর্যন্ত। সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য এ রাজ্যে একটি সংগীত একাদেমী স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্নতাত্বিক বিষয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছে প্রত্নতাত্বিক গ্যালারী। লোকরঞ্জন শাখার কাজকর্ম গোটা রাজ্য জুড়ে প্রসারিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুক্ত হয়েছে জীবনের সপক্ষে বহু নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস। ঝাড়গ্রাম ও শিলিগুড়িতে লোকরঞ্জন শাখা স্থাপিত হয়েছে আঞ্চলিক মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদার দিকে নজর রেখে। রাজ্যসরকার একটি লোকসাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন করেছেন। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোক উৎসব, সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা দেশের লোকজীবনে প্রচলিত ঐতিহ্যময় বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সংস্কৃতি দপ্তর ছোট বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের ব্যাপক প্রচার করছেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত নীতি চালু হয়েছে—ছোট বড় সমস্ত রেজিস্টার্ড কাগজই বিনা তদবিরে বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এরই মাধ্যমে গোটা দেশের মানুষের কাছে তাঁদের এই ব্যাপক কর্মউদ্যোগ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পরিচিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী

আমরা যেগুলি উল্লেখ করলাম সেগুলি বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এর গুরুত্ব সর্বভারতীয়। এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রভাব গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী মানুষের ওপর পড়তে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান সমাজকে পালটে যে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে পৌঁছবার পক্ষে এই কার্যকলাপ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। গভীরভাবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপাতত আরও কি কি আমরা করতে পারি। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সেই কাজ আমাদের করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন্ কাজ কতটুকু করা হল তথ্য ও সংখ্যার বিচারে সেটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল মানুষের প্রতি এক দরদী দৃষ্টিভঙ্গী। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রটি মুষ্টিমেয়র লীলাবিলাসের কব্জা থেকে উদ্ধার করে ব্যাপক মানুষের অংশ গ্রহণের উদার ক্ষেত্রে পরিণত করার যে অঙ্গীকার বর্তমান সময়ে উদ্ভাসিত হয়েছে সেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বহু মানুষের দ্বারা চর্চিত না হলে সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটাময় সুরভিত কুসুমটি বাঁচে না। বন্ধ দুয়ারের আড়াল থেকে বের করে এনে তাকে স্থাপিত করতে হবে বহু মানুষের বিস্তীর্ণ আঙিনায়। মনে রাখতে হবে, এ কাজ খুব সহজে কুসুমাস্তীর্ণ পথে করা যাবে না। প্রতিক্রিয়ার সক্রিয় বাধা আসবে। মরণাপন্ন পুঁজিবাদী সভ্যতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে আজ কোণঠাসা। তার পূতিগন্ধময় শরীরে এখন জাগণের মনোহরণকারী কোন আকর্ষণ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবার আগে সে চরম আঘাত হানার চেষ্টা করবেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা বারবার দেখা দেবে। সমাজে তাদেরই সৃষ্ট ক্ষতগুলির দিকে বীভৎস অঙ্গুলি নির্দেশে তারা দেখাবে এই হল অনিবার্য ও একমাত্র বাস্তব। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন করে তোলবার চেষ্টা করবে আজকের প্রজন্মকে। বর্তমানকে করে তুলবে বিষণ্ন, ভবিষ্যতকে নির্দিষ্ট করবে অনিশ্চিত বলে। চোখ কান খোলা রাখলে দৃষ্টি এড়াবে না যে এক বিশাল দায়িত্বের সামান্য যে প্রারম্ভিক কাজ এই সরকার শুরু করেছেন, কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে তাতেই নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অকারণ, মিথ্যা ও হাস্যকর সমালোচনা করা হচ্ছে বাজারী কাগজে, অর্ধশিক্ষিত নেতাদের বক্তৃতায়। তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু দায়িত্ব নেবার আছে। একটা সংগ্রাম চলছে, চলবে দীর্ঘকাল। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের বহু ঐতিহ্যময় দেশকে, সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে হবে ঈপ্সিত কাঙ্ক্ষিত লোকে। সে কাজে হাত লাগাতে হবে সকল স্তরের মানুষকে শ্রমে, সচেতনতায়।

বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর ও যুবকল্যাণ বিভাগ

অরুণ সরকার

বিষয়টি অবতারণার আগে বলা প্রয়োজন যে যুবকল্যাণের যাবতীয় উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য সারা ভারতের অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম একটি পৃথক দপ্তরের সৃষ্টি করা হ'য়েছে এবং সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজও অদ্বিতীয়।

আমাদের সমাজে দারিদ্র আছে, ক্ষুধা আছে. কর্মহীনতা আছে, আছে নিরক্ষরতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগের অভাব; সামাজিক সংকীর্ণতা ও উন্নাসিকতা আছে, আছে সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের সীমাবদ্ধতা। আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুবসমাজও এই ঘনীভূত সংকটে নিমজ্জিত। এই সামগ্রিক সমস্যা ছাড়াও যুবসমাজের কিছু নিজস্ব চাহিদা, কিছু অভাব ও আবেদন, কর্মসংস্থানের অভাবনীয় অপ্রতুলতা, সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে হাজারো প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়েই যুবজীবনের বর্তমান চালচিত্র।

সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সব সমস্যার মৌল সমাধান সম্ভব নয়। যুবসমাজের চাহিদা সীমাহীন আর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অতি সীমিত। তবুও এরই মধ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতাকে মূলধন ক'রে এই বিভাগ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ক'রে যুবজীবনের এই বেদনাকে একটু প্রশমিত করা যায়, একটু সুযোগ, একটুখানি অধিকারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তারা উপলব্ধি করতে পারে যে সরকার তাদের সমব্যথী এবং সাথী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামমুখী। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে কিছু কিছু প্রকল্পের সুযোগ সকলের জন্য নির্দিষ্ট। আরও অধিকমাত্রায় শহরগুলিকে বিশেষকরে শহরের অনগ্রসর এলাকাগুলিকে এই বিভাগের কাজের পরিধির মধ্যে আনার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত তিন বছরে আমরা যেসব কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পেরেছি তার কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হ'য়েছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

কর্মক্ষম মানুষের কাজের সংস্থান না থাকা তার জীবনের এক চরম অভিশাপ। দুঃসহ বেকারীর জ্বালায় যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত। এই হতাশা ও বিভ্রান্তির অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল তার নৈতিক মানের অধঃপতন এবং প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই দুরূহ সমস্যার বন্ধমূল সমাধান যদিও সম্ভব নয় তবু যুবকল্যাণ বিভাগ তার সীমিত সংগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণ লগ্নীসংস্থা শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ সাধারণতঃ ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন এবং এই বিভাগ থেকে প্রান্তিক ঋণ হিসাবে বাকী ১০ ভাগ মঞ্জুর করা হয়। যে সমস্ত প্রকল্প অতিরিক্ত কর্মসংস্থার খাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে, ছাগল ও শূকর পালন, সার/ মণিহারী/বই/তৈরী পোষাক ইত্যাদির দোকান স্থাপন, মোমবাতি/ছাতা/টালি/খেলাধুলোর সাজসরঞ্জাম/পুতুল/সাবান ইত্যাদি তৈরীর কারখানা স্থাপন এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবহণ প্রকল্পে প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হ'য়েছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে বিগত তিন বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল—

(১) যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রান্তিক ঋণের পরিমাণ— ৩০,৯৪,২৬০,০০

(২) প্রকল্প সমূহে নিয়োজিত মোট অর্থের পরিমাণ— ৩,০৯,৪২,৬০০,০০

(৩) এই সব প্রকল্পে মোট নিযুক্তির সংখ্যা—২৪০০ জনেরও বেশী

পর্বতাভিযান, পর্বতারোহণ শিক্ষণ, ট্রেকিং ও স্কীয়িং

যুবসমাজকে দুঃসাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবার মত মানসিকতা সৃষ্টি করার কাজে যুবকল্যাণ বিভাগের যেসব কর্মসূচী নেওয়া হ'য়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পর্বতাভিযান ও ট্রেকিং অভিযান পরিচালনায় অর্থ সাহায্য দেওয়া এবং পর্বতারোহণ ও স্কীয়িং এ প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া। পর্বতাভিযানে এ রাজ্যের পর্বতারোহীদের সাহায্য করার জন্য চলতি আর্থিক বছর থেকে এই বিভাগ একটি সরঞ্জাম ভান্ডার গড়ে তুলেছে এবং এ বিষয়ে পর্বতারোহীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপনের কাজও সমাপ্তির পথে।

বিগত তিন বছরের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল।

(ক) বিগত তিন বছরে পর্বতাভিযান পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পর্বতারোহী সংস্থাকে মোট ২,২২,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হ'য়েছে।

(খ) ঐ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'য়েছে—
(১) পর্বতারোহণের জন্য—৪৬ জনকে।
স্কীয়িং-এর জন্য—১৪ জনকে।

(গ) সরঞ্জাম ভান্ডার ও পাঠাগারের জন্য নির্দিষ্ট মানের সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মহাশয়কে ২,৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে। কিছু সরঞ্জাম কেনা হ'য়েছে এবং তার বিতরণের কাজও শুরু হ'য়েছে।

স্কাউটিং, গাইডিং, ব্রতচারী ও মণিমেলা

শিশু ও কিশোর কিশোরীদের চরিত্র গঠন, শরীর গঠন, নিয়মানুবর্তীতা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই বিভাগ থেকে ভারত স্কাউট এবং গাইড, ব্রতচারী মণিমেলা ইত্যাদি সংস্থাকে প্রতি বছর দেড় লক্ষ টাকারও অধিক অনুদান দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের কার্যক্রম

১৯৭৯ সালটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত ছিল—ঐ বছরটি যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে এই বিভাগ পালন করেছে। ঐ বছর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা আমাদের অধীন তিনটি শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দ্রের মাধ্যমে কলকাতার বস্তি এলাকার শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ও প্রমোদানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

অসম-সাহসিকতার জন্য উৎসাহদান প্রকল্প

মহৎ উদ্দেশ্যে সাহসিকতার জন্য যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবকল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম

যুবকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞান কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরা। বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারেই নিবদ্ধ নয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গেও যে বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনকে যুক্তিবাদী করে, কুসংস্কার দূর করে আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বস্তুবানুগ মূল্যায়ণে পরিমন্ডল সৃষ্টিতে সহায়তা করে—বিজ্ঞানের এইসব মূল্যবান বার্তাকে গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দেবার কাজে আমরা ব্রতী।

বিগত তিন বছরে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করেছি—

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে সংগঠিত করে একে সুসংহত ও গতিশীল করে তুলতে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপূরক কারিগরি সাহায্য আমরা পাচ্ছি ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার কাছ থেকে। গত আর্থিক বছরে ৪৭টি বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ২৩,৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'য়েছে।

বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রতিবৎসর নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও বিজ্ঞানমেলা ও শিবির পরিচালনা করে আসছে।

বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ঃ—এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র চারটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লকস্তর, (২) জেলাস্তর (৩) রাজ্যস্তর এবং (৪) আন্তরাজ্যস্তর। এই প্রতিযোগিতায় উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে। বিগত তিন বছরে এই প্রতিযোগিতায় ৪০০০ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতি স্তরের প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে।

জেলা বিজ্ঞান মেলা ও পূর্বভারতীয় (আন্তঃরাজ্য) বিজ্ঞান শিবির—

এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের তৈরী মডেল ইত্যাদির প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়—(১) জেলা পর্যায় ও (২) আন্তঃরাজ্য পর্যায়। এই প্রতিযোগিতায় বিগত তিন বছরে ২৮০০ জন অংশ গ্রহণ করেছে এবং কৃতি অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হ'য়েছে।

জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন—

গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উন্নতিকরণ, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন, বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান, স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য পুরুলিয়ায় একটি জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা ও যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রূপায়ণ করা হবে। যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে এ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হ'বে; এর মধ্যে ২ লক্ষ টাকা ইতিপূর্বেই এই বিভাগ থেকে গত আর্থিক বছরে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প সমূহ

বিদ্যালয় সমবায়—

সম্বলহীন দুঃস্থ পল্লীবাংলার ছাত্রছাত্রীদের নায্যমূল্যে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ সমূহ সরবরাহের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে বিদ্যালয়-সমবায় স্থাপনে আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করা হয়। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে ১৭৯টি বিদ্যালয় সমবায় স্থাপন করা হ'য়েছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হ'য়েছে ৬২,০০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী।

পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার—

ব্লক এলাকার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য প্রতি ব্লকে পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার স্থাপনের এক প্রকল্প এই বিভাগ থেকে নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হ'য়েছে। এর মাধ্যমে মোট ৬২,৪৩৬ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হ'য়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান—

মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যায়তন সমূহের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান এই বিভাগের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। প্রতি আর্থিক বছরের শুরুতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ বিদ্যায়তন সমূহ থেকে আবেদনপত্র আহবান করা হয়। যাতায়াতের রেলভাড়া ও অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের খাইখরচা বাবদ অনুদান এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিগত তিন বছরে এ বাবদ ৮১০টি বিদ্যায়তনকে মোট ১৫,৫৭,১০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'য়েছে। উপকৃত

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫,৮৫০ জন। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪০০ জন।

বিভাগীয় পত্রিকা 'যুবমানস' প্রকাশন

বর্তমান সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর এই পত্রিকাটিকে ত্রৈমাসিক স্তর থেকে মাসিক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে এবং এর প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার করা হ'য়েছে। যুব জীবনের নানাবিধ সমস্যার সঠিক প্রতিফলনে, যুব জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশনে, দেশ ও বিদেশের তথ্য ও সংবাদাদির প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনে, যুব সমাজকে একটি সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক পথনির্দেশনায় এবং তাঁদের সাহিত্যচেতনাকে প্রগতিবাদী করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'যুবমানস' প্রকাশনা করা হচ্ছে। এই পত্রিকাটি যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হ'য়েছে।

যুবকল্যাণ কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাবে রূপায়ণে অধিক সংখ্যায় যুব অফিস স্থাপন

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার সময় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ৪০টি ব্লক যুব অফিস খোলা হ'য়েছিলো। যুব সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম যাতে আরও প্রসারিত করা যায় এবং যাতে অবহেলিত যুব সম্প্রদায়ের আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত তিন বছরে নতুন ২৮৭টি ব্লক যুব অফিস খোলা হ'য়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় ব্লক যুব অফিসের সংখ্যা ৩২৭। এতাবৎকাল কেন্দ্রীয় সরকারের জেলাস্তরের যুবকেন্দ্র সমূহ এই বিভাগের জেলা অফিসের দায়িত্বপালন করে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায় জেলা পর্যায়ের যুব অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মীনিয়োগের কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। অনতিবিলম্বেই এই জেলা যুব অফিসগুলি দায়ীত্বভার গ্রহণে সক্ষম হ'বে।

বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচী

রাজ্যের বয়স্ক-নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা ও তৎসহ বিধিমুক্ত শিক্ষাদানের জন্য এই বিভাগ একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে ক'লকাতার বস্তী এলাকা ও হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চলে ৩০০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

যুব আবাস প্রকল্প

গণ্ডীবদ্ধ জীবনের কূপমণ্ডুকতা যুব জীবনের এক অভিশাপ। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে, তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে, সুখ-দুঃখ-আশানিরাশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতা দান যুব সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছার অভাবের জন্যই নয় আর্থিক অনটনই যুব সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশকে ভ্রমণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। যুব সম্প্রদায়ের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে সস্তায় স্বল্পকালীন বাসের জন্য রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে যুব আবাস স্থাপনের কর্মসূচীকে আরও সম্প্রসারিত করার কাজে যুবকল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যের বাইরে রাজগীরে যুব-আবাস এর জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হ'য়েছে। পুরীতে একটি যুব-আবাস স্থাপনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হ'য়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যের বাইরে আরো যুব-আবাস স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়-ভাবে বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

রাজ্যের ভিতর শিলিগুড়িতে একটি ২০ আসনবিশিষ্ট যুব-আবাস সম্প্রতি স্থাপন করা হ'য়েছে। দীঘাতে, লালবাগে যুব-আবাস তৈরীর কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী চলছে। আশাকরা যাচ্ছে এই বছরের মধ্যেই নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

শুশুনিয়া এবং বোলপুর যুব-আবাস স্থাপনের প্রাথমিক কাজ পূর্তবিভাগ শেষ করেছেন এবং নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

রাজ্য যুবকেন্দ্র

কলকাতার মৌলালীতে রাজ্য যুবকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের জন্য একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে। ঐ প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকার উপরে।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাজ্য যুবকেন্দ্রে থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, জিমনাসিয়াম, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক যুব-আবাস, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বহুতল বিশিষ্ট কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে।

কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গণ মঞ্চ স্থাপন

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে (ক) কমিউনিটি হল ও (খ) মুক্তাঙ্গণ মঞ্চ স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্প দুটির খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসেবে দেওয়া হ'য় এবং বাকী ৫০ ভাগ খরচের দায়ীত্ব স্থানীয় উপকৃত জনসাধারণের। প্রতিটি কমিউনিটি হ'লের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১২,৫০০ এবং মুক্তাঙ্গণ মঞ্চের ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ ৭০০০। জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই প্রকল্প দুটি রূপায়ণ করা হয়। এপর্যন্ত ১১৮টি কমিউনিটি হ'লের জন্য মোট ১৪,৭৫০০০ ও সম-সংখ্যক মুক্তাঙ্গণ মঞ্চের জন্য ৮,২৬,০০০ টাকা এই বিভাগ থেকে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নতিতে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী

গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনে যুবকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল—

(১) খেলার মাঠ স্থাপন

খেলার মাঠের অপ্রতুলতা গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নয়নের একটি অন্যতম অন্তরায়। এই অসুবিধা দূরীকরণে এই বিভাগ খেলার মাঠ স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হ'য়েছে। এই প্রকল্পে খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। এই সাহায্যের পরিমাণ মাঠ পিছু ২৫০০০ টাকা। এই প্রকল্পটিরও রূপায়ণ স্থানীয় জেলাপরিষদের মাধ্যমেই

করা হয়। এই খাতে এ পর্যন্ত মোট ১৪৭টি খেলার মাঠের জন্য ৩৬,৭৫,০০০ টাকা বিভাগ থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

(২) ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহ দেবার জন্য প্রতি বছরই যুব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লক স্তর (২) জেলা স্তর ও (৩) রাজ্য পর্যায়।

(৩) খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ

খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব গ্রামীণ খেলাধুলার আর এক অন্তরায়। এই কথা মনে রেখে এই বিভাগ খেলাধুলার সরঞ্জাম বিলির কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প বাবদ বিগত তিন বছরে এই বিভাগ ৫,৯০,০০০ টাকা ব্যয় করেছে। এর মাধ্যমে ত্রিশ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে উপকৃত হয়েছে।

(৪) গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দান

অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের দ্বারা গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মান উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। চলতি আর্থিক বছরে এ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৫) জিমনাসিয়াম তৈরীর প্রকল্প

গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর গঠনে শরীর চর্চার উপকারীতা সম্বন্ধে অবহিত ও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করে জিমনাসিয়াম কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য এই আর্থিক বছরে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৬) ক্লাব সমূহকে সাহায্যদান প্রকল্প

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিকে খেলাধুলার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ থেকে আর্থিক সাহায্যদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ বাবদ গত আর্থিক বছরে মোট ১১,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই বরাদ্দের ২৩,৫০০ টাকা বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র নয় এমন যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান

গত আর্থিক বছর থেকে অ-ছাত্র যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এই খাতে ১,৯০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

যুব উৎসব

উৎসব গ্রামের মানুষের জীবনধারার একটি মূল স্রোত। তাই গ্রামবাংলার প্রতি প্রান্তে এত বেশী লোক-উৎসবের ছড়াছড়ি, সেখানে বারো মাসে তের পাবনের সমারোহ। উৎসবের এই আবেদনকে সামনে রেখেই যুবকল্যাণ বিভাগ প্রতিবছর ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের যুব উৎসবের আয়োজন নিয়মিতভাবে করে আসছে। এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধুলা, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হয় এবং গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিশেষতঃ অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি ঘটানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করাও এইসব উৎসবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র প্রকল্প

যুবক-যুবতীদের বেকারী নিরসনে সাহায্যদান, খেলাধুলায় উৎসাহ সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক পুনরোজ্জীবনে অনুপ্রাণিত করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এ বাবদ চলতি আর্থিক বছরে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বহুমুখী ব্লক যুব তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র

বহুমুখী জেলা কেন্দ্রের অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্লকে একটি করে ব্লক তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

[শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বছর : ৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যবস্থা নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সবথেকে বড় বিষয় ছিল এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা একটা আদর্শগত সংগ্রাম। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গণটোকাটুকির কথা। এই রোগে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এখন এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট অংশের মানুষের সহযোগিতা ও উদ্যোগ দরকার। এ কথা বলা যেতে পারে এই লড়াইতে সুস্থ বুদ্ধির জয় হয়েছে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলি (যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডিকেট, ইত্যাদি) এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এসব সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে কাউন্সিল তৈরী করেন এবং নূতন আইন তৈরীর কাজে হাত দেন। এই আইনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা থাকতে পারবেন, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের আরও গণতন্ত্রীকরণ হবে। এসব কিছুই উচ্চশিক্ষাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি বাম সরকার একটি নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এই নীতি হল—শিক্ষা-প্রসারের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। একটি গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি গরীব মানুষ সমাজের মালিক না হন, বামফ্রন্ট সরকার সমাজকাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবেন না, তার জন্য সমাজবিপ্লবের প্রয়োজন হবে। যতদিন না তা' হচ্ছে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষার স্বার্থে কাজ করছেন। এরজন্য চাই রাজ্যের হাতে আরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের মত গণতান্ত্রিক দাবীগুলি নিয়ে বাম সরকার দাবী উত্থাপন করছেন। বাম সরকারের এই বক্তব্যের সাথে এ রাজ্যের এবং অন্যান্য রাজ্যের মানুষ কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ

সুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের মাটিতে দ্বিজাতি তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে সাংঘাতিক জাতিবৈরীতার বীজটিকে রোপণ করে গিয়েছিল তাই আজ মহীরুহ হয়ে দেশের মধ্যে নানা অশান্তি ও অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে। আজকের নানা বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীর আন্দোলনের উৎস সেখানেই। নানা বিচিত্র দাবী নিয়ে বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে, নানা নামে নানা চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে দেশের সংহতি ও ঐক্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভারতের স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও তাই আজও ওঠে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবে এ জিনিষ কল্পনাও করা যায় না। এই বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগুনে আজ দগ্ধ হতে চলেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং এর শিকার হয়ে চলেছে দেশের হাজার হাজার মানুষ। এমনটি চললে দেশ একদিন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে—বিপন্ন হবে দেশের স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে দূরদর্শী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উচ্চারিত সেই সাবধান বাণী আজ আবার মনে পড়বে, যা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করে, দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে আপোষের মাধ্যমে যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে মনে করা ভুল হবে। কারণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় চতুর সাম্রাজ্যবাদ শক্তি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে জাতিবৈরীতার যে বীজ দেশবাসীর মনে বপন করে যাবে তাতে একদিন "ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে।" দেশ স্বাধীন হবার পরে যা' হবার তাই হ'ল। বিদেশীর বদলে শাসন ক্ষমতা পেলো দেশী বুর্জোয়ার দল। এতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল না। পরিবর্তন হলো শুধু শোষকের। এরাও একটানা দীর্ঘ ত্রিশ বছর দেশ শাসন করলো ইংরেজের মতোই 'বিভাজন ও শাসন' এ নীতিকে আশ্রয় করে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি, সুখ সুবিধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর এরা দেয়নি। এদের চরম ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। এ ক্ষিপ্ততার কারণ তাদের অন্তরের বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বেদনা। সেই পুঞ্জীভূত বেদনাই আজ যে কোন উস্কানিতে মানুষকে ধাবিত করছে চরমপন্থার দিকে। আজ যে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে এর পেছনেও কারণ ঐ একই দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা ও বঞ্চনা। আর আজকের এ আন্দোলন যে নামেই চলুক, যে দাবিকে সামনে নিয়েই হাজির হোক না কেন—আসলে এ বিভেদপন্থী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনছে না।

আজ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে অযৌক্তিক নানা দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলনের নামে চলছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস। আসাম থেকে তা' মিজোরামে, মিজোরাম থেকে মণিপুরে, মণিপুর থেকে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা থেকে পশ্চিমবাংলার উত্তর প্রান্তে এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বেশ কিছু অঞ্চলে। নাগাল্যান্ড তো স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকেই হয়ে আছে অগ্নিগর্ভ। শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতেই নয় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আজ গ্রাস করতে চলেছে ভারতের আরও নানা প্রান্তকে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে জিন্না সাহেব দেশ ভাগের সময় পাকিস্তান ছাড়া শিখদের দলে টানবার জন্য স্বাধীন "শিখিস্থান" গড়বার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিখদের অনীহার জন্য তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সেদিন যা হয়নি, পাঞ্জাবে আজ আবার সে দাবি উঠছে। তারা দাবি তুলছে ভারত থেকে পৃথক হয়ে একটি "স্বাধীন শিখ রাজ্য" প্রতিষ্ঠার। রাজধানীর অতি কাছে চলছে এর উদ্যোগ। অবশ্য ভারতে প্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল নাগাল্যান্ডে। নাগাদের মধ্যে ছিল শ্রেণী বিভাগ। ছিল তীব্র গোষ্ঠী বিবাদ। একে যখন ভারতের অঙ্গরাজ্যরূপে গ্রহণ করা হয়, বিদেশী অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে তখনই ওখানে শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন। সেই ভয়াবহ আন্দোলনকে রুখতে ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হয়। এর পরই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন দেখাদেয় মাদ্রাজে। এদের দাবি ছিল পৃথক "দ্রাবিড় ভূমির"। এ দাবি সেদিন মাদ্রাজের গণদাবিতে পরিণত হয়। এবং এ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে হিন্দিভাষা ও হিন্দি এলাকার প্রভুত্বের অভিযোগ তুলে। এর ফলে মাদ্রাজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয় হিন্দি ভাষাকে এবং রাজ্যের নাম বদলে রাখা হয় 'তামিলনাড়ু'। আসাম সরকারের চরম অবহেলায় মিজোরামেও শুরু হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ফলে একদিন আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা গঠন করে পৃথক মিজোরাম রাজ্য। মিজোরামের পরই সে ঢেউ ধাক্কা দেয় মণিপুরে। মণিপুরের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের স্রোত আজও চলছে এবং এর তীব্রতা ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছে সীমান্তরাজ্য বার্মা থেকে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানীতে।

সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামরাজ্য এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের স্রষ্টা। এটা নতুন নয়, এ রাজ্যে এরকম আন্দোলনের জিগির তোলা হয়েছে বার বার। এ যেন কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কিছুদিনের বিরামের পর হঠাৎ অগ্নি উদ্গিরণ। যে কোন একটু উস্কানি, যে কোন রকম প্রাদেশিকতার সুরসুরি পেলেই সেখানে শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ, খুন জখম। আর এ আন্দোলনের মূল শিকার হয়ে আসছিলো এতদিন শুধু সংখ্যালঘু বাঙালীরা। এবারের আন্দোলন চলছে সেখানকার 'আসু' ও গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। এবারের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিন্তু আর "বাঙালী খেদাও" আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এবার এ আন্দোলন চলছে বিদেশী তাড়ানোর নামে। তার ফলে শুধু

বাঙালী, নেপালীরাই নয়, মার খাচ্ছে গোটা সংখ্যালঘু অ-অসমীয়ারা। তাদের অনেকেই এদের সহিংস এ আন্দোলনের বলি হয়েছে। হয়েছে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা, এমনকি প্রদেশ ছাড়া। তারা আজ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ওরা আর আসামে ফিরে যেতে চাইছে না। ওদের আশঙ্কা ওখানে ফিরে গেলে প্রাণে আর তারা বাঁচতে পারবে না, কারণ ঐ সব আন্দোলনকারীরা সংবিধান মানে না। বিদেশী বলে ওরা ভারতের নাগরিকদের যা' খুশী তাই করতে পারে। বিদেশী কারা তা' তারা নির্দ্ধারণ করবে নিজেদেরই ইচ্ছামত। ভারতের যে কোন প্রান্তের নাগরিকই যে ভারতের যে কোন প্রদেশে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকারী—একথাটা ওরা মানতেই চাইছেনা, ওদের খেয়ালের শিকার হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই আন্দোলনের পেছনে মদত জোগাচ্ছে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনীর দল এবং কিছু বিদেশী শক্তি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী হঠানোর নামে এরা অর্থ ও প্ররোচনা দিয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের বিপথগামী করে তুলছে। এরা চাইছে এ আন্দোলনকে সামনে রেখে ওদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। অথচ আশ্চর্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছু বুঝেও এ সমস্যা সমাধানের ফলপ্রসু কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করতে পারছে না। কেন পারছে না? প্রশ্নটা সেখানেই।

অনুরূপভাবে সম্প্রতি ত্রিপুরাতে উপজাতি আন্দোলনের নাম করে উগ্র-উপজাতি দল মান্ডাই বাজারে অ-ত্রিপুরাবাসী-দের উপর অতর্কিতে হানা দিয়ে যে নারকীয় গণহত্যা সংঘঠিত করলো তাতেও বলি হলো প্রায় ছ' শোর মত মানুষ। বহু লোক আহত হলো। পুড়লো অনেক ঘরবাড়ী। ঘর ছাড়া হলো কয়েক হাজার মানুষ। এর পেছনেও আছে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থবাদের এবং বিদেশী শক্তির মদত। এরা উপজাতি আন্দোলনের নাম করে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টির এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল অনেক আগেই। উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। ত্রিপুরাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বেশী করে উৎসাহ জুগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী, বিদেশী মিশনারী সংস্থা ও সি, আই, এ। এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় উগ্রপন্থী উপজাতি যুব-সমিতি বীভৎস হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। এদের উস্কানিতেই উপজাতিদের একাংশ আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে উপজাতিরা সুদীর্ঘকাল সামগ্রিক-ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন কিছু সাহায্য ও সহ-যোগিতা পায়নি যার ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। উপজাতিরা আজও সমানভাবে অনগ্রসরই রয়ে গেছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী সে বিষয়টি আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমত এই ধরনের সম্ভাব্য উপজাতি আক্রমণের আশঙ্কায় ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার সৈন্য ইত্যাদির সাহায্য চেয়েছিল. কিন্তু কেন্দ্র এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয়ত এখনও ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ সেনা আছে তা পার্বত্য-উপজাতিদের আচমকা আক্রমণের মোকাবিলা করার পর ত্রিপুরার নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পূরণ করতে গড়িমসী করছেন। অতএব এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ত্রিপুরাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরও খেলতে চাইছে। ত্রিপুরার বাম-ফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করাই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রের সব থেকে প্রধান উদ্দেশ্য হলো বামপন্থী আন্দোলনের ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা। সেটা দেখা যাচ্ছে আসামের বেলায়। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ ভারতের বাম আন্দোলনের কাছে অনেকটা শক্তিহীন, তাই তাকে আজ স্তব্ধ করতে আশ্রয় ও কৌশল নিয়েছে অন্য পথের। আসামে আসাম ছাত্র ইউনিয়ন বা গণসংগ্রাম পরিষদকে মদত এবং ত্রিপুরার উগ্র-উপজাতিদের মদত দেওয়া সেই ষড়যন্ত্রেরই একটা চাল। অর্থাৎ আসাম ও ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে আজ আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলছে বামপন্থী আন্দোলনের উপর। আগামী দিনে তা আরও ভয়ঙ্কর পথে যে মোড় নেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আসামের ঘটনার সঙ্গে ত্রিপুরার সামগ্রিক ঘটনাবলীর কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। আসামে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সংখ্যা-লঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপে। আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আজ একাধিক কারণে নিজেদের আশঙ্কায় ভরিয়ে তুলে সংখ্যা-লঘু অংশকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিতে সচেষ্ট। সেই প্রয়াস থেকেই রব উঠেছে প্রাদেশিকতাবাদের—স্বতন্ত্র আসাম দেশ গঠনের। অতএব আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলার, দাবী আদায়ের, নিজেদের সুখ সুবিধাকে প্রতিষ্ঠা করার। অপর দিকে ত্রিপুরার ঘটনাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রিপুরায় আক্রমণের সূচনা করেছে উপজাতিরা—যারা ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু অংশ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পুরোধাও তারা। সাম্প্রতিক গণহত্যার নায়কও তারাই। আসামে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতির জন্য যে আশঙ্কায় শঙ্কিত সংখ্যাগুরু অংশ, ত্রিপুরায় সেই আশঙ্কায় শঙ্কিত সংখ্যালঘু অংশ, সংখ্যাগুরুদের ভয়ে। দুটি স্রোতই কিন্তু একই জায়গায় মিশতে চলেছে। দুটি স্রোতের মূল লক্ষ্যও এক।

উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়েই রয়েছে। অনগ্রসর অংশ হিসাবেই তারা চিহ্নিত। ব্রিটিশ সব সময়েই উপজাতিদের সঙ্গে অ-উপজাতিদের একটা বিরোধের সূত্রকে জীইয়ে এসেছে। গত তিরিশ বছরে তৎকালীন সরকার সমূহের অপদার্থতায় সে সূত্র আরও বড় আকার নিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, তিরিশ বছর আগে উপজাতি সম্প্রদায়ের যে অর্থনৈতিক মান ও ভিত্তি ছিল, আজ সেই মান এক থেকে দেড় শতাংশের বেশী বাড়েনি। এই বৈষম্যের ছবি দীর্ঘকাল মনে গাঁথতে গাঁথতে আজ তা' পরিণত হয়েছে ব্যাপক হিংসা ও দ্বেষে। আর এই প্রবল বিতৃষ্ণাকেই কাজে লাগিয়েছে চতুর রাজনীতিবিদেরা এবং অদৃশ্য বিদেশী হাত। এরাই মদত জুগিয়েছে হিংসার। সে হিংসা ছিন্ন করেছে আজ ত্রিপুরা-বাসীদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিকে।

আসাম ও ত্রিপুরার অশান্ত ঢেউ আজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে এসে আঘাত করেছে। উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে রাজবংশী ও অনগ্রসর তপশীল জাতি ও উপজাতির জনসাধারণের মধ্যে "উত্তর খণ্ড" আন্দোলনের নামে এক প্রচার কার্য চলছে। সংখ্যায় এরা স্বল্প হলেও একে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এখানেও সেই একই কারণে অর্থাৎ অর্থ-নৈতিক অনগ্রসরতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর লোক এই দাবী তুলছে যে, উত্তর বাংলার জমিজমা বণ্টনের

ব্যাপারে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ দাবী অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বা অন্যায় বলা যাবে না। কিন্তু এ আন্দোলনের যেমন ভাবে এ'রা প্রসার ঘটাতে চাইছেন সেটাই বিপদের। এ আন্দোলনের নেতারা এমন প্রচার-কার্য চালাচ্ছেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরাই বুঝি ওদের সব দুঃখের কারণ। ওরাই নাকি ওদের অন্নে বাইরে থেকে এসে ভাগ বসাতে চাইছে। অর্থাৎ ওরা নাকি বহিরাগত। আসামে 'বঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন এবং ত্রিপুরায় নৃশংস হত্যাকান্ডের পর এই আন্দোলনকে নিতান্ত নিরীহ বলে ভাবার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এ আন্দোলনের দাবী যা'ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনে পরিণত হবে। ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির মত উত্তরখন্ডের আন্দোলনকারীরাও যে একদিন 'ভাটিয়া' তাড়াও বলে হুংকার ছাড়বে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এর মূলে রয়েছে কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির সময় থেকেই। ঐ সময়ে রাজবংশীদেরই একটা অংশ কোচবিহারকে সঙ্গে যুক্ত করতে। ঐ দাবীদার ছিল সেখানকার সম্পন্ন লোকেরাই এবং জোতদারেরা। তারাই সেদিন সরল সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভনের সুরসুরির সাহায্যে বিভ্রান্ত করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল। উত্তর বাংলার উন্নয়নের দাবী অবশ্যই ন্যায্য। দীর্ঘদিন উত্তর বাংলাকে নানা দিক দিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু একটা অঞ্চলের অনগ্রসরতার সমস্যা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন নয়। দেশভাগের ফলে বাংলা-ভাষী অঞ্চলের অধিকাংশই ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়। সঙ্কুচিত পশ্চিমবঙ্গকে যে সংকটের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা ভুললে চলবে না। উত্তর বাংলার উন্নয়ন গোটা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নেরই সঙ্গে যুক্ত। তাকে আলাদা বলে দেখা ঠিক হবে না। তবে ওদের প্রচারে কিছু কিছু ভুল রয়েছে। যে সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রচার চাই। এটা অনস্বীকার্য যে বামফ্রন্ট সরকার রাজবংশী ও তপশীলদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা ইতিমধ্যে করেছেন। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পেয়েছে ওখানকার তপশীল সম্প্রদায়ই। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে উত্তরখণ্ড আন্দোলনও ভ্রান্ত পথে চালিত হতে পারে। তার জন্যই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ও সরকারকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিরোধী এই ধরনের বিভেদপন্থী আন্দোলন কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত এখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং এ বিভেদের বীজকে অংকুরেই বিনষ্ট করে ফেলা। এ আন্দোলন জোরদার করতে কোন রাজনৈতিক দলই যেন এগিয়ে যেতে সাহস না করে এর জন্য বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দলের কর্মীদের উচিত সজাগ দৃষ্টি রাখা।

দৃষ্টি না রেখে উপায় নেই কারণ এর পেছনেও রয়েছে জঘন্য এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের হঠাৎ তীব্রতা অনুভব করা গিয়েছিল সেখানকার বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের সামান্য শক্তিবৃদ্ধিতেই। কায়েমী স্বার্থবাদীর দল এতেই বিচলিত বোধ করেছে। বাধ্য হয়েই বাম স্রোতকে রুখতে এরা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছে। আবার ত্রিপুরায়ও যখন বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল, তখনই সমস্ত কায়েমী স্বার্থ উপজাতি ও বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য, বিশেষকরে বর্গাদার, ক্ষেতমজুর প্রান্তিক চাষীদের অভূতপূর্ব জাগরণ ও তাদের অবস্থার উন্নতিতে দিশেহারা হয়ে কায়েমীস্বার্থ এখানেও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। উত্তরবঙ্গেও এরা তারই সুযোগ খুঁজছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় কয়েক লক্ষ চা বাগান শ্রমিক আছে। তা' ছাড়া আছে বনাঞ্চলে সংগ্রামী বন-শ্রমিক, এরা প্রধানত আদিবাসী ও নেপালী। বাঁচার দাবীতে চা বাগানের শ্রমিক ও বন-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিক ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার মালিকশ্রেণীর পক্ষে এ সম্ভাবনাকে মানা সম্ভব নয়। তাই তারা সুযোগ খুঁজছে এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার জন্য। এর পিছনে ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো। দৃষ্টি আরও দিতে হবে এই জন্য যে ঐ সব বিচ্ছিন্নতা-বাদীর দল আরও বিচিত্র নানা দাবীকে ওদের আন্দোলনের সামনে রাখবার চেষ্টা করছে, যা' পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। উত্তরখণ্ডের আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ কিছু দিন আগে 'কামতাপুর' রাজ্য গড়ারও স্বপ্ন দেখেছে। এদের অনেকেরই আজও দৃঢ়বিশ্বাস কোচবিহারের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত নয়। একে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শুধু নয়, ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আবার কেউ কেউ নেপালী বাঙ্গালী বিরোধ বাঁধিয়ে দার্জিলিং জেলাকেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক, এমনকি পারলে ভারত থেকেও পৃথক করার কথা বলছে। এক সময় এখান থেকেই উঠেছিল, নেপাল, দার্জিলিং জেলা ও সিকিমকে নিয়ে এক 'মহানেপাল' গড়ার বিচিত্র শ্লোগান।

এদিকে আবার ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে বীনপুর গোপী-বল্লভপুর দহিজুড়ী ইত্যাদি আদিবাসী মাহাতো ও সাঁওতালরা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি নামক এক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংহত হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগনা ও ময়ূরভঞ্জ সংলগ্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি একত্র করে ঝাড়খন্ড নামে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি রাজ্য গঠনের আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন। এ ঘটনাও উপেক্ষার নয়। কারণ এর পেছনেও আছে বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ, বেদনার ও অবহেলার ইতিহাস। এখানেও আদিবাসীদের একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। আশে-পাশের বহু পরিবর্তন ও উন্নয়নের চেহারায় তারাও আজ ক্ষিপ্ত। সেই ক্ষোভই হয়তো এ বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের রূপকার। তিন দশকের বেশী শাসন কর্তৃত্ব হাতে পেয়েও শাসকবর্গ ওদের জন্য কিছু করার চেষ্টাই করেননি কেন—সে প্রশ্নই আজ তারা করছে। ক্ষোভের তাড়নায় জাগৃতির আন্দোলনকে অস্বাভাবিক ভাবা যায় না, আন্দোলন করবার অধিকার তাদের আছে কিন্তু সে পথ কোনমতেই আত্মস্বাতন্ত্রের পথ হওয়া উচিত নয়। যে কোন আত্মস্বাতন্ত্রের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার আন্দোলনের দিকে যায়। এখানেও দেখতে হবে পেছন থেকে সুতো টানছে কারা? বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশী কুচক্রীরা এদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং করেছে বলেই

[শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়]

মস্কো অলিম্পিক : মানুষের অলিম্পিক

সৌমিত্র লাহিড়ী

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট রাশিয়া। সেই সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় এবার ২২তম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য শুধু প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে নয়, এই প্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীন দেশে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদি জনগণ অসীম কৌতূহলে বর্তমান অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। ২১-তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিলে, এবার বাইশ-তম প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে, প্রথম অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? প্রথম অলিম্পিক গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯৬ সালে গ্রীস দেশের এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জনক ব্যারন পিয়ের ডি কাউবারটিন (Baron Pierre de Coubertin) উদ্যোগী হয়ে এই প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু করেন। জন্ম হয় আধুনিক অলিম্পিকের।

'আধুনিক' এবং 'পুনরায়' শব্দদুটি চলে এলো। অতএব একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যার সূত্র নিহিত রয়েছে অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায়। বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ না করে তারও একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে অলিম্পিয়া মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভূকম্পনে ভূগর্ভে অন্তলীন হয়ে যায় এবং এর কিছুদিন পরেই আসে আলফিউস নদীতে প্রবল বন্যা। প্রলয়ংকরী ভূকম্পন এবং বিধ্বংসী বন্যার করাল গ্রাসে অলিম্পিয়ার উপত্যকা ডুবে যায়। অলিম্পিকের সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্রীড়াঙ্গণ অতীতের স্মৃতির মতন হারিয়ে যায়, জমে ওঠে পলি আর অরন্যাবৃত সবুজ ভূমির ওপর বিশাল বিশাল গাছপালা। দেখে বোঝাই যায় না এখানে কখনও কোনদিন কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকরা অতীতের স্মৃতি খুঁড়ে প্রাচীন অলিম্পিক প্রান্তর আবিষ্কার করেছেন প্রায় এক শতাব্দী আগে (১৮৭৬-১৮৮১)।

প্রাচীন অলিম্পিক কত প্রাচীন সে বিষয়ে নানা রকম মতভেদ আছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অবশ্য সর্বসম্মত একটা ইতিহাস তৈরী করেছেন।

প্রাচীন গ্রীস দেশের গাথা ও চারনদের গানের মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়ার টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া যায়। হোমারের লেখাতেও অলিম্পিকের ছায়াপাত ঘটেছে। আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব এক হাজার বছর আগে প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়, কিন্তু ৮৮৪ খৃঃ পূঃ আগেকার ধারাবাহিক স্মৃতি কোথাও নেই বলে জানা যায় না অলিম্পিক সত্যিই কত প্রাচীন।

অলিম্পিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ অলিম্পিয়াস থেকে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ দেবতাদের আবাসভূমি। মানুষ তার ইতিহাসকে যেমন বিভিন্ন শিল্পে সাহিত্যে গানে, সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল, সেই সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে যেমন আমরা আমাদের অতীতকে চিনেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই অলিম্পিকের সম্পর্কেও কিছু কিছু গল্প কথা, উপকথা প্রচলিত আছে, যার সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে, আমরা খুঁজে পাই অতীত, আমরা খুঁজে পেয়েছি তার ইতিহাস, তার সুমহান ঐতিহ্য, তার চির অম্লান বাণী 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব, সংহতির বিজয় গান'। মানুষের সুস্থ সুন্দর সবল সৌর্যবীর্যের প্রতীক অলিম্পিক।

ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময়ই দেখা যায় আর্য জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্য জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে খেলা ধূলার বিশেষ প্রচলন ছিল। বিবাহ, দেবপূজা, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হয়ে আর্য যুবকরা শরীর চর্চা, অস্ত্রচালনা এবং অন্যান্য ক্রীড়ার নানা কায়দা কৌশল প্রদর্শন করতেন। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রমাণ খৃষ্ট পূর্ব দুহাজার বৎসর পূর্বে ক্রীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা নানা ছবিতে রয়েছে।

গ্রীস দেশেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল খেলাধুলা। বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে এবং ছুটির দিনে গ্রীক জাতির মধ্যে মিলিত হয়ে ক্রীড়া চর্চার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় এই সব আনন্দ অনুষ্ঠানের নাম 'প্যানেগেরিশ'। হোমারের ইলিয়ডে (২৩ খণ্ডে) পেট্রোক্লিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে প্যানেগেরিশের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১১০০ খৃঃ পূঃ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রথ চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ, কুস্তি প্রভৃতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ট্রোজান যুদ্ধখ্যাত আজাক্‌স ইউলিসিস এণ্টিলোকাস প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ওডেসিতে রাজা আলমিন্যাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্যানেগেরিশে।

প্যানেগেরিশ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে তিন চারটি প্যানেগেরিশ নিয়ে একটি বৃহত্তর প্যানেগেরিশ সৃষ্টি হয়। আর এই প্যানেগেরিশে যোগদানের জন্য শরীর চর্চা ও ক্রীড়া গ্রীক জাতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পিণ্ডার হেসিয়ড, হেরো ডোটাস পসেনিয়াস প্রভৃতি বহু বৃহত্তর প্যানেগেরিশের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে ওলিম্পিয়ার জিউসদেবের মহা-পূজা উপলক্ষে ওলিম্পিয়ার উৎসব, এপোলোদেবের পাইথন হত্যার উপলক্ষে পাইথন উৎসব, হারকিউলিসের 'নেম্যান সিংহ' হত্যা উপলক্ষে নেম্যান উৎসব, হারকিউলিসের ক্রীটের উন্মত্ত বৃষ হত্যা উপলক্ষে ফোরিন্স যোজকে ইসথমিয়ান উৎসব, হায়্যানসিনথ্যাসের মৃত্যু উপলক্ষে হায়্যাসিনথ্যাস উৎসব, এথেন্সের থারপেলিয়া এথেনা দেবীর সম্মানে অনুষ্ঠিত প্যানথেসিয়া উৎসব, নবান্ন উপলক্ষে মেটাপটানিয়া উৎসব মাইফেলের প্যানয়াবোমিয়া উৎসব, ডেল্লসের এপোলোদেব উৎসব উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে এইসব উৎসব গ্রীক জাতির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস বলে স্থানীয় প্যানে-

গেরিশ থেকে জাতীয় হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস সৃষ্টি হয়েছিল। হেল্লেনেসদের চারটি হেলেনিক জাতীয় ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। কালক্রমে অলিম্পিয়ার জিউসদেবের সম্মানে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য তিনটি বন্ধ হয়ে যায়। অলিম্পিক ক্রীড়াই ছিল প্রাচীনতম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া জন্মলগ্নের পর থেকে বার বার নানা-রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধ মহামারী সংঘর্ষ রক্তপাত বার বার দেখা দিয়েছে, কিন্তু অলিম্পিকের আদর্শ কখনও ম্লান হতে পারে নি। যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা গেছে অলিম্পিক ক্রীড়া হচ্ছে। কিন্তু তারও সমাপ্তি ঘটে কালের অমোঘ নিয়মে। ১১৭২ বছর পর ২৯৭তম অলিম্পিয়াডের সাথে সাথে অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৭৬ সালে ফরাসী জাতির যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ফরাসী জাতির জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোটা জাতি হতাশায় ডুবে যায়। তখন ফরাসী ধনকুবের পরিবারের সন্তান কিউবারটিনের বয়স মাত্র ১৪ বছর। তার জন্ম ১ জানুয়ারী ১৮৬২। বালক বয়সেই ধনিক পরিবারের সন্তান হলেও কিউবারটিন যুদ্ধের উন্মত্ত লালসা থেকে মুক্ত শান্তির পৃথিবীতে বাস করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন দেখার মুহূর্তেই জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকরা অতীত দিনের অলিম্পিকের মহান বাণীর স্মারক চিহ্নগুলি মাটির গহ্বর থেকে সূর্যের আলোয় টেনে আনছিলেন। যুদ্ধ হাঙ্গামা বিধ্বস্ত ফরাসী জাতির মনে মানবীয় মূল্যবোধগুলিকে পুনঃস্থাপিত করতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করতে কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু করতে উদ্যোগী হন। কলেজে কলেজে ছাত্রদের জমায়েত করে, বক্তৃতা করে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে তিনি সফল হলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্ধ থাকার পর আধুনিক অলিম্পিক আবার আত্মপ্রকাশ করল ১৮৯৬ সালে। আধুনিক অলিম্পিকের জনক কিউবারটিন প্রথম অলিম্পিক প্যারীতে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গ্রীস দেশের প্রবল ইচ্ছারও চাপ ও ঐক্যের খাতিরে তিনি অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীস দেশেই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হন।

প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হন গ্রীস দেশের ডিমিট্রিয়াস ভাইকেলাস। প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে নীতিগত সাতটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি হ'লো (১) প্রাচীন অলিম্পিকের আদর্শে বর্তমান অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হলেও যুগের পরিবর্তনের সাথে একে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে। (২) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র অপেশাদার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (৩) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার অধিকারী হবে। (৪) কোন রাষ্ট্র নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোন দেশের নাগরিকদের মনোনীত করতে পারবে না। (৫) অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। (৬) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা যথাক্রমে এথেন্স ও প্যারীতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। (৭) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র শক্তির সাহায্য ব্যতীত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল হতে পারে না।

১৮৯৬ সালের প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে দশটি দেশের মাত্র ৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এথেন্স অলিম্পিকে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে ছিল আমেরিকা, গ্রীস, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, চিলি ও সুইডেন।

মস্কো অলিম্পিক ২২তম অলিম্পিক হলেও আসলে ১৯ বার অলিম্পিকের আসর বসছে। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মোট তিনবার অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

এপর্যন্ত যেসব জায়গায় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে—(১) এথেন্স (১৮৯৬) (২) প্যারী (১৯০০) (৩) সেন্ট লুইস (১৯০৪) (৪) লণ্ডন (১৯০৮) (৫) স্টকহোম (১৯১২) (৬) বার্লিন (শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি), ১৯১৬ (৭) এনাইওয়ার্প (১৯২০) (৮) প্যারী (১৯২৪) (৯) আর্মস্টারডাম (১৯২৮) (১০) লস্ এঞ্জেলস (১৯৩২) (১১) বার্লিন (১৯৩৬) (১২) লণ্ডন (১৯৪৮) (১৩) হেলসিংকি (১৯৫২) (১৪) মেলবোর্ণ (১৯৫৬) (১৫) রোম (১৯৬০) (১৬) টোকিও (১৯৬৪) (১৭) মেক্সিকো (১৯৬৮) (১৮) মিউনিক (১৯৭২) (১৯) মন্ট্রিল (১৯৭৬)।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী জায়গা গ্রীস দেশেই হোক এই দাবী গ্রীস দেশ উপস্থিত করেছিল; আমেরিকার সমর্থন ছিল এই দাবীর প্রতি। কিন্তু কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক চরিত্র অব্যাহত রাখার জন্য অবিচল থাকলেন। দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে তিনি সভাপতি হন এবং প্যারীতে দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ১৯০০ সালে। রাশিয়া খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ না করলেও দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেসে সরকারীভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

দ্বিতীয় অলিম্পিকে ১৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১২১। ভারতের যোগদান এই অলিম্পিকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় এ্যাথলেট ডবলু. জি. পিটচার্ড বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তার প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিশেষ কিছু পাওয়া না গেলেও আলেকজাণ্ডার এস অয়ণ্ডার লিখেছেন—"that in the 2nd Olympic held in 1900, an Indian athleth Mr. W. G. Pritchard secured the second position in 200 metres and 200 metres Hardle run, these securing 6 point for India in truck and field events" প্যারীতে পয়েন্ট গণনা হত কোন বিষয়ে প্রথম ৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ৩ পয়েন্ট তৃতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাব অনুসারে আমেরিকা ১৪০ পয়েন্ট, গ্রেট ব্রিটেন ৩১ পয়েন্ট, ফ্রান্স ২০ পয়েন্ট, ভারত ও হাঙ্গেরী ৬ পয়েন্ট পায়। প্রথম অলিম্পিকে গ্রীক মতে পয়েন্ট ছিল প্রথম ২ পয়েন্ট ও দ্বিতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাবে আমেরিকা ২৩ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম ও গ্রীস ৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

অলিম্পিক ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংহতি ভ্রাতৃত্ববোধ

ও মানবীয় মূল্য বোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। অলিম্পিকের প্রধান শ্লোগান ছিল মানুষ অপরাজেয়, মানুষ সব কিছু জয় করতে পারে, অলিম্পিকের আদর্শ হলো—Fitius, Altius, Fortius. (তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান)।

অলিম্পিকের মহান আদর্শ পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তোলে ফলে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে যোগদানকারী দেশের ও প্রতিযোগীর সংখ্যা এবং দর্শকের সংখ্যাও। পরপর বিভিন্ন দেশে অলিম্পিকের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এইভাবে সংখ্যাগুলি বাড়তে থাকে—তৃতীয় অলিম্পিকে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী ১১টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, চতুর্থ অলিম্পিকে ২০৫৯ জন (৩৬ জন মহিলা সহ) ২২টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, পঞ্চম অলিম্পিকে ২৮টি দেশের ২৫৪১ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫৭ জন মহিলা ছিলেন। সপ্তম অলিম্পিকে ২৯টি দেশের ২৬০৬ জন প্রতিযোগী ছিলেন যার ৬৩ জন মহিলা। অষ্টম অলিম্পিকে দেশের সংখ্যা আরও বাড়ে। ৪৪টি দেশের ৩০৯২ জন প্রতিযোগী ছিলেন, যার ১৩৬ জন মহিলা। নবম অলিম্পিকে ৪৬টি দেশের ২৯০ জন মহিলা সহ ৩০১৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। দশম অলিম্পিকে অবশ্য প্রতিযোগীর ও দেশের সংখ্যা কমে যায়। ৩৭টি দেশের ১৪০৮ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন যার মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন মহিলা। একাদশ অলিম্পিকে ৪৯টি দেশের ৪০৬৯ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩২৮ জন মহিলা। দ্বাদশ অলিম্পিক জাপানের টোকিওতে প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যুদ্ধ অলিম্পিক আন্দোলনে আবার নখদন্ত বিস্তার করে। স্থান পরিবর্তন করে ফিনিসে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আই. ও. সি. করে, কিন্তু হিংসার উন্মত্ত লেলিহান শিখা সেখানেও থাবা উঁচিয়ে বলে—তফাৎ যাও। ফলে অলিম্পিক স্থগিত হয়ে যায়। ত্রয়োদশ অলিম্পিকও মহাযুদ্ধের ফলে লণ্ডনে হতে পারেনি। চতুর্দশ অলিম্পিক আবার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে লণ্ডনে। যুদ্ধের রণদামামা থামার সঙ্গে সঙ্গেই এই খেলার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পর পর দুটি অলিম্পিক বাতিল হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অবিচ্ছেদ্য আন্দোলন বলে চিহ্নিত করার জন্য ক্রমিক হিসাবে লণ্ডন অলিম্পিককে চতুর্দশ অলিম্পিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই অলিম্পিকে ৫৯টি দেশের ৪৪৬৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৮ জনে।

পঞ্চদশ অলিম্পিক নানা দিক থেকে স্মরণীয়। ১৯৫২ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকেই সর্ব প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া যোগদান করে। শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অলিম্পিকের মূল আদর্শ অংশ গ্রহণ, জয়লাভ বা পদক লাভ প্রধান লক্ষ্য নয়। কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক গ্রামকে ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগুলি উপস্থিত করার কেন্দ্র রূপে বিবেচনা করা হয়। অতীতের অলিম্পিকে অলিম্পিয়া গ্রামে মূল অনুষ্ঠানের এগার মাস আগে প্রতিযোগীরা হাজির হতেন। তাদের নিয়মিত অনুশীলন, শরীর চর্চা ও তালিমের ব্যবস্থা থাকত। কঠোর শৃংখলা ও অনুশীলনের এগার মাসের শিক্ষানবীশ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটত মূল ক্রীড়াঙ্গণে। এখনও অতীতের মত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্মত অলিম্পিক গ্রাম তৈরী করা হয়। সেখানে ক্রীড়া চর্চার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থাও থাকে।

অলিম্পিক আদর্শের কথা স্মরণে রেখেও বলা প্রয়োজন সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ গ্রহণের ফলে অলিম্পিক ক্রীড়ার গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। পদক বিজয়ে আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের রাশ টেনে ধরে খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপরূপ সাফল্য এই অলিম্পিকে চমক সৃষ্টি করে। পদক বিজয়ে অবশ্য সেবারও আমেরিকা শীর্ষে ছিল। আমেরিকা পায় ৪০টি স্বর্ণ, ১৮টি রৌপ্য এবং ১৭টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৬১৫ পয়েন্ট)। আর সোভিয়েট রাশিয়া পায় ২২টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য এবং ১৫টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৫৪১ পয়েন্ট)। আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরী স্বর্ণ পায় ১৬, রৌপ্য ১০ এবং ব্রোনজ ১৫টি যার বেসরকারী পয়েন্ট ৩০৫। সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি ৫,০০০ মি, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে মানব ইঞ্জিন নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়। মানব ইঞ্জিন এমিল জেটোপ্যাকের স্ত্রী ডানা জেটোপ্যাকও ১৬৫-৭ ফুট জেভিলিন নিক্ষেপ করে অতীতের সমস্ত বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দেন।

পঞ্চদশ অলিম্পিকে যে চমক জাগানো আবির্ভাব সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ঘটিয়েছিল তা পরবর্তী কালেও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাসী আজ একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি মানবজীবনের প্রাথমিক দৈনন্দিন চাহিদাগুলির সমস্যা মীমাংসায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ধনতান্ত্রিক বিশ্বকে শুধু টেক্কা দেয়নি, মানব জীবনের বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমাজব্যবস্থা বিশল্যকরণীর মত কাজ করেছে। খেলাধুলায় অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থার ফসল মাত্র, তাই মাত্র সাতটি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়া এপর্যন্ত ৬৮৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ২৫৮, রৌপ্য ২২১, ব্রোনজ ২০৪), আর আমেরিকা পেয়েছে ৬০৫টি পদক। প্রসঙ্গত আমরা ৬৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের করুণ চেহারা স্মরণ না করে পারিনা। দুই সমাজব্যবস্থার মৌলিক তফাৎটি এক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। লজ্জায় ঘৃণায় আমরা মুখ লুকাই যখন দেখি আমাদের প্রতিযোগীরা প্রায় শূন্য হাতেই ঘরে ফিরে আসছে।

২২তম অলিম্পিক ১৯ জুলাই শুরু এবং শেষ ৩ আগস্ট। গত এক শতাব্দীর আবহাওয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে, এই সময় মস্কোর আবহাওয়া থাকবে মনোরম, প্রতিযোগিতার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। বেশীর ভাগ খেলাই হবে মস্কোতে। শুধু ইয়টিঙ প্রতিযোগিতা হবে তাল্লিনে এবং বাছাই পর্যায়ের ফুটবল ম্যাচগুলি লেনিনগ্রাদে কিয়েভ ও মিনস্কে অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা হচ্ছে ২১টি খেলার ২০৩টি প্রতিযোগিতায় ছয় হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করবেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মস্কোয় যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য বিশ্ববাসীর পয়লা নম্বরের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত ঘোষণার সাথে সাথে মস্কো প্রস্তুত হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবির চায় না যে, বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা মস্কোয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমাহীন সাফল্যগুলিকে স্বচক্ষে দেখতে পায়। এমনিতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে তারা যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় নিজেদের হাজির করেছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির আতঙ্কিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার দীর্ঘকাল ধরে তারা করে এসেছে তার মুখোশ খশে পড়ছে, প্রচারের উলঙ্গ চেহারা আরও নির্মমভাবে ধরা পড়ে যাবে যদি বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও দর্শকরা মস্কোর অলিম্পিকে যোগদেন। তাই তারা ছুতো খুঁজছিল। অবশেষে আফগান জনগণের আহ্বানে সোভিয়েট সৈন্য সে দেশে অনুপ্রবেশ করার ঘটনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তুরুপের তাসের মত পেয়ে গেছে। এই তুরুপের তাস রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টায় তারা মরিয়া।

প্রেসিডেন্ট কার্টার একা নন। তার সংগে আছেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার প্রমুখ পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়করা। তারা মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়। নানা রকম অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, প্রতিযোগীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিশ্বখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে দূত করে আফ্রিকার দেশে দেশে অভিযানে পাঠায়। কিন্তু তাতেও খুব বেশী সাড়া মেলেনি।

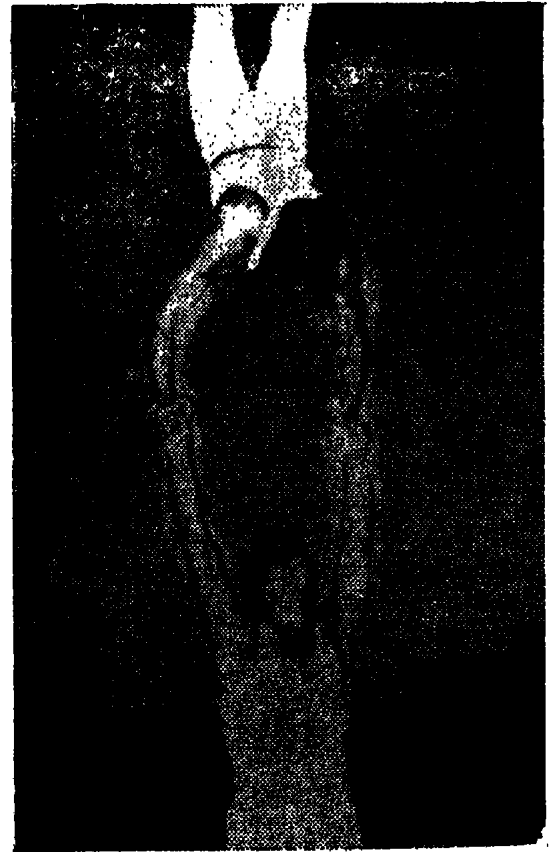
একজন ক্রীড়াবিদের জীবনে অলিম্পিকে যোগদানের সম্মান ও সুযোগ বার বার আসে না। অলিম্পিকে পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যারা প্রস্তুত হয়েছে তাদের কার্টার সাহেব ভয় ভীতি প্রলোভন দেখিয়েও অবদমিত করতে পারেনি, অনেক প্রতিযোগী যোগ দিচ্ছেন; এমনকি অনেক অলিম্পিক কমিটি দেশের শাসক বর্গের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা অলিম্পিকের পতাকা তুলে নিয়েছেন।

৮৩টি দেশ এবার মস্কো অলিম্পিকে যোগদান করেছে। মস্কোয় ন্যাটো চুক্তি ভুক্ত অনেকগুলি দেশের উপস্থিতি এবং অস্ট্রেলিয়ার মত দেশের যোগদান কার্টারের মানবীয় অধিকার ও শান্তি ধ্বংস করার চক্রান্তকে চপেটাঘাত করবে। আঙ্গোলা, ভিয়েৎনাম, লাওস, বোৎসোয়ানা, জিম্বাবেয়ে, সেচিলিজ প্রভৃতি দেশের প্রথম যোগদান অলিম্পিক আন্দোলনের অবিরাম সাফল্যেরই ইঙ্গিতবাহী। নারী পুরুষের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এবার কোয়ায়েতের মহিলা ক্রীড়াবিদরা মস্কোয় আসছেন। কোয়ায়েতের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

আমেরিকার নির্লজ্জ ভূমিকার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ সোচ্চার হয়েছেন, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আইরিশ ভদ্রলোক লর্ড কিলানিন খেলাধুলাকে রাজনীতির সূক্ষ্ম জটিলতায় আবদ্ধ না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অলিম্পিকের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক কমিটি, ক্রীড়াবিদ, এমনকি মার্কিন অলিম্পিক কমিটির সভাপতি রবার্ট কেন ও বয়কট সিদ্ধান্তকে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বয়কট আন্দোলনের তামাশা সত্ত্বেও মস্কো নিপুণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের আদর্শ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি মানুষ কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছেন। সামান্য কাজকেও অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সম্পাদন করা হচ্ছে। কোন কাজই গুরুত্বহীন নয়, কোন মানুষই অপ্রয়োজনীয় নন। মানুষের এই মর্যাদা ও সম্মান দেখে, কাজের এই অপূর্ব শৃংখলা দেখে, খেলাধুলার প্রতি এই মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা দেখে বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মারচেল্লো মারচেলিনি বলেছেন—রোম অলিম্পিককে যদি সংগীতের অলিম্পিক বলা যায়, টোকিওকে বলা যায় কারিগরীবিদ্যার অলিম্পিক, মেক্সিকো সিটির অলিম্পিককে যদি গ্রাফিক শিল্পের অলিম্পিক বলা হয়, মিউনিখকে বলা হয় স্থাপত্যবিদ্যার অলিম্পিক এবং মন্ট্রিল অলিম্পিকের নাম দেওয়া যায় সংকটের অলিম্পিক, তাহলে মস্কো অলিম্পিককে বলতে হবে মানুষের অলিম্পিক।

বলাবাহুল্য মারচেল্লো মারচেলিনি ক্রীড়াবিদ বা ক্রীড়া সংগঠক নন। শান্তি-মৈত্রী-সংহতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত অলিম্পিক মানুষের ক্ষমতার সীমাহীনতার প্রতীক। সেই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রথম পার্থ। তাই আমরাও প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই মস্কো অলিম্পিক মানুষের অলিম্পিক। এর সাফল্য অনিবার্য।



মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ব্লক যুব উৎসবে জিমন্যাস্টিক প্রদর্শনী।

রোমানিয়ার কমিউনিস্ট যুব সংস্থার একাদশ সম্মেলন

অমিতাভ বসু

"সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে যুবশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবসমাজে নতুন নতুন পরিবর্তন বহন করে আনতে যুবসমাজই সবচেয়ে সজীব, উৎসাহী শক্তি......" যুবসমাজের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন রোমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি নিকোলে চসেস্কি।

এই বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে সমাজবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে বীর দর্পে এগিয়ে চলেছে রোমানিয়া। সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।

রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণের অতীত ইতিহাস শোষণের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের ইতিহাস। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্ভেই ১৯২১ সালে রোমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে রোমানিয়ার যুব সংগঠনের ইতিহাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত। ১৯২২ সালে রোমানিয়ার সমাজবাদী যুবসংগঠনের জন্ম। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের ভূমিকায় এই যুব সংগঠন ভাস্বর হয়ে আছে। নিকোলে চসেস্কি ১৯৩৯-৪৪ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোমানিয়ার যুব কমিউনিস্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের সাফল্যে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রোমানিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হয়। বিগত ৩৫ বৎসর ধরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করে, প্রধান প্রধান শিল্প, খনি, ব্যাংক, বীমা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এই দেশের জনগণের সঙ্গে যুবশক্তি সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। "এমন একটি দেশ যার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কৃষি ভিত্তিক, যেখানে নিরক্ষর মানুষ ছিল ৪০ লক্ষ সেই রোমানিয়া রূপায়িত হয়েছে শিল্প ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশে। ব্যাপক শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় খামার এবং কৃষি সমবায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে......"

এই প্রথম ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, রোমানিয়ার কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তাদের একাদশ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৫ই মে সকাল ৯টায় একাদশ সম্মেলনের উদ্বোধন হলো স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল হলে। হলটি অনেকটা আমাদের নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মত। ৮০০০ লোকের বসার উপযোগী আসন ব্যবস্থা এবং গ্যালারি সহ একটি খোলা মঞ্চ। সম্মেলন উদ্বোধন করলেন নিকোলে চসেস্কি— "কমিউনিস্ট যুব সংগঠন, কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন, পাইওনিয়ার সংগঠন এবং শিশু সংগঠনের এই একাদশ সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার যুব ও শিশুদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্মেলন কমিউনিস্ট যুব তথা দেশের সমগ্র যুব সমাজের সামনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে তুলে ধরবে।"

সম্মেলনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় প্যালেস অফ রিপাবলিক-এ (প্রজাতন্ত্র প্রাসাদে)। এই প্রাসাদটি রোমানিয়ার রাজধানী, বুখারেস্ট শহরের কেন্দ্রে। এর একটু দূরেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। আর এক পাশে কমিউনিস্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। এগুলিও এক একটি প্রাসাদ-তুল্য। সম্মেলন ৭ই মে পর্যন্ত।

১৯৭৯ সালে কমিউনিস্ট যুব সংঘের সদস্য সংগৃহীত হয় ৩২৫০,০০০ হাজার। কারখানা, খামার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং সামরিক কেন্দ্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট যুব সংস্থার ইউনিটগুলি গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ইউনিট থেকে নির্বাচিত ২৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বিদেশী প্রতিনিধি ছিলেন ১৩০ জন। ২৫০০ প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিক ১২৮২, কৃষক ৩৫০, ইঞ্জিনিয়ার ১৭৫, শিক্ষক ৭৫, ৩৭৫ স্কুলের ছাত্র, ১০৬ জন কলেজের ছাত্র, ৫০ জন ডাক্তার এবং অর্থনীতিবিদ, ৭৫ জন জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ১২ জন অফিস কর্মচারী। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৬·৬।

কমিউনিস্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৬৩ জন। প্লেনারী অধিবেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। এই একই রিপোর্টের উপর সর্বোচ্চ সম্মেলনের পূর্বে বিকেন্দ্রীত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৬৩ জন। এদের আলোচনার মর্মবস্তু উপস্থিত করেন ঐ ৬৩ জন প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় হচ্ছে কত বেশি বেশি যুব সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সতেজ ও সজীব মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। কিভাবে, কতটা যোগ্যতা অর্জন করছেন, কি লক্ষ্য ছিল, কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, দুর্বলতা কোথায়, সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে তাকে অতিক্রম করার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখছিলেন তাদের মাতৃভাষায়—রোমানিয়া ভাষায়। কিন্তু একই সময় ছয়টি ভাষায় অনূদিত হয়ে হেডফোনের মাধ্যমে ভিনদেশীয় প্রতিনিধিদের শোনাবার ব্যবস্থা ছিল।

কমিউনিস্ট যুব সংঘের সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সীমা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুবদের বিগত-দিনের বিশাল এবং সুন্দর কাজগুলির সঙ্গে ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের পরিচিতি ঘটানো। এই কর্মসূচী শুরু হয় ২রা মে থেকে।

মে দিবসের পোস্টার, ফেস্টুন, লাল পতাকায় মুখরিত বুখারেস্ট শহর। গোটা বুখারেস্ট শহরে রাস্তার দুধারে, মাঝখানে চেরি, স্ট্র বেরী, ঝাউ-এর বাগান। মাঝে মাঝে লাইলাক, তুলিফ এবং আরো নানা রং-এর ফুলের বাগান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধব্ ধব্ করছে চারিধার। অজস্র ফুলের দোকান। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলের হাতেই ফুল। কাজে যাচ্ছে ফুল নিয়ে কাজ থেকে ফিরছে ফুল নিয়ে। কাজের সিফ্‌ট চেঞ্জ হলো। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিযুক্ত মহিলারা, যাদের স্থলে যোগ দিলেন তাদের হাতে তুলে দিলেন নানা রং-এর একতোড়া ফুল। নিয়মিত এই ঘটনা, সত্যিই লক্ষ্যণীয়। রাস্তায় অজস্র ট্রাম, বাস, ট্রলি-বাস, বৈদ্যুতিক বাস, মোটর গাড়ী চলছে, চলছে প্রশস্ত পথ ধরে অথবা কম প্রশস্ত পথ ধরে। কোথাও ভিড় নেই বা ভিড়ে পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে দেখা যায় নি।

প্রত্যেক ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে একজন করে গাইড এবং দোভাষী। যুব-ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদে যেতে হলো এক সন্ধ্যায়। যুব-ছাত্ররা নিজেরাই গড়ে তুলেছেন ত্রিতল বিশিষ্ট সেই প্রাসাদ। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যুব-ছাত্ররা এইখানে সংস্কৃতি বিশেষতঃ নাট্য, সংগীত, নৃত্য কলা প্রসঙ্গে পড়াশুনা, মহড়া এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রাসাদের বাইরে এবং ভিতরে অপূর্ব ওয়ালপেন্টিং এবং ফ্রেসকোর কাজ। স্থপতিরাই শিল্পী। কোনো আতিশয্য নেই প্রাসাদের নির্মাণ-ভঙ্গির মধ্যে। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তার অভাব কারো মনে হলো না। ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এই একটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২০০০ হাজার যুব-ছাত্র। এরকম আরো কেন্দ্র আছে সারা দেশে।

সেদিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল ট্রান্‌সিলভেনিয়া, মলডেভিয়া এবং ওয়ালেশিয়ার লোকনৃত্য আর গান। দুটি ব্যালে নৃত্যও প্রদর্শিত হলো। সুরে, ছন্দে, তাল, লয়ের ঐক্যতানে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো সেই সন্ধ্যা। বীরত্বপূর্ণ অতীত কাহিনী প্রাণের আবেগে মাতিয়ে তুলেছিলো ব্যালের মাধ্যমে। ক্যান্টিন ঘরে বসে এই সমস্ত শিল্পী যুব-ছাত্রদের সঙ্গে পরে পরিচয় হলো।

'ঐতিহাসিক মিউজিয়াম'—সত্যই বিস্মিত হতে হয়। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে আধুনিক কালের গোটা রোমানিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতার নিদর্শনগুলিকে নিখুঁত, ধারাবাহিকভাবে, স্থান-কালের সমন্বয়ে উপস্থিত করা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেখেও ছয়ঘণ্টা লাগলো। বড় বড় এক একটা হল ঘর এক একটি শতাব্দী। সমস্ত মানুষের চেতনায় একটা সামগ্রিক চিন্তা তুলে ধরার কি অপূর্ব 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী' প্রয়াস এই মিউজিয়াম তা প্রমাণ করে।

একটি ইলেকট্রনিক কারখানা, ১০ হাজার কর্মী কাজ করেন। শতকরা ৯০ জনের বয়স ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ২৯০০। কারখানা ইউনিটের সম্পাদক একজন মহিলা, ৫৫ বৎসর বয়স, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী মহিলা। এছাড়া কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার সদস্য ৩০০০। মহিলা কর্মী শতকরা ৬০ জন। কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। ন্যূনতম বেতন ১৮০০ লেই এবং সবচেয়ে বেশীর বেতন ৩২০০ লেই। ডলারের হিসাবে এক লেই সমান ২ টাকার কিছু বেশী হবে। কারখানার ভিতর ঝক্‌ঝক্ তক্‌-তক্ করছে চারদিক। কর্মীদের গায়ে ধব-ধবে পোষাক-পরিচ্ছদ। দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবরা কারখানায় কাজে নিযুক্ত হন এবং পরে তারা উচ্চ শিক্ষা অথবা বিশেষ উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। এই কারখানা সম্পর্কিত কারিগরী কলেজ এবং স্কুল আছে। শতকরা ৯০ জন কর্মী বিশেষ স্নাতক শিক্ষা অর্জন করে বিশেষ বিশেষ দক্ষ কাজে তারা নিযুক্ত আছেন। পার্টি নেতৃত্বের আদর আপ্যায়নে সত্যই মোহিত হতে হয়। গর্ব এবং বিনয়ের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এদের ব্যবহারে।

'ঐতিহাসিক উদ্যান' এর মধ্যে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি হ্রদ। এই উদ্যান থেকেই (তখন ছিল জঙ্গল) প্রথম ১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়। তাই উদ্যানটির নাম ঐতিহাসিক উদ্যান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ১২৫ রকমের একটি গোলাপ বাগান এই উদ্যানের মধ্যে। বসন্তের শুরু গোল পেরও প্রায় শেষ। উদ্যানের মধ্যে খেলাধুলার স্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। হ্রদে ভ্রমণের জন্য বড় বড় লঞ্চ, স্পিড্ বোট, দাঁড় বাইবার নৌকো, ইয়াস্ট হ্রদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ছুটির মেজাজ নিয়ে প্রায় ৫০০০ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম, শিল্পাঞ্চল, শহর থেকে চলে আসেন। সে সময় মে দিবসের ছুটি চলছিল। ওখানে মে দিবসের ৪ দিন ছুটি। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল গোটা উদ্যানটি। অফুরান প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে উদ্যানের মাটি আর হ্রদের জল।

বেকার যুবক বা যুবতীর সন্ধান ৮ দিনের মধ্যে পাওয়া গেল না। বেকার শব্দটাই ওদের কাছে অজানা। বিগত বিশ বছরে আয় বেড়েছে অনেক কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম বিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। ভিখারী চোখে পড়ে না।

সম্মেলনের শেষের দিনে নাদীয়া কমানেসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন নব-নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। অপূর্ব সুন্দরী এবং সরল। কথা বলার সময় মনেই হচ্ছিল না এই সেই মন্ট্রিল অলিম্পিক তারকা। এতটুকু অহমিকা নেই। অল্প স্বল্প ইংরাজী জানেন। আমি ঠাট্টা করে বললাম—দেখত, তোমার উপস্থিতিতে আমাদের অটোগ্রাফ্ দেওয়া কি শোভা পায়। কিশোর, কিশোরীরা, আমাদের অটোগ্রাফ্ নেওয়ার জন্য ঘিরে ধরেছিল। নাদীয়া কমানেসী কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হয়েছেন। সম্মেলন থেকে ১০ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ২৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হন। প্যানটেলিমন গ্যাভেনেস্কু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে যুব দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

কথা হচ্ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে। মূলত আমাদের দেশের অবস্থা, যুবকদের অবস্থা এবং ওদের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা। কমিউনিস্ট যুব সংস্থার নেতৃত্ব মনে করেন আগামী পাঁচ বৎসর তাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। সমস্যা আছে। এ সমস্যা তাদের অতিক্রম করতেই হবে। সেই বিপ্লবী আবেগ এবং মনোভাব নিয়েই তারা কথা বলছিলেন। তাঁদের বক্তব্যের মূলে কথাটা হলো—"এই বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজ তাদের উচ্ছলতা এবং বিপ্লবী মনোভাব নিয়েই সামনের সারিতে থাকবে। তারা সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, গবেষণা সংস্কৃতির অঙ্গনে উপস্থিত থাকবে। কমিউনিস্ট যুব সংস্থার সমগ্র কর্মসূচী বিপ্লবী সাম্যবাদী মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, দেশের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং সমগ্র জনগণের স্বার্থের উদ্দেশে নিয়োজিত হবে।"

সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। কিছু দোভাষী কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী। তারাই প্রধানত এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সাহায্য করতেন।

[সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ : ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সরকার ও জনসাধারণকে সতর্কভাবে এ আন্দোলনকে বিস্তারে বাধা দিতে হবে। আর আদিবাসী অঞ্চলে কোন বিদেশী সংস্থা যাতে সক্রিয় থাকতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। ঝাড়গ্রামে নাকি সম্প্রতি বিদেশীদের আগমন অনেক বেড়েছে এবং এর পর থেকেই নাকি সেখানে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কিছুদিন থেকে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও এরা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় নানা ধরনের গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা চাইছে, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ পাশাপাশি কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য গড়তে। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রামে কিছু পোস্টারও পড়েছে, দেয়াল লিখনও চলছে। তবু এও সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। কারণ বিদেশীচক্র এখানে বেশ সক্রিয়। এ আন্দোলনের সংগঠকদের দাবী—ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কোন উদ্বাস্তু আনা চলবে না এবং সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে দেশের যে কোন অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন হঠাৎ কোন উদ্দেশ্যহীন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। এর পেছনে রয়েছে এক একটা ষড়যন্ত্র এবং উদ্দেশ্য। এর জন্ম ও বিস্তার রাজনৈতিক কারণেই। এবং এর মদত দেয় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং সাম্রাজ্যবাদী কিছু বিদেশী শক্তি। সেই বিদেশী শক্তির অনুচর হিসাবে চুপিসারে কাজ করে যাচ্ছে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি। এরাই দেশের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগে তাদের বিভেদমূলক আন্দোলনে প্ররোচিত করে। পশ্চিমবঙ্গেও ওরা জাল পাতার চেষ্টা করছে।

পরিশেষে বলি, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদমূলক আন্দোলনের তরঙ্গ বইছে তার প্রধান শিকার হচ্ছে কিন্তু বাঙালীরা। এরা সেই বাঙালী, যারা দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। আর সেদিন এরা উদ্বাস্তু হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থেই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেন কখনও না ভোলেন যে সেদিন তাঁদেরই কেউ কেউ এদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন এদের স্বার্থ সংরক্ষার এক সুন্দর প্রতিশ্রুতি। সেই বাঙালী উদ্বাস্তুর দলকে যদি কোন অজুহাতে ভারতের কোন অংশে বসবাস করতে দেয়া না হয় তবে তাঁরা আজ যাবেন কোথায়? স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও কি সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগুনেই তাদের দগ্ধ হতে হবে?



কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে কম খরচে যৌথ শৌচাগার-এর মডেল দেখান হচ্ছে

জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাজতন্ত্র

অগাস্ট বেবেল

জনাধিক্যের আতংক

এমন লোক আছেন যাঁরা জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুতর ও আশু সমস্যার সমাধানের যোগ্য বিষয় বলে বিবেচনা করেন। কারণ, এখনই এটা আতংকজনক হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বিশেষভাবে আন্ত-র্জাতিক পর্যায়েই প্রয়োজন। কেননা, মানুষের আহার্য ও ঘনবসতি ক্রমবর্ধমানহারে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত। ম্যালথাসের সময় থেকেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম সম্পর্কে ব্যাপক বিতর্ক হয়ে আসছে। তাঁর একদা-বিখ্যাত ও অধুনা-কুখ্যাত জনসংখ্যা নীতির ওপর রচনায় তিনি বলেছেন—জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২) আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)। এই রচনার ওপর কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছেন, এটা স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী, হালকা এবং স্যার জেমস স্টিওয়ার্ট, টাউনসেন্ড, ফ্রাঙ্কলিন ওয়ালেস থেকে পেশাদারী-অলংকারপূর্ণ-ধর্মপ্রচারের সাহিত্যিক-চৌর্যাপরাধের একটি টুকরো মাত্র" এবং এটাতে "একটি লাইনও নিজস্ব নয়।" এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল: অতি দ্রুত জনসংখ্যা ও খাদ্যসরবরাহে অসঙ্গতি দেখা দেবে; এই অবস্থা অনিবার্যভাবে ব্যাপক দৈন্য ও পরিণামস্বরূপ ব্যাপক মৃত্যু ডেকে আনবে। কাজেই "জন্মনিরোধ অবলম্বন করা" অত্যাবশ্যক। পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তিদের বিয়ে করতে দেওয়া অনুচিত। অন্যথা, তার বংশধরদের "প্রকৃতির কোলে" স্থান হবে না।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আতংক অনেক পুরনো। এই আতংক গ্রীস ও রোমান আমলেও ছিল এবং মধ্যযুগের অবসানের সময়েও ছিল। প্লেটো এবং এরিস্টটল, রোমান ও মধ্যযুগের পাতিবুর্জোয়ারা সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এর প্রভাবে ভলটেয়ারও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বিষয়ের ওপর বই লেখেন। অন্যান্য লেখকও তাঁকে অনুসরণ করেন। সব শেষে ম্যালথাসের রচনায় এই আতংক অত্যন্ত শক্তিশালী অভিব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, তখন সবসময় জনসংখ্যার মাত্রাধিক্যের আতংক দেখা দেয়। তখন যে সাধারণ অসন্তোষ দপ্ করে ছড়িয়ে পড়ে, জনসংখ্যার আধিক্য ও খাদ্যের স্বল্পতাই তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়, খাদ্য কিভাবে উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তা নয়।

মানুষ দ্বারা মানুষের সবরকমের শোষণের ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণীশাসন যার প্রথম ও প্রধান উপায় হল জমি কুক্ষিগত করা। সাধারণ সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। মানুষকে বিত্তহীন করে বিত্তবানদের সেবা করেই জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হয়। এই অবস্থায় পরিবারে সামান্য নবা-গতকেও বোঝা বলে মনে হয়। জনাধিক্যের (ওভারপপুলেশন) ভূত মরীচিকার মত দেখা দেয়। এটা সেই পরিমাণে আতংক সৃষ্টি করে যে পরিমাণে জমি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উৎপাদন ব্যাহত করে। তাছাড়া জমি উপযুক্ত-ভাবে চাষ না হওয়ার জন্য কিংবা ভাল জমিগুলি পশুচারণে পরিণত করার ফলে অথবা জমির মালিকের শিকারের সখ মেটাতে জমি সংরক্ষণ করার জন্য। খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই জমি আর পাওয়া যায় না। রোম ও ইতালি খাদ্যসংকটে কষ্ট পায় যখন দেশের জমি মাত্র তিন হাজার জমিদারের হাতে থাকে। "জমিদারীগুলিই রোমের সর্বনাশের কারণ"—সেখানে এই ধ্বনিই তখন চীৎকৃত হয়। ইতালির জমি পরিণত হয় সম্ভ্রান্ত মালিকদের সুবিস্তীর্ণ শিকারভূমি ও সৌখীন উদ্যানে। দাসশ্রমিক দিয়ে কৃষিকাজ ব্যয়বহুল বলে বহু জমি পতিত রাখা হয়। এর চাইতে আফ্রিকা বা সিসিলি থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দামে সস্তা পড়ে। এটা খাদ্যশস্য থেকে মুনাফাবাজির দরজা খুলে দেয়। এই ব্যবসায় রোমের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা প্রধান ভূমিকা নেয়। পরে এই ব্যবসা দেশে জমি-চাষে ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধনী ব্যক্তিরা দেশে জমি চাষ করার পরিবর্তে খাদ্য ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে থাকে।

শাসকশ্রেণীগুলির সংখ্যাল্পতা রোধ করার উদ্দেশ্যে এই অবস্থায় শাসকশ্রেণী রোমের নাগরিক ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট অভি-জাতবর্গদের বিয়ে ও সন্তান উৎপাদনে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য-দান সত্ত্বেও তাঁরা বিয়ে করা ও সন্তান প্রজনন থেকে বিরত থাকেন। শাসকশ্রেণীগুলির অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের উচ্চশ্রেণী ও পুরোহিতবর্গ শত শত বছর ধরে সবরকমের চক্রান্ত ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অসংখ্য কৃষকের জমি আত্মসাৎ ও জনসাধারণের জমি কুক্ষিগত করার পর মধ্যযুগের অবসানের সময় অনুরূপ ব্যাপার সৃষ্টি হয়। যখন দীর্ঘ অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে কৃষকরা বিদ্রোহ করে এবং ঐ বিদ্রোহ চূর্ণ করা হয়, তখন অভিজাতশ্রেণীর দস্যুতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি ধর্মীয় রাষ্ট্রের সংস্কার সাধিত গির্জার অনুগামী রাজন্যবর্গ এই অপকর্ম অনুশীলন করে। চোরডাকাত, ভিখারি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং রিফর্মেশনের (ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত হয়। এটা ছিল মূলতঃ সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। অনেক দেশে এই আন্দোলন তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে—যেমন ১৫২৪-২৫ সালে জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ইংলন্ড ইত্যাদি জায়গায় বুর্জোয়া বিপ্লব) পর এই সংখ্যা চরমে ওঠে। জমির দখলহারা কৃষকরা দলে দলে ছুটল সহরের দিকে। কিন্তু উপরিবর্ণিত কারণে সেখানেও জীবনযাত্রার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। কাজেই "সর্বত্রই জনাধিক্য" বিরাজ করছিল।

ম্যালথাসের আবির্ভাব ইংলন্ডের শিল্প বিকাশের সময়েই। তখন হারগ্রিভস, আর্করাইট ও ওয়াট প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রশিল্পে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিরাট পরি-বর্তন দেখা দেয়। প্রধানতঃ যন্ত্রশিল্পে এই প্রভাব পড়ায় কুটির

শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ডে ভূসম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং বৃহদাকার শিল্পের প্রভূত বিকাশ ঘটে। একদিকে যেমন সম্পদ বাড়তে থাকে, অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে শাসকশ্রেণীগুলির একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তদানীন্তন জগত সম্ভাব্য সকল জগতগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট জগত ছিল, এবং ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পায়ণ ও অপরিমেয় সম্পদসৃষ্টির মাঝখানে ব্যাপক জনসাধারণকে নিঃস্ব করার মত স্ববিরোধী ঘটনায় আপাতঃদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজতে গিয়ে তারা অপরাধস্ক্ষালনের সুযোগ পায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি ও মুষ্টিমেয় জমিদারের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের ফলে যে অগণিত শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে তার পরিবর্তে অতি প্রজননের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অতি দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর দোষ চাপানোর চাইতে সহজতর আর কিছু ছিল না। এই অবস্থায় ম্যালথাস "স্কুল ছাত্রের উপযোগী, লঘু ও পেশাদারী ধর্মপ্রচারের অলংকারপূর্ণ ভাষণের সাহিত্যিক চৌর্যাপরাধের অংশ" রচনা করে বর্তমান দুরবস্থার যে কারণ নির্দেশ করেন তাতে শাসকশ্রেণীর অন্তরের গভীর চিন্তা ও কামনাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং দুনিয়ার সামনে শাসকশ্রেণীর সেই চিন্তা ও কামনার যৌক্তিকতাকে হাজির করেছে। একমহল থেকে এর পেছনে সোল্লাস সমর্থন এবং অন্যদিক থেকে এর প্রবল বিরোধীতাই এর কারণ। ম্যালথাস সঠিক সময়ে সঠিক কথা নিয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের পক্ষে হাজির হয়েছেন এবং যদিও "তাঁর রচনায় একটিও নিজস্ব বাক্য নেই," তবুও তিনি এইভাবে একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ মতবাদের সাথে তাঁর নাম সমার্থক হয়ে আছে।

(২) জনাধিক্যের কারণ

যে অবস্থা ম্যালথাসকে বিপদ সংকেত দেখাতে ও কর্কশ শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছে তা তখন থেকেই যুগে যুগে বিস্তার লাভ করছে। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর উপদেশ আঘাতের উপর অপমান-স্বরূপ। এটা যে ম্যালথাসের স্বদেশ গ্রেটব্রিটেনে শুধু ছড়িয়েছে তা নয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাসম্পন্ন সব দেশেই এর বিস্তৃতি ঘটেছে। এই ব্যবস্থা ভূমিলুণ্ঠন ও জনসাধারণকে যন্ত্র ও কারখানার দাসে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে তার উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে,—তা জমিই হোক্ বা যন্ত্রই হোক্ এবং পুঁজিপতিদের কাছে তাকে সমর্পণ করেছে। এই পদ্ধতি নিত্যনতুন শিল্পশাখা নির্মাণ করে তা উন্নত ও কেন্দ্রীভূত করে; কিন্তু এটা বরাবর নতুন জনসমষ্টিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে ঘোষণা করে বেকারে পরিণত করে। প্রাচীন রোমের মত এটা আনুষঙ্গিক কুফল সহ 'লাটিফাণ্ডিয়া' বা জমিদারীতে উৎসাহ প্রদর্শন করে। ইংলণ্ডীয় ধারায় ভূমি লুণ্ঠনে সর্বাধিক ক্লিষ্ট আয়ারল্যাণ্ড ইয়োরোপের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৮৭৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ১২, ৩৭৮, ২৪৪ একর তৃণভূমি ও উৎকৃষ্ট পশুচারণভূমি ছিল, কিন্তু কর্ষণোপযোগী জমি ছিল মাত্র ৩, ৩৭৩, ৫০৪ একর। প্রতি বছরই লোকসংখ্যা কমতে থাকে; অথচ, আরও বেশী কৃষিযোগ্য জমি তৃণভূমি ও পশুচারণভূমিতে এবং জমিদারদের শিকার ভূমিতে পরিণত করা হয়। ১৯০৮ সালে দাঁড়ায় ১৪, ৮০৫, ০৪৬ একর তৃণভূমি ও ২, ৩২৮, ৯০৬ একর মাত্র কৃষিযোগ্য জমি। তাছাড়া, কর্ষণোপযোগী জমির অধিকাংশ থাকে বিপুলসংখ্যক ছোট থেকে আরও ছোট কৃষকদের হাতে যারা জমি থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদনে অসমর্থ। এই ভাবেই আয়ারল্যাণ্ড কৃষিজমি থেকে পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনসংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ, এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষের কিছু বেশি, তাতেও বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ বাড়তি হয়ে পড়েছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশদের বিদ্রোহকে এইভাবে অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। জমির মালিকানা ও জমি কর্ষণের ক্ষেত্রে স্কটল্যাণ্ডেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। এই একই রকম অবস্থা হাঙ্গেরীতেও। সেখানে সাম্প্রতিক দশকে আধুনিক প্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান। ইউরোপের অনেক দেশের চাইতে উন্নত জমিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ আজ ঋণভারে জর্জরিত, জনগণ দারিদ্রক্লিষ্ট এবং মহাজনের কৃপার ওপর নির্ভরশীল। হতাশ জনগণ ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করছে। কিন্তু জমি এমন সব আধুনিক পুঁজিপতি রাঘববোয়ালদের হাতে কেন্দ্রীভূত যারা বর্বরভাবে বনভূমি ও কৃষিজমি স্বীয় স্বার্থসাধনে ব্যবহার করছে। ফলে হাঙ্গেরী অদূর ভবিষ্যতে শস্য রপ্তানিকারক দেশ থাকবে না। ইতালিতেও অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান। জার্মানির মত ইতালিও জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক বিকাশ উন্নত করেছে। কিন্তু পিডমন্ট, লোম্বার্ডি, টাসকেণী, রোমাগ্না ও সিসিলির পরিশ্রমী কৃষকরা ক্রমশঃ দরিদ্র হতে হতে ধ্বংসের সম্মুখীন। কয়েক বছর আগে যেখানে দরিদ্র কৃষকের দখলী জমিগুলি সযত্ন-পরিচালিত উদ্যান ছিল, আজ তা জলাভূমিতে পরিণত হতে শুরু করেছে। রোমের নিকটবর্তী ক্যামপাগ্নার লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি পতিত রয়েছে। ঐ এলাকা এককালে পুরনো রোমের অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু স্থানের অন্যতম ছিল। জলায় পরিণত জমিগুলি বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত করে। যদি যথাযথভাবে ক্যামপাগ্নার জল নিষ্কাশন ও জলসেচনের উত্তম ব্যবস্থা হয় রোমের অধিবাসীরা খাদ্যের একটা সমৃদ্ধ উৎস পেয়ে আনন্দিত হতো। কিন্তু ইতালি বৃহৎশক্তি হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনা, সামরিক ও নৌ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য এবং উপনিবেশ তৈরির জন্য অর্থব্যয় করে ইতালির শাসকরা জনগণের সর্বনাশ করে। এজন্য কৃষিকাজ, যেমন ক্যামপাগ্নার জমি উদ্ধার ইত্যাদির জন্য অর্থের সংস্থান তারা করতে পারে না। ক্যামপাগ্নার মত অনুরূপ দুরবস্থা দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতেও বর্তমান। যে সিসিলি এককালে রোমের শস্যাগার ছিল আজ তা দারিদ্রের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। সিসিলির মত দারিদ্রজর্জরিত ও নিগৃহীত লোক ইউরোপের আর কোথাও নেই। ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর দেশের অল্পে-সন্তুষ্ট সন্তানরা আজ ইউরোপের অধিকাংশ ও আমেরিকায় নগণ্য মজুরিতে কাজের সন্ধানে ভিড় করে; কিংবা দলবেঁধে চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হয়। কারণ স্বদেশের জমি তাদের সম্পত্তি নয়, নিজের দেশে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও তারা চায় না। ম্যালেরিয়ার মত উৎকট জ্বর-ব্যাধি ইতালিতে এত ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে যে সরকার অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ১৮৮২ সাল নাগাদ এক তদন্ত চালান। তদন্তে এই শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ হয় যে দেশের ৬৯টি বিভাগের মধ্যে ৩২টি বিভাগ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত, ৩২টি আংশিক-

ভাবে এবং মাত্র ৫টি বিভাগ এই রোগ থেকে মুক্ত। এই রোগ আগে শুধু গ্রামাঞ্চলেই দেখা যেত, এখন শহরগুলিতেও প্রবেশ করেছে যেখানে দলে দলে গ্রাম্য সর্বহারাদের সহরে চলে আসার ফলে ঘন সন্নিবিষ্ট সহরে সর্বহারার দল বহুগুণ বর্ধিত হয় এবং রোগ সংক্রামণের যোগ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

(৩) দারিদ্র ও বহুপ্রসূতা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, দেখা যায়, খাদ্যের স্বল্পতা এবং জীবনধারণের উপায়ের অভাব জনসাধারণের অভাব ও দুর্দশার ফল নয়। যে অসম বন্টন ও অর্থনীতিক কুব্যবস্থা কাউকে প্রাচুর্য দান করে এবং অন্যদের খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করে,—এটা তারই ফল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকেই ম্যালথাসীয় যুক্তি অর্থপূর্ণ। অন্যদিকে ধনবাদী ব্যবস্থাই সন্তান প্রজননে উৎসাহ দেয়। কারখানায় শিশুদের সস্তা ও সুলভ শ্রম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রয়োজন হয়, হিসাব করেই সর্বহারাদের জন্মদান করতে হয়—তাদের ভরণপোষণের মত উৎপাদন করতে হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কুটিরশিল্পে নিযুক্ত সর্বহারাদের অধিক সন্তান লাভ করতে বাধ্য হতে হয়। এই অনস্বীকার্য ঘৃণ্য প্রক্রিয়া শ্রমিকের দারিদ্র তীব্রতর করে এবং নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভরতা বাড়ায়। সর্বহারা অত্যন্ত দুঃখদায়ক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। কুটির শিল্পে শ্রমিকদের জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা করতে বা সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে অধিক অর্থব্যয় করতে নিয়োগকর্তা বাধ্য না থাকায় কুটিরশিল্পে সে অধিকসংখ্যক লোক নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা, এই জাতীয় শিল্পে সে যে সুবিধা পায়, অন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে তা সহজে পায় না; অবশ্য বিশেষ কোন উৎপাদন পদ্ধতি সেই অবস্থায় যদি সম্ভব হয়ে থাকে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি শুধু যে পণ্য ও শ্রমিকের অতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তা নয়, এই ব্যবস্থা অধিক বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির দিকেও চালিত হয়। বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর সদস্যদেরও চাকরি পাওয়া ক্রমবর্ধমানহারে কঠিন হয়ে পড়ে। চাহিদার চাইতে সরবরাহ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়। ধনতান্ত্রিক জগতে একটিমাত্র জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় না—তা হ'ল পুঁজি ও তার মালিক পুঁজিপতি।

যদি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ম্যালথাসের অনুগামী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বুর্জোয়া স্বার্থের দিক থেকে স্বাভাবিকই, শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের এই বুর্জোয়া খেয়াল প্রসারিত না করাই উচিত। জন স্টুয়ার্ট মিল লিখেছেন, "......কমিউনিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এই জাতীয় স্বার্থপর অমিতাচারের বিরুদ্ধে জনমত তীব্রতম প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। যে কোন সংখ্যাবৃদ্ধি জনগণের আরামের অপহ্নব ঘটাবে বা শ্রমের পরিমান বৃদ্ধি করবে তা সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অসুবিধা সৃষ্টি করবে এবং এটাকে নিয়োগকর্তার অর্থলিপ্সা বা ধনীদের অন্যায্য অধিকারের ফল বলা যাবে না'। এই পরিবর্তিত অবস্থায় অযৌক্তিক ধারণাকে অস্বীকার করা হয় এবং তাতেও না হলে যে কোন রকম শাস্তিমূলক বিধান নেওয়া হয় বা সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর নিন্দনীয় আরাম-অয়েশের প্রতি বশ্যতার প্রশ্রয় দিতে হয়। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা লোকসংখ্যাবৃদ্ধির আতঙ্ক থেকে উত্থিত প্রতিবাদ প্রকাশ্যে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঐ পাপ বা অমঙ্গল ঘটবার আগেই বাধা দেবার চেষ্টা করে।" অধ্যাপক এ ওয়াজুনার রাউ-এর 'ম্যানুয়াল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' বইয়ের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, "সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদকের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।" উপরোক্ত লেখকরা এই ধারণা থেকেই তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন যে সবরকম সমাজব্যবস্থাতেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই স্বীকার করেন যে অন্য সবরকম সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অধিকতর সক্ষম। তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্তটি সঠিক, আগেরটি নয়।

অবশ্য ম্যালথাসীয় মতবাদে কলুষিত কিছু কিছু সমাজ-তন্ত্রী আছেন যাঁরা জনাধিক্যের আশু বিপদ সম্পর্কে আতঙ্কিত। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী ম্যালথাসবাদীরা এখন উধাও হয়েছে। প্রকৃতি ও বুর্জোয়া সমাজের আসল চরিত্র সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁদের শিক্ষা হয়েছে। আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের সবিলাপ সঙ্গীত থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে আমরা বিশ্ববাজারের দৃষ্টিতে অতি-রিক্ত খাদ্যই উৎপাদন করি—যার ফলে দাম যায় কমে এবং কম-দামের জন্য খাদ্য উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়েছে।

আমাদের ম্যালথাসবাদীরা ভাবে, আর চিন্তাশক্তিহীন বুর্জোয়া প্রবক্তাদের ঐকতান সেই ভাষাকেই প্রতিধ্বনিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভালবাসার পাত্র নির্বাচনে স্বাধীনতা বর্তমান এবং যেখানে মানুষের উপযোগী ব্যবস্থা সকলের জন্য অবারিত, সেখানে মানুষ শশকের মত বংশবৃদ্ধি করে যাবে এবং নীতিবহির্গত যৌন সম্ভোগে ব্যাপৃত থেকে ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটাবে। আশা করা যায়, ঘটবে এর বিপরীতটাই। এখনও পর্যন্ত সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবারে নয়, নিকৃষ্টতম পরিবারেই অধিকসংখ্যক শিশুর আগমন দেখা যায়। অতি-রঞ্জনের অপবাদ থেকে মুক্ত থেকে একথা বলা যায়, অধিকতর দুর্দশাগ্রস্থ সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই অধিকতর সংখ্যা শিশুর আবির্ভাব হয়। ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই তা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিরচোর লেখা থেকে এর সমর্থন মেলে, মানসিক উদ্দীপক বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, অধঃ-পতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ইংরেজ শ্রমিক মাত্র ২টি উপভোগের উৎস জানে, এক মাদকতা, দুই যৌন সংগম। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সাইলেসিয়ার জনগণও তার সমস্ত কামনা-বাসনা এই দুই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে। সুরা ও যৌন কামনা পরিতৃপ্তিই সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং একথা অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায় যে শারীরিক বলিষ্ঠতা ও নৈতিক দৃঢ়তা যে পরিমাণে কমে সেই পরিমাণে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

মার্কসও তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাই নয়, পরিবারসমূহের পূর্ণ আয়তন আয়ের উচ্চতার বিপরীত অনুপাতে হয়ে থাকে এবং সেজন্য বিভিন্ন স্তরেই শ্রমিকের জীবিকার ওপরও নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই নীতি অসভ্য জাতির কাছে অবাস্তব মনে হবে, এমনকি সভ্য উপনিবেশের অধিবাসীদের পক্ষেও। এটা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল

ও নিয়ত আক্রান্ত পশুগুলির সীমাহীন বৃদ্ধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।" মার্কস লাইং-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "সব মানুষ যদি অনায়াসে জীবনধারণের অবস্থায় থাকত তাহলে পৃথিবী অনতিবিলম্বে জনশূন্য হয়ে যেতো।" লাইং ম্যালথাসের বিপরীত মত পোষণ করেন: জীবনযাত্রার উন্নত মান বরং জন্মহ্রাসেরই অনুকূল, জন্মবৃদ্ধির নয়। হার্বার্ট স্পেন্সর একই মত প্রকাশ করেছেন, "পূর্ণতা ও প্রজননশক্তি সবসময় সর্বত্রই পরস্পরবিরোধী। এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আরও প্রগতির জন্য মানবজাতি যে সমাজের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ফলে সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদন হ্রাস হবে।"

আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিরা এই একটি বিষয়ে একমত এবং আমরা তা সমর্থন করি।

(৪) লোকসংখ্যার ঘাটতি ও খাদ্যে বাড়তি

জনসংখ্যার গোটা প্রশ্নটি এই বলে সহজেই ছেড়ে দেওয়া যায় যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিপদ দৃষ্টিগোচর নয়, কারণ আমরা অতিরিক্ত খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন, যা আবার বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাবারই আশংকা। তাই এই সম্পদ নিয়ে কি করা হবে এই দুশ্চিন্তা, খাদ্য পর্যাপ্ত কিনা এই দুশ্চিন্তার চেয়ে অনেকবেশি বড়। খাদ্য উৎপাদনকারীরা সাগ্রহে খাদ্যের ভক্ষকদের দ্রুত বৃদ্ধিকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু ম্যালথাস-বাদীরা আপত্তি তুলতে ক্লান্তিবোধ করেন না। সুতরাং আমাদের নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে হবে পাছে তারা এই অজুহাতের আশ্রয় নিতে পারে না যে তাদের আপত্তি অকাট্য।

তাঁরা দাবি করেন যে অতি নিকট ভবিষ্যতে জনাধিক্যের বিপদ 'কম হ্রাসমান উৎপাদন বিধি'-র মধ্যে নিহিত। আমাদের জমি "উৎপাদনে নিঃশেষিত," বর্ধিষ্ণু ফসল আর আশা করা যায় না এবং যেহেতু কৃষির উপযোগী জমি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, তাই খাদ্য সংকটের বিপদ আসন্ন যদি লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকে। কৃষিতে জমির ব্যবহার সম্পর্কিত অধ্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে আমরা বিশ্বাস করি যে, কৃষি বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরেই নতুন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ কি বিপুল অগ্রগতি ঘটাতে পারে। আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন অত্যন্ত যোগ্য বড় ভূস্বামী ও সর্বজনস্বীকৃত অর্থনীতিবিদ (যিনি উভয় ক্ষেত্রে ম্যালথাসের চাইতে শ্রেষ্ঠ।) রডবার্টাস কৃষি রসায়ন শস্ত্রের শৈশবে ১৮৫০ সালে বলেছেন, "কাঁচা সামগ্রী উৎপাদন যেমন, খাদ্যোৎপাদন ভবিষ্যতে শিল্পোৎপাদনে ও পরিবহনের পেছনে পড়ে থাকবে না। কৃষি রসায়ন এখনই কৃষির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে আরম্ভ করছে। যদিও এর ভুলপথ পরিক্রমা করার আশংকা বিদ্যমান, তবুও এটা পরিণামে খাদ্য উৎপাদনকে সমাজের আয়ত্তাধীনে স্থাপন করবে, যেমন বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পশমের সরবরাহ পেলে যে কোন পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করা যায়।"

কৃষি রসায়ণের প্রতিষ্ঠাতা জুস্টাস ভন লিবিগ এই মত পোষণ করেন যে "যদি মানুষের শ্রম ও সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে জমি অফুরন্ত উৎপাদনশীল থাকে এবং বছরের পর বছর অপরিমেয় ফসল দিতে পারে।" উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ম্যালথাসীয় খেয়াল মাত্র, এটা কৃষিকাজের অতি নিম্নস্তরে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদিও এই নিয়ম বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নিয়মটি বরং এইভাবে বলা যায়—"একটা জমির উৎপাদন মানুষের ব্যয়িত শ্রম (বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতিসমেত) ও সেই জমিতে প্রদত্ত যথার্থ সারের সাথে সমানুপাতিক।" যদি গত ৯০ বছরে ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষুদ্র কৃষি খামারগুলি নিয়ে তার উৎপাদন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়ে থাকে (লোকসংখ্যা কিন্তু দ্বিগুণও বাড়েনি), তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পন্ন সমাজ থেকে অনেক বেশি ভাল ফল আশা করা যায়। ম্যালথাসবাদীরা আর একটি সত্য এড়িয়ে যান যে, শুধু আমাদের দেশের কথাই হিসাবের মধ্যে গণ্য করলে চলবে না, পৃথিবীর সব জমি, প্রধানতঃ যে সব দেশের জমি আমাদের দেশের ভূখণ্ড থেকে বিশ থেকে ত্রিশ ও তারও বেশি গুণ ফসল দেয়, তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বস্তুতঃ পৃথিবীর সম্পদরাশি মানুষ ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে। তবুও বলতে হয় এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বাদ দিলে যতটুকু হওয়া সম্ভব সেভাবে কোথাও জমির চাষ ও ফলপ্রদভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে না। শুধু গ্রেট ব্রিটেনই যে একমাত্র বর্তমানে যা উৎপাদন করে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে তাই নয়; ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়াও তা পারে এবং এ সত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র ওয়ার্টেমবার্গে ৮৭৯,৯৭০ হেক্টর কর্ষণযোগ্য জমিতে কেবল বাষ্পচালিত লাঙ্গল ব্যবহারের ফলে ৬,১৪০,০০০ সেন্টনার উৎপাদনকে ৯,০০০.০০০ সেন্টনারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মানির বর্তমান জনসংখ্যার অবস্থা দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় রাশিয়া তার বর্তমান ১০ কোটি লোকসংখ্যার পরিবর্তে ৪৭·৫ কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। আজকের ইউরোপীয় রাশিয়াতে প্রতি বর্গমাইলে ১৯·৪ জন লোক বাস করে, সেক্সনীতে করে ৩০০ জন। রাশিয়ার সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে জলবায়ু উচ্চপর্যায়ের উর্বরতা অসম্ভব করে তুলেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি জার্মানির জমির তুলনায় অনেক বেশি কৃষি উৎপাদনক্ষম। তখন আবার জনসংখ্যার ঘণত্ব ও উন্নত জমি কর্ষণ (যা অব্যবহিত পরেই হয়) জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাবে যা এমনকি আজও অনুমানকে হার মানায়। যেখানেই লোক রাশীকৃত হয়, সেখানেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

এসব বিষয়ের ওপর আমরা গুরুত্ব দিই না বললেই হয়, এমনকি এগুলির সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। কারণ বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে বিরাট আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ বা সম্ভাবনা আমাদের নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজকের অতি হাল্কা বসতিপূর্ণ নরওয়ে ও সুইডেন তাদের বিরাট বনাঞ্চল, সত্যিকারের অফুরন্ত খণিজ সম্পদ, অসংখ্য নদনদী এবং সমুদ্রতীরবর্তী দীর্ঘ এলাকা নিয়ে আরও ঘণ জনসংখ্যার জন্য সমৃদ্ধ খাদ্যসংস্থান করতে পারবে। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায়ের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের একাংশ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে যা বলা যায়, ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে আরও অতুলনীয় অধিক মাত্রায় তা প্রযোজ্য—যেমন পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, গ্রীস, দানিয়ুবীয় রাজ্যসমূহ,

হাঙ্গেরী, তুরস্ক প্রভৃতি। ঐসব দেশসমূহের ক্লৈদাক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলে শত সহস্র মানুষ দেশে অবস্থান বা নিকটবর্তী সুবিধাজনকভাবে-অবস্থিত দেশে স্থায়ী বসবাস করার পরিবর্তে দেশত্যাগ করে সমুদ্রের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। যেইমাত্র একটা ন্যায়নিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্থাপিত হবে, তখন ঐ বিস্তীর্ণ ও উর্বর ভূমিকে উন্নত পর্যায়ের কৃষিভূমিতে উন্নীত করতে নতুন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে।

অদূর ভবিষ্যতে যখন ইউরোপে অতি উন্নত সাংস্কৃতিক লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে লোকসংখ্যা বাড়তির চাইতে ঘাটতিই দেখা দেবে এবং সেই অবস্থায় জনাধিক্যের আতঙ্ক পোষণ করা অসম্ভব হবে। সবসময় মনে রাখা দরকার যে শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদনের উৎসের যথাযথ ব্যবহার সীমাহীনভাবেই করা যায়। কারণ প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন খাদ্যের উৎসবৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

আমরা ইউরোপ ছেড়ে যদি অন্য দেশের দিকে তাকাই, তাহলে লোকের ঘাটতি ও জমির প্রাচুর্য আপনা থেকেই আমাদের চোখে পড়ে। পৃথিবীর প্রচুর পরিমাণ উর্বর জমি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ পতিত জমি কৃষি উপযোগী করে যথাযথ ব্যবহারের কাজ সম্পাদন করা কয়েক হাজার লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বহু লক্ষ লোকের ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপন প্রয়োজন, প্রকৃতির এই প্রাচুর্যের কিয়দংশকে মানুষের নিয়ন্ত্রাধীন করতে। অন্যান্যের মধ্যে এই পর্যায়ে পড়ে কয়েক লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট ভূখণ্ড, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্জেন্টিনার অধীনে ৯·৬ কোটি হেক্টর উর্বর জমির মধ্যে অনধিক ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় শস্য উৎপাদনক্ষম পতিত জমির পরিমাণ কমপক্ষে আনুমানিক ২০ কোটি হেক্টর: অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে সম্মিলিতভাবে শস্য উৎপাদন হয় ১০·৫ কোটি হেক্টর জমি। ৪০ বছর আগে ক্যারী এই মত পোষণ করতেন যে ৩৬০ মাইল দীর্ঘ ওরিনোকো উপত্যকা একাই সমগ্র মানবজাতিকে খাওয়াবার মত শস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই অনুমানের অর্ধেকও মেনে নিলে তবু আরও প্রচুর থাকে। যে কোন ক্ষেত্রে একা দক্ষিণ আমেরিকাই বর্তমান জগতের লোকসংখ্যার বহুগুণকে খাওয়াতে পারে। পুষ্টিকারিতার দিক থেকে একখণ্ড জমিতে কলা চাষ ও ঐ পরিমাণ জমিতে গম চাষের হার হয় ১৩৩ ঃ ১। যেখানে আমাদের ভাল জমিতে গমের ফসল বীজের ১১ থেকে ২০ গুণ মাত্র হয়, সেখানে ধান উৎপাদনকারী জমিতে বীজের তুলনায় ফসলের পরিমাণ হয় ৮০ থেকে ১০০ গুণ, ভুট্টা ২৫০-৩০০ গুণ এবং কোন কোন স্থানে যেমন ফিলিপাইনে ধানের উৎপাদন হয় বীজের ৪০০ গুণের মত। এইসব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপাদনের সময় তার পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখা দরকার। পুষ্টির ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্রের বিকাশের সীমাহীন পরিধি রয়েছে।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রাজিলে, আয়তনে প্রায় সারা ইউরোপের সমান। ব্রাজিলের আয়তন ৮,৫২৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথচ জনসংখ্যা ২·২ কোটি যেখানে ইউরোপের আয়তন ৯,৮৯৭,০১০ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি। জমির প্রাচুর্য ও উর্বরতার জন্য এই দেশের গর্ব পরিব্রাজকদের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে। তাছাড়া এইদেশসমূহে অফুরাণ আকরিক ও ধাতব পদার্থ আছে। তবুও এসব দেশ এখনও বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ এখানকার জনসাধারণ শ্রমবিমুখ ও সংখ্যায়ও তারা নেহাৎ অল্প, সভ্যতার আলো পেয়েছে সামান্যই এবং শক্তিধর প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে তারা অক্ষম। আফ্রিকার অবস্থা কি রকম সেটা সাম্প্রতিক দশকগুলির আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে। মধ্য আফ্রিকার একটি ভাল অংশ ইউরোপীয় চাষের পক্ষে অনুপযোগী হলেও এমন বিরাট বিরাট ভূখণ্ডও রয়েছে, মানুষের উপনিবেশ গড়ার যুক্তিগ্রাহ্য নীতিগুলি প্রয়োগ করা হলে যেগুলিকে ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে, এসিয়ার সুবিস্তীর্ণ ও উর্বর এলাকাগুলি লক্ষ লক্ষ অগণিত লোকের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে। অতীতে আমরা দেখেছি, মৃদু জলবায়ু পেলে প্রায় মরুভূমির মত অনুর্বর স্থানগুলি মূল্যবান পুষ্টির যোগান দিতে পারে যদি মানুষ জানে কিভাবে তাতে জীবনসঞ্চারী জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্বর ধ্বংসমূলক দেশজয় ও স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর উন্মত্ত নির্যাতনের মাধ্যমে অতি উন্নত ধরণের কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী ও সেচ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের ফলে পশ্চিম এসিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকাগুলির হাজার হাজার বর্গমাইল বালির মরুভূমিতে পরিণত হয়। একই ঘটনা সংঘটিত হয় উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ও পেরুতে। যদি সভ্য মানুষ এই সমূহ এলাকায় লক্ষে লক্ষে বসবাস করে তাহলে অফুরন্ত খাদ্যের উৎসের দ্বার খুলে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকায় খেজুর গাছের ফল অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে ফলে এবং তাতে এত কম জায়গার দরকার হয় যে, ২০০টি গাছ এক মর্গেন স্থানে (দুই একরের সামান্য বেশি) রোপন করা যায়। মিশরে ডুরা (আটা ময়দার মত গুঁড়ো করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) নামক শস্য বীজের ৩০০০ গুণ ফলন দেয়। তবুও দেশটি গরিব। জনাধিক্য এর কারণ নয়। বর্বর ধ্বংসকার্যের ফলে যুগ যুগ ধরে মরুভূমি বেড়েই চলেছে, এই গোটা দেশে মধ্য ইউরোপের উদ্যান ও কৃষির কলাকৌশল প্রয়োগ করলে যে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যাবে তা সব হিসাবকে হার মানায়।

বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বর্তমান জনসংখ্যার (৮·৫ কোটি) ১৫ থেকে ২০ গুন লোকের (১৫০ কোটি থেকে ১৭০ কোটি) অনায়াসে আহারের সংস্থান করতে পারে। অনুরূপভাবে কানাডাও ৬০ লক্ষ মানুষের খাদ্য সংস্থানের পরিবর্তে কোটি কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ যার মধ্যে অনেকগুলি আয়তনে যেমন বড়, উর্বরতাও তার অসাধারণ। সভ্যতার নামে এখন লোকসংখ্যা কমানো নয়, বাড়ানোর আবেদনই মানবজাতির কাছে পেশ করা হচ্ছে।

সর্বত্রই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি নয়। কয়েকটি উত্তম ফসল উপর্যুপরি খাদ্যের মূল্য এত কমিয়ে দেয় যে অসংখ্য চাষীরই সর্বনাশ হয়। কৃষকের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই হয়। ভাল ফসলের মূল্য কমে যায় বলে বর্তমানে কৃষকদের এক বৃহদাংশ ভাল ফসলকেই

দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। এবং একেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা মনে করা হয়। অন্য দেশের ফসল প্রাপ্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য খাদ্যশস্যের ওপর চড়া শুল্ক বসানো হয়। এতে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানী ব্যাহত হয় এবং দেশী বাজারে দাম চড়ে যায়। কারখানার প্রস্তুতজাত বহু সামগ্রীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পদ ও উৎপাদন সম্পর্কের জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ লোক প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সেইরকম লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়, কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তারা তার দাম দিতে অপারগ। এই রকম একটা উন্মত্ত অবস্থা স্পষ্টতঃই বিদ্যমান। যখন ফসল ভাল হয় আমাদের খাদ্যশস্যের মুনাফাখোরেরা ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য নষ্ট করে ফেলে, কারণ তারা জানে, যে পরিমাণ খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণে তার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় জনাধিক্যের ভয় আমাদের করতেই হয়! রাশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গুদাম ও পরিবহনের সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রতি-বছর লক্ষ লক্ষ সেন্টনার (এক সেন্টনার প্রায় ৫০ কেজির সমান) খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় ফসলকাটার যন্ত্র-পাতির অভাবে বা ঠিক সময়ে কাজ করার লোকের স্বল্পতার জন্য প্রতি বছর আরও লক্ষ লক্ষ সেন্টনার খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। বহু শস্য-মঞ্জরী ও পরিপূর্ণ শস্যাগার এবং গোটা ভূসম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে যে লাভ হয়, তার চাইতে বীমার প্রিমিয়ম অনেক বেশি লাভজনক। একই-কারণে নাবিকসহ শস্যভর্তি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য বিনষ্ট করা হয়। আমাদের সামরিক অভিযানের সময় ফসলের একটা বিরাট অংশ বছর বছর নষ্ট করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের সামরিক অভিযানের জন্য ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। এটা সকলেরই জানা বিষয় যে এই হিসাব খুব কম করেই ধরা হয়, এবং অনেক সামরিক অভিযান প্রতি বছরই হয়ে থাকে। একই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক গ্রামের সম্পূর্ণটাই ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং বিরাট এলাকা কৃষিকাজ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সমুদ্র হল খাদ্যের একটা সহায়ক উৎস। পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের ১৮ঃ ৭ অনুপাতে আছে অর্থাৎ জলভাগ স্থলভাগের চাইতে আড়াইগুণ বড় এবং এর অপরিমেয় খাদ্যসম্পদ এখন বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে। সম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ ম্যালথাসবাদী-দের অঙ্কিত জীর্ণ চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পরিশেষে, কে বলতে পারে আমাদের রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কীয় জ্ঞানের শেষ কোথায়? কে সাহস করে বলতে পারে মানুষ আগামী শতাব্দীগুলিতে আবহাওয়া পরিবর্তনের ও জমি ব্যবহারের পদ্ধতির জন্য কি বিরাট বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করবে?

আজ আমরা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পরিকল্পনা কার্যকরী হতে দেখি এক শতাব্দী আগে এটাকে অসম্ভব ও উন্মাদ পরিকল্পনা বলেই ভাবা হতো। বিস্তৃত যোজক কেটে সমুদ্রকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। অতি উচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত দেশকে সংযোজনের জন্য বহু মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পৃথিবীর বুকে খনন করা হচ্ছে। দূরত্ব কমাবার জন্য এবং সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত দেশের নানা বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য সমুদ্রগর্ভেও অনুরূপ সুড়ঙ্গ খনন চলছে। "ব্যস, এপর্যন্তই, আর না!"—এই কথা বলার যো কৈ? বর্তমান অভিজ্ঞতা 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' (Law of diminishing returns) শুধু যে খণ্ডন করেছে তা নয়, উদ্ধৃত উর্বর জমিও কোটি কোটি লোক দ্বারা কর্ষিত হবার অপেক্ষায় আছে।

এই সমূহ কৃষি প্রকল্প যদি একই সঙ্গে হাতে নেওয়া হয়, আমরা লোকের আধিক্যের বদলে লোকের অতি-স্বল্পতাই অনুভব করব। সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা সমাধানের জন্য মানবজাতির প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি দরকার। চাষের আয়ত্ত্বাধীনে আনা জমিরও পরিপূর্ণ ব্যবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনই পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ জমি চাষ করার জন্য প্রচুর লোকেরও অভাব। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যে আপেক্ষিক জনাধিক্য সৃষ্টি করে, সভ্যতার উন্নত স্তরে তা আশীর্বাদ বলে গণ্য হবে। জনসংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, তা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়, অন্তরায় হয় না। যেমন, বর্তমানে খাদ্য ও পণ্যের অতি উৎপাদন; নারী ও শিশুকে শিল্পে নিয়োগের ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা সমাজের মধ্যশ্রেণীর উৎসাদন ইত্যাদি সবকিছুই সভ্যতার উন্নত স্তরের পূর্বসর্ত হয়।

৫। সামাজিক সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা

এই সমস্যার অন্যদিক হচ্ছে—মানুষ কি অনির্দিষ্ট হারে বাড়ে এবং এই বাড়ার প্রয়োজন কি তারা অনুভব করে?

মানুষের সন্তান উৎপাদনের বিরাট ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাসবাদীরা সাধারণতঃ ব্যতিক্রমযুক্ত পরিবার ও মানুষের বিরল ঘটনার উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। এসব বিরল ঘটনার বিপরীতদিকে আবার এমন ঘটনা আছে যেখানে অনুকূল জীবনযাপন ব্যবস্থার মধ্যেও সম্পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব বা নামমাত্র জন্মদান ক্ষমতা অল্পসময় পরেই দেখা দেয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি কি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয় সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য অন্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক, কমবয়সে বসবাসের জন্য এদেশে আসা সত্ত্বেও প্রতি ৩০ বছরে মাত্র জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। বার থেকে কুড়ি বছরে জন-সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও বিরাট আকারে নেই।

ভির্চো ও মার্ক্স থেকে উদ্ধৃত বাক্যসমূহ প্রমাণ করে যে দরিদ্রতম অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বেশি দ্রুত। কারণ, ভির্চো সঠিকভাবেই দাবি করেন যে মাদকতা ছাড়াও যৌন সংগমেই হ'ল তাদের একমাত্র আনন্দ। সপ্তম গ্রেগরি (Gregory) যখন যাজকদের উপর চিরকৌমার্যব্রত বাধ্যতা-মূলক করেন, মেইঞ্জের বিশপের এলাকায় নিম্নপদের যাজক-দের অভিযোগঃ প্রধান পুরোহিতদের দেখেই বোঝা যায় যে যারা সম্ভাব্য সব বয়সের আনন্দে যোগদান করতে পারে, তাদের আনন্দের উৎস মাত্র একটিই—তা হ'ল নারীসম্ভোগ। হরেকরকম পেশার অভাবের জন্যও বোঝা যায় কেন গ্রাম্য পুরোহিতদের বিবাহ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এটাও অনস্বী-কার্য যে জার্মানীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলি যেমন ইউলেনবার্গ (সাইলেসিয়া), লসিজ, আর্জ, ফিস্তেলজিবার্গ, থুরিঙ্গিয়া

বন, হাজ' প্রভৃতি অধিক ঘন বসতিতে পূর্ণ, যদিও তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল আলু। এটাও নিশ্চিত যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্তদের যৌন আবেগ বিশেষভাবে তীব্র; এবং শারীরিক অবস্থার অবনতির সময় যখন সন্তান উৎপাদন অসম্ভব মনে হয় তখনই অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

(১) সংখ্যা দিয়ে মানের ক্ষতিপূরণ করাটাই প্রকৃতির নিয়ম। (২) হার্বার্ট স্পেনসার, লাইঙ প্রভৃতির উদ্ধৃত বাক্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। বড় ও শক্তিশালী পশু যথা হাতী, সিংহ ও উট প্রভৃতি, আমাদের গৃহপালিত পশু যেমন ঘোড়া, গাধা ও গরু প্রভৃতি জগতে কম সন্তানই আনয়ন করে। অন্যত্র নিম্নশ্রেণীর পশুরা বিপরীত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যেমন সব রকমের পোকামাকড়, অধিকাংশ মৎস্য, নিম্ন স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি। অন্যদিকে ডারউইন এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে কতকগুলি পশু তাদের প্রজননশক্তি হারিয়ে ফেলে যখন তাদের বশীভূত করে গৃহপালিত করা হয়। হাতী একটা দৃষ্টান্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে নতুন জীবন ধারণের পরিবেশ ও পরিবর্তিত জীবন যাপনের পদ্ধতি প্রজনন ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করে দেয়।

এটা বিস্ময়ের বিষয় যে ডারউইনবাদীরাই জনাধিক্যের আতঙ্কের অংশীদার এবং তাদের পাণ্ডিত্যের ওপরই আমাদের আধুনিক ম্যালথাসবাদীরা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক ডারউইনপন্থীরা যখন তাদের তত্ত্বগুলি মানব জাতির প্রতি প্রয়োগ করেন তখন তাঁদের ভাগ্য সব সময়ই বিরূপ হয়, কারণ তাঁরা সেরা হাতুড়ে পদ্ধতির শরণাপন্ন হন এবং বিস্মৃত হন যে মানুষ যদিও উচ্চ পর্যায়ের জীব এবং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা অন্য পশুরা পারে না—নিজের স্বার্থে প্রকৃতির নিয়মকে ভাল ভাবে কাজে লাগাতে জানে।

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের তত্ত্বমতে নতুন জীবনের বীজ প্রাণধারণের বর্তমান উপায়ের চাইতে অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকতে পারে। এই তত্ত্ব মানুষের বেলায়ও প্রয়োগ করা যেত যদি মানুষ মস্তিষ্কচালনা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাতাস, জমি ও জলকে ন্যায্যভাবে ব্যবহারের পরিবর্তে তৃণভোজী পশুর মত চরতে থাকত বা বানরের মত অবাধ যৌনকার্যে নিরত থাকত, অর্থাৎ সে যদি বানর হয়ে যেত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মানুষ বাদ দিলে বানররাই একমাত্র জীব যাদের যৌন আবেগ কোন নির্দিষ্ট সময়ের দ্বারা সীমিত নয়, এটা একটা অকাট্য প্রমাণ যে, এই উভয় জাতির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদিও তারা নিকট সম্পর্কিত, তারা অভিন্ন নয় এবং তাদের একই পর্যায়ে স্থাপন করা চলে না বা একই মানদণ্ডে বিচার করাও চলে না।

এটা সত্য যে মালিকানা ও উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্কের অধীনে ব্যক্তি মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং এখনও করতে হয়। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে অনেকেই ব্যর্থ, জীবনধারণের উপায়ের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এটা নয়। এর কারণ হ'ল—বর্তমান সামাজিক অবস্থায়—এমন একটা জগতে বেঁচে থাকার উপায় থেকে মানুষ বঞ্চিত যেখানে এক বিরাট প্রাচুর্য বিদ্যমান। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করাও অন্যায় হবে যে যখন আজ পর্যন্ত এই ধরণের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে, কাজেই এটা পরিবর্তনের অতীত এবং কখনও তার পরিবর্তন হবে না।

এখানেই ডারউইনবাদীরা স্থানচ্যুত হন। কারণ তাঁরা প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব অনুশীলন করেন কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁরা করেন না। সুতরাং গভীরভাবে বিবেচনা করেই তাঁরা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের পথের পথিক হয়ে যান। এই জন্যই তাঁরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন।

মানুষের সহজাত যৌন উন্মাদনা সারা বছরব্যাপীই থাকে; এটা সবচাইতে শক্তিশালী উন্মাদনা এবং স্বাস্থ্য খারাপ না হওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি খোঁজে। এই প্রেরণা সাধারণতঃ তীব্র হয় সুস্থ এবং স্বাভাবিক সুঠাম শরীরে, ঠিক যেমন স্বাভাবিক ক্ষিদে এবং হজম সুস্থ পাকস্থলীর লক্ষণ এবং সুস্থ শরীরের মৌলিক পূর্বসর্ত। কিন্তু যৌন প্রেরণায় পরিতৃপ্তি এবং গর্ভসঞ্চার এক কথা নয়। মানব জাতির প্রজনন সম্পর্কে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত আছে। মোটের ওপর, আমরা এই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। তার প্রধান কারণ হল, বহু শতাব্দী ধরে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের সূত্র অনুসন্ধানে, মানুষের সন্তান উৎপাদন ও বিকাশ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে মানুষকে বিরত রেখেছে বোধশূন্যহীন নিষেধের বেড়া। অবস্থা শুধু ক্রমশঃ পাল্টাচ্ছে এবং আরও পাল্টাতে বাধ্য।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে উচ্চতর মানসিক বিকাশ এবং কঠোর মানসিক পরিশ্রম, এক কথায়, উন্নততর স্নায়বিক ক্রিয়াশীলতা যৌন আকাঙ্ক্ষা দমিত করে এবং প্রজননশক্তি দুর্বল করে। এই মতের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁরা দেখেন যে গড়ে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর সন্তান সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তা শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল নয়। নিঃসন্দেহভাবে তীব্র মানসিক পরিশ্রম যৌন আবেগ দমন করে, কিন্তু আমাদের সম্পদশালী শ্রেণীর অধিকাংশ এই ধরণের কাজ করে বলা হলে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যৌন আকাঙ্ক্ষা দমনে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু, সব রকমের অত্যধিক পরিশ্রমই ক্ষতিকর এবং তা বর্জনীয়।

অন্যেরা দাবি করেন যে নারীর জীবনধারা বিশেষতঃ খাদ্যতালিকা ও তার সাথে কতিপয় প্রাকৃতিক অবস্থা মিলিতভাবে তার গর্ভধারণের ও প্রসবের শক্তি নির্দ্ধারণ করে দেয়। পশুর বেলায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অন্যান্য সব জিনিষের চাইতে খাদ্যই প্রজনন ক্রিয়ার কার্যকারিতাকে বেশি প্রভাবিত করে। এটাই বস্তুতঃ প্রধান নিয়ামক শক্তি হতে পারে। কোন কোন প্রাণীর জীবকোষের ওপর খাদ্যের প্রভাব বিস্ময়করভাবে প্রদর্শিত হয়েছে মৌমাছির বেলায়। বিশেষ খাদ্য প্রদানের দ্বারা ইচ্ছামত রাণীর জন্মদান চলে। মৌমাছিরা তাহলে তাদের যৌনবিকাশের জ্ঞানে মানুষের চাইতে অগ্রগামী। খুব সম্ভবতঃ গত দু' হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যে এটা প্রবেশ করানো হয়নি যে যৌন ব্যাপারে আলোচনা "অশ্লীল" ও "নীতিবিগর্হিত"।

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে উৎকৃষ্ট ও ভাল সার দেওয়া জমিতে গাছ খুব বিপুলভাবে বাড়ে কিন্তু ফল দেয়না। এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে মানুষের বেলায়ও পুরুষের শুক্রকীট গঠনে ও নারীর ডিম্ব ফলপ্রসূ করণে খাদ্যের প্রভাব আছে। কাজেই মানুষের প্রজনন ক্ষমতার অনেকখানি নির্ভর করে তাদের খাদ্যের প্রকৃতির ওপর। এ

ব্যাপারে অন্য কিছু বিষয়েরও ভূমিকা আছে যদিও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায়নি।

ভবিষ্যতে জনসংখ্যার প্রশ্নে অত্যন্ত নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্বের বিষয় হবে বিনা ব্যতায়ে আমাদের সকল নারীর উচ্চতর ও অধিকতর স্বাধীন অবস্থায় অবস্থান। ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভগবানের দান হিসেবে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে, জীবনের সর্বোত্তম বছরগুলি গর্ভবতী থাকতে বা কোলে একটি শিশু নিয়ে বুকের দুধ দিয়ে কাটাবার ইচ্ছে বুদ্ধিমতী ও তেজী মহিলাদের নেই। ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গর্ভবতী নারী ও জননীদের যত উন্নত ব্যবস্থাই করুক না কেন অধিক সংখ্যক সন্তান না পাওয়ার প্রবণতা (এমনকি এখনও যা অধিকাংশ নারীর মধ্যে আছে) না কমে বরং বাড়বে। আমাদের মতে এর অর্থ এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া সমাজের চাইতে জনসংখ্যা খুব সম্ভবতঃ অনেক ধীরে বাড়বে।

ভবিষ্যতে মানব জাতির বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের ম্যালথাসীয়-দের মাথা ঠোকার সত্যই কোন হেতু নেই। আজ পর্যন্ত কোন জাতি লোকসংখ্যা হ্রাসের জন্য ধ্বংস হয়েছে বলে জানা যায়নি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তো নয়ই। সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলা যায় যে সমাজ ক্ষতিকর মিতাচার ও অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলবে, সেই সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিষয়েও ভবিষ্যৎ কার্ল মার্ক্সের যাথার্থ প্রতিপাদন করবে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিকাশের সময়কালে, তার নিজস্ব একটা বিশেষ জন্ম-মৃত্যু বিধি থাকে, সমাজতন্ত্রের অধীনেও মার্ক্সের এই অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

এইচ ফার্ড 'বংশের কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা' গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন—"ম্যালথাসবাদের তীব্র বিরোধিতা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের একটা বদমাইসি মাত্র। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হলে জনগণের দারিদ্র্য বাড়বে এবং এর ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। জনাধিক্য যদি রোধ করা হয় তাহলে সোস্যাল ডেমো-ক্র্যাসির অবসান হবে এবং সমস্ত চাকচিক্যসহ সোস্যাল ডেমো-ক্র্যাটিক রাষ্ট্র চিরকালের জন্য কবরস্থ হবে। সোস্যাল ডেমো-ক্র্যাসিকে উৎখাতের জন্য অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে আরও একটি অস্ত্র আমাদের বাড়ল—তা হ'ল ম্যালথাসবাদ।"

অধ্যাপক এডলফ ওয়াগনার জনাধিক্যের আতংকে পীড়িত ব্যক্তিদের একজন। তাঁর দাবি হল, বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রমিকদের বিয়ে করা ও বাসস্থান নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে মধ্যবিত্তদের তুলনায় শ্রমিকরা অতি অল্প বয়সেই বিয়ে করে। এই একই মতাবলম্বী অনেকের মত তিনিও এই সত্য অগ্রাহ্য করেন যে মধ্যবিত্তেরা নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিয়ে করার অবস্থায় যখন আসেন, তখন তাঁদের বয়েস হয়ে যায় অনেক। কিন্তু তারা তাদের এই মিতাচারের ক্ষতিপূরণ করে গণিকাসক্ত হয়ে। শ্রমিকদের বিয়ের ক্ষেত্রে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তারাও একই পথে ধাবিত হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্পর্কে কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয় এবং "ধর্ম ও নৈতিকতা গেল গেল" বলে চীৎকারও যেন না ওঠে। যদি পুরুষ ও নারী (কারণ নারীরও পুরুষের মতই অনুভূতি) স্বাভাবিক যৌন কামনা চরিতার্থ করতে অবৈধভাবে মিলিত হয় এবং সহর ও পল্লী বীজের মত অবৈধ সন্তানে ভরে দেয় তাহলেও রাগ করা উচিত নয়। ওয়াগনার অ্যান্ড কোম্পানির মতবাদ বুর্জোয়া স্বার্থের ও আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধী। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হয় যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাজের লোক যাতে একটা শ্রমিক বাহিনীকে প্রতিযোগিতার জন্য দুনিয়ার বাজারে নিক্ষেপ করা যায়। বর্তমান যুগের পাপ পঙ্কিলতা মামুলি প্রস্তাবগুলিতে দূর করা যাবে না, যে প্রস্তাবের উৎসস্থান হ'ল অদূরদর্শী বৈষয়িকতাবাদ ও পশ্চাদপদতা। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমভাগে কোন শ্রেণীর বা রাষ্ট্রশক্তির এমন শক্তি নেই যে সমাজের স্বাভাবিক অগ্র-গতিকে পিছু টানে ধরে রাখতে পারে বা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এই জাতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিকাশের জোয়ার এত শক্তিশালী যে তা সমস্ত বাধাই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আজকের রণধ্বনি। যে এখনও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখাতে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানবজাতি সর্বপ্রথম যথার্থ স্বাধীন হবে এবং স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী জীবনধারণ করবে। মানবজাতি তখন তার নিজের বিকাশকে সচেতনভাবে চালিত করবে। পূর্ববর্তী যুগসমূহে মানুষ উৎপাদন ও বণ্টন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং তা করেছে কোন্ নিয়মে তারা শাসিত হচ্ছে সেটা না জেনেই অর্থাৎ অচেতনভাবে। নতুন সমাজে স্বীয় বিকাশের নিয়মধারা সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে মানবজাতি কাজ করবেন সচেতনভাবে এবং পরিকল্পনা-মাফিক।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিজ্ঞান।

[ভাষান্তর—মৃদুল দে]

[অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভাষায়, অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান পার্টির সবচেয়ে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মননের এবং অগাস্ট বেবেল এমন একজন ব্যক্তি সব-সময়ে ও যে কোন অবস্থায় যাঁর ওপর নির্ভর করা যায়, কোন-কিছুই তাঁকে বিপথগামী করতে পারে না। ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম ও ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু। প্রায় এক শতাব্দী আগে জনসংখ্যা সম্পর্কে বুর্জোয়া নীতিবাগীশদের যে তত্ত্ব বেবেল খণ্ডন করেছেন, আজ সেই অসার তত্ত্বই নয়া-ম্যালথাসবাদীরা বুর্জোয়াদের প্রবক্তা হিসেবে হাজির করছে। মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্র্যের জন্য বুর্জোয়ারা দায়ী করছে এক-মাত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে। কিন্তু আসলে তার জন্য দায়ী শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের লাগামহীন শোষণব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। বেবেল সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখে যেতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার এই সমস্যাকে সমাধান করা হয়েছে। ম্যালথাসবাদীদের প্রচারকে আরও অসার করার মতো তথ্যপ্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা রেখেছে। পরবর্তী সংখ্যায় তা আলোচিত হবে।

—অনুবাদক]

রাজশেখর কিম্বা পরশুরাম : একটি ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব

গৌতম ঘোষদস্তিদার

এখন এ-কথা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় যে, রাজশেখর বসু গত শতকের এক উজ্জ্বল চরিত্র—প্রজ্ঞায়, প্রতিভায়, ব্যক্তিত্বে, হাস্য-পরিহাসে তাঁর মত ঋজু পুরুষ ওই শতকে আর খুব কমই জন্মেছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের বৈজ্ঞানিক কর্মশালা থেকে এক প্রতিভাবান রসায়নবীদ হঠাৎ যে-ভাবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ ক'রে সকলকে সচকিত ক'রে তুলেছিলেন, সেটা ছিল অনেকটাই অভাবনীয়। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি সাহিত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান ক'রে নিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। এমনকি, বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের সাহিত্যিক রূপে আকস্মিক আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের মত পাঠককেও বিস্মিত ক'রে তুলেছিল, তিনি রাজশেখরের প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে প্রমাণিত হ'য়েছিল যে তিনি 'খাঁটি খনিজ সোনা' চিনতে একটুও ভুল করেন নি।

বাংলাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ নামে সূর্যটি ঈষৎ স্তিমিত হ'য়ে এলেও পাশাপাশি উজ্জ্বল তারকার অভাব ছিল না। ছোট গল্পের জগতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র তো আসর জাঁকিয়ে আছেনই. উপরন্তু জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ তৎকালীন তরুণ লেখকগণ ক্রমশই স্বপ্রতিভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রছেন। রবীন্দ্রানুগত্য এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার পরস্পর বিরোধী পথে বাংলাসাহিত্য পূর্ণতার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য আন্দোলনের এই দুই বিপরীত জলোচ্ছ্বাসে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম একটুও তলিয়ে না গিয়ে, একটি স্থির বাতিস্তম্ভের মত বাংলাসাহিত্যের অন্তস্থলে সুদৃঢ় শিকড় চালিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গুরতাকে ঔপনিবেশিক বা ফ্রয়েডীয়—কোন চোখেই না দেখে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে এবং দেখাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার রহস্যের চাবিকাঠি ছিল এক অনাবিল হাস্যরস মহিমায় প্রোথিত। তিনি একরূপ স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, অনসূয়, সংযত হাস্যরস ধারায় বাংলাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আমরা আগে যে-ক'জন গল্পকারের উল্লেখ ক'রেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনকে নানা ভাবগম্ভীর দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ছাড়া হাস্যরসের সাহিত্যিক প্রয়াস আর ক'রো মধ্যে তেমন লক্ষ্যগোচর হয় নি। অবশ্য, সমকালে না হ'লেও বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রবর্তন ঘটেছিল আরো আগে। ঈশ্বর গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, এমনকি বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হাস্যরসের প্রবাহকে আরো গতিশীল করেছিলেন। তাই রাজশেখর বা পরশুরামের রচনা একেবারে ঐতিহ্যহীন এবং আকস্মিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হিং-টিং-ছট, জুতা আবিষ্কার ইত্যাদি দুর্লভ হাস্যরসের সাহিত্য পরশুরামের আগেই লেখা হ'য়ে গেছে। তবে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের রচনাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আঘাতধর্মী।

কিন্তু পরশুরামের অবলম্বন ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ হাস্যরস। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় যতটুকু রুক্ষতা এবং সীমাবদ্ধতা ছিল তার অনায়াস অপসারণ ঘটেছে রাজশেখরের হাতে। বস্তুত, তাঁর গল্পগুলির আড়ালে সমাজ সমালোচনার কটাক্ষ থাকলেও তাঁর হাস্যরস-রসিকতা কখনোই বিদ্রূপাত্মক 'স্যাটায়ার'-এ পরিণত হয় নি। যদিও তাঁর রচনায় ভণ্ড গুরু, ধূর্ত ব্যবসায়ী, নারীলোলুপ যুবক, ন্যাকা যুবতী, সুযোগসন্ধানী ডাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নরনারী তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হ'লেও, তিনি কখনোই কিন্তু তাদের মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। তাঁর 'পরশুরাম' ছদ্মনাম গ্রহণে এরকম মনে হ'তেই পারে যে, তিনি বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক অসংগতির ওপর কুঠারাঘাত হানার প্রেরণায় ওইরূপ নামগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা আদৌ সেরকম নয়। তাঁর নিজের ভাষায় এই পরশুরাম হ'ল 'একজন স্যাকরা'। পৌরাণিক পরশুরামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।......এই নামের পিছনে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখবো জানলে ও-নাম হয়তো নিতাম না'।

১৯২২ সালে, ৪২ বছর বয়সে (একজন লেখকের গুণাগুণ যে-বয়সে স্পষ্ট নির্ধারিত হয়ে যায়) তিনি লেখেন জীবনের প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'—এই প্রথম গল্পেই তিনি দারুণ হৈ-চৈ ফেলে দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। গল্পটি প'ড়ে অনেকে ধারণা ক'রেছিলেন যে তা কোন আইনজীবীর রচনা। কেননা, একটি লিমিটেড কোম্পানী গড়ে তোলার যে কূটকৌশল তিনি এখানে বর্ণনা ক'রেছেন, তা আইনবিদ্যা জানা না থাকলে অসম্ভব। আবার এই গল্পেই হাস্যচ্ছলে বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের কুমড়োর সাথে কস্টিক পটাশের

হাসারসিক সংমিশ্রণে ভোজটেবিল সু' তৈরীর আজব পরিকল্পনা আমাদের অনাবিল হাস্যরসের সন্ধান দিয়ে যায়। এবং সেই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি কীরকম ক্রুদ্ধ ছিলেন, এই গল্পটি তারও প্রমাণ। তবে সমাজ সংস্কার বা সমালোচকের ভিক্তা তাঁর রচনায় কখনোই প্রকট নয়। কেননা তাঁর সামাজিক ক্রোধ এবং ঘৃণা তাঁর চরিত্রেরই অন্তর্গত বিষয়. তাই তার প্রকাশ এত স্বতোস্ফূর্ত। তাঁর চরিত্রে কোন অন্ধ সংস্কার ছিল না, তাই তিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো রূপে দেখতে পেয়েছিলেন। এবং এই সংস্কারহীনতার কারণেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো এত জীবন্ত। সেজন্যেই শিহরণ সেন, লালিমা পাল (পুং), দোদুল দে. বিগলিত ব্যানার্জী, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, পেলব রায়, অকিঞ্চিৎ কর. ইত্যাদি চরিত্র এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ আজো আমাদের পুলকিত করে। তাঁর শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, কচিসংসদ, গড্ডালিকা, চিকিৎসা-সংকট, বিরিঞ্চি বাবা, কজ্জলী, ধুস্তরীমায়া, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি অসংখ্য উজ্জ্বল ছোটগল্প রাজশেখরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির শাণিত উজ্জ্বলতা এবং ব্যঙ্গরস পরিবেশনে এখনো আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে আছে। হাস্যরসকে ধ্রুপদী পর্যায়ে উন্নীত করার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

পরশুরামের প্রতিভা যে কতটা বৈচিত্র্যধর্মী, তা বোঝা যায় তাঁর অন্যান্য গম্ভীর গ্রন্থের পরিচয় নিলে। বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের তিনি ছিলেন এক উত্তম নায়ক। অশুদ্ধ শব্দ এবং শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ভাষার স্বেচ্ছাচার তাঁকে পীড়িত করেছিল। তাই শব্দচিন্তা এবং পরিভাষা প্রণয়নে তিনি একক প্রচেষ্টায় অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন। তবে শব্দের এবং বানানের শুদ্ধতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকলেও তিনি কখনোই পাণ্ডিত্যের অন্ধ অহংকার দ্বারা পরিচালিত হননি। মাতৃভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা অপেক্ষাও বিদেশী ভাষা থেকে শক্তি সঞ্চয় করার দিকেও তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিদেশী শব্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না'। অন্ধ সংস্কার নয়, তাঁর কাছে এই প্রয়োজনটাই ছিল বড় কথা।

১৯৩০ সালে 'চলন্তিকা' প্রকাশের সাথে-সথেই রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার প্রমুখ শব্দ-বিশারদেরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করলেন। এই কিম্বদন্তীপ্রতিম অভিধানে বাংলা বানান এবং শব্দের ব্যবহার, সাধু-চলিত ক্রিয়াপদ, তৎসম শব্দের বানানরীতি, ব্যকরণের দুরূহ তত্ত্ব ইত্যাদির একটি বিশেষ আদর্শ স্থির করতে চেয়েছিলেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি তাঁর অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষার অশেষ উপকার ক'রেছেন। তাঁর 'চলন্তিকা' এখনো আমাদের কাছে একটি পরম নির্ভরযোগ্য হ্যাণ্ডবুক।

বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ অনুরোধে তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়েও আগ্রহী হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর মহত্তম কাজ বাংলা পরিভাষাকে একটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা। এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের সরস চলতি গদ্যানুবাদ ক'রে তিনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে হাস্যরসের কারবারী মানুষটি কীভাবে শব্দ চর্চা, ছন্দ চর্চা, অনুবাদ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়েও একজন কিম্বদন্তীর নায়ক হ'য়ে উঠেছিলেন। আসলে, তাঁর ব্যক্তিত্বে দু'টি স্পষ্ট ভাগ ছিল— পরশুরাম এবং রাজশেখর। প্রথমজন যেখানে হাসির স্রোতে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে দেন, তিনিই আবার দ্বিতীয়জন হ'য়ে আমাদের জ্ঞান পিপাসার সহায়ক হন, যিনি আমাদের স্রোতে ভাসান তিনিই আবার শৃঙ্খলিত করেন। বস্তুত পক্ষে, প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সহাবস্থানে রাজশেখর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, এক কিম্বদন্তীর পুরুষ।

তারুণ্যের বিজয় উৎসব বাগমুণ্ডিতে

জি. এম. আবুবকর

গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হোল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত যুব উৎসব '৮০।

এতদঞ্চলে এর পূর্বে কখনো এমন বৈচিত্র্যেভরা বর্ণময় আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়নি। উৎসব প্রাঙ্গণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল পলাশ কুসুম শাল পিয়াল বৃক্ষশোভিত পাথরডি গ্রাম। তার পিছনে বিস্তীর্ণ উদার অযোধ্যা পাহাড় নৈসর্গিক দৃশ্যপট হয়ে দাঁড়িয়ে। এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনেও এখানে এলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়ায় মন আপনা থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যুব উৎসবের খেলাধূলার আঙ্গিনা হিসেবে ছাতাটাড়ের বি এস এ ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর জন্য বি-ডি-ও-অফিসের পিছনের খোলা মাঠে অনুষ্ঠান মঞ্চ ও প্রদর্শনী মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল।

খেলাধূলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে পুরুষ বিভাগে ছিল ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা, লৌহ গোলক ও তীর নিক্ষেপ এবং সাইকেল রেস। মহিলা বিভাগে ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা ও লৌহ গোলক নিক্ষেপ এবং মিউজিক্যাল চেয়ার। অনূর্ধ্ব চোদ্দ বছর বয়সী বালকদের জন্য ১০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও ক্রিকেট বল নিক্ষেপ এবং বালিকাদের ৭৫ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও মাটির কলসী মাথায় করে ভারসাম্যের দৌড়। এছাড়া সকলের জন্য মজাদার 'যেমন খুশী সাজো'। আর ছিল পুরুষদের আটটি দলের লাঠিখেলা। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল 'ছুর' খেলার। এই গ্রামীণ খেলাটির স্থানবিশেষে নাম 'দাঁড়িয়াবান্ধা'।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কয়েকটির হিট ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮শে মার্চ। ওইদিন বিকেলে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টি নামে। ফলে মাঝপথে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। উৎসবে সমস্ত খেলাধূলার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪৬ জন। পুরুষদের তীর ছোঁড়ায় ও বালকদের ১০০ মিঃ দৌড়ে শতাধিক করে প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে।

১৮ই এপ্রিল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল সাতটায় সাইকেল রেস দিয়ে। ওই সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড রিফর্মস্ কমিশনার ও অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ। সাইকেল রেস ছিল যুব উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় খেলা। ২৩টি যুবক উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে জাইরার মোড় পর্যন্ত কালীমাটি গামী ২০ কিলো মিটার কংক্রীটের রাস্তায় সাইকেলে জোর ছুটেছেন। রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে তাদের দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এদিকে খেলার মাঠে শুরু হয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানেও ক্রীড়ামোদী দর্শকের ভিড়। সমস্ত খেলাধূলো বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ হয়েছে ফলে প্রখর রৌদ্রের তাপ খেলোয়াড়দের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'বৈকালিকী বৈঠকে' ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। খুবই পরিচিত কবিতা, বড়োদের জন্য সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' আর ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন'। 'সান্ধ্যবাসরে' ঝুমুর সংগীত প্রতিযোগিতায় ৬৫ জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন। শিল্পীদের অনেকেই রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, দিনু তাঁতী, ভব প্রীতানন্দ, বিনন্দা সিং এর পদ গেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় বয়সের কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই ১০ বছরের কনিষ্ঠ শিল্পীর পরে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ শিল্পীকেও সংগীত পরিবেশন করতে দেখা গেছে। কণ্ঠ মাধুর্যের সৌকর্যে উভয়েরই গান উপভোগ্য হয়েছে। ঝুমুরের অনুষঙ্গ মাদল বাঁশি। শিল্পীদের অনেকে হারমোনিয়াম ব্যবহার করেছেন। অনেকে মাদলের পরিবর্তে তবলা ব্যবহার করেছেন। অনেকে কোন যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়াই গান পরিবেশন করেছেন।

'নৈশ আসরে' আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় সাঁওতালী নাচের দলগুলি অংশ নিয়েছে।

প্রথমদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র (শার্ঙ্গদেব), কলকাতার প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ঝুমুরগানের আকর্ষণে বাগমুণ্ডির যুব উৎসবে এসেছেন। আর ছিলেন পুরুলিয়ার প্রবীণ বিদগ্ধ ব্যক্তি, 'সমবায়ের কথা'র সম্পাদক ও আকাশবাণী সংবাদদাতা অশোক চৌধুরী, 'ছত্রাক' পত্রিকার প্রতিনিধি নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এবং ছো-নৃত্য ও ঝুমুর গানের প্রবীণ রসিক সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক, ভবানীপুর গ্রামের ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিজেন্দ্র সিংহদেব ও ব্রজেন্দ্র সিংহদেব।

১৯শে এপ্রিল সকালে খেলার মাঠে ছোটদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চোদ্দবছর বয়সী ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ছিল নির্বাচিত ঝুমুরগানের অনুষ্ঠান

ঝুমুরিয়া'। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকের ঝুমুর—দাঁড়, ভাদরিয়া, বৈঠকী, পালা, দেহতত্ত্ব, ঢুয়া, ঝিঙাফুলী, ডমকোচ, খেমটা, উদাসা, কীর্তনা, লগনসাহী প্রভৃতি। সুরবৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে সমৃদ্ধ লোকসংগীতের এই ধারাটি মানভূমের গ্রামের মানুষেরা বুকে করে ধরে রেখেছেন। কীর্তনের মতো ঝুমুরগানে আছে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকথা। সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন, ঝুমুরের ইতিহাস কীর্তনের চেয়েও পুরানো। মানভূমের মানুষের কাছে এ সংগীতের মর্যাদা জাতীয় সংগীতের মতো।

অনুষ্ঠানে সুভাষ ভকত গেয়েছেন ভাদরিয়া আর ডমকোচ। 'কাচ মরকত নবীন জড়িত/সুকোমল তনু শ্যামল/ভুরু দুটি আঁকা, ঈষৎ বাঁকা/বাঁকা আঁখি দুটি ঢলঢল/দেখে যা সখী ভরিয়া আঁখি/নাগর রূপে বন করিয়াছে আলো।' অপূর্ব গেয়েছেন তরুন গায়ক সুভাষ। অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর প্রতিনিধি সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেতারের জন্য গানটি টেপরেকর্ডে তুলে নিয়েছেন। শ্রোতারা পরপর অনুরোধ করে গেছেন অন্য একজন নবীন শিল্পী অবনীপ্রসাদ সিংহের একাধিক গান শোনার জন্য। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করলেন খুদুডি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সুচাঁদ মাহাতো। এই শিল্পীর নাচনীনাচে ও ঝুমুরগানের অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়াই ধরলেন দুর্যোধন দাসের পদ একটি দরবারী ঝুমুর—'কে না যায় যমুনার জলে/কে না চায় কালার কদমতলে গো/তবে কেন মন্দ বলে আমায় পরস্পর।' শিল্পীর আর সেই গানের গলা নেই। তবু অস্তমিত সূর্যের দিগন্তভালে ছড়িয়ে থাকা রক্তিমাভার মতো তাঁর কণ্ঠে আছে ছন্দ, লয় আর বৈঠকী ঢঙ। এই অনুষ্ঠানে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংগীত পরিবেশন করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং। 'ঝুমুরিয়া' অনুষ্ঠানটি বিদগ্ধজনদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিল আলোচনাচক্র। বিষয়—পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার স্থান। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি বিরিঞ্চি মোহন দে ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্যেশ্বর মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতির স্থান নিয়ে তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

আলোচনাচক্রের পর গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো-নৃত্য শিল্পী চড়িদার গম্ভীর সিং মুড়াকে ও ঝুমুরগান ও নাচনীনাচের প্রবীণ অশিতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সুচাঁদ মাহাতোকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। যুব উৎসব কমিটি ও বাগমুণ্ডির অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এঁদের দুজনকে স্মারক হিসেবে দুটি সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত উষ্ণীষ পরিয়ে দিয়েছেন। গম্ভীর সিং তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাঁর বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গরু-বাগালী করতেন আর নদীর ধারে বালির উপর একা একা নাচতেন। এইভাবে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তবে তাঁর রক্তে ছিল নাচের ছন্দ। সেকালের প্রখ্যাত ছো-নৃত্য শিল্পী জিপা সিং তাঁরই পিতা। গম্ভীর সিং এবং তাঁর দল স্বদেশে বিদেশে শত শত অনুষ্ঠানে ছো-নৃত্য পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছেন। ছো-নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তাঁর অবদান অপারিমেয়।

সুচাঁদ মাহাতো প্রথমে নিজের সম্পর্কে মুখ খুলতে চাননি। পরে সকলের অনুরোধে রাজী হয়ে যা বলেছেন তা সকল শিল্পীজীবনেরই মর্মকথা। তিনি সারাটি জীবন অবিরামভাবে নৃত্য গীতের মাধ্যমে রূপ ও রসের সৃষ্টি করে এসেছেন। আজ জীবনের সায়াহ্নকালে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যে এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে এনে সম্মান জানানো হলো এজন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সবাই গুরুত্ব দিয়ে একটি কথা বলেছেন যে, এই ধরনের গুণীজন সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে যে সমস্ত লোকশিল্পীরা জীবনভর কোন একটি শিল্পের জন্য সারাটা জীবন ব্যয়িত করলেন তাঁদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করাকে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের আশু কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

ছো-নৃত্যের আসর বসলো রাত্রি দশটায়। আসরে লোকে লোকারণ্য। দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসেছে সারারাত ধরে ছো-নাচ দেখার জন্য। পুলিশ আর ভলান্টিয়াররা ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়েছে। উপচে পড়া ভিড় মাঝে মাঝে মঞ্চের সামনে নাচের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ঢুকে পড়ছে। অনেকে খালিগায়ে বিপদের সহচর টাঙি কিম্বা লাঠি হাতে নিয়ে বনের পথ ভেঙে উপস্থিত হয়েছে আসরে। আঠারোটি দলের প্রতিযোগিতামূলক নৃত্য। ছো-নৃত্যের প্রত্যেকটি পালা রামায়ণ মহাভারতের কোন একটি বীর রসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত। প্রত্যেক নৃত্যশিল্পী তাঁর নির্দিষ্ট চরিত্রের মুখোশ এঁটে দলগত নৃত্য পরিবেশন করবেন।

আসরে একজন বিদেশিনী অতিথি উপস্থিত ছিলেন। মিস্ সুসান হকস্—তিনি ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ছো-নৃত্য কলার উপর গবেষণা করতে। বাগমুণ্ডির যুব উৎসবের সংবাদ পেয়ে উৎসাহ অনুসন্ধিৎসু নিয়ে হাজির হয়েছেন আসরে। এই অল্পবয়সী তরুণী সারারাত জেগে ছো-নাচ দেখেছেন, তাঁর দামী ক্যামেরায় মুহুর্মুহু ছবি তুলেছেন আর নোট লিখেছেন।

প্রথম নৃত্য পরিবেশন করলেন অযোধ্যা পাহাড়ের কৃত্তিবাস মাহাতোর দল গণেশ বন্দনা দিয়ে। ছো-নৃত্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকদল নৃত্য শুরু করার আগে গণেশ বন্দনা করেন। বিচারকরা সময়াভাবের জন্য কেবল প্রথমদলকে গণেশ বন্দনার সুযোগ দিয়েছেন। ধমসা, ঢোল আর সায়নার (শানাই) আওয়াজে মেলা প্রাঙ্গণ গমগম করতে লাগলো। কৃত্তিবাস মাহাতোর দলের গণেশ বন্দনার পর ছাতাটাড়ের বিবেকানন্দ ক্লাবের কিরাত অর্জ্জুন পালা, কড়েং এর চরণ মাহাতোর দলের গো-সিঙ্গা বধ, বুকাডির দলের সাত্যকী ভূরীসর্বা বধ। রেলার ধনঞ্জ সিং মুড়ার দলের অভিমন্যু বধ (প্রথমস্থান), বুড়দার তরুণ সংঘের রক্তবীর্য অসুর বধ (দ্বিতীয়), সিন্দ্রির খুল্লু মাহাতোর দলের শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ (তৃতীয়) নৃত্য পরিবেশন খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ছো-নাচ যখন শেষ হলো তখন ভোরের পাখিরা গান গাইছে, পূর্বাকাশে রক্তিম সূর্য উঁকি দিয়েছে।

উৎসবের শেষদিনে সকাল আটটায় আটটি দলের লাঠি-খেলা হয়েছে। লাঠিখেলার সঙ্গে ছিল ঢোল আর সানাইয়ের

বাজনা। এই বাজনা না থাকলে খেলার মেজাজই আসেনা। লড়াইর পরে ছিল তিনদলের গ্রামীণ 'ছৌ' খেলা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল পুরস্কার বিতরণী উৎসব। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়, প্রবীণ অতিথি রাজেশ্বর মিত্র এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিস্ সুসান হক্‌স্। যুব উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে মানপত্র ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরস্কার বিতরণী উৎসবে।

পুরস্কার বিতরণের পর ছিল 'বিচিত্রা' নামাঙ্কিত অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, গণসঙ্গীত, নৃত্য-গীতি, আধুনিক গান, ইত্যাদি পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরীও সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের উদ্দীপিত করেন।

যুবউৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ছিল গম্ভীর সিং এর দলের আমন্ত্রিত ছো-নাচ, কিরাত-অর্জ্জুন ও অভিমন্যুবধ পালা। এ অনুষ্ঠানটিও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

যুবউৎসব উপলক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের চারটি গ্রামে সাঁওতাল মেয়েদের দেয়াল চিত্রাঙ্কণের একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে যুব-উৎসব কমিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ের লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। পুনিয়াশাসন, সাহারজুড়ি, বাদা, বাগানডি—এই চারটি গ্রামের ৯৭ জন গ্রাম্য রমণী তাঁদের মাটির বাড়ির দেয়াল রঙের আলপনায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। এইসব চিত্র আঁকতে মেয়েরা বাইরের কোন দোকানের রঙ ব্যবহার করেননি। ঘাস পুড়িয়ে কালো রঙ, ছাই থেকে ছাই-রঙ, পাহাড়ের বিভিন্ন বর্ণের মাটি যোগাড় করে নানান রঙ ব্যবহার করেছেন তাঁরা। বেশীরভাগ দেয়ালেই একপ্রকার সহজ আলপনার মতো গোল ফুল। কোথাও লতা পাতা গাছ ফুল মনোলোভা রঙে আঁকা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার একটি দেয়াল ছাড়া কোন দেয়ালে জীবজন্তু বা মানুষের চিত্র দেখা যায়নি। বাগানডি গ্রামের মেয়েরা প্রায় সকলেই অনবদ্য এঁকেছেন। চোখ জুড়ানো ভালো লাগার মতো এঁকেছেন রঙ্গী কর্মকার (প্রথম), মঙ্গলা মুড়াইন (দ্বিতীয়), রবন সর্দ্দারী, শান্তি কর্মকার, বেহুলা মাছুয়ার, সোমারী লোহার, বুধনী হেমব্রম, ঘাসনী মুর্মু ও শান্তি মাছুয়ার। গ্রামের আদিবাসী মেয়েদের দেয়াল অলঙ্করণের মতো অনাদৃত লোক শিল্পকে তুলে ধরে যুবউৎসব কমিটি যে একটি ভালো কাজ করেছেন তা সংস্কৃতিবান প্রতিটি মানুষ একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

যুবউৎসবে মেলা প্রাঙ্গণে পুরুলিয়ার পত্রপত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে মানভূম সংস্কৃতি মুখপত্র 'ছত্রাক' পত্রিকাগোষ্ঠী তাঁদের দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্টলে শ'খানেক মূল্যবান স্যুভেনীর অজস্র পত্রপত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন, ম্যাপ, দলিল-পত্র ছিল। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে বেশী সংখ্যায় ছিল মুক্তি, সমবায়ের কথা, মালভূমি, রুখু মজদুর দর্পণ, শিখর ভূমি, ডহর, টুকলু, কংশাবতী, পুরুলিয়া প্রভাকর, কেতকী, পুরুলিয়া গেজেট, জয়যাত্রা ইত্যাদি। 'ছত্রাক' পত্রিকার জন্ম থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা। এছাড়া ছত্রাকের মূল্যবান সংখ্যাগুলোর প্রচ্ছদের বর্ধিত কলেবরে সুদৃশ্য রঙিন চিত্র যা দেখে দর্শককে মানভূম সংস্কৃতিতে পত্রিকাটির অবদানের কথা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পত্রপত্রিকার স্টলের পাশেই ছিল মুখোশ ও মৃৎশিল্পের প্রদর্শনীর স্টল। স্টলে ঢুকতেই চোখে পড়ে রামচন্দ্র কুমারের মৃন্ময়ী সাঁওতালী মেয়ে। অনেকে প্রথম দর্শনে একে জীবন্ত মানব প্রতিমা জ্ঞানে ভ্রম করেছেন। মৃৎশিল্পের মধ্যে অধিক সংখ্যায় ছিল ষাঁড়, ময়ূর, গরু, ভালুক ইত্যাদি। মুখোশ শিল্পের প্রদর্শনীতে চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত খুঁজে যেন এক একটি চরিত্রকে শিল্পীরা হাজির করেছেন। শিব, কার্তিক, অভিমন্যু, গয়াসুর, কালিঙ্গাসুর, নরসিংহ দৈত্য, কিরাত-কিরাতী, গো-শিঙ্গার ভিড় বেশী। সারা পুরুলিয়ার ছো-নৃত্য শিল্পীদের মুখোশ সরবরাহ করেন এই চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা। প্রতিটির মূল্য পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে দু'শ আড়াইশ। কাপড়ের সঙ্গে কাগজ মিশিয়ে অপূর্ব কৌশলে এইসব মুখোশ তৈরী হয়, তারপর দেওয়া হয় বাহারী রঙের ছোপ, করা হয় নানান অলঙ্করণ।

বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত যুবউৎসব '৮০ যুব মানসে ও সামগ্রিক জনমনে অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আকৃষ্ট করতে বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একদিকে মান-ভূমের চিরায়ত লোক সংস্কৃতিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতিকেও পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষের জন্য আলো-চনাচক্র, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী, অন্যদিকে যৌবনদীপ্ত তরুণদের জন্য বিস্তর খেলাধুলার আয়োজন উৎসবের দিনগুলোকে মুখর করে তুলেছে। উৎসব পরিচালনা করতে স্থানীয় ক্লাবগুলি, পঞ্চায়েত সংগঠন, সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় নাগরিকরা এবং লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ও ছত্রাক পত্রিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্যেও ছিল অভিনবত্ব, রুচিশীলতা ও মনোহারীত্ব। উৎসব সমাপ্তিতে প্রতিটি মানুষ কামনা করেছেন এমন আনন্দ-মুখর উৎসবের দিন তাঁদের কাছে যেন প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে।

গল্প

অরাজনৈতিক সেই লোকটার গল্প

শুভাশীষ চৌধুরী

মিছিলটা নিঃশব্দতার মলিন শোকাহত কন্‌কনে বাতাস সংগে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। রাশি রাশি সুতীক্ষ্ম চোখগুলো কি এক জিজ্ঞাসায় সামনে এগিয়ে চ'লেছে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে মিছিল প্রবাহিত নদ-নদীর মত এসে মূল মহা সমুদ্রের উত্তাল স্রোতের সাথে ক্রমাগত একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। এ মিছিলের শেষ কোথায় বোঝা যায় না। শুরুটাও ঠিক মত ধরা যায় না। কোন কোন জায়গায় দু সারি লাইন ঠিক মতো নেই। সেখানে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন আকৃতির মানুষ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন সম্প্রদায়। শুধু এগিয়ে যাওয়টাই মূল লক্ষ্য। মুখ বরাবর, সামনের দিকে। এই ভাবে আমরা, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবেরা দানবীয় ক'লো, অন্ধকার রাতটার সাথে জীবন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চ'লতে লাগলাম। ওপরের হাজার হাজার মূক নক্ষত্রমণ্ডল, নীচের বিস্তীর্ণ শিশির সিক্ত প্রান্ত ভূমিকে মনে হ'চ্ছে আলের সাথে যুদ্ধ-জয়ী কোনো বীরপুংগবের পরিশ্রান্ত স্বেদ বিন্দু।

নজরুল হঠাৎ ব'লে ওঠে আমরা তো থানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি? এদিক দিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? কথা ও খুব আস্তে বলে। কারণ এটাতো একটা শোক মিছিল। ওর কথার পাল্টা কোন উত্তর আসে না। আমি নিমাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে একটা বিড়ি বের করি। দম নেওয়া দরকার। দেড় ঘণ্টার ওপর শুধু হেঁটেই চ'লেছি। নিমাই অন্ধকারে আমায় ঠাওর ক'রে ব'লে ওঠে—আচ্ছা এতো লোক আমাদের মিছিলে এলো ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। শহরের বাড়ি ঘর কি সব ফাঁকা? আমি বিড়ির ধোঁয়ায় আমেজ এনে বলি মিছিলে আবার আমাদের তোমাদের কি? একজন মানুষ হঠাৎই খুন হ'লো। খুনটা কি জলভাত? সাড়া শব্দ নেই। পাল্টা কথাও আসে না। নিমাই মোটা কাঁথার মত চাদরটি খুলে কোমরে লেপ্টে রাখে। চাদরটায় আধোয়া-জনিত একটা বিট-কেল গন্ধ বের হয়। শীতের হুল ক্রমাগত ফুটে চলে শিরা-উপশিরায়—মিছিলটা এগিয়ে চলে। নিঃঝুম থমথমে সারিবদ্ধ মিছিল।

আমায় হঠাৎই পেছন থেকে কে যেন চিমটি কেটে তার পাশটে কণ্ঠ শুনিয়ে ব'লে ওঠে—আচ্ছা ওনার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরাও নাকি এই মিছিলে আছে? আমি প্রতি উত্তরে বলি—এ সময় কথা বলা ঠিক নয়। মিছিলটাতো এক জায়গায় শেষ হবেই। তখন সব জানা যাবে। পাল্টা চিমটি আসে—ব'লে ওঠে—না ঘটনাটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যের। একজন রাজনৈতিক ঝুট ঝামেলা মুক্ত মানুষও খুন হ'লো। ধর্মঘটের দিনেও তো ও বলেছিল কারখানায় না গেলে খাবো কি? চাকরী চলে গেলে কে দেখবে? তাকেই কিনা আমরা আজ কাঁধে নিয়ে চলেছি। বাঁ পাশ থেকে একজন বুড়ো কফ্-গলায় ঘর্ঘর ক'রে বলে—কেন কাঁধে নেওয়াটা কি পাপ? লোকটাতো শেষ পর্যন্ত প্রতি-বাদ ক'রেছিলো। ওর কথাগুলো ঠিক মতো কানে আসে না। দাঁতবিহীন ঘন-কফে কেমন যেন জড়িয়ে যায়। কেউ ওর কথা শুনছে কিনা সে খেয়াল ওর থাকে না। বা এসময় কথা বলা ঠিক নয় তাও ও বোঝে না। ধর্মঘট করার প্রশ্নে লোকটার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর নগ্নরূপ দেখে ওর মানবিক বোধ জেগে ওঠে।—তেতে থাকা উত্তেজনায় বুড়ো কথাগুলো বলে—ওর হাতের বিক্ষিপ্ত কাটা ছেঁড়া জায়গাগুলো দেখিয়ে ও বলে আমাকেও ওরা রেহাই দেয় নি।

সুজন মাংকি ক্যাপের মাঝখান থেকে ঠোঁট নেড়ে জবাব দেয়—আসলে কমরেড অজিত ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অজিতের উপর হামলাটা আসায় লোকটা আর চুপ থাকতে পারে নি। লোকটা স্বভাব চরিত্রে এক নম্বর ভীতু। তাছাড়া কোনদিন উঠোন-লেপ্টানো পরিসর ছেড়ে বাইরে বের হয় না।

মিছিলটা কখন থামবে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই আমরা সকাল বেলায় এসেছি। কথা ছিল তিন শিফটে দায়ীত্বপূর্ণ কয়েকজন কমরেডের ওপর আলাদা আলাদা ভাবে দায়ীত্ব দেওয়া থাকবে। সেই ভাবেই দায়ীত্ব ভাগ করা হ'য়েছিল গতকালের সভায়। আমি, সাগর, অজিত, নজরুল ছিলাম ফার্স্ট সিফটে। গণ্ডগোল যে হ'তে পারে তা আমরা আগেই বুঝেছিলাম। কারণ গতবার যারা আমাদের ধর্মঘটে যোগ দেয়নি তার বেশীর ভাগ অংশই এবার আমাদের সাথে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই মালিক এবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবে সুবিধা ছিল আমাদের অন্য ইউনিয়নের নীচু তলার শ্রমিকরা প্রকাশ্যেই ব'লে ছিল রাজনৈতিকভাবে আপনাদের সমর্থন করি না তবে যে দাবী নিয়ে ধর্মঘট করা হ'চ্ছে আমরা তা সমর্থন করি। আর এই জায়গাতেই ছিল আমাদের আসল ঐক্য। আমরা ধর্মঘটের দিন কারখানায় এসে সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। উপস্থিতির হার শতকরা দশ জনও নয়। গেটে নজরুল, সাগর, অজিতের এক সাথে থাকবার

কথাও নয়। ওদের উপর আক্রমণ হ'তে পারে আমরা সবাই তা জানতাম। ওরা যে কেন হঠাৎ ওখানে একসাথে জড়ো হ'য়ে বক্তৃতা শুরু করেছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশগুলো প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা পালন ক'রতে পারে নি। গুণ্ডারা এ্যাকশন্ ক'রেছে ওরা দূরে ব'সে নীল আকাশে হাই তুলেছিল।

সাগর যে কোথা থেকে আমার পাশ ধ'রে ধ'রে হাঁটছিল তা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমি ব'ললাম—কমরেড তোমার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে? ও দাঁত বের করে হেসে উঠলো। বললো—কি ব্যাপাররে শালা একেবারে ইউনিয়নের মিটিংয়ের ঢংয়ে কথা। '৬২ সালের মার মনে নাইরে হারামজাদা! বলেই ও আমার পিঠে ওর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালের এক গোত্তা দিল। আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

......এতক্ষণে একটা আওয়াজ কানে এসে পেঁাছালো। মনে হ'ল অজিতের গলা। ও চীৎকার ক'রে ব'লছে—আপনারা সবাই এখানে ব'সে পড়ুন। বিরাট ফাঁকা মাঠ আছে। ব'সবার কোন অসুবিধা হবে না।

ও যে কথাগুলো ব'লছে তার অর্ধেক কথা বোঝা যাচ্ছে না।

নজরুল আমায় ব'লে, এই শীতে হাত পা সব কাঠের মতো হ'য়ে গেল। আচ্ছা শীতটা কি এবার একটু আগে পড়েছে? আমি ব'ললাম,—হ'তে পারে। থাকতে তো হবেই। নজরুল বলে তা লোকটার নাম কি ছিল? আমি তো জানি উনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড় বংশের ছেলে। আমিষ খেতেন না। বুড়ো মনে হয় সজাগই ছিল। শীত ওকে পরাস্ত ক'রতে পারে নি। ব'লে ওঠে—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আসছে কোথা থেকে? লোকটা আমাদের মত একজন শ্রমিক। এই গঙ্গার ধারে পাটকলের শ্রমিক। তাকে গুণ্ডারা খুন ক'রেছে। যারা ধর্মঘট ভাঙ্গতে এসেছিল তারা খুন করেছে। ও এখন আমাদের একজন। আমি ঐ লোকটাকে একটা বিশেষ কারণে ভাল মত চিনি। ওর নাম দীনদয়াল আচার্য। মাপা ছকে বেড়ে ওঠা নিরীহ মানুষ। অন্যায় করতেন না—অন্যায় দেখলে কিছু ব'লতেন না। গত ধর্মঘটে পুলিশ যখন আমায় পিটিয়ে কেটে পড়লো তখন আমি ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একটু সাহায্য করতে বলেছিলাম। সেই সময় তিনি আমায় একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎই আমি আসছি বলে চলে গেলেন। পরে হাসপাতাল থেকে ফিরে ওকে দারুণ গালিগালাজ করে ছিলাম। অজিত না থাকলে হয়তো পিটিয়েও দিতাম। যাই হোক মাঠটা অজস্র রকম মানুষের ভীড়ে কানায় কানায় ফুলে ফেঁপে উঠলো। শিশির সিক্ত ঘাসে আমরা সবাই হাত পা গুটিয়ে ব'সে পড়লাম। পিছন থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে বলে উঠলো হুকুম দিন—শালাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবো। কয়েকজন ওর কথাকে সমর্থন জানানোর জন্য হাততালি দিয়ে উঠলো। বিভিন্ন জনের বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে মনে হ'চ্ছিল আমাদের দানবীয় চুল্লিটা যেন সাময়িক ভাবে এখানে উঠিয়ে আনা হ'য়েছে। শীতের তীব্র কাঁটা কারো গায়ে বিঁধতে পারছে না। বারুদে ডোবানো হাজার হাজার পরিচিত দেখা-অদেখা কালো কালো অবয়ব মাঠের এদিক সেদিক ছটফট্ ক'রছে। ঘৃণা, ক্রোধ সঞ্চিত অভিশপ্ত জীবনের অবসান চায় সবাই। এই লগ্নেই।

অজিত একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ওর বক্তৃতা আরম্ভ ক'রলো। অজিত আমি কারখানায় একই বিভাগে কাজ করি। দুজনেই ফাজলামি-ইয়ার্কী খুব করি; কিন্তু এখন ও আমার সাথে ঠাট্টা মস্করা করা—শুধু অজিত নয়। ও এখন বিরাট একটা দলের প্রতিনিধি। সমস্ত মানুষের মেজাজ আজ ওর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

ও শুরু করে—কমরেড আজ আমি এই রাতে আপনাদের বেশী কথা বলবো না। দীনদয়াল বাবুকে ওরা খুন করেছে। আমরা এতক্ষণ মিছিল ক'রলাম। আমাদের যখন গুণ্ডারা আক্রমণ করে তখন তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। উনি ওদের বলেছিলেন কারখানায় যাদের ঢোকার ইচ্ছা ছিল তারা তো ঢুকেই গ্যাছে। আমরা জানি তিনিও কারখানায় ঢোকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। উনি সে কথাও ওদের ব'লেছিলেন। কিন্তু গুণ্ডারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ ক'রলো সাগরের মাথা ফাটিয়ে দিলো তখন তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। এটাই আমাদের আনন্দ এবং গর্ব। এ সময় সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। পিছন থেকে শ্লোগান উঠল শহীদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। অজিত রেশ টেনে ব'লে চলে আমরা আগামীকাল আবার ধর্মঘট করবো। আমরা দোষী গুণ্ডাদের শাস্তি চাই। মালিকদের বাধ্য করবো যাতে তাঁর স্ত্রী ঐ কারখানায় চাকরী পায়। তবুও যদি দাবী না মানা হয় তবে ধর্মঘট চলবে। সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—হ্যাঁ এটাই ঠিক। তাই ক'রতে হবে আমাদের। মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে এক মহিলা কমরেড বলে ওঠে ওনার স্ত্রীকে বলবেন ওর হাজার হাজার অভিভাবক ওদের পরিবারকে চোখের মণির মত আগলিয়ে রাখবে। যে যায় সে আসে না; কিন্তু তার কাজ ইতিহাস হ'য়ে থাকে। আমরা বহু চেষ্টা করেও ওনার স্ত্রীর চেহারাটা অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। সম্ভবতঃ কোলের দুটো বাচ্চা নিয়ে উনি এখন খুব কাঁদছেন। হয়তো অফিস থেকে গিয়েই শুদ্ধ কাপড়ে গঙ্গাজলে আচমন ক'রে তিনি পুজোয় বসতেন। সংসারের বাঁধা জালটায় বসে বৌয়ের সাথে গল্প ক'রতেন। হয়তো রোজই তিনি তাই ক'রতেন। কেউ কোন খোঁজ নিত না। খোঁজ করার মতো কোন কিছুই তিনি হয়তো কখনো করতেন না। পাশ কাটিয়ে চলতেন। কিন্তু আজ, সামান্য একটু প্রতিবাদ। বুঝিবা প্রতিবাদও নয় নিছক রাজী করানোর আস্থা নিয়ে ভালোমানুষী। ভিতর থেকে উগ্‌লে বেরোনো মানবতার টান। শুধু সেই কারণেই তিনি পৃথিবীতে আর থাকতে পারলেন না।

কফ-গলায় ঘর্ঘর আওয়াজে বুড়ো বলে ওঠে—কাল যে অচীন ছিল আজ সে আমাদের মনের বাড়তি শক্তি হ'য়ে উঠলো!

কবিতা

সেদিন সূর্য

চট্টোপাধ্যায়

গতরাত্রেই বলব সে কি,
আকাশভরা চন্দ্র
গ্রামশহরের মাথায় মাথায়
জ্বল্‌ছেছিল চন্দ্র।

ভোর হয়েছে ভোরের মত
উত্তরণের দীপ্তি
তিমির ছেঁড়া অন্ধকারেও
যুবজীবন দীপ্ত—

সকাল হতেই জীবনযাপন
চায় মশালের মন্ত্র
অবাক আলোয় ঝরতে থাকে
বীজ বপনের মন্ত্র;

হাঁটতে হাঁটতে আটকে গেলাম
সামনে দেখি সূর্য......
মাঠের পরে মাঠ চলেছে
চতুর্দিকেই সূর্য।

মায়ের মুখ

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

এইমেঘ আকাশ বাতাস ভালোবাসা স্ফটিক খচিত প্রিয় মুখ
এই মুখ বর্ষার অনন্ত ভিজে মুখ
রাশভারী আমার মায়ের মুখ সোহাগ মেশানো,
মাটির অন্নের স্বাদ পড়ন্ত বেলার ঘ্রাণ
চাষার মাতানো গান শালিখের সিক্ত প্রাণ
স্বচ্ছ বাঙলার মুখ এইখানে এই গাঁয়েতে বিছানো।

এইখানে বৃক্ষলতা তাল-তরু সারি স্থবির স্থপতি
আমার মায়ের প্রজা মা আমার সবার নৃপতি
রোজ রোজ পদ্ম ফোটে মায়ের চরণতলে পূত হয় দীঘির শরীর,
ঘরময় মাতৃপদচিহ্ন আঁকা মনময় প্রেমের বিন্দুক
মাঠময় অসীম তালুক তার সাজানো সিন্দুক
দিকচক্রবালে এক বন-রেখ গন্ডী আঁকা সীমানা খড়ির।

মহুল ফুলের ভিজে ঘ্রাণ বাউল গানের প্রিয় প্রাণ
ভাহুক-ভাহুকী প্রেম দান গাঁয়ের বধূর অভিমান
এইসব নিয়ে আমার মায়ের মুখ সোহাগী মায়ের মুখ,
মায়ের গেরুয়া শাড়ী পথময় সোনালী স্বপন
লাল সিঁথি পাকা শস্য অনুরাগী হিমেল নয়ন
আমার মায়ের স্বাদ এইখানে এইখানে আমার মায়ের মুখ।

মেহগনি ও বণিক সভ্যতা

রণজিৎ সিংহ

বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মেহগনি। তার প্রকাণ্ড গুঁড়ি আর ছড়ানো ডালপালায় উপছে পড়ছে বাঁচা। চিকন সবুজ পাতায় ঝরছে খুশি।

ফাল্গুনে বহুদূর পর্যন্ত তার ফুলের সুগন্ধ বুক ভরে টেনে আমরা টের পাই এ সেই মেহগনি। বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে মহা-পরাক্রমশালী সূর্যের আঁচে ঝলসে আমরা তার ছায়ায় দাঁড়াই। আর বলি: তুমি বাঁচো চিরদিন।

শোনা যায় ফড়ে আর মালিকে চলছে দরকষাকষি। মালিক চায় ১২ হাজার। ফড়ে ৭ পর্যন্ত উঠে আবার আড়ে আড়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেড় জরিপ করে। আর অঙ্ক কষে তক্তার হিসেবে ঠিক কতয় পড়তা।

লুট

বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ

ঢাকনাখোলা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে
থরে থরে সাজানো বিশাল সম্পদ
উদাম পড়ে আছে

লুটেরাদের হাত ঢোকে ঝাঁপির ভিতরে।
প্রতিযোগিতা,
রক্তারক্তি।
শূন্য হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি
নিঃস্ব পৃথিবীর বুকে।

সাপেরা বাসা বাঁধে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে।

বাংলা সিনেমা—তরুণ মনে তার প্রতিক্রিয়া

হীরালাল শীল

তরুণ মনে সিনেমার প্রতিক্রিয়া কেমন, কতখানি, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। সিনেমার জন্ম-লগ্নটা একটু তুলে ধরা যাক না।

বাংলা সিনেমার বয়স ষাট বছর পূর্ণ হ'ল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। প্যারিসের গ্রাণ্ডকাফেতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর যখন প্রথম 'চলমান ছবি' প্রদর্শিত হ'ল, তার মাস দুয়েকের মধ্যেই তা বাঙালীর কল্পনার ভিতকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নানা সময়ে বাংলাদেশে চলমান ছবি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তারই ফলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রূপালী পর্দায় প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা চলচ্চিত্রের জনক-স্থানীয়দের মধ্যে জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, হীরালাল সেন, দেবী ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁদের হাতেই এদেশের ছায়াছবির হাতেখড়ি। তবে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি জন্ম নিয়েছিল জে. এফ. ম্যাডানের হাতে। ১৯১৮ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিল্বমঙ্গল' তৈরী করে।

ক্রমশঃ বাংলা ছবি ৪২ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব পথে—গতিতে ছন্দে। যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিশুর জন্ম হয়েছে দাদাসাহেব ফালকের হাতে, তার শিক্ষক বলা যায় বাংলা ছবির কারিগরদের। শিশুকে চলতে শিখিয়েছেন তাঁরাই।

দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বোস প্রমুখ প্রখ্যাত পরিচালকদের হাতে পড়ে সেই শিশু বড় হয়ে উঠেছে। সে আজ কিশোর, কিংবা যুবক নয়, সে প্রৌঢ়-পরিণত। আজ সে নিজেই একটি চরিত্র—তার ভাষা আলাদা, বিভিন্ন পরিচালক চলচ্চিত্রকে মাধ্যম করে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্রকে তুলে ধরেন। সুখের কথা, আমাদের কোন পরিচালকের অভাব যেমন কোনদিন ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সিনেমার জন্ম-লগ্নে যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, আর আজকাল যে ধরনের ছবি তৈরী হচ্ছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য কি আমাদের চোখে পড়ছে না? অবশ্য, পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, যুগের ধর্মকে তো অস্বীকার করা যায় না। সে যুগে সেটাই সত্য ছিল, তার পেছনে ছিল আন্তরিকতা—নিষ্ঠা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে যে ধরনের ছবি তৈরী হচ্ছে, তার পেছনে কতটুকু আন্তরিকতা, নিষ্ঠা বর্তমান সে ব্যাপারে চিন্তা করলে হতাশ হতে হয়, বিগত দুই দশক ধরে যে সব বাংলা ছবি (নামোল্লেখের প্রয়োজন নেই) আমাদের দেখানো হ'ল, সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত নিম্নমানের, কি উপস্থাপনার দিক থেকে, কি আঙ্গিকের দিক থেকে, কি বক্তব্যের দিক থেকে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা বাদ দিলে আমরা এমন কোন পরিচালকের নাম কি খুঁজে পাব, যাঁদের চলচ্চিত্র থেকে আমরা কিছু পেয়েছি? অথচ দেশে বাঙালী পরিচালকের তো অভাব নেই, ছবির সংখ্যাও তো পরিমাণের দিক থেকে কম দেখছি না, তবে গুণের অভাব কেন? কেন এই সব পরিচালক পরিণত মনস্তাত্ত্বিকের ভাবনা-চিন্তা-সৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না? কেন একবার ভেবে দেখেন না, 'অযান্ত্রিকে'র মতো আর একটা কিছু করা যেতে পারে কিনা? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ভাবতে কষ্ট লাগে বর্তমানে পরিচালকদের স্বাধীনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের মর্জির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এর ফলে বাঙলা সিনেমার যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হতে চলেছে, তা একবার তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সিনেমাকে মানের দিক থেকে খাটো করা কখনওই উচিত নয়। সেই কারণেই বর্তমানে সিনেমার অশ্লীলতার পরিমাণটাই বেশি চোখে পড়ে।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিগুলিতে যে মহত্তর সত্য ও জীবনের নতুনতর অর্থের সন্ধান করে গেছেন সারা জীবন, যে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েও তাঁর চরিত্রদের হারতে দেখিনি কখনও: এখনকার পরিচালকদের ছবিগুলিতে সেই সব আর খুঁজে পাই না কেন? কেন 'কিছু একটা করা'র নামে সস্তা চটুল ছবি দেখানো হয়?

শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই নয়, গত কয়েক দশকের প্রায় শ'তিনেক বাংলা ছবির তালিকার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব যে, শিল্পগত মানের দিক থেকে বাংলা সিনেমা কতটা নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। একই রীতি, একই ধরনের সংলাপ, একই চরিত্রচিত্রণের পুনরাবৃত্তিতে বাঙালী দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন—"চারপাশের মানুষগুলোর জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না হলে ছবি করার কোন মানেই হয় না।" দুঃখের বিষয়, জীবনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ দূরের ব্যাপার বাঙালী পরিচালকরা আমাদের চারপাশের মানুষগুলোকেই জানেন না। পৃথিবীর সর্বত্র সিনেমা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে, তর্ক-বিতর্ক আছে.

[শেষাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়]

লোক চিত্রকলা

ভানু ত্রিবেদীর তুলিতে—

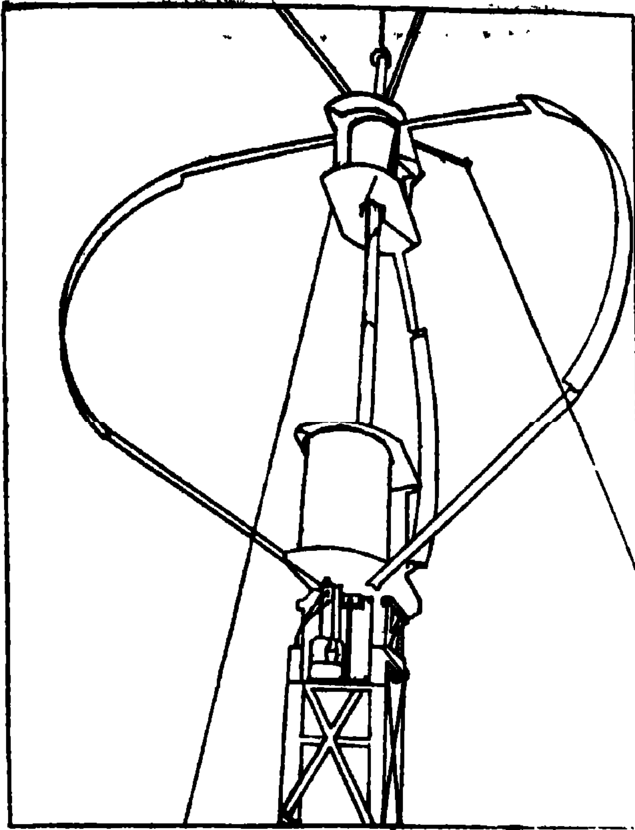


পরিবর্ত শক্তি-উৎস

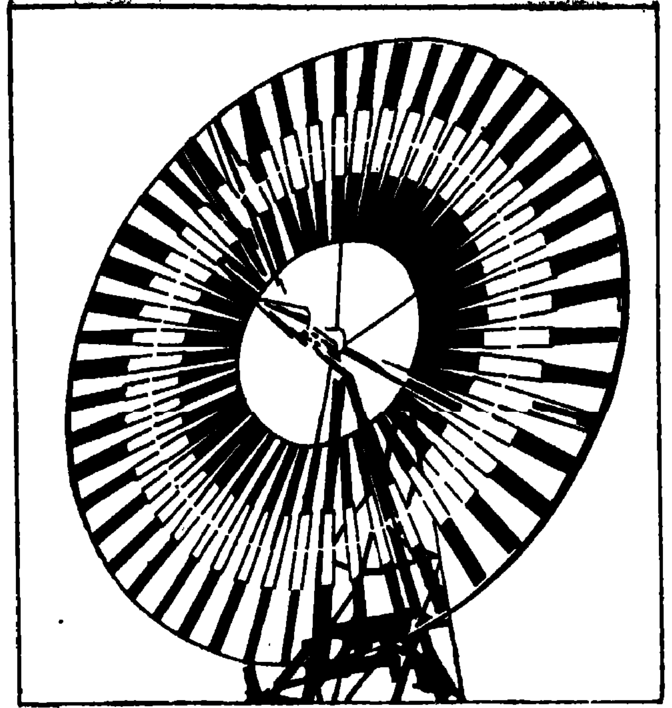
বাতাস/হাওয়া-কল—আদিম মানুষ ভয় পেত হাওয়াকে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে, মানুষ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির মত হাওয়া অর্থাৎ বাতাসকেও তার কাজে লাগাতে শিখল। যে বাতাসকে মানুষ কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় করত আস্তে আস্তে সেই বাতাসকে মানুষ তার দৈহিক শক্তির পরিবর্ত শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত করতে শিখল।

আজ থেকে অনেক দিন আগেই মানুষ দেখেছিল যে, চার পাঁচটা পাখার সমন্বয়ে যদি একটা চক্র তৈরী করা যায়, আর সেই চক্রকে যদি বাতাসের সামনে রাখা যায় তাহলে সেই চক্রটি ঘোরে। বাতাসের জোরে বওয়া আস্তে বওয়ার উপর নির্ভর করে চক্রের ঘোরার গতি। মানুষ এটুকুও বুঝেছিল যে চক্রের মূল অক্ষদণ্ডর সাথে যদি কুয়োর দড়িটাকে একটু কায়দা করে সংযুক্ত করতে পারলে কুয়ো থেকে আর টেনে টেনে জল তুলতে হয় না। এবং সুতরাং বাতাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পানীয় জল ও কৃষিকার্যের জল সংগ্রহর কাজটাকে সহজ করে তুলল, একই ব্যবস্থায় মানুষ আরও অনেক কাজই করতে শিখেছিল যার ফলে তার দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেকটা কমে গেল। কি কি কাজ ? যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধান কোটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে বাতাসকে কাজে লাগানো হত। বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত দুরূহ কাজও মানুষ করেছিল। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই ধরণের কাজে বাতাসকে মানুষ বড় বড় চক্রাকার এক ধরণের যন্ত্র যার চলতি নাম হাওয়া-কল, তার মাধ্যমে নিজের কাজে লাগাত। প্রতিমুহূর্তে উন্নতি-অগ্রগতির অন্বেষণে নিরত মানুষ, হাওয়া-কলকে বাতিল করে দিল সেদিন যেদিন আরও সুবিধার সন্ধান সে পেয়ে গেল। বাষ্প-চালিত, বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রাদি হাতের মুঠোয় আসায় হাওয়া-কল নামক বস্তুটি সম্ভবতঃ হারিয়ে গেল। তারপর যেদিন খনিজ তৈল (পেট্রোলজাত তৈলাদি) তার করায়ত্ত হল সেদিন তো একেবারে সবাই ভুলেই গেল বাতাস পরিচালিত হাওয়া-কলের কথা।

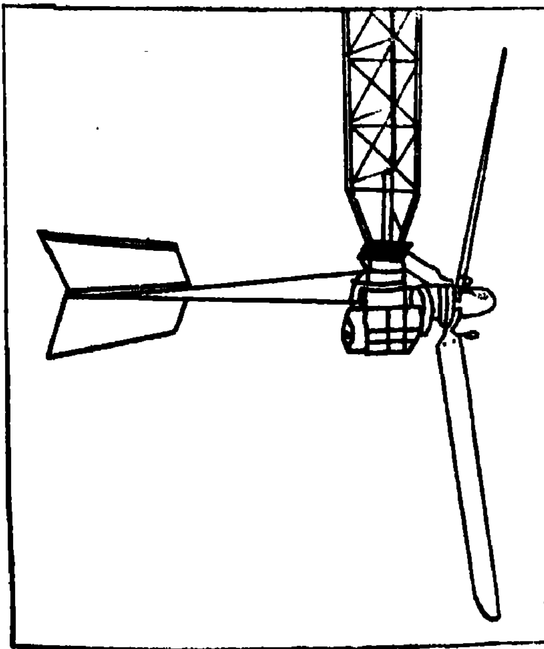
কিন্তু আজ টান পড়েছে কয়লার ভাঁড়ারে, তেলের অবস্থাও সুবিধার নয়। তার উপর ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সবাই আবার নতুন করে ভাবছে হাওয়া-কল বা wind-mill এর কথা। তবে পুরোনো আমলের হাওয়া-কলের থেকে আজকের হাওয়া-কলের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আজ যারাই হাওয়া-কল নিয়ে চিন্তা করছেন তারা ভাবছেন কিভাবে হাওয়া-কলকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র জেনারেটর-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও বেশী বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়া-কল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা (NASA) নামক সংগঠনটি এমন একটি হাওয়া-কল প্রস্তুত করেছে যার সাহায্যে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ঘণ্টায় ২৩ মাইল বেগে হাওয়া বইলে তার সাহায্যে ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ওদেশেরই অন্য একটি প্রস্তুতকারক সংস্থা। আমেরিকান এনার্জি অল্টারনেটিভ নামক একটি সংস্থা এমন একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সহায়তায় ১·৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। (ছবি-১) ওদেশের আরেকটি সংস্থা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার ডেভেলপস একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে; এর সাহায্যে ১৮ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। (ছবি-২) অন্যান্য দেশগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্সের একটি সংস্থার তৈরী "এ্যারো-ওয়াট" (ছবি-৩) নামক হাওয়া-কলের সাহায্যে ৪·১ কিলো-ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ডোমেনিকো স্পেরান্ডিও নামক একটি ইটালীয় সংস্থার তৈরী হাওয়া-কলের সাহায্যে ১ মেগাওয়াগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সুইজারল্যান্ডের ইলেকট্রো গ্যাম্ব সংস্থা ইলেক্ট্রোজেনারেটর (ছবি-৪) নামে এক ধরণের হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সাহায্যে ৫০ ওয়াট থেকে ৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার "ডানলাইট" (ছবি-৫) ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী যে হাওয়া-কল তৈরী করেছে তার উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগা-ওয়াট থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।



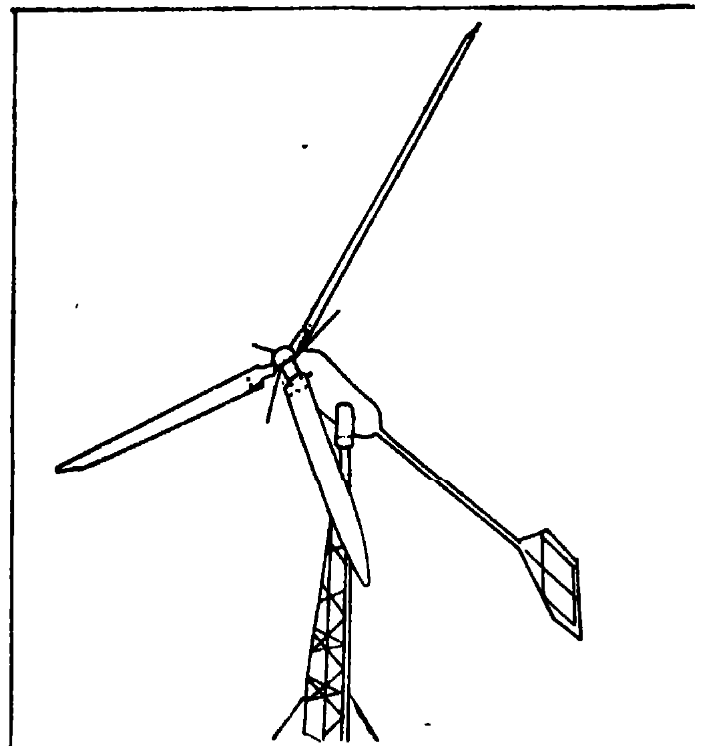
ছবি—১



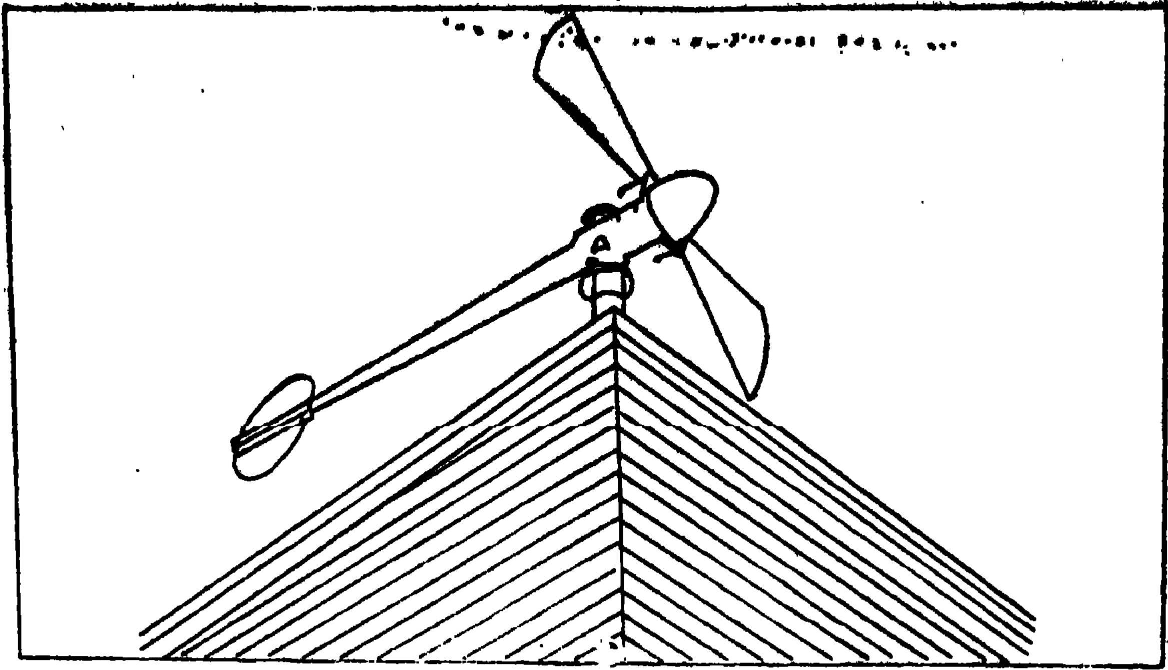
ছবি—২



ছবি—৩



ছবি—৪



ছবি—৫

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সারা পৃথিবী জুড়েই হাওয়া-কল নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। তবে সবারই উদ্দেশ্য এক—বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এই কাজে কোন সংস্থা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কিছুটা হয়তো এগিয়ে গেছে কেউ বা একটু পিছিয়ে চলছে। তবে এই শক্তি সংকটের যুগে সবাই আবার বাতাসকে কাজে লাগাবার চিন্তা করছেন এটাই আশার কথা। আর এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হল—ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে গ্রামীণ সভ্যতার উন্নয়নে হাওয়া-কলের মত যন্ত্র সত্যি সত্যি মানুষের উপকারে আসবে।

—অমিতাভ রায়

শিল্প-সংস্কৃতি : ৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, কেবল বাংলা চলচ্চিত্রে তার কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

আসলে, সিনেমা তৈরীর পেছনে দরকার সততা. তা আমাদের কতটা আছে? রোজ একটি করে আর্ট ফিল্ম হোক, এতটা আমরা নিশ্চয়ই কেউ আশা করি না। কিন্তু ভালো কমার্শিয়াল ছবির জন্যও যা যা প্রয়োজন—সুলিখিত কাহিনী, সু-অভিনয়, সুগ্রথিত চিত্রনাট্য, বাস্তববোধ, জীবনচেতনা, আঙ্গিকের বুদ্ধিসম্মত প্রয়োগ, এই সবের একান্ত অভাবই আমাদের যন্ত্রণা দেয়।

মানলাম, বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে যথেষ্ট সংখ্যক পুঁজির অভাব, এমনকি ভালো ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও পশ্চিমবঙ্গে নেই, কিন্তু তাই বলে সব রকম প্রচেষ্টা হাল্কা প্রমোদ-উপকরণের স্রোতে ভেসে যাবে কেন? প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রায় চোখে পড়ে—"মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচুক—ভালো ছবি তৈরী হোক। ভালো ছবির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এখনই।" এই 'এখন' কবে আসবে গালে হাত দিয়ে না ভেবে, কিংবা চায়ের কাপে তুফান না তুলে যদি আমরা রুচিসম্মত মানুষেরা রুচীহীন চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া চলচ্চিত্র শিল্পকে টেনে তুলি, তবে কি আমরা বাংলা সিনেমাকে নতুন জীবন দান করতে পারব না?

কলকাতায় এশীয় টেব্‌ল টেনিসের আসর

মে মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫-এর ফেব্রুআরিতে অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার পর এই দ্বিতীয়বার কলকাতার নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম এই ধরনের বড়সড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক আসরে পরিণত হল। কল্লোলিনী কলকাতার ইদানিংকার ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের বিশালতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রইল। অনুকূল পরিস্থিতি, ক্রীড়ারসিক দর্শকদের সাগ্রহ উপস্থিতি এবং ক্রীড়া সংগঠকদের পরিশ্রমের যোগফলে আরও একবার প্রমাণিত হল কলকাতাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা সংগঠনের দাবিদার হতে পারে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রগুলির মধ্যে। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার সংগঠকেরা রাজ্যসরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় একটি মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দর্শকদের কাছে উপহার দিতে পেরেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৯ মে তারিখে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সময়োচিত ভাষণে তিনি এই ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের সার্থকতা ও তাৎপর্যের কথা তুলে ধরলেন। প্রতিযোগী দেশগুলির মার্চপাস্ট এবং সি. এল.-টির চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই দিনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল বহুলাংশে। আলোকোজ্জ্বল স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকের দর্শকের করতালি ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার ক্রীড়ামোদী দর্শকদের সহজাত প্রবণতা ও মানসিকতা। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং উপস্থিতি সংগঠকদের ভবিষ্যতে আরও বর্ণোজ্জ্বল ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে। ১০ মে থেকে শুরু হল দলগত প্রতিযোগিতার খেলা। চলল ১৩ মে পর্যন্ত। ১৪ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত (১৭ মে বাদে) হল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার খেলা। আট দিনের সুখস্মৃতি ক্রীড়ারসিক দর্শকদের আলোড়িত করে রাখল কানায় কানায়। দুটি প্রতিযোগিতাতেই জয়জয়কার হল সমাজতান্ত্রিক চীনের। আরও একবার প্রমাণিত হল রাষ্ট্রের কল্যাণব্রতী দৃষ্টিভঙ্গী, শারীরিক পটুতা ও নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন একটা দেশের সাফল্যকে কিভাবে সুনিশ্চিত করে।

এই প্রতিযোগিতায় মোট বাইশটি দেশ অংশ নিয়েছিল। সেগুলি হল: ভারত, চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যান্ড, লাওস, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, হংকং, ব্রহ্মদেশ, সিংগাপুর, ইরাণ, সৌদী আরব, ইয়েমেন (এ. আর), শ্রীলংকা, ইয়েমেন (পি. ডি. আর), সিরিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ এবং বাহরিন। প্যালেস্টিন থেকে এই প্রথম একজন প্রতিনিধি এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসেছিলেন। এছাড়া অনুপস্থিত ছিলেন কাম্পুচিয়া, সংযুক্ত আরবশাহী, কাতার, কুয়েত—এই চারটি দেশের প্রতিনিধি এবং খেলোয়াড়েরা। আতিথ্য, পরিবহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুখস্মৃতি নিয়েই যে এই সমস্ত দেশের খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেছেন, সেকথা তারা যাবার আগে বারবারই বলে গেছেন। চীন দলগত ও ব্যক্তিগত—দুটি প্রতিযোগিতাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানেও ছিল এই চীন। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল জাপানের, মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল উত্তর কোরিয়ার। ১৯৭৭ সালের কুয়ালালামপুরের চতুর্থ এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল উত্তর কোরিয়া। জাপানের খেলা এবার দর্শকদের পুরোপুরি হতাশ করেছে। উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়াপদ্ধতিতেও খুব একটা উন্নতির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। ১৯৭৫-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের নিরিখেই একথা-গুলো মনে আসছে। পুরুষ বিভাগে বিশ্বের দু'নম্বর চীনের গুয়ো হুয়া, ১৮ বছরের কিশোর সাইকে জাপানের গোটা এবং উত্তর কোরিয়ার জো ইয়ং হো ক্রীড়াশৈলীর সুস্পষ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। মহিলা বিভাগে হংকঙের হুই সো হুং, জাপানের এমিকো কান্ডা, চীনের লিউ ইয়ং এবং উত্তর কোরিয়ার লি সং সুক ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'চার খেলোয়াড়'। ৭৫ ও ৭৭ সালের মহিলা বিভাগের বিজয়িনী পাক-ইয়ং সুন বরং দর্শকদের প্রত্যাশার ওপর সুবিচার করেন নি। ভারতের মনমিত সিং ও নন্দিনী কুলকার্নীর খেলায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির ছাপ ছিল। বালক বিভাগের রাণার্স সুজয় ঘোড়পাড়ে আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্পষ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছে। তুলনায় ভারতের চন্দ্রশেখর এবং ইন্দু পুরীর খেলায় শারীরিক অক্ষমতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আটটি দেশের বিরুদ্ধে একতরফা খেলে চীন সরাসরি ৫-০ ম্যাচে জিতেছে। দলগত প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপে চীনের সাথে ছিল ভারত, উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রাই যা চীনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ কিছুটা গড়ে তুলেছিলেন। তা না হলে, চীন না খেলেই জিতে গেল, এরকম কথা বললেও অত্যুক্তি হত না। ভারত চতুর্থ স্থান দখল করে কিছুটা এগিয়েছে বলা চলে।

এর আগে এশীয় প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে ভারতের স্থান ছিল ষষ্ঠ। চীন ও জাপান ভারতের বিরুদ্ধে সহজে জিতলেও উত্তর কোরিয়াকে ভারত ভাল মতই বেগ দিতে পেরেছে বলা চলে। উত্তর কোরীয় প্রশিক্ষকের নির্দেশনায় ভারত যে বেশ কিছুটা এগোতে পেরেছে, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। বিশেষ করে মনমিত সিং উত্তর কোরিয়ার দুই বাছাই খেলোয়াড় জো ইয়ং হো এবং হং সুন চোলকে যথাক্রমে ২১-১৮, ১০-২১ ও ২১-১৪ এবং ২৪-২২ ও ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীন জয়ের পথে একমাত্র উত্তর কোরিয়া ছাড়া অন্য সবকটি দেশ—ভারত, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও অস্ট্রেলিয়াকে সরাসরি (৩-০ ম্যাচে) হারিয়েছে। ভারত মহিলা বিভাগে ষষ্ঠ স্থান পায়। এর আগের এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ। পুরুষ সিঙ্গলস্, ডাবলস্, মহিলা সিঙ্গলস্, ডাবলস্, এবং মিক্সড্ ডাবলস্ এই পাঁচটি বিভাগেই শীর্ষে ছিল চীন। বালক ও বালিকাদের সিঙ্গলস্ জিতেছে যথাক্রমে হংকং এবং জাপান। পুরুষদের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইন্যালে পরপর তিনটি গেম জিতে ঝিহাও সাইকেকে পরাজিত করলেন। চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে ফাইন্যালের দুজনেই এলেন একই দেশ থেকে। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে জয়ী হলেন চীনের আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কি ঝাউজিয়াং। তিনি হারালেন স্বদেশেরই অ-বাছাই খেলোয়াড় লিউ ইয়াংকে ৩-১ ম্যাচে। পুরুষদের ডাবলসে চীনের গুয়ো ইয়ে হুয়া ও জাই সাইকে ৩-১ ম্যাচে স্বদেশের অ-বাছাই শি ঝিহাও ও সাই ঝেন হুয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হলেন। মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই জুড়ি উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়াং ওক এবং হংগিল সুনকে হারিয়ে চীনের ঝ্যাং ডাইং এবং লিউ ইয়াং জয়ী হলেন। মিক্সড ডাবলসে স্বদেশের শীর্ষ বাছাই জুড়ি গুয়ো ইয়ে হুয়া ও লিউ জুটিকে সরাসরি ৩-০ ম্যাচে হারিয়ে অ-বাছাই জুড়ি জি সাইকে এবং ঝ্যাং ডাইং জুটি জয়ী হলেন। বালকদের বিভাগে ভারতের সুজয় ঘোড়পাড়ে ফাইন্যালে হারল হংকঙের লু কামটুঙের কাছে। স্বদেশের দিসকা হোসিনোকে হারিয়ে বালিকা সিঙ্গলস্ জিতেছে জাপানের ফুকিৎমা ওকামোটো।

মোট ৮৩ জন আম্পায়ার এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলাগুলি পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে দুজন ছিলেন বিদেশী। পুরুষ আম্পায়ার মিঃ ওং এসেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে, প্রতিযোগিতার একমাত্র মহিলা আম্পায়ার ছিলেন হংকঙের ফু চ্যাং লিং। ভারতীয় সংবাদসংস্থা ও পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি ছাড়াও মোট ১২ জন বিদেশী সাংবাদিক এই উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। চীনের সিনহুয়া নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি ছিলেন ৪ জন। এছাড়া ইরাণ, জাপান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সাংবাদিকরাও ছিলেন। খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন অভ্যর্থনা উপ-সমিতির নির্দেশনায় ৬০ জন তরুণ-তরুণী এ্যাটাশে বা সহায়কেরা। স্টেডিয়ামের মধ্যেই মিনি হাসপাতালে সবরকমের আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন সমাগত খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন দিনে মেডিক্যাল ইউনিট নানাভাবে খেলোয়াড়দের পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা একবাক্যে সংগঠকদের নিপুণতা, নিষ্ঠা এবং কলকাতার দর্শকদের সমঝদারি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে গেছেন।

ময়দানী বিশৃঙ্খলা ঃ প্রতিকার কোন পথে

সাম্প্রতিককালে ময়দানের ফুটবলকে কেন্দ্র করে দর্শক-অশান্তি এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নই এর সঙ্গে জড়িত নেই। সামাজিক মূল্যবোধের অপহ্নব এবং যুবমানসের বিপথচারী প্রবণতা এই ধরনের গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। এটা সুখের কথা, সুস্থ চিন্তা-সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনাসভা এবং পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় মূল্যায়ণ—ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্যাটি সকলের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রাজ্যসরকার এই প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল শিশির মঞ্চে এই প্রসঙ্গে একটি আলোচনাসভারও আয়োজন করেছিলেন। ৭ জুন, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এই ধরনের গণ্ডগোলের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন ঃ রেফারি, বড় ক্লাব, খেলোয়াড়, সংবাদপত্র ও পুলিসের দায়িত্ব এই প্রবণতা রোধে সবচেয়ে বেশী।

মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছিলেন ঃ ফুটবলের মত জনপ্রিয়তম খেলার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় দর্শকের উচ্ছৃঙ্খল এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতেই হবে। এই অরাজকতাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তিনি বড় ক্লাবগুলি এবং সেই সঙ্গে কলকাতার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই. এফ. এ-র কাছে সময়োচিত আবেদনও জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত হোল ঃ ক্লাবগুলি এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বসে কি করে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। খেলোয়াড়দের দায়িত্বের কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। রেফারীদের সংগঠনকেও তিনি মাঠের শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে তারা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। পুলিসকে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নটি শক্তহাতে মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু গণ্ডগোল হলে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সর্বত্রচারী হয়ে পড়ে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ উত্তেজনা প্রশমনে তাদের বিরাট ভূমিকা আছে। লেখার স্বাধীনতা থাকলেও তার অপব্যবহারও কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। উত্তেজনা বাড়তে পারে এমন কিছু প্রকাশ করা ঠিক নয়। এই আলোচনায় রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি শ্রী স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং আই. এফ. এ-র তৎকালীন সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষও অংশগ্রহণ করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলার পথনির্দেশ করেছিলেন।

এর পরবর্তীকালে দায়িত্বশীল যুবসংগঠন এবং ছাত্রসংস্থাগুলি পথসভা এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এই অরাজকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে সমস্যার গুরুত্ব ও জটিলতার বিচারে এই প্রয়াসগুলি যথোচিত সার্থকতার রূপ নিতে পারে নি, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

ময়দানী বিশৃঙ্খলার প্রশ্নটি গত ফেডারেশন কাপের খেলার সূত্রে বড় হয়ে দেখা দিলেও, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে ধারাবাহিক অশান্তির পরিবেশটি গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে, তার পটভূমি অন্বেষণে আমাদের কতকগুলি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগুলি প্রশ্ন এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একথা অনস্বীকার্য, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশটি মহানগরী কলকাতাকে ঘিরে থাকে বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় জুড়ে, তার পেছনে বহু লোকের ক্রীড়ামনস্কতা যেমন কাজ করে, তেমনই বহু ধরনের অবাঞ্ছিত প্রবণতা এবং স্বার্থবাহী কার্যকলাপও একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। এই সমস্ত প্রবণতা ও কার্যকলাপের জটীলতা আপাতভাবে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও গভীরে এদের উপস্থিতি একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে।

প্রথমেই বড় ক্লাবগুলির কার্যাবিধির দিকে চোখ ফেরানো যাক। তিনটি বড় ক্লাব তাদের সুবিপুল সমর্থকদের কল্যাণে বছরের পর বছর ধরে উত্তরোত্তর বিরাট অঙ্কের বাজেট অবলম্বন করে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রথম সোপানের কাজ করে যাচ্ছে। সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের মানসিক আবেগের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মূলধন করছে বড় ক্লাবগুলি সুনিপুণভাবে। ধনিক স্বার্থ অনুপ্রবেশ করছে এই রাস্তা ধরেই। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের ব্যান জ্যাক ফড়িয়াবৃত্তি। বিপুল টাকার লেনদেনে যে খেলার শুরু, ক্রমশ তা রূপ নিচ্ছে শিবির ভাগের নোংরামিতে। যে অবক্ষয়ের চেহারা সমাজের সর্বস্তরে শিকড় গড়ছে অন্য অনন্য নির্দেশে, তারই একটা রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে খেলার মাঠে। বিপথগামী যুবশক্তি প্রতিটি বিকেলে তাই ময়দান অঞ্চল ছাড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিকৃত দলবাজির আগুন নিয়ে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠছে। এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সর্বগ্রাসী মূল্যবোধের অপহ্নবে এদের আর ভূমিকা কতটুকু। কিন্তু যেটা আশংকার কথা, এই যুবশক্তি বৃহত্তর ভাঙনের খেলায় খেলার মাঠের ট্রেনিংকে কাজে লাগাচ্ছে, সামাজিক পরিবেশে অশান্তি ডেকে আনছে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মের অংশীদার হচ্ছে। তাই প্রয়োজন বড় ক্লাবের বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অনুগৃহীতজন ও পরিষদবর্গের অচলায়তন ভাঙা। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার অবকাশ আছে। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

খেলা যেহেতু পরিচালিত হয় রেফারির নির্দেশে, সেহেতু খেলা পরিচালনার মানও যাতে উন্নত হয়, তার জন্য চেষ্টা করাটাও জরুরি। একটি অমূল্য ভুলেই, মনে রাখা উচিত, নব্বুই মিনিটের খেলার ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। তখনই এসে পড়ে আইন-শৃংখলার প্রশ্ন, সামাজিক পরিবেশ হয়ে ওঠে বিষাক্ত। তাই উপযুক্ত নির্বাচন, পরিচালনার মানোন্নয়ন, রেফারিদের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা—সবকিছুই শান্তিরক্ষার গ্যারাণ্টি হয়ে দাঁড়ায়। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আসল কথা—এসব যেমন সত্যি, তেমনই একথাও মনে রাখা উচিত মানসিক উত্তাপ সৃষ্টির সমস্ত রকমের উৎসমুখ বন্ধ করে রাখার চেষ্টা সব সময়েই করতে হবে। সেইজন্যই প্রয়োজন খেলা পরিচালনার মান উন্নয়ন, রেফারিদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ব্যবথার কার্যকরণ।

এবার আসা যাক খেলোয়াড়দের দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গে। যেহেতু তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে কিশোর ও তরুণদর্শকদের মানসিক আবেগের কেন্দ্রগুলি, সেহেতু আচরণে তাদের আদর্শস্থানীয় হতে হবে। উত্তেজনায় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু কোন সময়েই তাঁদের ভব্যতার সীমারেখা অতিক্রম করা ঠিক নয়। তাঁদের সামান্য একটু ক্রোধের প্রকাশ হাজার হাজার দর্শকের ক্রোধকে উস্কে দিতে সক্ষম, এটা মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত, তাদের পেছনে ব্যয়িত হচ্ছে বহু মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ, সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা তাঁরা করতে পারেন না। গ্যালারির অভিনন্দনকে পুঁজি করে তাঁদের উচিত উন্নততর ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করা, উত্তেজনার শরিক হওয়া নয়। সাম্প্রতিককালের কিছু নামজাদা খেলোয়াড় তাঁদের আচরণে এই ধরনের প্রবৃত্তিরই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাতে তাঁদের ক্রীড়াদক্ষতারও অপহ্নব ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কথায় বলা যায়, তারাই পারেন এই দর্শক-অশান্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সবচেয়ে সার্থক ভূমিকা পালনে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা সে দায়িত্ব অনেকক্ষেত্রে পালন করছেন না, উপরন্তু একটা মোহ ও কল্পনার পরিবেশ তৈরি করে উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত পত্রিকার খুব একটা সদর্থক ভূমিকা নেই, বরং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর তাড়নায় এবং সুচিন্তিত জনবিরোধী পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে করতে ক্রীড়াক্ষেত্রেও তারা থাবা বাড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। এদের ভূমিকা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। শুভবুদ্ধির উন্মোধনে দরকার হলে এদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। দায়িত্বশীল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি এ ব্যাপারে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করুক, এটা সকলেই চান।

সবশেষে, আইনশৃংখলা রক্ষার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে আরক্ষা বাহিনীকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, পশ্চিমবংলার সুমহান ক্রীড়া-ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কঠোরতার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে কোন মূল্যে মানুষের সমর্থনকে পাথেয় করে ময়দানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন করার ক্ষেত্রে আরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বই সর্বাধিক।

—দেবাশীষ দত্ত

ঐক্য বাক্য মাণিক্য। তপন চক্রবর্তী

ক্রান্তিক প্রকাশন, ১১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

তপন চক্রবর্তী প্রগতি শিবিরের তরুণতম লেখকদের অন্যতম। তার গল্প কবিতা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বাহক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে। 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' গল্প সংকলনে নন্দন, সত্যযুগ, ক্রান্তিক, গল্প সংকলন প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ১৪টি গল্পকে গ্রথিত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত এই গল্পগুলির রচনাকাল সত্তর দশকের প্রথম আটটি বছর। সত্তর দশকের রক্তাক্ত চত্বরে গল্পগুলি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাই অত্যন্ত স্বভাবিকভাবেই এই সব গল্পে বারবার মেহনতী মানুষের সংগ্রাম আন্দোলন, দমন পীড়ন, খুন-সন্ত্রাস, গুলিবাজী নির্যাতন, জোতদারের কুটিল চক্রান্ত, হিংস্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও অকুতোভয়ে সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য দাঁতে দাঁত কষে এগিয়ে যাওয়ার ছবি ঘুরে ফিরে এসেছে। লেখককে ধন্যবাদ 'ব্লা-সর্বস্ব' সাহিত্য সৃষ্টির চটুল মাদকতা অস্বীকার করে তিনি গণ-আন্দোলন সংগ্রামকেই তার সাহিত্যের বিষয়ভুক্ত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাই কল্পাড়ের মানদা মাসীর তাৎক্ষণিক বুদ্ধির দীপ্তি, নিবারণের অনুভূতির নবজন্ম, রামরাবণের সংগ্রামের ময়দানে লুটিয়ে পড়া শব, সাংবাদিক অরুণের শৃংখল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা প্রক্রিয়া, রেল ধর্মঘটের দিনে ভিখিরী মেয়ের হলদে দাঁতের হাসি, অবনীবাবুর প্রমোশন নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা, বন্যাত্রাণে জাত পাতের প্রশ্ন তুলে জোতদারের আখের গোছানোর হীন প্রচেষ্টা, চটকলে মজুর ধর্মঘট ভাঙতে দেখে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার জন্য কুসুমের মনের অতলে তলিয়ে যাওয়া, ভেড়ির মালিকের নিষ্ঠুর লুণ্ঠন, ট্রেনের মধ্যে গরীব মানুষের একাত্ম অনুভব করার কথা, আবু হোসেনের গল্প প্রভৃতি টুকরো টুকরো ছবি তার গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ছবির মত চোখের সামনে তুলে ধরে।

সংকলনের গল্পগুলির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর। টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে লেখক লড়াকু মানুষের জীবনজয়ের চিত্রটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সংগ্রামে কখনও কখনও ভুল হয় (কমরেড), কখনও বিশ্বাসহীনতা দেখা দেয় (অবনীবাবুর প্রমোশন), কখনও হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে (নখদর্পন, খবর, মাছরাঙ্গা) আবার কখনও মানুষ অপরূপ উপলব্ধির স্পর্শে নবরূপে উদ্ভাসিত হয় (ঐক্য বাক্য বাণিক্য, কুসুমের মন, গতকালও আজ প্রভৃতি)। লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন গল্পের নায়ক নায়িকাদের বিশ্বাস যোগ্য করে তুলতে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেন নি। গল্পগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই মনে হয়েছে লেখক বিষয় বস্তু সংগ্রহে যতটা ব্যস্ত, ভাষা বিন্যাস, শব্দ চয়ন, সংলাপ নির্মাণ, এক-কথায় রচনা শৈলীর প্রতি ততটা মনোযোগী নন। অনুশীলনের অভাব অধিকাংশ গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে। হলদে দাঁতের হাসি ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের একটি চমৎকার চিত্র বিধৃত করেছে। কিন্তু ঐ হলদে দাঁতের হাসিতে এসে থামলেই যেন গল্পটি আরও বেশী ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত। সেন্সর গল্পে রূপকের মাধ্যম অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু রূপক গল্পে যে তীব্র ভাষার গতি প্রয়োজন তা একদম নেই, ফলে গল্পটি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবনীবাবুর প্রমোশন গল্পটি একটি মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প। এই গল্প একই সংগঠনের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সংগঠকে সংগঠকে যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, ভুল বোঝাবুঝি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার নেপথ্য কারণ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক। কিন্তু বাণীকণ্ঠ, অবনীবাবু সুরমা দের মনস্তত্ত্ব ধরার মত কলমের জোর তপনবাবুর নেই। কুসুমের মন গল্পটাই মহিলাদের আত্ম মর্যাদা বোধ ও ধর্মঘট ভাঙ্গা দালালদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কুসুমের মত বাপ মা হারা মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মত মানসিক জোর সংগ্রহ করার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি দরকার তার সামান্যতম চিত্রও নেই। ফলে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য 'ভালো ছেলে অশোক' দালালি করে চটকলে ঢুকছে দেখেই কুসুমের মন বিষাক্ত হয়ে গেল দেখলে ব্যাপারটা খুবই সরলীকরণ মনে হতে পারে। সংকলনের অনেক গল্পেই এ রকম অসংগতি চোখে পড়ে। বিষয়ের গভীরতা থাকলেই যে কলমের জোরে তাকে বিশ্বস্ত করে তোলা যায় তার জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন। লেখক সেই অনুশীলনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন বলে মনে হলো। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি পড়ে নীচু ক্লাসে ছাত্রের সিঁড়ি ভাঙ্গা অংকে যেনতেন প্রকারেণ শেষ উত্তর শূন্য করার ঝোঁকের কথা মনে পড়েছে বারবার। কে না জানে সিঁড়ি ভাঙ্গা অংকে সাধারণত মুখ্য উত্তর এলেও অসংখ্য ক্ষেত্রে অন্য উত্তরও আসে, তাতে অঙ্ক ভুল হয় না। লেখক প্রায় সব গল্পেই শেষ কালে একটি সংগ্রাম বা বিদ্রোহ বা বিক্ষোভকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই চিত্র এসে পড়ে সেখানে বলার কিছু নেই, কিন্তু যেখানে জোর করে আনতে হয় আপত্তি ওঠে সেখানেই। টুকরো টুকরো ছবিতে মানুষের জীবনের নানা রকম চিত্র তুলে ধরে সংগ্রামের কথা না বলেও পাঠকের মনে রেখাপাত করা যায়। তার জন্য চাই দক্ষতা। আমরা আশা করব লেখক সেই দক্ষতা অদূর ভবিষ্যতেই অর্জন করবেন। বর্তমান সংকলনে সেই প্রতিশ্রুতি খুব উজ্জ্বল ভাবেই ফুটে উঠেছে।

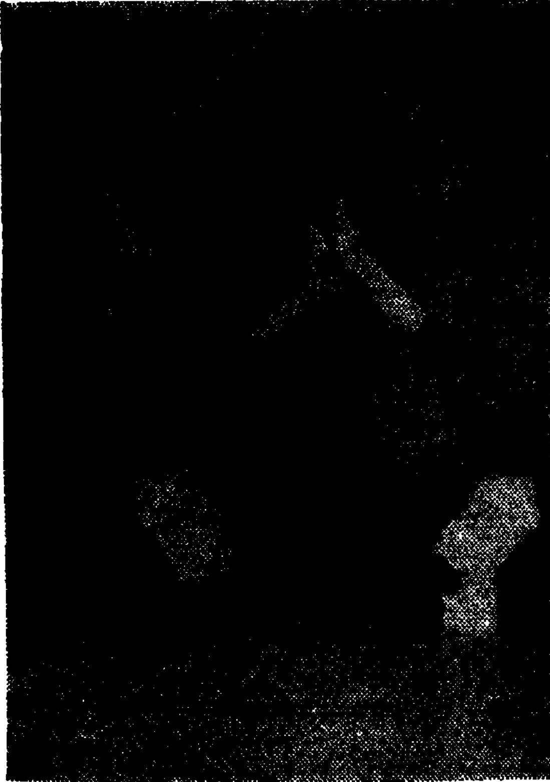
গল্প সংকলনের ছাপা এতো পীড়াদায়ক হলে পাঠকের ধৈর্য ধরে রাখা খুবই কষ্টকর হয়। এতো অসংখ্য ছাপার ভুল কেন? এই অবহেলা নতুন লেখকদের সুনাম অর্জনে বাধার কারণ হতে পারে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে প্রকাশক এদিকে দৃষ্টি দেবেন। প্রচ্ছদ সাধারণ মানের। ছাপার জগতে সংকটের দিনে একশ চার পাতার বই সাতটাকায় পাওয়া গেলে আপত্তি করার কোন কারণ নেই।

—সরল বিশ্বাস

বিভাগীয় সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা

সাগরদিঘী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এই ব্লকের ব্লক যুব উৎসব (১৩ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত) মার্চ মাসের ১৬ তারিখে শেষ হয়। একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি। এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৫টি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ৫টি প্রদর্শনী। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল শিশুদের বসে আঁকো, অঙ্ক দৌড়, আবৃত্তি, যেমন খুশী সাজা, নাটক, নানা ধরণের সঙ্গীত, আলোচনা চক্র, বিতর্ক ইত্যাদি। খেলাধুলার



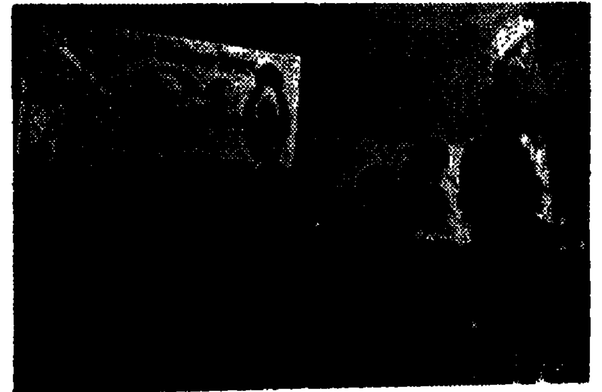
বামনগোলা ব্লক যুব উৎসবে বালিকাদের যোগাসন প্রদর্শনী

মধ্যে ছিল ভলিবল, খো-খো, ডিসকাস, দৌড়, কবাডি, তীর নিক্ষেপ ও লৌহগোলক নিক্ষেপ। সর্বমোট ১০৭৪ জন নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১৭ই মার্চ সকাল ৯টায় জেলা পরিষদের সভাধিপতির সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জন প্রতিনিধি পঞ্চায়েত সভাপতি, বিডিও ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বেলডাঙ্গা-১ ব্লক যুব-করণের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২১ থেকে ২৩শে মার্চ। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সভাপতি মহঃ নৌসাদ আলি। নানা ধরণের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী চলে তিনদিন ধরে। ২৩শে মার্চ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শরীর শিক্ষা আধিকারিক অধীর ঘোষ। এ ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ধরণের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা

রায়গঞ্জ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও পরিচালনায় ৪ঠা মে ব্লক স্তরে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগে ৩৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ব্রততী ঘোষরায় ১৫ জন কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেন। এবারকার এই প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ প্রতিযোগীদের সংখ্যাধিক্য একটি বিশেষ আনন্দসংবাদ বলা যেতে পারে। এই ব্লকের পরিচালনায় ১৬ ও ১৮ মে যুব উৎসবের আয়োজন করা



গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন রণজিৎ মিত্র, এম. এল. এ

হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব-উৎসব কমিটির সভাপতি প্রাণনাথ দাস। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ৫৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। আদিবাসী যুবকদের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যুব-উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সত্যব্রত ঘোষ। বিভিন্ন বিভাগের কৃতী ৬৩ জনকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র উপহার দেওয়া হয়।

বর্ধমান জেলা

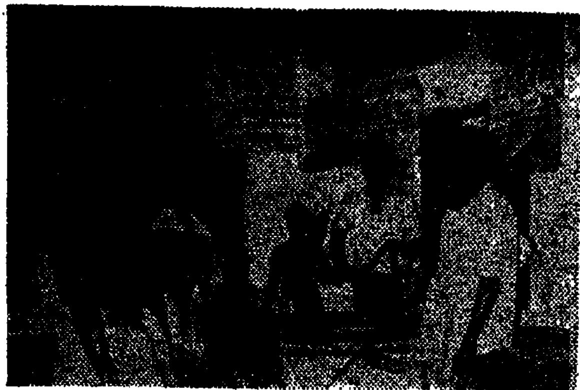
আউসগ্রাম-১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২১, ২২ ও ২৩ শে মার্চ যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুব উৎসব কমিটির সভাপতি কালিদাস মাঝি উৎসবের উদ্বোধন করেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। আদিবাসী যুবকদের জন্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট ছিল। কৃতী প্রতিযোগীদের শ্রীযুক্ত মাঝি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।



রায়গঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় জনৈক আদিবাসী প্রতিযোগী

আউসগ্রাম ২নং ব্লক যুব অফিস যুব উৎসব চলে ২৯ থেকে ৩১শে মার্চ। উৎসবের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সভাপতি জানে আলম্। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৯ জন ও ৭৯ জন। সরকারী প্রচেষ্টায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনমনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী।

কালনা ২ নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের ২৯শে মার্চ উদ্বোধন করেন পঃ বঃ সরকারের পশুপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠানসূচীতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সফল ১০৭ জনকে পুরস্কৃত করেন বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী।



কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনী মণ্ডপ

নদীয়া জেলা:

রানাঘাট ২ নং ব্লক যুব-করণ আয়োজিত ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ ব্যাপী যে যুব উৎসব অনুষ্ঠান চলে তার উদ্বোধন করেন রানাঘাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য গৌর চন্দ্র কুণ্ডু। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সূচীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন মিটারের দৌড়, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফন, ডিসকাস থ্রো ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে আবৃত্তি, সঙ্গীত, লোকনৃত্য, ব্রতচারী



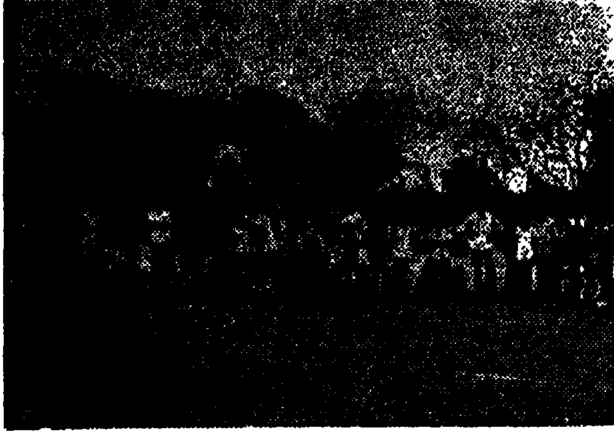
নবদ্বীপ ব্লক যুব উৎসবে দৌড় প্রতিযোগিতা

অতিপ্রদর্শন, বিতর্ক, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিষয়সূচীভেদে ২ থেকে ৭ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হয়। ১৫ই মার্চ স্থানীয় রানাঘাট (পূর্ব) কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দার্জিলিং জেলা:

মিরিক ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক অফিসের উদ্যোগ ও ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মারমা প্রেমসুন্দর স্মারক পাঠশালা প্রাঙ্গণে ১০ ও ১১ই মে যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও যুব সংগঠনের প্রায় তিন শত ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ওস্ফু নাচ, নেপালী নৃত্য ও লোকনৃত্য ও লোকগীতি, কবিতা ও শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন রকমারি পাহাড়ী ফুলের প্রদর্শনী, হাতের কাজ এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত চা-বাগানের কর্মীদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এক প্রবীণ (৯৬) সমাজসেবী। পুরস্কার বিতরণ করেন মারমা চা-বাগানের ম্যানেজার এল. বি. দেওয়ান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মিরিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সি. বি. রাই ও মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক।



রায়গঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে উচ্চ লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী

কার্শিয়াঙ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত পাহাড়ী এলাকা বেষ্টিত কার্শিয়াঙ শহরে এন, ভি, ট্রেনিং সেন্টার ময়দানে গত ১৪ ও ১৫ জুন '৮০ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হাজার হাজার পাহাড়ী লোকের সমাগমে কার্শিয়াঙ ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য যুব ছাত্রের মধ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৪ জুন সকাল দশটায় অসংখ্য ছাত্র যুব উপস্থিতি কার্শিয়াঙ সদরের মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং ভারত স্কাউটস এণ্ড গাইডের কার্শিয়াঙ শাখার পরিচালনায় বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সহ-মহকুমা শাসক ও যুব উৎসব কমিটির সভাপতি আর. মুৎসুদ্দি এবং স্বাগত ভাষণ দেন ব্লক যুব আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও আহ্বায়ক এস. দেওয়ান।

১৪ জুন বিকাল ৪টায় যুব উৎসবের শিক্ষামূলক অঙ্গ হিসাবে বর্তমান আসাম সমস্যা ও পার্বত্য বিকাশ প্রকল্পের ওপর এক "আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত" হয়। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন দার্জিলিঙ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবকুমার রাই। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মুৎসুদ্দি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসিত রাই। তুলসী ভণ্ডারাই ও আরো অনেকে।

১৫ জুন সকাল দশটায় স্থানীয় সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ যুব ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতামূলক "সাহিত্য বাসরের" আসর বসে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে সাহিত্য বাসরের শুভ সূচনা করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পি. কে. রায়। সভাপতিত্ব করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মুৎসুদ্দি ও প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন ডাউহিল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি এস. প্রধান।

১৫ জুন দুপুর দুটায় নেপালী একক ও যৌথভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠান সব থেকে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসব প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কার্শিয়াঙ ব্লকের বহু দূরদূরান্ত বস্তী থেকে তরুণ তরুণীরা এসে এই উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রেখেছিল। রাত্রি ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। উভয়দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি। এই যুব উৎসব প্রসঙ্গে দেওয়ান জানান যে, সব বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চারশত প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৭ জন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় পুরস্কারসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানপত্র দেওয়া হয়।

পাঠকের ভাবনা

নাটক প্রকাশ করুন

অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম নাটক। আবার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়বার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম এই নাটক। অথচ অপসংস্কৃতি মূলক নাটকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির নাটকের সংখ্যা খুব কম।

'যুবমানস' পত্রিকা একটি সুস্থ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেই জন্য আমাদের অনুরোধ 'যুবমানসের' প্রতি সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সাথে সাথে একটি করে সুস্থ সংস্কৃতির ও প্রগতিশীল নাটক প্রকাশ করুন।

—দিলীপ কুমার মাজী
গ্রাম-চাউলা
পোঃ-ঘাটাল
মেদিনীপুর

প্রচার ব্যাপক হোক

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল '৮০ সংখ্যা পড়ে অনুপ্রাণিত হ'লাম। বিশেষতঃ প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত সমকাল চিন্তিত এবং রাজনীতি-সচেতন।

তবুও বলতে হয়, 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর মত 'যুবমানস' পত্রিকার ব্যাপক প্রচার নেই। কারণ জানিনা। আজকের হতাশ-গ্রস্থ বিভ্রান্ত যুবকসম্প্রদায় যথেচ্ছ রুচিতে পড়তে বাধ্য হচ্ছে বাজারী পত্রিকাগুলোর উপহার ঃ বস্তাপচা সাহিত্যের প্রভাব।

যুবমানসের প্রচার ব্যাপক হ'লে বিভ্রান্ত পাঠকদের কাছে 'যুবমানস' আদর্শ সম্মিল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

—স্বপন নাগ
১১৮, পি. কে. গুহ রোড। কলকাতা-২৮

মাসিক যুবমানসের আমি নিয়মিত পাঠক। আর সেই অধিকারে এই পত্রটি পাঠাচ্ছি 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগে। যুব-মানসের গত মে সংখ্যায় প্রকাশিত একগুচ্ছ কবিতা পড়ে ভাল লাগল। আর একটি মূল্যবান লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ঃ বিচ্ছেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে'। লেখাটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

'যুবমানস' যে ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে একটা অনুরোধ, এত সুন্দর একটি পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন।

—পাঁচুগোপাল হাজরা
৮০০৮/১৫, কল্যাণগড় (হাবড়া)
২৪-পরগনা।

নিয়মিত প্রকাশ প্রয়োজন

আমি 'যুবমানস' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি বেশ উপভোগ্য। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানের এই পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের ফলে যুব-ছাত্র সমাজ বেশ উপকৃত হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান কয়েকটি সংখ্যা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। পত্রিকার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা বিভাগ সত্যিই মূল্যবান।

তথাপি এই পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশনায় পাঠক সমাজ সত্যিই হতাশ-গ্রস্থ। এই পত্রিকার প্রকাশ যদি নিয়মিত না হয় এবং পাঠক সমাজের হাতে যদি নিয়মিত না পৌঁছায়, তাহলে এই পত্রিকা হয়ত পাঠক সমাজের মানস লোকের অজ্ঞাতেই থেকে যাবে। ব্যর্থ হবে যুব মনের চাহিদা মেটাতে।

আপনারা পত্রিকাতে 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগ সংযোজন করেছেন, তাই উৎসাহিত হয়ে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করে আমার এই আবেদন।

—তুষার কান্তি সামন্ত
গড়-কোটালপুর। বাঁকুড়া।

পাঠকদের কাছে নিবেদন

গত সংখ্যায় গৌতম ঘোষ দস্তিদারের লেখা 'দুটি মেলা তিনটি উৎসব' রিপোর্টদুটিতে কিছু ছাপার অস্বস্তিকর ভুল থেকে গেছে। ২৪ পৃষ্ঠায় 'কোপিয়াত্তম' নয় 'কোডিয়াত্তম', 'আমপু' নয় 'থামপু', 'চিতেগু চিন্তি' নয় 'চিত্তেকু চিন্তে' গহণ নয় 'গ্রহণ' পড়তে হবে। এছাড়া গৌতম ঘোষের তেলেগু ছবি 'মা ভূমি'-এর আগে সর্বপ্রাথা শব্দটি বাদ যাবে। 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটির নাম 'খর্ব শ্রাদ্ধ' হ'য়ে গেছে এবং এই ছবির একটি চরিত্র 'নানী'-এর স্থলে হয়েছে 'মানী'। 'চালক' নয় হবে 'বালক'। সৈয়দ মীর্জার ছবি দুটির সঠিক নাম—'অরবিন্দ দেশাই কী অজব দস্তানা' এবং 'আলবার্ট পিন্টো কো গোস্যা কিউ আতা হ্যায়'।

'সলিল চৌধুরীর গান আমাদের সঞ্জীবিত করে' জায়গায় পড়তে হবে সঞ্জীবিত করে।

এই অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিক-ভাবে দুঃখিত।

—সঃ মঃ যুবমানস



বাগমুণ্ডি ব্লক যুব উৎসব '৮০ তে ছো-নৃত্য



সিটুর রাজ্য সম্মেলনে যুব কল্যাণ বিভাগের প্রদর্শনী স্টলে ছাত্র-যুবদের ভীড়

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনীতে ভাগচাষী রেকর্ড সম্পর্কে চাষীদের বোঝান হচ্ছে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
অগাস্ট, '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : অশোক মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ৯/১ মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট (?) ... মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

প্রায় দুই শত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি যেদিনে মুছিয়া গেল, সেদিন ভারতের অফিস আদালত হইতে 'ইউ-নিয়ন জ্যাক'কে বিদায় করিয়া ত্রি-বর্ণ পতাকা স্থান দখল করিল। দেশের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যেদিন আনুষ্ঠানিক অবসান হইল সেই ১৫ই আগস্ট প্রত্যেক ভারত-বাসীর নিকট যে একান্ত পবিত্র—একথা নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই স্বাধীনতার জন্য কত ভারতীয় সিপাই-সান্ত্রী ইংরেজের তোপের মুখে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কত সন্ন্যাসী ত্রিশূল তুলিয়া বিদ্রোহের আহ্বান জানাইয়াছেন, কত ছাত্র স্কুল-কলেজের মায়া কাটাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, কত বিদ্রোহী যৌবন অতুলনীয় আত্ম-ত্যাগের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার যুদ্ধে কতভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার পথকে আরও কত সহজ করিয়া দিয়াছেন—তাহার একটু ক্ষুদ্র অংশও মনে পড়িলে গর্বে কাহার না বুকখানি ফুলিয়া ওঠে?

দেশ বলিতে তাঁহারা কোন অবাস্তব দেবী মূর্তির কল্পনা করেন নাই, তাঁহারা দেশের মানুষকেই বুঝিয়াছিলেন। স্বভাবতই স্বাধীনতা দিবসে সমীক্ষা করা হয় স্বাধীনতার স্বাদ মানুষের ভাগ্যে কতটুকু জুটিয়াছে। 'ক্ষুধার রাজ্য' হইতে কি মানুষ মুক্তি পাইয়াছে? যুবকের বেকারত্বের যন্ত্রণার জ্বালার কি কিছুটা অন্তত উপশম হইয়াছে? নিরক্ষরতার আঁধার কি দেশ হইতে অপসারিত হইয়াছে? গ্রামে জোতদারী-মহাজনী শোষণের কব্জা কি আলগা হইয়াছে? মালিক-মজুতদারের অত্যাচার কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা, অস্পৃশ্যতার মত মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ কি হ্রাস পাইয়াছে? বিদেশী পুঁজির অক্টোপাস্ হইতে কি জাতীয় অর্থনীতি মুক্তি পাইয়াছে? শ্রদ্ধার সাথে অগণিত স্বাধীনতা যোদ্ধার স্মৃতি তর্পণ যেমন আজকের দিনে প্রয়োজন—সেই সঙ্গে জনজীবনে এই ধরণের প্রশ্নগুলির মীমাংসা এই ৩৩ বৎসরে কতখানি হইয়াছে তাহাও গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। উপলব্ধি করিতে হইবে এই জাতীয় সমস্যার যদি কোন সঙ্গত সমাধান না হয় মানুষের নিকট স্বাধীনতার তাৎপর্য, তাহার মর্ম একান্ত-ভাবেই ফিকে হইয়া যাইতে পারে।

একই সঙ্গে সুতীক্ষ্ম নজর রাখিতে হইবে যেন দেশের কোন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রতি-ক্রিয়াশীল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের ঐক্য এবং সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া স্বাধীনতার মূল শিকড়কে আলগা করিয়া দিতে না পারে।

ইহা তো ধ্রুব সত্য যে আমাদের এই বিশাল দেশে নানা বর্ণের, নানা ভাষার, নানা কৃষ্টির, নানা ধর্মের মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিবেশ হইতে শুরু করিয়া আচার-ব্যবহারের মধ্যে পর্যন্ত বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আমরা একই দেশের অধিবাসী। চিন্তা-চেতনায় আমরা এক। একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মধ্যে মিলন—ইহাই তো আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সত্যকে যেমন আমাদের প্রত্যেকের সঠিক ভাবে বুঝিতে হইবে, ততোধিক বলিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে দেশের কর্ণধারদের।

এই ৬৫ কোটি মানুষের দেশের শাসন ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রায় তিন যুগের শাসন কালে জাতীয় সংহতির সূতা কি শক্তিশালী হইল না দুর্বল হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিব না? অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা যতটুকু বাড়িয়াছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তাহার সামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টন কি আদৌ হইয়াছে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির মধ্যে যুক্তি-নির্ভর সম্পদ বিতরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সুষম অর্থ বিনিয়োগ, রাজ্যের মানুষের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও ক্ষমতা প্রদান—এই সবই তো বিভিন্ন এলাকার বিকাশ সাধনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়গুলি কি সুবিচার পাইয়াছে?

জাতীয় ভাষা, মূল সাংস্কৃতিক ধারার সহিত লয় রাখিয়া আঞ্চলিক প্রধান ভাষাগুলি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি সমূহ উন্নতির কোন সঙ্গতিপূর্ণ সুযোগ কি পাইয়াছে? পাইলে ইহার আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি হইতে পারিত কি না সে বিতর্কের মধ্যে না যাইয়াও কসম করিয়া বলা যাইতে পারে বর্তমান বেদনাদায়ক ও নিষ্ঠুর বৈষম্য জাতীয় সংহতিকে এই ভাবে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারিত না। এই বৈষম্যের গর্ভেই জন্ম লাভ করে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ। তাহা হইতে সৃষ্টি হয় আঞ্চলিকতাবাদ। ইহারই প্রকাশ ঘটে 'ভূমি পুত্রদের জন্য সংরক্ষিত সুযোগ' এর দাবীতে। আর এই ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী দাবীকে কার্যকরী করিবার জন্য তৈরী হয় শিবসেনা, লাচিত সেনা, আমরা বাঙ্গালী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রমুখ সংগঠনগুলি। তৈরী হয় 'আসু'র মত বিবেক বর্জিত বাহিনী।

ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দর্পণে মানুষ যখন এই সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, কাতারে কাতারে মানুষ সমবেত হইতে থাকে সেই পথের ধারে—তখনই ভীত-শঙ্কিত কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী বহুদিন ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চিত হওয়া মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করিবার জন্য মানুষকে বিশেষ করিয়া সংবেদনশীল যুব-ছাত্র সমাজকে সর্বনাশা পথে ঠেলিয়া দিতে উদ্যত হয়। ত্রিপুরা-উপজাতি যুব সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর খণ্ড, গোর্খা খণ্ড ও ঝাড়খণ্ডওয়ালারা সেই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের শিকার। আর এই সুযোগ বুঝিয়া ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁহার নিজস্ব এজেন্টদের সাহায্যে তাহার খল উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়াছে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহ ইহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার আহ্বানে দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষ করিয়া যুব ও ছাত্র সমাজের যোগ্যতার সহিত সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এত গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। বহু কষ্টার্জিত ও লক্ষ শহীদের রক্তাক্ত পথে আগত এই স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতিকে যে কোন মূল্যে রক্ষা ও শক্তিশালী করিতে হইবে। দেশের অখণ্ড সত্তার মধ্যেই জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথে সমস্ত মানুষকে সমবেত করিতে হইবে। সেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়াই এ বৎসরের স্বাধীনতা দিবস পালিত হউক যুব মনের নিকট এই আমাদের আবেদন।

এবারের স্বাধীনতা দিবস

প্রমোদ দাশগুপ্ত

সম্পাদক, সি. পি. আই (এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারত স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এবারে দেশের জনগণ চৌত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন। বর্তমান বছরের একটা বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এই বছরেই পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চারটি ঐতিহাসিক ঘটনার পঞ্চাশতম বার্ষিকী। এই চারটি ঘটনা হলো: গাড়োয়াল বিদ্রোহ, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, সোলাপুর বিদ্রোহ এবং গাড়োয়ালী বিদ্রোহ। এই সমস্ত বিদ্রোহ ভারতের



স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। এই সমস্ত বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অগ্নিরূপ—এই সমস্ত বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে নিছক অহিংস পথে জয়যুক্ত হয় নি তারই স্বাক্ষর বহন করছে এই সমস্ত বিদ্রোহ। এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই সমস্ত অমর শহীদকে যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়নের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের এই কঠোর আত্মত্যাগ, কারা নির্যাতন, কষ্ট-স্বীকার ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ কোন দিন ভুলতে পারেন না। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কাহিনী প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এই তেত্রিশ বছরের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব এই সময়ে একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ বিরাট বিরাট গণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এমন একটি বছর অতিক্রান্ত হয় নি, যে বছরে ঘাটতি বাজেট পেশ হয় নি বা জনগণের উপর নতুন করে করের বোঝা চাপে নি। ঘাটতি বাজেট পেশ এবং করের বোঝা বৃদ্ধি ধনবাদী শাসন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি। বিগত তেত্রিশ বছরের হিসেব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে টাকার মূল্য কমতে কমতে বর্তমানে ২৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। এত অল্প সময়ে এই ধরনের অর্থের মূল্যহ্রাস আর কোন দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এই অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান। আর অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সংকট প্রসারিত। সম্প্রতি লোকসভায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হলো দেড় কোটি। যে সমস্ত যুবক-যুবতী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান তাঁরা সকলেই শিক্ষিত যুবক-যুবতী। যাঁরা শিক্ষিত নন, তাঁদের এক বড় অংশই বেকার। রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের চাইতে অন্তত দশগুণ হবে অরেজিস্ট্রিকৃত বেকার। এ থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা বোঝা যায়। এই অর্থনৈতিক সংকট আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করছে বিদেশী ঋণের উপর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের বর্তমান বিদেশী ঋণের পরিমাণ হলো তের হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান এই অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন ক্ষমতা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেই, থাকতে পারে না।

ইতিহাসের নিয়ম হলো, ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি শাসক ও শোষক শ্রেণী যখন জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়, যখন বিভিন্ন সমস্যা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে এবং সংকট ও সমস্যার গভীরতা বাড়তে থাকে তখন বুর্জোয়ারা এই সংকটের সমস্ত বোঝাই জনগণের উপর

চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। ইতিহাসের আরো শিক্ষা হলো, ধনবাদী শাসকেরা একটা স্তরে মুখে জনকল্যাণের বুলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের একটিই লক্ষ্য থাকে—শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসন বজায় রাখা। স্বাধীন ভারতের তেত্রিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ভারতের বুর্জোয়া শাসকেরা এই পথ ধরেই চলেছে।

অর্থনৈতিক সংকট যত বৃদ্ধি পাবে শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য তত বেশি বেশি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ভারতের বুর্জোয়া-জমিদার শাসন ব্যবস্থায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের দাবি ছিল গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান। দাবি ছিলঃ বাক স্বাধীনতা, সংবাদপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সংবিধানে যে সমস্ত মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ হয় সেগুলি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে উত্থাপিত দাবিসমূহেরই প্রতিফলন। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে যে সমস্ত দাবি উত্থাপিত হয় তার সবটার স্বীকৃতি ভারতের সংবিধানে নেই। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের অধিকার সমূহ যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখনই উপেক্ষা করা হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। সংবিধান রচনার সময় যে সমস্ত অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয় তার অনেকগুলিই এই তেত্রিশ বছরে কেড়ে নেওয়া হয়। মাত্র তেত্রিশ বছরে ভারতের সংবিধানের ৪৫ বার সংশোধন করা হয়। এই ধরনের সংবিধানের ব্যাপক সংশোধন আর কোন দেশে হয় নি। আর অধিকাংশ সংশোধনই গেছে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের বিরুদ্ধে, নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত সংশোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়—কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

এবারে ভারতের জনগণ যখন চৌত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের বুঝতে হবে এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কেন্দ্রে সাত মাস হলো, ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে স্বৈরতন্ত্রের বিপদ ঘনীভূত হয়েছে। ৯টি নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা বাতিল, প্রেস কমিশন বাতিল, পি. ডি. আইন প্রবর্তন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারি ইত্যাদি ঘটনা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপজ্জনক ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ভি. এস. তারকুণ্ডে বলেছেনঃ বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার প্রাক্-মুহূর্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। আর এই সংকট যত বেশি বেশি করে বৃদ্ধি পাবে সরকারও তত বেশি বেশি করে স্বৈরতন্ত্রের পথে পা বাড়াবে। আজ দেশের জনগণের সামনে এই বিপদ নতুন করে দেখা দিয়েছে, এই বিপদ ক্রমবর্ধমান।

একদিকে যেমন স্বৈরতন্ত্রের বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ভারতের জনগণের সামনে আর একটি বিপদ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিপদ হলো বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপদ, ভারতকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত। প্রায় এক বছর হতে চললো আসামে "বিদেশী বিতাড়নে"র নামে চলছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এই তথাকথিত আন্দোলনের নামে সেখানে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন কয়েকশ' নরনারী। কয়েক কোটি টাকার বিষয় সম্পত্তি, ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বহু মানুষকে আসাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আসাম সমস্যা সমাধানের জন্য দু' দুবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও কার্যকর কিছুই হয় নি।

আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনে যে বিদেশী শক্তি অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রয়েছে তা আজ সুপ্রমাণিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগঠিত করে আজ দেশকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আজ জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে তুলতে উদ্যত। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তারা আজ এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এদেরই চক্রান্তে ত্রিপুরায় নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আজ স্বাধীনতা দিবসে দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষকে এই ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির স্বপক্ষে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করে তুলতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর পরে একদিকে যেমন স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে দেশের সামনে আর একটি বিকল্প চিত্রও রয়েছে। সেই চিত্র হলো বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার জনগণ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে সামনে রেখে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলেছেন। কেরালায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার। এই সমস্ত সরকার নিজ নিজ রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই সমস্ত সরকার স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশব্যাপী এই শক্তির প্রসার ঘটাতে হবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংকল্প হোকঃ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হবে; জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্ট

মাখন পাল

সম্পাদক, আর. এস. পি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারতের ৬৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২০ কোটি মানুষকে 'ফালতু' বলে ঘোষণা করা হয়েছে; ইংরেজী ভাষায় বলা হয় —'Redundant'। এরা কোথায় থাকে, কী খায় এবং কোথায় যায় তার খবর রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কেউই রাখেন না, অথবা খবর রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। সারা ভারতের হিসাবে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন মানুষ আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ থেকে ৭২ জন কর্মক্ষম মানুষ বেকারির জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে; এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই শতকরা ৭২ থেকে ৭৩ জন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। সরকারী মতে চার জনের পরিবার যদি গড়ে মাসে ১০০ টাকা আয় করে, তবে তাকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার উপরের স্তরে—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হল তার মধ্যে এই খণ্ডিত ভারতের অবস্থার এটাই হল হাল-ফিল চিত্র। এই হিসাব কিন্তু কোনও মার্কসবাদী বা বামপন্থী দলের সূত্রে প্রাপ্ত নয়। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব। আবার এই চিত্রও ঠিক আজকের চিত্র নয়—দু-তিন বৎসর আগেকার চিত্র। অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, বিগত দু'তিন বছরে এই চিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অন্য কথা বাদ দিলেও গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ক্ষুদ্র চাষীর জমি-জমা যেভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাতে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা গণনার বাইরে চলে গিয়েছে—যাদের সারা বছরে ৬ থেকে ৮ মাস কোনও কাজই থাকে না। শহরাঞ্চলেও মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ক্ষুদে দোকানদার প্রভৃতি গরীব মানুষের যা-কিছু ধনসম্পত্তি সবই ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে গিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পাঁচশালা যোজনার পর যোজনাপ্রণেতাদের পক্ষ থেকেই ফলশ্রুতি হিসেবে বলা হয়েছে —"ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব।" তারপর অনেকগুলি পুরো এবং আধা-পরিকল্পনার কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে ৭৫টি পরিবার, আরও সূক্ষ্ম হিসেবে ১৩টি পরিবার বর্তমান ভারতবর্ষের মালিক। টাকা-পয়সা, ধনসম্পত্তি —সব কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মালিকানা এরা পেয়ে গেছে। আপোষে-পাওয়া স্বাধীনতার এটাই হলো নীট ফল। পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত) ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশের ধনিক শ্রেণী যদি পরাধীনতার অবসানের পর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তবে যে এমন দুরবস্থাই জনজীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন সর্বহারার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড লেনিন। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে যখন ক্ষমতা অর্পিত হলো তখন তাদের অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারি নি। ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনজীবন যে বিপর্যস্ত হবে সে কথা আমরা তখনই ঘোষণা করেছিলাম এবং ভারতের জনগণের জীবনে এই স্বাধীনতা যে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করি নি। কিন্তু সেদিন ভারতের জনগণ নানাবিধ বিভ্রান্তির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকার ফলে আমাদের কণ্ঠ তাদের মনে সাড়া জাগাতে



পারে নি। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ধনবাদী শাসনের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ অবশ্য মেহনতী মানুষের সকল অংশের কাছ থেকেই উপরোক্ত ঘোষণার স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হবে না।

ধনবাদী শাসনে এমন অবস্থা যে ঘটবে তা তো অন্ততঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী কোনও মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা ছিল না। আজ তো বিংশ শতাব্দীর শেষ যামের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ধনবাদের সূর্য অস্তাচলের

পানে একেবারেই হেলে পড়েছে। কমরেড লেনিন এই যুগকে বলেছিলেন মুমূর্ষু ধনবাদের যুগ। সুতরাং ধনবাদী শাসনের রূপ কী দাঁড়াবে, বিশেষ করে অনুন্নত ধনবাদী দেশে, তা দুর্বোধ্য ছিল না। কারণ, ধনতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাবের কালে ফরাসী বিপ্লবের আমলে ধনিক শ্রেণীকেও আমরা দেখেছি। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে যারা ক্ষমতায় বসেছিল তারা সেদিন সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'সাম্যের' নামে আইনের চোখে সব সমান এই লম্বা-চওড়া উক্তি করলেও কার্যতঃ আইনের পুরোপুরি সুযোগ পেয়েছিল ধনিক শ্রেণী ও তার স্তাবকের দল। 'স্বাধীনতা'র স্লোগানকে রূপান্তরিত করল খেটে-খাওয়া মানুষকে শোষণের স্বাধীনতায়। আর 'মৈত্রী', তা তো সীমিত ছিল শোষক শ্রেণীর মধ্যে। আর আজ তো মুমূর্ষু ধনবাদের যুগ। এ যুগে যে মানুষ দুরবস্থার শেষ স্তরে পৌঁছুবে সে কথা ভাবতে বেশী বুদ্ধি খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণেই আমরা দেখেছি, যে অর্থ-নৈতিক বনিয়াদের উপর খেটে-খাওয়া মানুষের সুস্থ জীবন ও জীবিকার বনিয়াদ গড়ে ওঠে। যে মৌলিক অর্থনীতি গ্রহণের ফলে মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে ভারতের শাসক ধনিক শ্রেণী সে পথ গ্রহণ করল না। ভারতের অর্থনীতিকে দাঁড় করানো হল তিনটি খুঁটির উপর—(১) বিদেশী মূলধন আমদানি, (২) জনগণের উপর নানাবিধ পরোক্ষ করের বোঝা চাপানো, (৩) মুদ্রাস্ফীতি বা অঢেল কাগুজে নোট ছাপানো। বিদেশী মূলধন আমদানির ফলে ঋণের বোঝা এখন দশ-বারো হাজার কোটি টাকার উপরে উঠে গেছে। পরিশোধ করার মত ক্ষমতা ভারতের আর নেই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশটি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। পরোক্ষ করের ফলে প্রত্যেকটি জিনিষ, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আকাশ ফুঁড়ে উপরে উঠে গেছে। আর অঢেল মুদ্রা-স্ফীতির ফলে টাকার মূল্য সরকারী হিসেবে ২২ পয়সায় নেমে গেছে বললেও বস্তুতঃ দশ/বারো পয়সার বেশী নয়। মেহনতী মানুষের প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর অবস্থা। স্থিরী-কৃত আয়ের মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। কলঙ্কিত ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা মেহনতী মানুষকে আনাচে-আঘাটে মৃত্যুর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

অথচ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ভারতের সংগ্রামী জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না; আর খেটে-খাওয়া মানুষকেও এমন দুরবস্থায় পড়তে হতো না। দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা না করেও আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে জন-গণের স্বার্থে বিদেশী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের যুবশক্তি অকাতরে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন ডালি দিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষেরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বছরের পর বছর অবিচারে ও বিনা বিচারে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে, কত মা সন্তানহারা হয়েছে, স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। সর্বোপরি ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানকে কি আমরা ভুলতে পারি? আসমুদ্র হিমাচল হিংসা-অহিংসার গন্ডী অতিক্রম করে সেদিন "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো" স্লোগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিল। উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্ব পেলে ঐ গণ অভ্যুত্থানই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হত। ১৯৪৭ সালের কলঙ্কিত ১৫ই আগস্টে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। আগস্ট বিপ্লবের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতো শ্রমিক-কৃষক রাজ।

কিন্তু তা হল না। না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, সেদিন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আপোষ-বিরোধী নেতৃত্বের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নি। আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর গালভরা বুলি বিভিন্ন মহলকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। এমন কি, বামপন্থী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত কোনও কোনও দল ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণী সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের যে সাবধান বাণী তাকেও উপেক্ষা করেছিল। ফলে, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বৃটিশ শাসকদের প্রতি 'চরমপত্র' দানের যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা পরাজিত হল। নেতাজী বার বার যে-কথাটা বলেছিলেন—'শত্রুর বিপদ, আমাদের সুযোগ' (Enemy's difficulty, is our opportunity) সে-কথায় অনেকেই কর্ণপাত করলেন না। অথচ আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিন যদি যুদ্ধের সুযোগে জনগণকে প্রস্তুত করা হতো এবং সঠিক সময়ে সংগ্রাম শুরু করা যেত তবে ভারতের পক্ষে সত্যিকারের জনস্বার্থবাহী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন মোটেই অসম্ভব হতো না। যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ যে কী পরিমাণ ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হিসেবে সহজেই ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনগণ এমন অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, যে মহাত্মা গান্ধী নেতাজীর আপোষবিরোধী কর্মসূচীকে বিরোধিতা করে বলেছিলেন—এসময়ে আন্দোলন করা যাবে না। কারণ, আমি আন্দোলন আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু আন্দোলনকে থামাতে পারব না। (I can call a movement, but I cannot call it off), সেই মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট আন্দোলনের ডাক দিতে হলো। স্লোগান তুলতে হলোঃ ইংরেজ ভারত ছাড়ো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করা হলোঃ জমি হবে কিষাণের, কারখানা মজুরের, শান্তি সকলের তরে। কিন্তু স্লোগানেই তা সীমিত ছিল; নেতৃত্বের কোনও ব্যবস্থা করা হলো না, কোনও কর্মসূচী দেওয়া হলো না। ব্রিটিশ শাসন-শোষণে পর্যুদস্ত জনগণ সেই স্লোগানকে সম্বল করেই আসমুদ্র-হিমাচল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেতৃত্ব-বিহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই অস্তি-চিমুর-বালিয়া-সাতারা-বিহার, এমনকি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের (তৎকালীন অখণ্ড বাংলা প্রদেশ) মেদিনীপুরেও ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প সমান্তরাল সরকার (parallel government) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সারা ভারতেই জনগণের এই সরকার, তথা 'মজুর-কিষাণরাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল। সহস্র শহীদের আত্মদান তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের আমল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একটি সত্যে উপনীত হতে হয়, তা হলোঃ জনগণ নয়, জনগণের

সংগ্রামস্পৃহার অভাব নয়, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই বারবার গণ-অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

সুচতুর কংগ্রেসী ধনিক নেতৃত্বের অভিসন্ধি কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছে। তারা জানত যে, ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হলেও জনগণকে সঙ্গে পেতে হবে; আন্দোলনের পথ ধরে চলতে হবে। গান্ধীজী অবশ্যই এই সত্যটি স্বীকার করেই বলতেন : আমার আন্দোলন আপোষের জন্যই (My struggle is only for a compromise)। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ অথচ রূপায়ণের কোনও কর্মসূচী না দেওয়ার মধ্যেই তাঁর এই মনোভাব সুস্পষ্ট। আর সেজন্যই আন্দোলন চলাকালেই কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে তিনি ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপোষ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এই আপোষের প্রয়োজনে তিনি যে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবকে একদিন 'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস' (breath of life) বলে অভিহিত করেছিলেন সেই প্রস্তাবের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হলেন। এদিকে আন্দোলন ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠে চলেছে। জনগণের অভ্যুত্থান ছাড়াও বায়ুসেনা, পুলিশ বাহিনী, কারারক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে নৌ-বিদ্রোহ এবং আরও পরে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েই চলতে থাকল। একদিকে ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ভীত হয়ে উঠলেন, অপর দিকে অখণ্ড ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ—গণ-বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ফলে, আপোষের পথ সুগম হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্টে দেশ দ্বিখণ্ডনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূচনা এখানেই। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ভারতীয় ধনিক শ্রেণী অধিষ্ঠিত হলো।

তারপর ৩৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বজোড়া ধনবাদের সহগামী হিসেবে ভারতের ধনিক শ্রেণীও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তর লাভ করেছে। ভারতের ধনিক শ্রেণীর সব কয়টি গোষ্ঠী দ্বিধা-ত্রিধা-বহুধা বিচ্ছিন্ন। ধনিক শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় শাসন চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরবর্তী কালে সেই গোষ্ঠীর হাত থেকেও অপর গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটে বিদীর্ণ সেই গোষ্ঠীও শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল না। আজ আবার ফিরে এসেছে ইন্দিরা-নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই)-এর শাসন। সংকট কিন্তু বিন্দুমাত্র কমে নি। ধনিক শ্রেণী সংকটের সমস্ত বোঝা খেটে-খাওয়া মানুষের কাঁধে চাপিয়ে আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। স্বৈরতন্ত্রের পথে বিচরণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এবার আর ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জরুরী অবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। ইতিমধ্যেই ফ্যাসীবাদের জন্য গণ-ভিত্তি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে; এবং সে পথে ধনিক শ্রেণীর আত্মরক্ষা সম্ভব হবে যদি বামপন্থী শক্তি, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শক্তি, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে শ্রেণীসচেতন ও বিপ্লবসচেতন করার পদ্ধতি গ্রহণ না করে। অর্থনীতিবাদ এবং সংস্কারবাদের গড্ডালিকা প্রবাহে যদি বামপন্থী শক্তি গা ভাসিয়ে না দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংগ্রামের পথে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবেই এই মারাত্মক স্থিতির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবুর্গের সেই কথা—ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে (Fascism comes as a punishment for the failure of the proletariat in accomplishing the socialist revolution.)

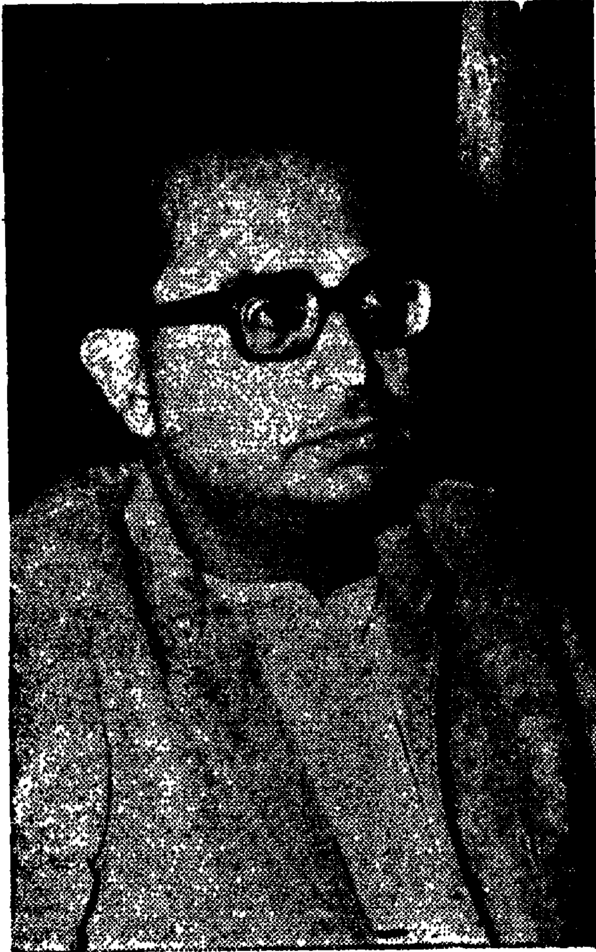
সারা দুনিয়ার ধনবাদী সংকটের তীব্রতা অনুধাবন করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, '৮০'-এর দশক বিপ্লবের দশক। কমরেড লেনিন এই যুগকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করে গেছেন। আমাদের সামনে আজ তত্ত্বগত ও বাস্তবসম্মত বিচারে সেই সত্যেরই পুনরাবির্ভাব ঘটতে চলেছে। কিন্তু তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয় (Unity of theory and practice) ছাড়া বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন—বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব হয় না। আরও বলেছেন—রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব হয় না। কিন্তু ধনবাদী শাসনে পর্যুদস্ত ভারতের এই খেটে-খাওয়া জনগণকে সচেতন করবে কে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা অর্থনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করতে হয় বাইরে থেকে। সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে আদর্শানুরাগী, অনুভূতি প্রবণ সচেতন যুবশক্তি।

ভারতের যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য সেই কারণেই অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশকে প্লাবিত করে যাতে যুবশক্তি বিপ্লবের কথা চিন্তার সুযোগ না পায়, অপসংস্কৃতির পঙ্কিল আবর্তে তারা নিমজ্জিত হয়ে যায়; এবং খেটে-খাওয়া জনগণের মধ্যে 'বিপ্লবের বীজাণু অনুপ্রবিষ্ট করার' (inject the bacillii of revolution among the masses) মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়। অথচ সময় এবং সুযোগ এসে গেছে। শত্রুর বিপদের সুযোগ গ্রহণের শুভলগ্ন উপস্থিত। ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নবজাতকের প্রাণচাঞ্চল্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় ধনিক শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি তাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি যদি শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে হাতিয়ার করে বিপ্লবের পথ ধরে এগিয়ে চলার দুঃসাহস দেখাতে পারে তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন হবে। সারা ভারতের বিপ্লবের সূচনা হবে এই অঞ্চল থেকেই। এবং দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ধনিক রাজের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন হবে। সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ধনিক শ্রেণীর এই চরম সংকটের সুযোগে নব ইতিহাস সৃষ্টির শুভ সম্ভাবনাও প্রতীক্ষা করছে। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি কি সেই স্বর্ণসম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে না?

আমার চোখে স্বাধীনতা

অশোক ঘোষ
সম্পাদক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ তেত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে। তেত্রিশ বছরের পূর্ণতা নিয়ে যে রাষ্ট্র কাঠামো ভারত নামক রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে—"স্বাধীনতা" শব্দের মূল্যায়ন, তার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিক্ষেপ, তার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ সবকিছুর প্রেক্ষিতেই আমাকে বিচার করতে হবে। সেই বিচার অবশ্যই হবে আমার দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে দৃষ্টিকোণ



স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ধ্যান ধারণার উপর নির্ভরশীল।

তাই আমার চোখে ভারতের স্বাধীনতাকে বিচার করতে গেলেই তার নিয়ামক মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে—'স্বাধীনতা' শব্দটি আমার কাছে কিসের দ্যোতক, কোন্ অর্থ সে বহন করে। "স্বাধীনতা" শব্দটিই এমন ব্যাপক এবং এত অর্থপ্রযুক্ত যে তার অর্থ যুগে যুগে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভিন্ন অর্থকে বহন করে।

'স্বাধীনতা' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা বা কেতাবী বিশ্লেষণ আমার কাছে এই প্রসঙ্গে তাই নিয়ামক মাপকাঠি নয়। আমি এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদত্ত সংজ্ঞাকে অভ্রান্ত বলে মনে করে তাকেই আমার বিচারের মাপকাঠি করে নিয়েছি শুধুমাত্র এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই নয় আমার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনেও বটে।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদের অবস্থিতিকালে যখন দেশবাসী ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়েই স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মুক্তি সংগ্রামের নায়করা, বিশেষ করে মহাত্মা-গান্ধী সমেত দক্ষিণপন্থী নেতারা কেউই রাখেন নি। রাখতে পারতেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁরা যে শ্রেণীর স্বার্থে ভারতীয় জনগণের ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণাকে কাজে লাগিয়ে শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছিলেন, স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা তাঁদের ভাণ্ডারে ছিল, সেই ব্যাখ্যা তাঁদের সেই পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিত। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা কুহেলীভরা মানসিকতা জনগণের মনকে ছেয়ে থাকুক তাই তাঁরা চেয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই যত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, দক্ষিণপন্থীদের আপোষমুখী চরিত্র তত বেশী প্রকট হয়েছে এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে বামপন্থীদের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য সংঘাত। সেই সংঘাতবহুল ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তে বামপন্থা ও বামপন্থী ঐক্যের পতাকাকে যিনি দক্ষিণপন্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিলেন সেই মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ভারতীয় জনগণের সামনে স্বাধীনতার স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন—"যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে, তাহারা ভ্রান্ত।" তিনি আরও বললেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি—সকলের জন্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ এবং সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে।"

স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখেই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক দলিলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সামগ্রিক পূর্ণতাকে স্বাধীনোত্তর ভারতের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

জাতির দুর্ভাগ্য যে নেতাজী যে বামপন্থী পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন—তা

গৌরব অর্জন করতে পারল না। ফলে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে গেল, সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকানা পেল আপোষ ও চুক্তির মাধ্যমে।

আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলেই আমাদের শুরু করতে হবেই সেই '৪৭ সাল থেকে, কারণ আজ ভারতে যা কিছু বিকশিত হয়েছে যা কিছু পরিণতি লাভ করেছে বা করছে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্তে। সেই '৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা খাওয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ভারতীয় জনতার সামনে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকেই স্বাধীনতার মুকুট পরিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হোল যাতে সাধারণ জনগণ তো মোহগ্রস্ত হলেনই, মোহগ্রস্ত হলেন তখনকার বামপন্থী দলগুলিও। ফরওয়ার্ড ব্লক সেদিন নেতাজীর মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিল ঘটনাপ্রবাহকে, ঘোষণা করেছিল তার তীব্র প্রতিবাদ—'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।' ফরওয়ার্ড ব্লকের সামনে জ্বল জ্বল করছে নেতাজীর সেই মহাবাণী—স্বাধীনতা মানে সাম্য, স্বাধীনতা মানে "All power to the Indian people". তাই যে ক্ষমতা হস্তান্তর ভারতের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া হাতে সঁপে দেওয়ার বন্দোবস্ত মাত্র, যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরিবর্তে একটি শ্রেণীর হাতে শোষণের অবাধ অধিকারকে তুলে দেয়—তাকে যত উচ্চকণ্ঠেই স্বাধীনতা নামকরণ করা হোক না কেন, ফরওয়ার্ড ব্লক তাকে স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে পারে নি।

তা ছাড়াও আর একটি সর্বনাশের বীজ সেদিন রোপণ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা। সেটি হোল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু পুরাতন এবং ঘৃণিত কৌশল 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের যুগে ইংরেজ বহুবার বহু রকমে তার এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে চেয়েছে বহু জাতি এবং বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে। কিন্তু ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আকুতি এবং সংগ্রামের চেতনা বার বার তাকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু '৪৭ সালে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে শুধু মেনেই নেওয়া হোল না, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোল, আবাহন জানানো হোল তার অনিবার্য পরিণতিকে দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সাড়ম্বর প্রচার এবং সরকারী জৌলুস আর আলোর ঝলকানিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সেই প্রতিবাদ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মোর্চায় সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে সেই প্রতিবাদ চিহ্নিত হয়ে আছে প্রতিদিন তার সত্যতা আরও গভীর হয়ে ফুটে উঠছে।

গত তেত্রিশ বছরের তথাকথিত এই স্বাধীনতায় জনগণ কি পেয়েছে? কি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতি হয়েছে এই ভারত রাষ্ট্রে?

তেত্রিশ বছরে একেবারেই কিছুই হয় নি যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। তেত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি লিখিত সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বর্ণাঢ্য প্রথা, দেশে একটি বা দুটি নয় পাঁচটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বহু নতুন কারখানা-শিল্প এবং শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। আর গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যা আগের অনেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরে, remould করেছে। ফলে ভারত আজ একটি উন্নতিশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবেই গড়ে ওঠে নি, ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশ আজ একচেটিয়া স্তরে উন্নীত হয়েছে এই তিন দশকে।

বুর্জোয়া অর্থনীতির এই বিকাশের কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেণীস্বার্থে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নামে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে শিল্প মালিক এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধির কাজে। কাজেই এই তেত্রিশ বছরে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে, তার সিংহভাগ লাভ করেছে দেশের একচেটিয়া পরিবারগুলো। এই বুর্জোয়া অর্থনীতির দ্রুত ও অসম বিকাশ অনিবার্যভাবেই সংকট সৃষ্টি করে চলেছে এবং ক্রমশঃ সেই সংকটগুলো ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক ক্রমশঃ হিমালয়ের মাথা স্পর্শ করতে চলেছে অপর দিকে বেকার বাহিনীতে দেশ ছেয়ে গেছে, মূল্যবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান গতিকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না, মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশঃই বাড়ছে, টাকার প্রকৃত মূল্য দ্রুতগতিতে শূন্যের দিকে নেমে চলেছে। এগুলি হল গত তেত্রিশ বছরের বুর্জোয়া অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি। ধনবাদী সমাজব্যবস্থাকে অটুট রেখে এই সমস্যার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা যতদিন বলবৎ থাকবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অবস্থায় এই সংকটের গতি কম ছিল ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীই কিছুটা 'ছাড়' দিয়ে বৃদ্ধির হারকে সংযত করতে পারছিল। কিন্তু যতই বুর্জোয়া অর্থনীতি পরিণতির দিকে যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির গতিতে ত্বরণ বাড়ছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখার কোন চেক্ ভালব বুর্জোয়া অর্থনীতিতে নেই।

১৯৮০ সালে দাঁড়িয়ে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে সংকটের মোকাবিলা আজ আর বুর্জোয়া রাষ্ট্র করতে পারছে না। জনগণের ওপর এই সংকটের চাপানো বোঝা আজ তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী শঙ্কিত। জনগণের এই ব্যবস্থাকে ঘাড়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলার মানসিকতা যতই তীব্র হচ্ছে ততই শোষক শ্রেণীর ভয় বাড়ছে যে ঐ বিক্ষুব্ধ মানুষেরা যাতে শ্রেণী সংগ্রামের শিবিরে সংগঠিত হতে না পারে। তাদের এই ভয়, জনগণের সচেতনতা সম্পর্কে তাদের এই আতংক—আজকে শোষক শ্রেণীকে তার গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকার স্বস্তি দিচ্ছে। দমবন্ধ হওয়া মানুষের মতোই তারা ক্রমাগত সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত বিধিকে লঙ্ঘন করে চলেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর তার বহু প্রচারিত সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণকে ক্যামোফেজ করতে পারছে না, তার অসারতা ক্রমেই জনগণের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা নিজেরই সৃষ্ট সমস্যার ফ্র্যাঙ্কেনস্টিনের তাড়ায় পিছু হটতে হটতে প্রায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ফেলেছে। তাই তারা তাদের পুরনো গুরু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দেওয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি শেষ অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। '৪৭ সালে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং তার পরিণতি দেশভাগকে স্বীকৃতি দিয়ে যে ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আজ সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়]

স্বাধীনতার ৩৩ বছর

বিশ্বনাথ মুখার্জী

সম্পাদক, সি. পি. আই. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

এই ১৫ই আগষ্ট আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৩ বছর পূর্ণ হলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল তারা উচ্চশ্রেণীর লোক অথবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী। তাদের লক্ষ্য ছিল বৃটীশ শাসনকে হটিয়ে এদেশের উচ্চশ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা।



তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন এদেশে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল যার প্রভাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল তখন গণবিপ্লবের পথে একে নেতৃত্ব না দিয়ে তারা বরং নিন্দা করেছিলেন, পেছনে টেনে রেখেছিলেন যাতে মেহনতী মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে না যায়; আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিক্ষোভকে বৃটিশ শাসকদের ওপর চাপ হিসাবে ব্যবহারও করেছিলেন যাতে তারা আপোষের ভেতর দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

বৃটীশ শাসকরাও বুঝেছিল এদেশে তাদের শাসন আর রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং মন্দের ভাল হিসাবে এদেশের উচ্চ-শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাল্টা চাপ হিসাবে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও তারা বাধিয়ে দিতে পেরেছিল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ব্যবহার করে।

ফলে ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত যখন স্বাধীন হলো তখন দ্বিখণ্ডিতও হলো—ভারত এবং পাকিস্থান এই পরস্পর-বিরোধী দুই রাষ্ট্রে। পরে পাকিস্থানও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

বৃটিশ ভারতের বেশীর ভাগটাই থাকল স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে। আধুনিক শিল্পে এবং রাজনীতিতে এই অংশই ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এবং এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা এলো জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। তাই এই ৩৩ বছরে ভারত রাষ্ট্রে আধুনিক শিল্পের বেশ কিছুটা বিস্তার ঘটেছে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে ভারী শিল্পও বেশ কিছুটা গড়ে উঠেছে প্রধানত রাষ্ট্রায়াত্ব অংশে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বেশীরভাগ সমাজবাদী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে পেরেছেন, বেশীরভাগ সদ্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে মিলে জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীও গড়তে পেরেছেন।

সেই সঙ্গে যেহেতু তারা ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব তাই মুখে সমাজবাদের কথা বলেও কার্যতঃ পুঁজিবাদী পথেই তারা দেশকে রেখেছেন, পুঁজিবাদী বিকাশই তারা ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের মত বিশাল, জন-বহুল, দারিদ্র দেশে পুঁজিবাদী পথে দ্রুত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতেই পারে না এবং যেটুকু বিকাশ হয় তারও ফল প্রধানত ধনীরাই ভোগ করার সুযোগ পায়, অবাধ মুনাফাকারী বলে, ধনীরা আরও আরও স্ফীত হয়, একচেটিয়া পুঁজি বিপুল শক্তি পায় এবং অপর দিকে বেকারী বাড়ে, দারিদ্র্য বাড়ে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, অর্থসংকট গভীর এবং তীব্র হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়—গত ৩৩ বছরে এই হলো আমাদের দেশের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

শুধু অর্থসংকট তীব্র ও অসহ্য হয়ে উঠছে তাই নয়, অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দিয়েছে এবং বিক্ষুব্ধ

জনগণকে দমন করার প্রয়োজনে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও সংকুচিত করছে বারে বারে, স্বৈরাচারী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে।

সেই সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনও ঘটছে দ্রুত গতিতে—ঘুষ দুর্নীতি সীমাহীন হচ্ছে, চুরি ডাকাতি রাহাজানি, সমাজের দুর্বল অংশের ওপর নৃশংস অত্যাচার, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাপে দেশ ভরে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বহু ভাষাভাষী বহু জাতি ও উপজাতির বাসভূমি এই ভারতে স্বায়ত্বশাসন ও উন্নয়নের ন্যায়সঙ্গত দাবির পাশাপাশি সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী, বিভেদকামী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, উত্তর-পূর্ব ভারতে তা বীভৎস আকার ধারণ করেছে এবং সারা ভারতেই তা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তেত্রিশ বছরের বুর্জোয়া শাসনে সত্যই আজ ভারত সর্বাঙ্গীণ সংকটাপন্ন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই ভয়ঙ্কর সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বুর্জোয়া শ্রেণীর একচেটিয়া শাসনের অবসান করা, জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পুঁজিবাদী পথ থেকে দেশকে সরিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া।

ইতিহাসের এই জরুরী আহ্বানে সাড়া দেওয়াই আজ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক, প্রগতিবাদী মানুষের পবিত্র কর্তব্য।

আমার চোখে স্বাধীনতা : ৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অন্তিম সংকট মুহূর্তে শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার শেষ অস্ত্র হিসেবে তাঁর উত্তরসূরীরা সেই দ্বিজাতি-তত্ত্বের নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সারা দেশটাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে। সেদিন তাদের পাশে এই কাজে সাহায্যকারীরা ছিল এটলী-মাউণ্টব্যাটেনের দল, আজ আবার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীরা। উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে আজ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করতে চাইছে, নিজেদের টিকে থাকার শেষ কৌশল হিসেবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে।

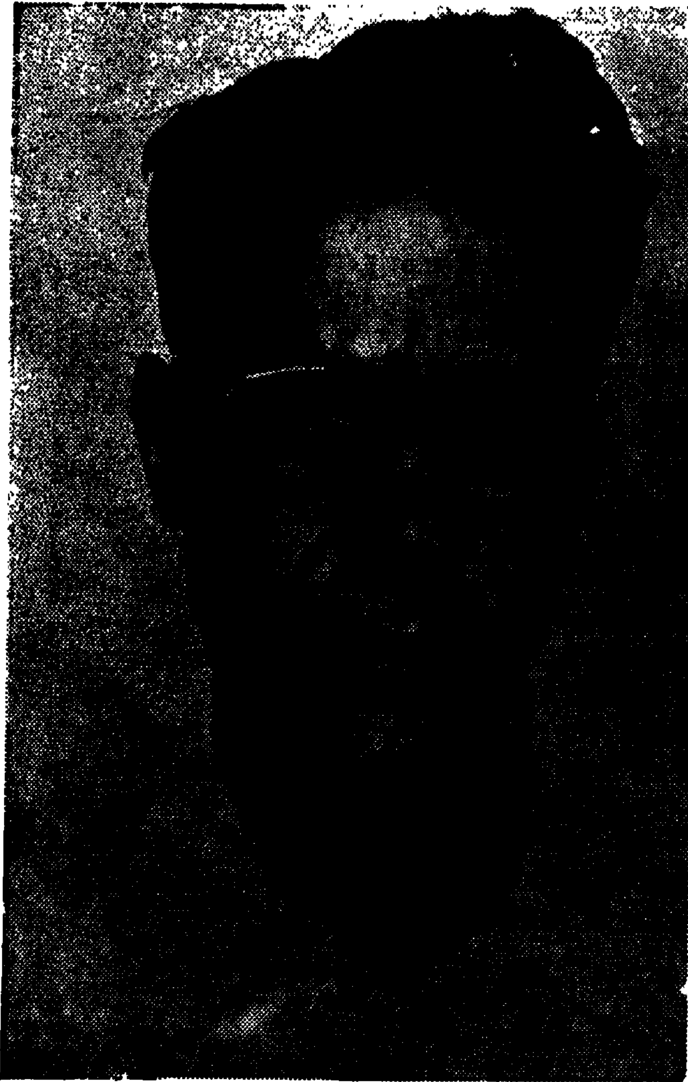
কিন্তু এই সংকট, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে– বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রসারিত করা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারানো—এ সবই তো স্বাভাবিক-বুর্জোয়া অর্থনীতিক বিকাশের অনিবার্য পরিণতি যা আমাদের তেত্রিশ বছরের তথাকথিত স্বাধীন দেশের বর্তমান চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবেই।

এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সহজ দাওয়াই নেই। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথে এই সমস্যা ও পরিণতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না কারণ এগুলি তো তারই সৃষ্টি। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হোল ভারতীয় জন-গণের নেতাজীর নির্দেশিত প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা। এই প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে কোন পথে? নেতাজী সেই পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপোষ করে বা সেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার রক্ষাকবচ সংসদীয় গণতন্ত্রকে অনুশীলন করে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শোষক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ফাঁদ থেকে জনগণকে রক্ষা করা। নেতাজীর নির্দেশিত পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের পথেই বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে নতুন সমাজব্যবস্থা আনতে পারে যে ব্যবস্থায় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্জিত হওয়া সম্ভব। তাই ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালায় যে বাম ঐক্যের বীজ উপ্ত হয়েছে তাকে প্রসারিত করতে হবে সারা ভারতে। প্রসারিত করতে হবে শুধু মাত্র নির্বাচনে নয়, সকল শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে। সুস্পষ্ট ইতিবাচক রণধ্বনি তুলতে হবে বর্তমানের শোষণভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে।

আমাদের স্বাধীনতা দিবস

গণেশ ঘোষ

১৯০ বছরের অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন এবং অমানুষিক শোষণে সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং ভারতের সমগ্র মানুষকে প্রায় একেবারে নিঃস্ব এবং রিক্ত করে ফেলবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর একান্ত কামনার এবং সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার "স্বাধীনতা দিবস" এসে দেখা দিল। এই অতি-প্রত্যাশিত দিনটিকেই



স্বাগত জানাবার প্রত্যাশায় প্রায় ১৯০ বছর ধরে (১৭৬৩-১৯৪৬) ভারতের বহু কোটি মানুষ নিজেদের বুকের রক্ত নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে এবং আরও বহু কোটি মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন হাসি মুখে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু এই দিনটিকে, ১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতার দিবস বলে দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা সত্ত্বেও এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই দিনটি "স্বাধীনতা দিবস" বলে প্রতিপালিত হোলেও বাস্তব পরিস্থিতির সতর্ক বিবেচনায় একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই দিনটিতেও ভারতের জনসাধারণ যথার্থভাবে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। ১৫ই আগষ্টের পরে, আরও প্রায় তিন বৎসর কাল শেষে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অপসারিত হয় এবং ভারতে সার্ব্বজনীনভাবে ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ঐ দিনে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং ওই দিনেই ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সগৌরবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং ভারতের জনগণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের ধনিক জমিদার কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধিগণের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপোষের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণের অবস্থার পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি; বরং এ কথা বলাই বাস্তব এবং সঠিক হবে যে বহু ক্ষেত্রেই পূর্বাপেক্ষা জনগণের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের তেত্রিশ বছর পরেও তাই আজকালও অপরিসীম দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত এবং সীমাহীন শোষণে আরও নিঃস্ব জনসাধারণের মুখ থেকে ট্রামে বাসে, পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায় বহু সময়েই এই হতাশাজনক অবস্থার অভিব্যক্তি এই বলে শোনা যায় যে, "এর চাইতে ইংরেজের আমল ভাল ছিল।" জাতীয় মর্যাদার পক্ষে এর চাইতে লজ্জা ও অবমাননকর আর কি হোতে পারে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এ সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বর্তমানের শাসকগণের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করবার এবং জনগণের দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য দূর করবার জন্য কোনরূপ বাস্তব এবং কার্যকর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না। বরং সঠিকভাবে এবং সত্য কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে জাতীয় নেতৃত্ব সর্বতোভাবে এবং সর্ব প্রচেষ্টায় দেশের কায়েমী স্বার্থের সর্ব প্রকারের স্বার্থরক্ষা করবার এবং দাবীপূরণ করবার ব্যবস্থাই করছেন এবং তার জন্য দেশের ব্যাপকতম জনগণের সর্ব প্রকারের স্বার্থ এমন কি তাদের বেঁচে থাকবার জন্য সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রয়োজনও অতি নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা ও বর্জন করছেন। দেশের ধনিক শ্রেণীর শোষণের মাত্রা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে; ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে স্বাধীনতার পর গত ৩৩ বছরেই ভারতের প্রায় সব সম্পদের মালিকানা এবং কর্তৃত্ব

গিয়ে জমা হয়েছে দেশের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতে এবং দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ অর্থাৎ ৬৬ কোটির মধ্যে সাড়ে পয়তাল্লিশ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে গিয়ে পড়েছে; তাদের মাসে গড়ে ২০ টাকা খরচ করবার সামর্থও নেই; অর্থাৎ তারা তিন দিনের ছয় বেলার মধ্যে একবারও পেটভরে খেতে পারে না। এই পরিস্থিতি কি ভীষণ ও ভয়াবহ তা যাঁরা শহর অঞ্চলে বাস করেন তাঁদের পক্ষে বোঝা কঠিন; গ্রামে গিয়ে কিছুটা ঘুরলেই এই দারিদ্র্যের ভয়াবহ অবস্থা কিছুটা বোঝা যাবে।

ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব অর্থাৎ ভারতের বর্তমান শাসকেরা যে নীতি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজ ৩৩ বছর দেশ শাসন করে চলেছেন তার ফলে একদিকে যেমন সীমাহীন দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে অপর দিকে অবার ঠিক তেমনিভাবেই অতি স্বল্প সংখ্যক বিত্তবানের হাতে (ধনিকের) সীমাহীন ধনসম্পদের পাহাড় জমা হচ্ছে; অর্থাৎ অতি ধনিকের সংখ্যা কমে কমে তৈরী হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি। পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতেই ভারতের প্রায় সমস্ত ধনসম্পদের মালিকানা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বোধ হয় এই সংখ্যা আরও কমে গিয়েছে এবং ভারতের মাত্র ২৫টি পরিবারই এখন ভারতের সব সম্পদের মালিক। এর সমস্ত কৃতিত্বই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীরই প্রাপ্য।

ভারতের এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ভারতে পুঁজি নিয়োগ করে দেশের ভিতর কলকারখানা গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক; অনেক অধিক মুনাফা অর্জনের লোভে এই এক-চেটিয়া পুঁজিপতিরা পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অতি অনগ্রসর দেশে পুঁজি রপ্তানী ক'রে সেই সব দেশে কলকারখানা গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছে; অথচ ভারতে এই পুঁজি নিযুক্ত হলে দেশের ভিতরেই অনেক কলকারখানা গ'ড়ে উঠত, দেশের লক্ষ লক্ষ অনশনগ্রস্ত বেকার মানুষ অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেত এবং সেই সঙ্গে অন্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরতাও বহু পরিমানে হ্রাস পেত।

ভারতের কায়েমীস্বার্থের নির্দেশে দেশের শাসকেরা যে নীতি নিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন তার ফলে স্বাধীনতা লাভের ৩৩ বছর পরেও দেশের বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি; এর ভেতর কিন্তু গ্রামের বেকারদের ধরা হয় নি। কারণ গ্রাম অঞ্চলে বেকারদের নাম লেখাবার কোন ব্যবস্থা আজ অবধি আমাদের দেশে হয় নি। সুতরাং এই অবস্থায় গ্রামের বেকারদের সম্ভাব্য সংখ্যা যোগ করলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি। এই বেকারেরা যে নিজেদের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে কিভাবে বেঁচে আছে তা' কল্পনা করাও কঠিন।

এখানে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন নতুবা আমাদের "স্বাধীনতা দিবসের" মাহাত্ম্যই বহু পরিমাণে হ্রাস করা হবে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) একমাত্র পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) থেকেই এক কোটিরও অধিক মানুষ নিরুপায় হয়ে এবং প্রাণ রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে বাড়ী ঘর সবকিছু ফেলে রেখে প্রায় এক বস্ত্রে এবং প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমাদের ভারতবর্ষে অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ মানুষ আজও ভারত ইউনিয়নে যথাযোগ্য পুনর্বাসন পায় নি; বহু সহস্র মানুষ আজও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে সরকারের এবং জনসাধারণের দয়া এবং ভিক্ষার উপর নির্ভর করেই কোন রকমে জীবনধারণ করে আছে। এই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে কয়েকটি স্থানে এই সকল পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু নরনারী যেভাবে বেঁচে আছে তাকে নিশ্চয়ই মানুষের মত বলা যায় না। অথচ দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে বহু লক্ষ অমুসলমান পাঞ্জাবের অধিবাসী ভারত ইউনিয়নে চলে এসেছে তারা প্রত্যেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। তারা কেউই ভারত ইউনিয়নে এসে ত্রাণ শিবিরে বাস করছে না কিম্বা পথের ভিখারীও হয় নি। দিল্লীর আশেপাশের অঞ্চলে কিছুটা চোখ মেলে ঘুরলেই এই কথার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পূর্ব বাংলার এই কয়েক লক্ষ হতভাগ্য উদ্বাস্তু আমাদের "স্বাধীনতা দিবসেরই" নিষ্করুণ অবদান। আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে এরা কিভাবে দেখে, আমাদের "স্বাধীনতা দিবসে" এদের কি মনে হয় আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দুঃখ এবং ক্ষোভের কথা, এই বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের শাসকেরা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করে বলেন যে দেশের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে, এখন আর কোন উদ্বাস্তু সমস্যা নাই। যাদের এখনও পুনর্বাসন হয় নি তাদের যথাযোগ্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে আমাদের শাসকগণের অনিচ্ছা কেন সে রহস্য আজও জানা যায় নি।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ নিঃসন্দেহে (রাজনৈতিক) স্বাধীনতা লাভ করেছে; কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষ ত্যাগের ফলে আমাদের যে স্বাধীনতা এসেছে তার মাঙ্গলিক অবদানটুকু ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ জন মানুষের ভাগ্যে আসে নি। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের ১৯০ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের এবং প্রাণদানের বিনিময়ে শেষ অবধি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ভারতের জমিদার ও ধনিকেরাই। তারাই এবং তাদের নির্দেশে তাদের "গোমস্তারাই" ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসকগণের পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করে তাদের পন্থায় এবং তাদের ধরনেই ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণকে নির্মম ও নিষ্করুণ-ভাবে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। তাদের ধারণা এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস ইংরেজদের শূন্য আসনে বসবার একমাত্র অধিকারী তারাই এবং তাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই ভারতের জনগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে সকলকে মেনে নিতে হবে।

তাদের শাসন ও অমানুষিক শোষণের ফলে যাতে জন-সাধারণের মধ্যে সহজে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমা হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে (শাসকগণের) প্রায় প্রথম থেকেই চেষ্টা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রাখবার জন্য। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের আবাদী অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে ভারতের লক্ষ্য হল সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা; অর্থাৎ জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা হল যে শাসকগণের চেষ্টা হবে ঠিক সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা না হলেও সেই ধরনেরই সমাজ গঠন

করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঐ শাসননীতির ফলে দেশের দরিদ্রেরা আরও অধিক দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে এবং মুষ্টিমেয় ধনিকের ধনসম্পদ সীমাহীন পরিমাণে বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হতে আরম্ভ হল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে জনগণকে নূতন করে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে শাসকগণের পক্ষ থেকে বলা হল, তখন বোধহয় ১৯৭১ সাল, যে এবার শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "গরিবী হঠানো" অর্থাৎ দেশ থেকে একেবারে দারিদ্র্য দূর করা। এবং এই ঘোষণারই কিছু বছর পরে বাস্তবে দেখা গেল ওই শাসন নীতির ফলে দেশে দরিদ্র্য ও নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৯ ভাগ এবং দেশের মাত্র ২৫টি ধনী পরিবারের হাতেই দেশের সমস্ত সম্পদের কর্তৃত্ব এবং মালিকানা গিয়ে জমা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যা' বলা হয়েছে তা হল দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, স্বাধীনতার পরিণতি। এর ভেতর থেকে ভবিষ্যতের আশার আলো খুঁজে পাওয়া অথবা দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। এই গভীর দুর্দশাময় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে তাই অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করেন, এই স্বাধীনতার জন্যই কি অগণিত শহীদগণ নিঃশব্দে প্রাণ উৎসর্গ করে গিয়েছেন? এই প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর আছে, না, নিশ্চয়ই তা' নয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন প্রমুখ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদগণ অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেন নি, কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁরা কেউই চান নি যে তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আসবে সেই পরিস্থিতিতে দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে থাকবে এবং মাত্র ২৫টি পরিবার সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। তাঁদের কামনা ছিল ইংরেজ দস্যুরা বিতাড়িত হবার পর দেশের মানুষ অন্ততঃ দুইবেলা দুইমুঠো পেটভরে খেতে পাবে। (ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ কি সম্ভব?)

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখলে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, ভারতের মুক্তিকামী (শোষণ থেকে, অত্যাচার থেকে মুক্তিকামী) জনগণের হতাশা বোধ করবার কিছু নেই; ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাহত হবার যথার্থ কোন কারণ নেই। পৃথিবীর বহু দেশেই প্রায় এইরূপ অবস্থাই ঘটেছে।

ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, প্রধানতঃ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, জনগণের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব যে সব দেশে ধনিক শ্রেণীর হাতে ছিল, এবং প্রায় সব দেশেই তাই ছিল, সেই সব দেশেই সুনিশ্চিতভাবে গণসংগ্রামের জয়লাভের পর সেই জয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ধনিকেরাই; ফলে দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণ পূর্বের ন্যায়ই শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত অবস্থায় থেকে গিয়েছে। ফরাসী দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যে ঐতিহাসিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সংগ্রামে অগণিত সাধারণ মানুষের প্রাণদানের বিনিময়ে সফল বিপ্লবের পর যে ব্যবস্থা সৃষ্টি হল সেই ব্যবস্থায় শতকরা ৮০ জন মানুষই পূর্বেও যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালীতেও মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ইটালীর ব্যাপকতম জনগণ পূর্বের ন্যায়ই শোষিত নির্যাতিত রয়ে গিয়েছে এবং আরও বহু দেশেই।

সুতরাং আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর যা' ঘটেছে তা' অস্বাভাবিক কিম্বা অদ্ভুত কিছুই নয়। এবং যা' ঘটেছে তাই-ই শেষ কথা নয় অথবা চিরস্থায়ী কিছুই নয়। যা' ঘটেছে তা' অতি স্বল্প সংখ্যক ধনিক জমিদারের অপসৃষ্টি। শেষকথা বলবে দেশের জনসাধারণ, ভারতের মুক্তিকামী নরনারী যাদের অন্তরের একান্ত কামনা ভারতে একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের দেশের জনসাধারণের এই আন্তরিক কামনার ভিতর অস্বাভাবিক অথবা অবাস্তব কিছুই নেই। রুশ দেশে যা সম্ভব হয়েছে, চীন দেশে যা সম্ভব হয়েছে ভারতের জনসাধারণের পক্ষে তা' সম্ভব হবে না মনে করবার কোন কারণই নেই। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রুশ এবং চীন দেশে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ওই উভয় দেশেই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ওই দুইটি দেশেরই অবস্থা ছিল ভারত অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর, অনেক অনুন্নত এবং অনেক পশ্চাৎ-অপসারিত।

ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে মুক্তিকামী জনগণের পক্ষে সত্য সত্যই হতাশ হবার কিছুই নেই। এক সময়ে ইংরেজরাও ভারতের জনমনে আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রচার করত যে ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি; তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না; তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত এক দিন ভারত থেকে দূরে হয়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

ভারতে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের ব্যাপকতম জনগণের প্রকৃত কামনা এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকলেই এই ব্যবস্থা আপনা থেকেই আসবে না, তার জন্য প্রয়োজন জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাই, দ্বিতীয় শর্ত হল এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকতম জনগণের নিরবচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় প্রচেষ্টা অর্থাৎ সংগ্রাম। এবং জনগণের এই প্রচেষ্টা যাতে সুসংহত হয় এবং সামরিক পদ্ধতিতে ও সুদৃঢ়ভাবে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় তার জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত জনগণ। সংগ্রামী জনগণ সংগঠিত না হলে তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট হয় না, সঙ্কল্প দৃঢ় হয় না, এবং তাদের সংগ্রাম সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায় না।

আমাদের "স্বাধীনতা দিবস" (১৫ই আগষ্ট) আমাদের গৌরবের দিন, আমাদের গর্বের দিন। এই দিনটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুগণের বিরুদ্ধে আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ সাফল্যের নিদর্শন।

কিন্তু এ তো আমাদের অতীত কালের ইতিহাস। আমাদের বর্তমানও আশু ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দেশ থেকে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চিরতরে নির্বাসিত করবার জন্য দেশব্যাপী গণমুক্তির সংগ্রাম সংগঠিত করা, গণমুক্তির সংগ্রাম আরম্ভ করা ও এই সংগ্রাম সফল করে তোলা।

তাই যারা গণমুক্তি প্রত্যাশী অর্থাৎ শোষণহীন সমাজ

[শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

আগষ্ট বিপ্লব ও আজ

সুকুমার দাস

ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লবের অর্ধলক্ষ শহীদের কথাই শুধু নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত জানা অজানা আরও অসংখ্য বিপ্লবীর কথা কোন প্রসঙ্গে স্মরণ করতে গেলেই আজকের দিনে কেন যেন বারবার মনের মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন প্রথমেই উঁকি মারে। কবিতার কয়েকটি ছত্রে অতি সহজেই যাকে প্রকাশ করা যায়।

"বীরের এ রক্ত স্রোত,
মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধূলায় হবে হারা ?"

মনের কোণে উঁকি মারে বোধ হয় এই জন্য যে, এরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য শাসক ও শোষক ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য কি দেশ স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর পরেও এতটুকু সিদ্ধ হয়েছে? এতে কোন সন্দেহই নেই যে, সেদিনের সেই দুঃসাহসী রক্তঝরা সংগ্রামের পেছনে ছিল তাঁদের দুটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা। প্রথম ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, পরে সেই স্বাধীন ভারতে সুন্দর এক শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও, শাসকের পরিবর্তন হলেও, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণের ব্যাপারটা আজও শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতেও যে তাঁদের ইপ্সীত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছোতে পারবো, তারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না, কারণ দেশের মানুষ আজও পিষ্ট হচ্ছে দুঃসহ দারিদ্র্যে, আর সেই পেষণ চলছে অবাধগতিতে এ দেশেরই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবারের নির্মম শোষণের যাঁতাকলে। এদের নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী এ সমাজ ব্যবস্থাই সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রকট করে দিচ্ছে সর্বগ্রাসী এক শোচনীয় অবক্ষয়ের।

আজ, একদিকে পুঁজিবাদের এই বহুমুখী শোষণ, অপর দিকে দেশের দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছে আর এক সর্বনাশা প্রবণতা, যে প্রবণতা বিচ্ছিন্নতাবাদের।

বিচ্ছিন্নতাবাদী এ অপপ্রয়াস আজ দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে ঐ সব বিপ্লবীরা সেদিন একমাত্র ভারতবাসী পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন-পণ করে দেশমুক্তির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন, খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সে সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আজ সেই খণ্ডিত ভারতও আবার বিচিত্র সব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঢেউয়ের আঘাতে আরও খণ্ড বিখণ্ড হবার মুখোমুখী। এ এক সাংঘাতিক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতিতেই আজ স্মরণ করতে হচ্ছে আগষ্ট বিপ্লবকে —যে বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেই বিপ্লবের কাহিনীকে আজ আবার তুলে ধরতে হবে দেশের বর্তমান যুব সমাজের কাছে। তুলে ধরতে হবে শুধু এই জন্য যে, কিছু কায়েমী স্বার্থবাদীর দল আর কিছু বিদেশী চক্রের কারসাজিতে আজ দেশেরই কিছুসংখ্যক যুব-ছাত্র এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াল থেকে এই সব চক্রের উস্কানী এরা ধরতেও পারছে না। এরা বুঝতেই পারছে না যে ওদের অঞ্চলের অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য, ওদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষাকে মূলধন করে অদৃশ্য এক অশুভ শক্তি তাদের নিজেদের আরও বড় এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আন্দোলনকারীদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ তো হবেই না, এবং সর্বনাশ হবে সারা দেশের। যদি তাই হয়, তবে তো আগষ্ট বিপ্লবের শহীদদেরই শুধু নয়, দেশের জন্য অসংখ্য বিপ্লবীর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভারতের যুব সমাজের কাছে সত্যিই তা হবে চরম লজ্জার! আগষ্ট বিপ্লব সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে এ কথাটা মনে হলো বলেই আজকের যুব সমাজকে একটু সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। আগষ্ট বিপ্লব সেদিন দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাদের মূল বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আর বিদেশী চক্রের চক্রান্তে আজকের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস সেই ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

সেদিনের আগষ্ট বিপ্লবের মূলেও ছিল অত্যাচার, বৈষম্য ও উপেক্ষা। বহুদিন ধরে ইংরেজ সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা ও অত্যাচার ভারতবাসীর অন্তরে পুঞ্জীভূত করেছিল প্রবল অসন্তোষ। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে নানা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। এবং ইংরেজ সরকারও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে সে সব কর্ম প্রচেষ্টাকে দমন করে স্বীয় শাসনকে নিরঙ্কুশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এত দমন পীড়নেও ঐ সব প্রচেষ্টা একেবারে থেমে থাকেনি কোনদিনই, সে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বল প্রয়োগে একদিকে তা কখনও সাময়িক স্তিমিত হলেও, অন্যদিকে সে বিদ্রোহের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে প্রায় তখনই। অবশ্য কংগ্রেস এসব বৈপ্লবিক প্রয়াসকে কোনদিন কার্যকরী বলে মনে করেননি। বরং তাঁরা একে হঠকারী প্রচেষ্টা বলে দূরে সরিয়ে রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের এত অত্যাচার ও দমন পীড়নের পরও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংরেজ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায় বিচারের ওপরেই ছিলেন অধিকতর আস্থাবান। তাঁরা মনে করতেন সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে আবেদন নিবেদনের নীতিই হবে বেশী কার্যকরী। তাই তাঁরা অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে বারবার হাজির হতেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কিছুদিন আগে থেকেই কংগ্রেসের এ ক্লীব নীতির বিরুদ্ধে তাঁদেরই একাংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছিলেন। কিন্তু

কংগ্রেসের অপোষ প্রিয় নরম পন্থীরা এদের ঐ দাবীকে বারবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ওরা এদের চরমপন্থী বলে আখ্যাত করে তাঁদের দেশের যুবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চরম-পন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে তখন সম্মুখ সারিতে এগিয়ে এসেছেন বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়; অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো দেশ নেতারা। চরমপন্থীদের ইচ্ছাকে তখন রোখে সাধ্য কার? তাঁরা দেশের যুবশক্তিকে বোঝালেন, "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" এবং তা' আদায় করে নিতে হবে শত্রুকে চরম আঘাত হেনে। অপরাপর দেশের মুক্তি আন্দোলন এই শিক্ষাই দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির প্রভুত্ব থেকে কোন দেশই আবেদন নিবেদনে রেহাই পায় নি। বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ। এই প্রেরণায় জেগে উঠলো মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব। সেখানকার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠলো নানা বৈপ্লবিক সংস্থা। এদের কর্মতৎপরতায় ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার কিন্তু এদের চরম শাস্তি দিয়ে স্তব্ধ করার কোন কসুরই করলো না। দিকে দিকে বিপ্লবী কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মৃত্যুর মহান জয়গান। সেই জয়গানেই সুর মেলালেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সূর্য সেন, বিনয় বাদল ও দীনেশের মত আরোও অসংখ্য নির্ভীক বিপ্লবীদল। আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এদেরও পরে এবং এদেরই মহান আত্মাহুতির মহান অনুপ্রেরণায়।

সেদিনটি ছিল ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট। যেদিন সারা দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করবার জন্য শুরু হয়েছিল বিপ্লবীদের এক মরণপণ সংগ্রাম। আগের দিন, অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয় "ইংরেজকে এখনই ভারত ছাড়তে হবে", এবং এই দাবীতেই সারা দেশে আন্দোলন শুরু করা হবে। এ প্রস্তাব পাশের প্রায় সংগে সংগেই বোম্বাইতে উপস্থিত সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করলো এবং সে কাজটি তারা করলো অনায়াসেই। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশকরেও কোন নেতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনে আত্মগোপন করে থাকার কোন চেষ্টাই করলেন না। গ্রেপ্তারের পরে তাঁরা স্থান পেলেন কোন প্রাসাদে, না হয় কোন দুর্গে।

কিন্তু দেশের যুবশক্তি নেতৃত্বের জন্য এক মুহূর্তও বসে রইলো না। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংবাদ এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশজুড়ে তাঁরা শুরু করলেন প্রচন্ড আন্দোলন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" এবং "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এই ধ্বনি তুলে তাঁরা ইংরেজ শাসনের চিহ্নগুলিকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চাইলেন। আন্দোলনের প্রাবল্যে প্রথমে পিছু হটলো ইংরেজ সরকার কিন্তু অচিরেই নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে তারা বিপ্লবীদের ওপর চালালো অমানুষিক দমন পীড়ন। ইংরেজ সরকার বুঝেছিল যে, এ আন্দোলন যে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলতে না পারলে ভারতে তাদের শাসনের দিন অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। তাই প্রচন্ড পশুশক্তি নিয়ে, পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে তারা এ আন্দোলন দমনে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা মনে করেছিল, বেয়নেট ও গুলিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আন্দোলনকারীরা দমে যাবে। কিন্তু ওদের এ ধারণা করাটাই হলো মস্ত বড়ো ভুল। বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে যাওয়ার ফল হলো উল্টো। মার খেয়ে বিদ্রোহীরা গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসার গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে মারমুখী ও সহিংস হয়ে উঠলেন। শুরু হলো সহিংস প্রত্যাঘাত, মারের বদলে মার। আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠলো তাদের সহিংস কর্ম-প্রচেষ্টায়। তাঁরা উপড়ে ফেললেন রেল লাইন আর টেলিফোনের খুঁটি। কেটে দিলেন টেলিফোনের তার, ভেঙ্গে ফেললেন সড়ক ও পুল। জোর করে দখল করতে লাগলেন একের পর এক থানা। নেতৃত্বহীন অসহযোগ আন্দোলন তখন আর নিছক আন্দোলন নয়, তা রূপান্তরিত হয়ে গেল এক রক্তাক্ত বিপ্লবে। ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের প্রতি চালালো বেয়নেট, গুলি, এমনকি ওপর থেকে মেসিনগান দেগেও বোমা ফেলেও ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এরই ফলে নিহত হলেন শত শত বিপ্লবী। সিন্ধু প্রদেশের হিমু কালানি এ বিপ্লবে প্রথম শহীদ হয়ে দেশের বিপ্লবীদের আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করলেন।

দিল্লীতে ১১ই এবং ১২ই আগষ্ট চললো পুলিশের বারবার গুলি। এতে নিহত হলেন ছিয়াত্তর জন। একইভাবে নাম না জানা অসংখ্য শহীদের সাথে নিহত হলেন বিহারের উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং, সতীশ প্রসাদ ঝা, বাংলায় মাতঙ্গিনী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদ্যনাথ সেন এবং আসামে ভোগেশ্বরী, বালুরাম, কনকলতা ও মুকুন্দ। এ আন্দোলন তখন হয়ে উঠেছে দুর্বার। সকলেরই এক লক্ষ্য, চূর্ণ করো ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ। ইংরেজের রক্ত-চক্ষুকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে ভারতের নানা রাজ্যে গঠিত হলো স্বাধীন জাতীয় সরকার। মেদিনীপুরের তমলুক, উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা হলো যে স্বাধীন সরকারের শক্ত ঘাঁটি। বস্তুতঃপক্ষে এ কয়েকটি অঞ্চলে সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসন বলে কোন চিহ্নই ছিল না। সেখানে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিলো বিপ্লবী সংগঠন দ্বারা।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক আগষ্ট বিপ্লবে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এক বছর নয়, ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত তমলুকের ঐ স্বাধীন জাতীয় সরকার মাথা উঁচু করে ব্রিটিশ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিল। এই সময়ে ইংরেজ শাসকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না এর চৌহদ্দির মধ্যে কোন রকমে প্রবেশ করে। ঐ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে একদিন ঐ অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি তুলে এগিয়ে চললো মিছিল করে তমলুক থানা দখল করতে। ওদের ভয় দেখাতে পুলিশ প্রথমে চালালো কয়েক রাউন্ড গুলি। কিন্তু ফল এতে কিছুই হ'ল না। জনতা এগিয়ে চললো আরও তেজে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উপায় না দেখে এবার ডাকা হলো মিলিটারী। তারা এসেই ঐ মিছিলের ওপর চালালো বেপরোয়া গুলি। মিছিলের পুরোভাগে পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছিলেন রামচন্দ্র বেরা। গুলির আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঐভাবে পড়ে যেতে দেখে ঐ পতাকাটি তুলে নিতে এগিয়ে এলো

তেরো বছরের নির্ভীক বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। মৃত্যু তাকেও কোলে টেনে নিল সেই মুহূর্তেই। জনতা বুঝি একটু চঞ্চল হ'লো। কিন্তু ওদের বিভ্রান্ত হবার কোন সুযোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকাটিকে তখনই তুলে নিলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। মিছিল যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু বেশী এগোতে হ'ল না তাদের; নিমেষের মধ্যে মিলিটারীর একটা গুলি মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো মাতঙ্গিনী হাজরার। প্রাণহীন দেহ তাঁর লুটিয়ে পড়লো সেখানেই। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখলো বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী মরে গিয়েও শক্ত করে আগের মতোই তখনও ধরে রেখেছেন সেই পতাকাটিকে। গুলি তবুও থামলো না। ওখানেই নিহত হলেন পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা, তাছাড়া আরও একচল্লিশ জন। কিন্তু এতেও ভয়ে স্থান ত্যাগ করলো না জনতা। সারা রাত তাঁরা থানা ঘিরে বসে রইলেন। পরদিন সকালবেলা জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি হলো অনেকগুণ। এবার আর তাঁদের ঠেকান ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'লো না। ওঁরা দখল করে নিলেন থানা এবং আগুন লাগিয়ে দিলেন অত্যাচারী দারোগার বাড়ীতে। রক্তঝরা অসম সাহসিক এ ঘটনাটির জন্যই আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর সৃষ্টি করলো এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর সেখানকার বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী হাজরা ঐভাবে শহীদ হয়ে দেশবাসীর কাছে হয়ে রইলেন চির-নমস্য।

অতীতের বহু বিপ্লব প্রয়াসের মতো একদিন এ আগষ্ট বিপ্লবও দমিত হ'লো। কিন্তু তা একেবারেই ব্যর্থ হ'লো না। এ বিপ্লবে অর্ধলক্ষ মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণ করে দেশের মানুষের মনে জাগিয়ে গেল এক দুরন্ত সংগ্রামী চেতনা। সে চেতনা এ আন্দোলনের পরেও—কাজ করে যাচ্ছিলো অবিরাম-ভাবে, একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ইংরেজ সরকার গর্বভরে সেদিন তাদের দেশে প্রচার করেছিলো যে দমন পীড়নেই পিছু হঠেছে সন্ত্রাসবাদীরা। কিন্তু সেটা আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার তাদের প্রবল পাশব শক্তিকেই সেদিন শুধু প্রয়োগ করেনি, সাথে সাথে অবলম্বন করেছিলো বহু নিন্দনীয় নির্যাতনের কৌশল। এমনকি, ভারতীয় মহিলাদের ওপরও এরা সেদিন অমানুষিক অত্যাচার চালাতে কসুর করেনি। কিন্তু তবুও এ বিপ্লব শুধু ওদের ঐ দমন পীড়নের কাঠিন্যেই দমিত হয়নি। এ বিপ্লব ক্রমশঃ স্তব্ধ হ'তে বাধ্য হয়েছিল আরও নানা কারণে। প্রথমতঃ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এ সহিংস জাগরণকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। দ্বিতীয়তঃ এ বিপ্লব চলছিল নেতৃত্বহীন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বল্গাহীন গতিতে। আর এরই মধ্যে বন্দী অবস্থায় স্বয়ং গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে হানলেন আর এক মোক্ষম অস্ত্র। হঠাৎ আগাখাঁ প্রাসাদে তিনি একুশ দিনের অনশন করে বসলেন। শুধু তাই নয়, দেশের অনেক রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলও সেদিন এ বিপ্লবের সঠিক মূল্যায়ন করে একে যথা-যোগ্য মর্যাদাদান ও উৎসাহ যোগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছিলেন গান্ধীজীও এ আন্দোলন শুরু করার সঠিক সময় নির্ধারণে। তিনি জনগণের বিপ্লবী মানসিকতাকে অনুধাবন করে যখন অনন্যোপায় হয়ে এ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করলেন, তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার তখন আর প্রাক বিশ্ব যুদ্ধের প্রবল সংকটে নেই। সেইজন্য দূরদর্শী সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালেই জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারকে দেশত্যাগের জন্য ছ'মাসের নোটিশ দিয়ে চরমপত্র দেওয়া হোক এবং ঐ সময়ের মধ্যে তারা ভারত ত্যাগ না করলে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে, নোটিশের সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও তদানীন্তন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড সুভাষচন্দ্রের সে প্রস্তাব সময়োপযোগী তো মনে করলেনই না বরং সঙ্কট মুহূর্তে ইংরেজ সরকারকে ঐভাবে ব্যতিব্যস্ত করা বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও মন্তব্য করলেন। কিন্তু সংকটাক্রান্ত ইংরেজের দুর্বল মুহূর্তে আঘাত হানবার ওটাই ছিল মাহেন্দ্র-ক্ষণ। তখন এ প্রস্তাব কানে না তুললেও গান্ধীজী কিন্তু ঐ প্রস্তাবই পাশ করলেন তার মাত্র তিন বছর পরে বোম্বাইয়ের অধিবেশনে। এই তিন বছরে তাদের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করে ইংরেজ সরকার কিন্তু তখন অনেক বলে বলীয়ান। তাই বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে তারা সমর্থও হলো।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মতো যদি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রাক্কালেই এই "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করা হতো, তবে হয়তো দেশের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লেখা হয়ে যেত। অপমানকর আপোষী স্বাধীনতার ফাঁস চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর গলায় পরতেও হ'তো না। সে ফাঁস আজ পদে পদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দেশ ছেড়েছে, তেত্রিশ বছর, কিন্তু আজও কি ভারত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছে? পেয়েছে কি ভারত আজও কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও এদেশে ইংরেজ পুঁজি কি খাটছে না? তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গতিবিধি অনুধাবন করেই সুভাষচন্দ্র সেদিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, কংগ্রেস অনুসৃত এ ক্লীব আপোষের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও, পূর্ণ স্বাধীনতা সে পাবে না। বিদেশী শাসক আপোষের মাধ্যমে ভারতকে খণ্ডিত ক'রে যে স্বাধীনতা দেবে, তা'র মূলেই তারা কৌশলে রেখে যাবে জাতি-বৈরীতার এক সর্বনাশা বীজ। সে জাতি-বৈরীতার বীজই আজ মহীরুহ হয়ে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ আন্দোলন দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না। তদানীন্তন কংগ্রেসের চালচলনে ব্যথিত হয়েই অন-ন্যোপায় সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শত্রু পরিবেষ্ঠিত হয়ে এ দেশে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য কোনমতেই সিদ্ধ হবে না। তাই দেশ ত্যাগ করে তিনি বার্লিন, টোকিও হয়ে সিঙ্গাপুরে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। আর সেই সরকারের ফৌজ নিয়েই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ ও আমে-রিকার মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এলেন ভারতের মণিপুরে। সেখানে তারা উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। কিন্তু কোহিমায় এসেই নানা প্রতিকূলতায় রুদ্ধ হলো তাঁদের অগ্রগতি। ব্যর্থ হলো ওদের অভিযান। কিন্তু ব্যর্থ হলো না ওদের প্রচণ্ড

আক্রমণের প্রতিক্রিয়া, যা' আলগা করে দিয়ে গেল ইংরেজ-শাসনের শক্ত বুনিয়াদ। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে এই আগষ্ট বিপ্লব ও অন্যান্য বিপ্লবের ঢেউ, অপরদিকে নেতাজীর সুযোগ্য পরিচালনায় দেশের বাইরে থেকে আজাদী সেনাদের মরণপণ সংগ্রাম—এ দুয়ে মিলে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করলো। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম কাল। প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের ঐ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল ক্যাবিনেট মিশন ও মাউন্ট-ব্যাটেনের মিশনকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের আলোচনায় বসতে। অতএব, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এসব সশস্ত্র সংগ্রামীদের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু লজ্জার কথা তবুও কংগ্রেস সরকার এসব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লবীদের কীর্তি গাঁথাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই অতি কৌশলে আড়ালে করবার—অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন তুলে তারা আজ এদের অবদানকে মুছে ফেলার এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তো স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য একমাত্র গান্ধীজীর অবদানকেই স্বীকার করতে চেয়েছেন। আর তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের শহীদদের সঙ্গে করে-চলেছেন একের পর এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দিল্লীর লাল-কেল্লার প্রাঙ্গণে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানাবার উদ্দেশ্যে তিনি "কালাধারে" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিকৃত ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন, তাতে তিনি ভারতের কোন বিপ্লবীর নাম তো রাখেনই নি, এমনকি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের নামটি পর্যন্ত তা' থেকে তিনি বাদ দেবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সেদিনও পার্লামেন্ট ভবনের সামনে প্রদর্শিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের কোন ছবিকে স্থান দেননি। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এর চেয়ে চরম বেইমানী আর কি হতে পারে?

এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু থাকতে পারে না যে, যে সরকার দেশের জন্য নিহত শহীদদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেন, যে সরকার নির্লজ্জের মতো সহজেই অস্বীকার করতে পারেন শহীদের রক্তের ঋণ, সে সরকার তাঁদের দেখা সুন্দর শোষণ-হীন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনীহা প্রকাশ করবেনই। আরও আশ্চর্যের যে, এ বঞ্চনা ও তাচ্ছিল্য কেবলমাত্র ভারতের বিপ্লবীদের প্রতিই এরা করে চলেন নি, এরা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও অনেক ক্ষেত্রে কোন মূল্যই দেননি। দিলে, গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ৮ই আগষ্টেরই এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে দেয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মূল প্রস্তাবটির প্রতি সম্মান দেখিয়েও তা' রূপদানের উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করতেন। অথচ সেদিনের প্রস্তাবে তিনি শুধু ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান চাননি সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবেই তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ শাসন অবসানের পর ভারতে শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে। সে উদ্যোগ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পুঁজিবাদের প্রসারই কেবল ঘটছে। এরই ফলে দিনের পর দিন দেশে নানা সঙ্কটই শুধু বাড়ছে। আর এ সঙ্কটে জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শোষণ ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না।

ইতিহাসের শিক্ষার পরিশেষে বলি যে, যে কোন শোষণ, বঞ্চনা, উপেক্ষারই একটা শেষ থাকে। এ সবের বিরুদ্ধে মানুষের মনের পুঞ্জীভূত অভিযোগকে ছল চাতুরী ও বলপ্রয়োগে বেশীদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। দেশের চারিদিকে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদের যে ঢেউ বইছে, তার মূলে কায়েমী স্বার্থ-বাদী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থাকলেও, এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘদিনের ক্ষমাহীন উপেক্ষা ও চরম অব-হেলাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আসলে এর বিরুদ্ধেই ওদের কারো কারো "বিদেশী বিতাড়নের" আন্দোলন আবার কারো কারো একেবারে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলন। এগুলিও আন্দোলন। তবে আগষ্ট বিপ্লবের আন্দোলনের চেয়ে এর চেহারাটা একটু (?) আলাদা। আগষ্ট বিপ্লবে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'বিদেশী' ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিলেন। আর আজ এসব আন্দোলন-কারীরা এ দেশেরই মানুষকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করতে চাইছে। সেদিন, আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে, আর আজ এই সব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে দেশটাকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করতে।

[আমাদের স্বাধীনতা দিবস : ১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যবস্থা কামনা করেন তাদের উদ্যোগ এবং উৎসাহ নিয়ে জন-গণকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠনে, অর্থাৎ খেটেখাওয়া মানুষকে তাদের ইউনিয়নে, কৃষকগণকে তাদের সমিতিতে, মধ্যবিত্তগণকে তাদের বিভিন্ন সমিতি অথবা সংগঠনে, ছাত্র যুব ও নারীগণকে তাদের নিজস্ব সংগঠনে সংগঠিত করবার দায়িত্ব নিতে হবে। সংগ্রামের পদ্ধতির কথা বলে গেছেন কার্ল মার্ক্স; সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন লেনিন, স্ট্যালিন, এবং আমাদের দেশের ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ শহীদগণ। দুর্দমনীয় এবং আপোষহীন সংগ্রাম ব্যতীত বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয় এবং গণমুক্তিও সম্ভব নয়।

"স্বাধীনতা দিবসে" আমাদের অন্যতম সঙ্কল্প এবং শপথ হোক গণমুক্তির জন্য আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে সর্বত্র যথা-যোগ্য গণ-সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করা।

কর্মচারী চয়ন আয়োগ : কি ভাবে নিয়োগ হয়

রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর

[তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। হাজার হাজার যুবক পকেটে মূল্যবান ডিগ্রী ডিপ্লোমা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে নেমে আসছে এক চরম হতাশা। ক্রোধ-ক্ষোভ, ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটছে নানাভাবে। যুব সমাজের এই জটিল সমস্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, অনেক যুবক-যুবতী—মূলত গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতী—শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পর কিভাবে চাকুরীর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় তাও উপযুক্ত নির্দেশকের অভাবে বুঝতে পারেন না। ফলে অত্যন্ত সীমিত যে সুযোগটুকু রয়েছে তাও তারা ব্যবহার করতে পারেন না। বর্তমান নিবন্ধটি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে বিবেচনা করে আমরা যুবমানসে প্রকাশ করলাম। নিবন্ধের লেখক রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল ডাইরেক্টর।]

—সঃ মঃ যুবমানস

কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৪ঠা নভেম্বরের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারী চয়ন আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৭৬ সালে এর রীতিনিবদ্ধ অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল। প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৭৮-এ। এই আয়োগ-এর পাঁচটি আঞ্চলিক শাখা আছে। (১) পূর্বাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—কলকাতা) (২) দক্ষিণাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—মাদ্রাজ), (৩) পশ্চিমাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—বোম্বাই), (৪) উত্তরাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—দিল্লী) এবং (৫) মধ্যাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—এলাহাবাদ)। এই শাখাগুলির প্রত্যেকটি এক এক জন আঞ্চলাধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বাঞ্চলীয় শাখা আটটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত উপরাজ্য নিয়ে গঠিত। পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে আন্দামান এবং সুদূর উত্তর-পূর্বে অরুণাচল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মনোনয়ন করাই এই আয়োগের কাজ। এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্মচারী। প্রায় ৫২ শতাংশ (যেখানে "যুক্তরাষ্ট্রীয় গণ কৃত্যক আয়োগ" মাত্র তিন শতাংশের মনোনয়ন করেন)। অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রায়োগিক (Technical) নিয়োজিত হন [সরকারের] বিভাগগুলির নিজস্ব নির্ধারণে। মাসিক ২৬০্ টাকা থেকে ৯০০্ টাকা পর্যন্ত এই তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বেতনের পরিধি। প্রায়োগিক (Technical) শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা [উপরিলিখিত] সরকারী সিদ্ধান্তে দেওয়া হয় নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তারী শাস্ত্রে স্নাতক উপাধি বিশিষ্ট কর্মচারী এই আয়োগের মনোনয়ন বিষয়ীভূত নয়। Senior Geological Assistant অথবা Senior Zoological Assistant (৫৫০—৯০০ বেতন ক্রম) অথবা আবহাওয়া বিভাগের Senior Observer (পদার্থ বিদ্যায় এম. এসসি যোগ্যতা বিশিষ্ট) ও অ-প্রায়োগিক (non-technical) পদ বলে পরিগণিত এবং এই আয়োগ-এর আওতাভুক্ত।

(২) শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই আয়োগ মারফৎ কর্মসংস্থানের প্রভুত সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংস্থানের জন্য যেরূপ প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষক প্রয়োজন এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু এই আয়োগের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারত সরকারের কোনও অফিসে কেরানীর চাকুরী সংগ্রহ করতে মাত্র একবার দরখাস্ত পেশ করতে হয়; এমনকি কোনও Interview ও দরকার নেই। পূর্বে আয়কর বিভাগে কেরানী চাকুরী প্রার্থীকে এবং শুল্ক বিভাগে অনুরূপ চাকুরীর জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্ত করতে হত এবং এ ব্যবস্থায় একই দিনে দুটি পরীক্ষায় বসতে হ'ত। প্রতি পরীক্ষার পৃথক ফি, পরীক্ষা দিতে যাতায়াত খরচ খুব বেশী ছিল। এই সব অসুবিধা এবং বাড়তি ব্যয় কমানোই এই আয়োগ-এর উদ্দেশ্য।

কেরানী পদ সমূহের জন্য আয়োগ নির্ধারিত সুযোগ সুবিধার কথা বলা হ'ল। অনুরূপভাবে, আয়কর বিভাগের অবর আধিকারিক (Junior Officer) যেমন—Income Tax Inspector, Central Excise Inspector, Preventive Officer (শুল্ক বিভাগ) প্রভৃতি পদের জন্য প্রার্থীকে একবার দরখাস্ত দিতে, Interview-র জন্য একবারই উপস্থিত হ'তে হবে এবং একটি মাত্র একক যুগ্ম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ, এই পদগুলির বেতনক্রম, নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক/উপাধি প্রভৃতি একরূপ। কার্যক্রম পৃথক হলেও—চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্যই কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের পরিদর্শক অথবা শুল্ক বিভাগের নিরোধক আধিকারিক (Preventive Officer) পদের চাইতে আয়কর বিভাগের পরিদর্শকের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা কম। কার্যতঃ

কর্মবিন্যাসের সময় কর্মপ্রার্থীর পরীক্ষার ফল ও নানারূপ কর্মক্ষমতার বিষয়ও পরিগণনা/বিবেচনা করা হয়।

(৩) এই আয়োগ বছরে পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করে; যথা—(১) কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা (২) সমীক্ষক/অবর হিসাব রক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা (৩) আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষা (৪) রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা (৫) পুলিশ বিভাগের সহ-পরিদর্শক পরীক্ষা।

কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা এবং রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা একই লিখিত পরীক্ষা হ'লেও রেখাক্ষর বিশারদ পদের জন্য প্রার্থীকে ৩টি স্তরে (মিনিটে ৮০ শব্দের, ১০০ এবং ১২০ শব্দের) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Test) দিতে হবে। তিন স্তরের Stenographer পদের বেতনক্রম পৃথক পৃথক হওয়ায় পৃথক Test গৃহীত হয়। কেরানী পর্যায়ের বিষয়গত ধরনের (Objective Type) একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। ইংরাজী ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, প্রাত্যহিক বিজ্ঞান, সহজ গণিত নিয়ে একটি পত্র (Paper)। কোনও রচনা বা সংক্ষিপ্তসার লিখতে হয় না। প্রার্থীকে শুধুমাত্র চারটি বিকল্পের মধ্য থেকে ঠিক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে কেরানী পদের জন্য প্রার্থীকে Type Test এবং Stenographer পদের জন্য Stenography Test দিতে হয়। ভারত সরকারের প্রতিটি কেরানীকে চাকরীতে যোগদানের পূর্বে অন্ততঃ মিনিটে ৩০টা শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই পরীক্ষা শুধুমাত্র যোগ্যতা বিধায়ক—সুতরাং প্রাপ্ত নম্বর যোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু Stenography Test-এর নম্বর লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সংগে একত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য বিবেচিত হয়। সমীক্ষক (Auditor) পদের পরীক্ষায় ৩টি পত্র (Paper)। ১ম টি বস্তুগত বিষয়গত সাধারণ পাঠ এবং এতে কৃতকার্য হ'লে প্রার্থীর অন্য দুটি উত্তর পত্র করা হয়। একই দিনে প্রার্থী ৩টি পত্র পরীক্ষা দিবে, ১ম পত্র সাধারণ জ্ঞান, ২য় পত্র সাধারণ ইংরাজী এবং ৩য় পত্র গণিত (স্কুলফাইনাল মানের)। এই আয়োগ প্রার্থীর পছন্দ ও যোগ্যতানুযায়ী মনোনয়ন দিলে কৃতকার্য প্রার্থীকে যেকোন বিভাগে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষাও অনুরূপ। সমীক্ষক পরীক্ষার মত এতেও ৩টি পত্রে পরীক্ষা হয়। প্রথম পত্রটি বিষয়গত এবং অপনয়নার্থে প্রযুক্ত। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে প্রার্থীকে Interview-এ ডাকা হয়, উত্তীর্ণ হ'লে প্রার্থীর পছন্দ ও যোগ্যতামত আয়োগ-এর সুপারিশক্রমে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়। পুলিশ বিভাগের Sub-Inspector পদের পরীক্ষায়ও তিনটি পত্র—সাধারণ ইংরাজী, সাধারণ জ্ঞান এবং দিল্লী পুলিসের (Delhi Police Establishment) সাধারণ হিন্দী এবং রচনা। পরীক্ষার মান আয়কর পরিদর্শকের পরীক্ষার মত। Interview-ও অবশ্যই দিতে হবে। আয়োগ প্রতিটি পরীক্ষা রুটিন মাফিক বৎসরে একবার নির্ধারণ করে। কখনও বা কোনও আঞ্চলিক শাখায় কর্মচারী হ্রাস নিবন্ধন বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে, অঞ্চলগুলির অবান্তর বিভাগে শিক্ষাগত মানের অসাম্য আছে এবং সেজন্য কৃতকার্যতার ন্যূনতম ধারা উঁচু নীচু হওয়া উচিত। যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর (Reserved Category) প্রার্থীদের জন্য করা হয়। আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে প্রথম পরীক্ষায় প্রার্থীরা ভালো ফল করে না—তাই বিশেষ পরীক্ষা (Special Test) গ্রহণ করতে হয়। যদিও পরীক্ষাগুলি সর্বভারতীয়, তবুও আসামে তা অল্পবিস্তর রাজ্যভিত্তিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ড অঞ্চল ভিত্তিক; কারণ প্রতিটি রাজ্য ও উপরাজ্যের জনগণের আকাঙ্খার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করা দরকার। রাজ্য বিশেষে বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কৃতকার্য প্রার্থীর অভাব হয় তখনই কেবল আমরা ভিন্নরাজ্যের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিই।

(৪) কর্মচারী মনোনয়নের জন্য অন্য আরও সংগঠন রয়েছে যেমন—Banking Service Recruitment Board, State PSC, UPSC এবং Railway Service Commission। যাতে বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন পরীক্ষার দিনক্ষণ নির্ধারণে সংঘাত উপস্থিত না হয় এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। তবে সব সময়ই যে এই অসুবিধা পরিহার করা যায় এমন নয়। ভারত সরকারের অধীনে বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে [হয়ত] পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় না। ১৯৭৯ সালের সমীক্ষক পরীক্ষায় এই আয়োগ নির্ধারিত ৭ই অক্টোবর তারিখটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে এবং ঐ আয়োগ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে কেরানী পরীক্ষা ১৪ই অক্টোবর স্থানান্তরিত করা হয়। পরীক্ষাপত্র সর্বদাই কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লীতে পরীক্ষিত এবং তারজন্য পরীক্ষান্তে সমস্ত উত্তর পত্রই পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সরাসরি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত পরীক্ষাকালে, বিশেষতঃ কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার সময় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহুবিধ লোকের প্রয়োজন হয়—পরীক্ষার নজরদার, পর্যবেক্ষক এবং পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমরা প্রভূত সহযোগিতা লাভ করি। এমনকি Stenography Test-এর সময় অনুচ্ছেদ বিশেষের dictation প্রয়োজনে বিভিন্ন কলেজ এবং সরকারী অফিসের আধিকারিকগণের সাহায্য পাই এবং তাঁরা পরীক্ষার মান ও ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন।

গত দুবছরে এই আয়োগ-এর কার্যকারিতা এতটা সন্তোষজনক হয়েছে যে Delhi Municipal Board এবং Delhi State Transport Corporation ও তাদের কর্মচারী মনোনয়নের ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে Controller and Auditor General-এর অফিস সমূহ আমাদের আয়ত্তাহীন নহে। কিন্তু ঐ অফিসের কর্তৃত্বও এই আয়োগের উপর কর্মচারী চয়নের ভার ন্যস্ত করেছে। এবং আয়োগ ও তা গ্রহণ করেছে। এগুলি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার/পরীক্ষা।

এবারের সীমিত পরীক্ষার কথা বলতে হচ্ছে। এগুলি নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীর পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক টাইপ পরীক্ষা (ঘ-বিভাগ থেকে গ-বিভাগে উত্তরণের জন্য) প্রভৃতি। দিনে দিনে এই আয়োগ-এর কাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং ১৯৭৯ সালে আমাদের কতিপয় বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। এছাড়াও ভারত সরকারের আবহাওয়া অফিসগুলির জন্য Senior Observer পদের মনোনয়নের জন্যও একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

(৫) পরীক্ষা এবং Interview-এর মাঝামাঝি Profi-

ciency Test নামে এক ধরনের সমীক্ষা আছে। গ্রন্থাগারিক (Junior Librarian, Assistant Librarian প্রভৃতি) পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি। আমরা এক ঘণ্টার একটি Proficiency Test-এর অবতারণা করেছি। প্রার্থীকে Proficiency Test-এ হাজির হয়ে একই দিনে Interview-তেও উপস্থিত হতে হয়। Proficiency Test-এর উত্তরপত্র রাজ্য সরকারের রাজ্য P. S. C. প্রভৃতির আধিকারিকদের দিয়ে পরীক্ষা করান হয়। কোন বিশেষ কাজের জন্য পদ সংখ্যা খুব কম (দশেরও কম) হ'লে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না এবং সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Interview এবং Proficiency Test-এর উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন করা হয়। সমস্ত ব্যাপারেই আমরা ভারত সরকারের "রোজগার সমাচার" এবং Employment News এবং রাজ্য কর্মসংস্থানের বিজ্ঞপ্তি মারফৎ দরখাস্ত আহ্বান করি। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা খুবই কম সেই সমস্ত পদকে বিবিক্ত (Isolated) পদ বলা হয়। তফসিলী ও আদিবাসী প্রার্থীদের Interview-এর সময় আমরা সংসদে তফসিলী/আদিবাসী সদস্য রাখার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে/সংস্থার ঐরূপ সদস্য পাওয়া যায় না। যেমন—দূরদর্শন ও আকাশবাণীর Transmission Executive পদ, আকাশবাণীর Farm Radio Reporter পদ, ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব জরিপ বিভাগের Senior Zoological Assistant পদ, জাতীয় মানচিত্র সংস্থা (National Atlas Organisation) এবং Cartographer Geographer পদ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদ প্রভৃতি। সাধারণতঃ রাজ্যগুলির রাজধানীতেই Interview নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, কারণ এতেই অধিকাংশ প্রার্থীর সুবিধা। Interview দিতে আসার এবং ফিরে যাওয়ার জন্য তপসিলী/আদিবাসী কর্ম প্রার্থীদের রেল/বাস ভাড়া দেওয়া হয়।

(৬) কেরানী পর্যায়ের/রেখাঙ্কর বিশারদের চাকুরী প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা পাশ; এবং অন্যান্য পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। আয়কর পরিদর্শকের চাকুরীর জন্য যে কোন ধারার স্নাতন/উপাধি হচ্ছে ন্যূনতম যোগ্যতা। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধিধারী হওয়া কেরানী পর্যায়ের পদের পরীক্ষা প্রদানের অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য হয় না। বস্তুতঃ ঐ পরীক্ষায় স্নাতকের সংখ্যা ন্যূন হয়। অথবা শুধুমাত্র কেরানীপর্যায়ের পরীক্ষাই বিষয়গত (Objective) প্রশ্নপত্র দ্বারা এবং অন্যান্য উচুস্তরের পরীক্ষাগুলির শুধুমাত্র প্রথম পত্র বিষয়গত এবং অন্য/অবশিষ্ট দু'টি পত্র গতানুগতিক এবং উদ্দেশ্য মূলক (Subjective)। আমাদের ধারণা, একজন ভাবী অধিকারিকের প্রকাশ ক্ষমতা অবশ্যই পরীক্ষিত হওয়া দরকার; তাই আমরা গতানুগতিক/ধারানুযায়ী প্রশ্নপত্র দ্বারা আয়কর পরিদর্শকের মত অবর অধিকারিকের পরীক্ষা গ্রহণ করি।

(৭) এই আয়োগ-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অফিস ৫নং এস্‌প্লানেড রো (পশ্চিম); কলকাতায় অবস্থিত। এটি টাউন হলের ঠিক পিছন দিকে। এসম্পর্কে যে কোন জ্ঞাতব্য থাকলে আয়োগ-এর উপরি উল্লিখিত ঠিকানাস্থ অফিসে (ছুটির দিন ছাড়া) যে কোন কাজের দিনে জানা যাবে।

মেহমান

হীরালাল চক্রবর্তী

আকাশের কোণে কালো পাথরের মত একখণ্ড মেঘ দেখতে পায় আজীজ। রকম দেখেই সে বুঝেছিল একটা কিছু ঘটবে। জাত চাষা সে। মিঞাদের খিদমত করে দিন গেলেও জন্ম ওর চাষীর ঘরে। মেঘের রং ঢং বোঝে বৈকি।

শেয়ালের হাঁ—এর মত মেঘের টুকরোটা যে সর্বনেশে মাতাল ঝড় নিয়ে ঝাঁপ দেবে না এমন নিশ্চয়তা কি। ঝরঝরে গাড়িটা শেষ আয়ু নিয়ে ঝোড়ো চড় সামাল দেবে কেমন করে ভাবছিল আজীজ। মাঝখান থেকে ওর গরু দুটোর দুর্গতির একশেষ হবে। ওর গরু ? হঠাৎ বুকের মধ্যেটা চিন্‌চিন্ করে আজীজের। নামেই বটে ওর গরু আসল দড়ির টান এনায়েৎ মিঞার হাতে। তা শুধু কি গরু ? ভিটেমাটি জমিজমা মায় সে নিজে বাঁধা মিঞার হাতে। মিঞারা এ গাঁয়ের আল্লা। এনায়েৎ মিঞা মস্ত জোতদার মহাজন। ব্যবহারে অমায়িক। কথা ভারি মিষ্টি। হাসি ছাড়া কথা নেই। কোরানের বোল ছাড়া বাক্যি ফোটে না।

আজীজ বাপের কাছ থেকে গোলামীর মৌরসীপাট্টা নিয়ে মিঞাদের সেবা করে বেহেস্তের পথ সুগম করছে। এনায়েৎ বলে, হাঁরে বাপজান তুরা আমার গোলামী করবি ক্যানে ? আল্লা হাত দেছে এই পিথিবীতে খেদমতের জন্য। খোদার দোয়ায় বেহেস্তের পথ সাফ করার লেগে। আমিও তো গোলাম। নাকি ?

কাঁধে হাত রেখে এনায়েৎ দাড়ি নাচিয়ে হাসে। তুই তো আমার মুনীশ নারে আজীজ। তুই আমার বাপজান। আল্লার মর্জি মন দে কাজ করে যা।

আজীজ আর কি বলবে। ঋণের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মন আল্লা আর মিঞার দোয়ার ফারাকটা ধরতে পারে না।

আজ সকালেই এনায়েৎ মিঞা বলছিল ক'জন মেহমানের কথা। সদর থেকে আসবে তারা। আসবে শেষ ট্রেনে। আজীজ পরম বিশ্বাসী লোক। এক জেতের লোক। সে ছাড়া এমন গোপন কাজ কে করবে। তা মিঞার বাড়িতে মেহমানের আনা গোনার তো শেষ নেই। দিনে দুপুরে এমন কি গভীর রাত্রেও দোর বন্ধ করে তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে সে দেখেছে। বর্গা নিয়ে সেদিনও দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার। এখন ধান রোয়ার মরশুম। বেশ একটা গরম হাওয়া গাঁয়ের মধ্যে। আজীজের রক্তও গরম হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। সে লুকিয়ে একদিন সমিতির মিটিং-এ এসেছিল, শুনতে। তার মনে হয় কথাখান ঠিক বটে। আজীজদেরও একখণ্ড জমি ছিল, হাল-বলদ ছিল। তা সে জমি কোনদিন সে ভোগ দখল করতে পারে নি। বাপের আমলেই জমিটুকু মিঞার গ্রাসে গেছে। এখন হালের বলদ দিয়ে ও গরু টানে। বাবুদের খিদমত খাটে। এই জমি হারানোর কথাই হচ্ছিল সেই মিটিং-এ, একজন এসব বুঝিয়ে বলছিলেন। রক্তও তেতে উঠেছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মত। ও দুর্বল স্বভাবের মানুষ। বুকের মধ্যে জ্বলত বটে কিন্তু বিহিত খুঁজে পেত না। মনে হ'ত মিঞারা ওকে ঠকাচ্ছে। পিতৃপুরুষের বোঝা ওর ঘাড়ে দিয়ে গোলাম করে রেখেছে। ঐ ভাবনা পর্যন্ত। কিছু করার মত সাহস ওর নেই। গোলামী করতে করতে মনটাও ওর দুর্বল হয়ে গেছে।

আজীজ জানত চাষাদের টিট করবার জন্যই পরামর্শ চলত দিনরাত। আজীজ থাকত প্রহরীর মত দরজায় দাঁড়িয়ে।

ঝড় আসবে আজীজ ধরেই নিয়েছে। আড়াই ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ ইস্টিশান। ঘোর আঁধার নামতেই এনায়েতের তাড়ায় সে বেরিয়ে পড়েছিল। হ্যারিকেন ধরানো নিষেধ। এ যে বড্ড গোপন কাজ। কাক পক্ষীকেও জানানো চলে না। চাষারা মাঠে নামার আগেই তাদের টের পাইয়ে দিতে হবে এনায়েৎ মিঞার জমি বড় শক্ত ঠাঁই। বর্গার জোরে জমি দখল করা সোজা নয়। উচ্ছেদ যাদের করেছে কিছুতেই মাঠে নামতে দেবে না সে। তার জন্য যদি দু'চারটাকে খুন করতেও হয় সে করবে। গাঁয়ের কিছু চাষী আছে তার দিকে। কিন্তু বেশির ভাগই নেই। বড় এক কাট্টা চাষীরা। ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে গায়ের জোরে হবে না। চাই কিছু পাকাখুনের দল। যারা দরকার হলেই এনায়েতের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিঞার মেহমান ওরাই। তাদেরই আনতে হবে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে। এমন কাজে বিশ্বস্ত লোক চাই আজীজের মত। অনুগত পোষমানা খিদমতগার আজীজ।

মেহমানরা আসবে শেষ ট্রেনে। রাত আটটায়। তাদের নিয়ে ফিরতে আঁধারই হবে সেরা আলো। আজীজ ভেবে দেখল আজ বৃষ্টি হলে কাল ভোরেই চাষীরা মাঠে নামবে। আজই মেহমানরা গাঁয়ে আসছে। হয়ত আজ রাত্রেই মিঞাসাহেব ওদের চাষীপাড়ায় ঝাঁপিয়েপড়ার হুকুম দেবে। অতর্কিতে লেলিয়ে দিতে মিঞার জুড়ি নেই। এমন পাথর অনড় ভূষো কালির মত রাতই চাই দাঙার স্যাঙাৎ হিসেবে।

আজীজ আজকাল ভাবে। বোঝেও। এনায়েৎ মিঞার মসজিদের গোপন শলায় অনেকদিন ধরেই একটা মতলব চলছিল। এরমানকে লোপাট করে দেবার জন্য একটা সিদ্ধান্তও হয়েছে। এরমান সমিতির পাণ্ডা। সেও এনায়েতের বর্গাদার।

শুধু নিজের নয় গাঁয়ের সব বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করিয়েছে সে। এনায়েতের মত মানুষকে সে স্পষ্ট বলেছে ফেরেপবাজ। মাঠগর্তের ধান লোপাটী ধেড়ে ইঁদুর। এ সবই জানে আজীজ।

কি বুকের পাটা এরমানের। আজীজ সেদিন ভয়ংকর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, মুগ্ধ বিস্ময়ে এরমানকে নয়া চোখে দেখেছিল। হ্যাঁ মিঞাকে জবাব দেবার মত মানুষ আছে বটে গাঁয়ে। এই সেদিনও এমন করে কথা বলতে সাহস পেত কেউ? আজ এরমান রুখে দাঁড়িয়েছে, সায় দিচ্ছে আরো পাঁচজনা। আজীজ ভাবে দিনকাল বদলেছে বটে।

মিঞারাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা আরো ভয়ংকর আরো হিংস্র হয়ে উঠছে। জিভ টেনে ছিঁড়তে চাইছে এরমানদের। গাঁখানাকে সেই আগের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবার জন্য কত না কসরৎ তাদের। দুজন চাষীর বুক ফেঁড়ে দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে মিঞারা। পুলিশ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ করে গাঁয়ে বাস করা সহজ নয়।

এনায়েৎ তবু হিমসিম খায়। তাদের ফরমান বরবাদ করে দিচ্ছে চাষীরা। এমন দোর্দণ্ড মিঞাদের কলা দেখাচ্ছে আজীজেরই কাছের মানুষেরা। আজীজের বুকেও খুসির খই ফোটে। মন নিজের অজান্তেই বাহবা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা বড় সাবধানে। বড় হিসেব করে। তার যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঁধা মিঞাদের খুঁটিতে। তার খুসি বুকের মধ্যেই ঘোরে। নিঃশব্দে সন্তর্পণে।

আজীজ অবাক হয় মিষ্টিমুখো 'বাপজান' বলনেওয়ালা এনায়েতের রাগ দেখে। মসজিদের শালিশীতে পোষ না মানা চাষার বেচাল দেখে খাপ্পা সে। মকবুলকে জুতো ছুঁড়ে মারে রাগের ঝোঁকে। বলে, লে বর্গা রেকর্ড করেছিস তো দোজখেই যা। দারোগাবাবুর জুত্তি না খেলে তুদের দিল ঠাণ্ডা হয় না। কেমন করে মাঠে নামিস তাই দেখব!

আজীজ এসব দেখেছে। বুঝেছে একটু দেরীতে। মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু বিবাদ লেগেই আছে। থাকবেও। এ যে ধানের বিবাদ। ধান তো নয় প্রাণ। আজীজও বোঝে ধানের চেয়ে বড় কিছু নেই। একদিন এনায়েৎ মিঞা মসজিদে বোঝাচ্ছিল সকলকে, গোল করে কে ঘাড় ভাঙ্গে কার। আরে লেতারা তুদের ক্ষ্যাপায়! বর্গা রেকর্ড কি? তুরা সব আমার জেত ভাই, তুদের ছাড়া কি জমি আমার এমনি এমনি ফসল দিবে! আল্লার কসম লাইন দিতে যাবি না। আজ এই দিন আছে কাল থাকবে না। তুরা যেমন চাষ দিচ্ছিস দেকে মানা করে। কিন্তু বেওয়াকুফের মত ঐ লেতাদের কথা শুনে গোল করিস না।

এসব আজীজ শুনেছে। 'বেওয়াকুফের' মতই চাষীরা লাইন দিয়ে নাম রেকর্ড করিয়েছে। আর মিঞা রাগে দাড়ির চুল টেনে ছিঁড়েছে। আজীজেরও বড় ইচ্ছা হত নাম রেকর্ড করায়। কিন্তু সে তো গোলাম। তার তো জমি নেই। চাষও নেই। খত লিখিয়ে কবেই সে জমিটুকু হজম করেছে মিঞা। মাঝেমধ্যে অন্য চাষীর হয়ে সে মাঠ চষে দেয়। বেগার খেটে দেয়। কিন্তু বর্গাদার তো সে নয়। এনায়েৎ মিঞার পার্শ্বচর অনুগত ভৃত্য। তবু হঠাৎ কখনো তার চোখেও আগুন ঝলসে ওঠে। কুঁকড়ে থাকা বশীভূত মনটা জ্বলে ওঠে। ঘরে তার বিবি। ছোটখাট একটি হুরী। নয়তো এনায়েতের কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে বিলাতের চোখে পড়বার কথা নয়। তেঁতুল-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রায়ই সে পানী চেয়ে খায়। চোখ তার ছুকছুক করে। আসল কথা পানী নয় শাকিলার জনাই সে আসে। একদিন আজীজের হাতের কাস্তেটা কেঁপে উঠেছিল। শহুরে বাবুর চোখ দুটো উপড়ে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। শাকিলা ওর হাত চেপে ধরেছিল। সেদিন আজীজ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের রাগ দেখে। সেও রাগতে জানে! ঘৃণায় সারা বুকটা জ্বলে ওঠে তারও?

আজো সেই আজীজই আছে। ঝড়জল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বৃষ্টির দেখা নেই। শুধু ঝড়ের ইঙ্গিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে আকাশের সীমানায়। আকাশের পটে আক্রোশ যেন ওৎ পেতে আছে।

শেষ ট্রেন এল। চলে গেল। ইস্টিশনের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকাল আজীজ। ট্রেন থেকে লোকজন খুব বেশী নামল না। দুচার জন যারা নামল তারা সব চাকুরে বাবু। শহরে চাকরী করতে যান। ফার্স্ট ট্রেনে ওঠেন লাস্ট ট্রেনে নামেন। তারা ইস্টিশানের ওপাশ দিয়ে ঘুরে লোকালয়ের দিকে চলে গেলেন। বিড়িতে শেষ টান মেরে আজীজ প্রায় হতাশভাবে অদূরের ক্ষীণ আলোর মধ্যে মেহমানদের পাত্তা নিতে চোখ দুটোকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। এমন সময় যেন জনাকয়েক লোককে ঢালুর দিকে গড়িয়ে নামতে দেখা গেল। ঢালুটা উঠে এসেছে পীচ রাস্তার ওপর। কালো কারের মত রাস্তাটা চলে গিয়েছে দুধারের ধানক্ষেতের বুক চিরে সিধে আরো পাঁচক্রোশ সাহেব ঘাটা অব্দি। দুতিন ক্রোশের মধ্যেই আজীজদের গাঁ গ্রাম। শুধু ধু ধু ধান ক্ষেত। পথের দুধারে বাবলা জারুলের গাছ। একটা সরু ক্ষেতিখাল বেড় দিয়ে রেখেছে গাঁখানাকে।

আজীজ তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। সেই কজন মূর্তি উঠে আসছে গড়ান বেয়ে। মেহমান! পথের পাশে ঝাঁকড়া মাথা বাবলাগাছের নীচে গরুর খুরের শব্দ হল। শোঁ শোঁ শব্দে শেয়ালের মুখের হাওয়া গোঙাচ্ছে। সাপের জিভের মত লিকলিকে বিদ্যুৎ কালো আকাশখানাকে এমাথা ওমাথা ফালা করে ঝলসে উঠল। ভয়ঙ্কর গর্জনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে মেহমানরা এসে দাঁড়াল।

—এনায়েৎ মিঞার লোক নাকি?

—জী।

আকাশের খেয়াল ভাল ঠ্যাকে না। জোরসে।

গাড়ি চলেছে। ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আজীজের চোখ যেন সার্চলাইট হয়ে ওঠে।

একজন মেহমানের প্রশ্ন—নাম কি?

—জী, আজীজ—

—কদ্দিনের লোক?

- সেই ছাওয়াল থেকে মিঞাদের গোলামী করি।

হঠাৎ ঝলকানীতে কয়েকজোড়া চোখ গেঁথে গেল কালো মিশমিশে বলিষ্ঠ আজীজের দেহে। একটানা বাতাসের গোঙানীর সঙ্গে গাড়ির চাকার আর্তনাদ মিশে এক ভয়ঙ্কর বীভৎস শব্দ আছড়ে পড়ে নিস্তব্ধ অন্ধকারে।

আজীজের মনের মধ্যেও শুরু হয়েছে একই বিক্ষিপ্ত চিন্তার আনাগোনা। এরা কেন এসেছে? মাঠের চাষ নিয়ে গোল বাঁধাবে বলে? আবার একটা খুনোখুনির লেগে? এনায়েতের

লোভের আগুনে গাঁখানা আবার জ্বলবে! ওর বুকেও বঞ্চনার আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু সাহস নেই। বড় ভয় করে। বিলাত সাহেব সেদিন চোখের ওপরই দু'টো বন্দুক সাফ করছিল। আজীজ সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার জন্য গাঁখানা থমকে রয়েছে। শাকিলাকে বলতে সে বলেছিল, তুমার ত সব নেছে মিয়া। খত নিখে দেছ! গতর খাটিয়ে করে নেবে। সবাই তা মানবে ক্যানে? তারাও কোমর বেঁদেছে।

—হাঃ। আমি মিঞাদের নেমক খেঁছি রে।

—কার নেমক কে খায় মিঞা। শাকিলা বলেছিল, মিঞারা তুমার জমি কেড়ে নেলে। খত নেকালে বান্দা হবার লেগে। তুমার জমির ধান খেয়ে ভাবলে হুজুরের নেমক খাচ্ছি।

এসব কথা আবার মনে পড়ছে আজীজের। বোশেখের মাঠের মত শুকনা বুকটা কড়কড় করে। কিন্তু বিশাল দেহ হলেও মন তার পিতৃপুরুষের ছাঁচে ঢালা। কণ্ঠস্বর আনুগত্যের সংস্কারে চাপা পড়ে থাকে। তবু বুকে তপ্ত মাঠের জ্বালা ঘুরে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ এনায়েতের মুখখানা মনে পড়লে সব কেমন গুলিয়ে যায়। বরং শাকিলার মন শক্ত। ওর বাপ একজন তেজী চাষা। কয়েক শো মানুষ আছে তার পেছনে। আছে সমিতি। গাঁয়ে তার বাপজান জমি চষে বুক ফুলিয়ে। নিজেকে বড় একা বিচ্ছিন্ন মনে হয় আজীজের। শুধু হুকুমের গোলাম সে! মাথা নামিয়ে শুধু হুকুম তামিল করা।

হঠাৎ আজীজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। একজন কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল,—হেই মিয়া গাঁয়ে ফুর্তিটুর্তির জিনিস আছে তো?

আজীজ ঠিক বুঝতে পারল না। কথাটা ভেঙ্গে বলতে সে বলে, হাঁ বাবু হুই খাল ধারে তেনারা—

কথাটা বোধহয় মনঃপুত হল না মেহমানদের। তাদের আলাপচারীতে মনে হল একটু উঁচুদরের জিনিস চায় তারা। আজীজ গরুর লেজে মোচড় দেয়। দু'টো গরু গতি বাড়িয়ে দেয়। ঝপঝপিয়ে ছোটে গাড়িটা।

আবার প্রশ্ন—ইদিক্কার অবস্থা কেমন হে মিয়া?

—সব ঠিক আছে বাবু। উ শালারা নাঠি সড়কি ছাড়া কিছু বোঝেনা। অজীজ দম টেনে বলে, আপনেরা শহরের মিস্তিরীরা পাকা মানুষী। ভয়ে উরা ন্যাজ গুটিয়ে পালাবে।

মিস্তিরী বলায় মেহমানরা বুঝি খুসি হয়। তারা শব্দ করে হাসল। ওদের আলাপ শুনতে লাগল আজীজ কান তুলে। কি করে চাষীপাড়ায় আক্রমণ চালাবে তারই কৌশল আঁটিছে ওরা। বিলাত সাহেব একটা ছক করে দিয়েছে। সেই ছকের ওপরই আলোচনা হচ্ছে।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টান লাগে গাড়িতে। দুর্বল গরুদু'টো বেসামাল হয়ে পড়ে। আজীজ বলে, আর এট্টু বাপ—আর এট্টু।

আজীজের পাচনটা ওপরে উঠেও ঝট করে নেমে যায়। গরুদু'টোকে মারতে অবশ্য তোলে নি। হঠাৎ যে কথাটা তার কানে এল তাতেই ওর শরীরটা যেন ঝাঁকানী খেয়ে হাত ওপরে উঠে গেল। রক্ত যেন টগবগিয়ে উঠল দেহের মধ্যে। মেহমান বলছে, হেই গাড়োয়ান গাঁয়ে ডগডগে চাষী বউ আছে তো? এ কাজে নিরামিষ ফিরতে রাজী লই বাবা!

কে জানে আজীজের হঠাৎ মনে হ'ল শাকিলার কথাটা। শাকিলা গোলামের বিবি হলেও চাষী ঘরের বউ। শাকিলা সুন্দরী। হঠাৎ ওর অনেকদিন আগের একটা ছবি মনে পড়ে। ধান ক্ষেতে এনায়েতের ভাড়া করা গুণ্ডারা বাচ্চু সেখের বিবিকে নিয়ে উৎসব করেছিল। আজ অনেক কাল পরেও সে দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি সে। সেদিন এর বিচার করার মত মনুষ ছিল না গাঁয়ে। চাষীপাড়ার অনেকেই তখন গাঁ ছাড়া। কারো কারো মাথার হুলিয়ার খাঁড়া। বাচ্চু সেখের বিবিকে দশ বারোটা শেয়াল খুবলে খেয়েছিল বলে তেমন সাড়া মেলে নি গাঁয়ে। বাচ্চু সেখ তার পনেরো দিন পরে পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল। প্রতিশোধের সুযোগ তার মেলে নি।

আজো আজীজ সেদিনের কথা ভাবলে চমকে যায়। হঠাৎ তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন সেদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকায় শিউরে ওঠে। দিন বদলেছে। গাঁয়ের অনেকেই ফিরে এসেছে। মোটামুটি একটা শান্তি ছিল গাঁয়ে। গাঁছাড়া যারা হয়েছিল গাঁয়ে ফিরে তারাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখত। সমিতি আরো বড় হ'ল। এনায়েৎ মিঞা ভালই দমে গিয়েছিল। তাকে কেউ জুলুম হুজ্জুতও করে নি। যে যার জমিতে শান্ত-ভাবেই চাষ আবাদ করছিল। আবার এনায়েৎ মিঞা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গাঁয়ে আবার অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে? বুকটায় রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। পাচনটা উঠেও নেমে যায়। দাঁতের নীচে ঠোঁট কেটে বসে যায়। গরুর লেজ মুচড়ে দিয়ে তাড়াদেয়—হেই-হেট্-হেই—

দমকা শাসানী ঠেলে গাড়ি ছোটে ক্যাঁচ-কোঁচ-ক্যাঁচ-কোঁচ। হাওয়াটায় ক্রমেই জোর বাড়ছে। দূরাগত একটা বুক কাঁপানো শব্দে আজীজ ধরে নেয় ঝড় আসছে। মনে মনে সে তৈরী হয় মোকাবিলার জন্য। গরুদু'টোকে আর তাড়া লাগায় না। মন সে ঠিক করে নিয়েছে গাড়ি এনায়েতের বাড়ির দিকে যাবে না। যাবে চাষীপাড়ার দিকে। মনকে শক্ত করেই সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে ঝট করে।

মেহমানদের ওদের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার কাজ শেষ। না। শেষ নয়। আজীজের মনের ঘোর খাওয়া অস্বস্তিটা থেকেই যাবে যতক্ষণ না নীচু মাথাটা উঁচু করে এনায়েতের সামনে দাঁড়াতে পারছে। বুক ফুলিয়ে বলতে পারছে,—মিঞা আজ আর আমি একা লই। গোলামী অনেক করেছি আর লয়। জমিখান ফেরৎ চাই।

মনটা হালকা লাগে। ঝড়ের ঝাপটা খেয়ে গাড়িটা আর্ত-নাদ করে ওঠে। কিন্তু মন তার উড়ে চলে দুরন্ত ঘোষণা নিয়েঃ হুঁশিয়ার ভাইসব। যন্তর এয়েছে সদর থেকে। হুঁশিয়ার!

এনায়েতের হিংস্র কুটীল মুখখানা যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। অন্ধকারেও ধক ধক জ্বলছে চোখ দু'টা। আজীজের বুকেও আজ আগুন লেগেছে। হাড়ে হাড়ে ছড়াচ্ছে সে আগুন। দীর্ঘ বঞ্চনার পর শাকিলার বাপের মতই সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে, তুমার চোকের ভয় করি না মিঞা। দ্যাও—এত্টা কালের হিসাব দ্যাও। নাইলে ছাড়ান নাই।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। ছোবল মারছে গাড়িটার গায়ে। মেহমানরা বলল, হেই মিয়া ঝড় যে এসে পড়ল।

—ঝড় এখনো এসে নাই বাবু।

আজীজ নিজের মনেও ভাবে এ ঝড় কিছুই নয়। যে ঝড় তার চাই তা আসবে আগামী কাল।

কবিতা

ভাঙুক এখন সুখের ডানা

স্বপন নাগ

ঝড়ের রাতে যাচ্ছে ছিঁড়ে রং বেরং এর স্বপ্ন কোথাও
কোথাও আবার আসছে দারুণ এক সমুদ্র-ডাক
সেই ডাকে কেউ ভয় পেওনা
ভয় পেওনা ঝড়ের দাপট কিংবা কেনো
সমুদ্রেরই মাতাল নাচন......
ঝড়ের ডাকে কাঁদছ তুমি মুখ লুকিয়েঃ
বুকের মধ্যে রাখছ পুষে বিষের দানা,
আমি তবু হাসছি উদার-উদাস-উদম
ঝড় আসছে আসুক না ঝড়!
ভাঙুক না ঘর নোকোর ছৈ পাখির ডানা
হারাক্ দূরের পরিজনের নিদেন হাঁক,
হারাক মানসঃ নরম স্বপ্ন দেখার মতন!
ঝড় একদিন থামবেই, সেদিন বাঁধব ঘরে
সুখের বাসর, আঁকব নতুন তুলি দিয়ে,
ডাকবে আলোর বন্যা ভীষণ; এখন শোনো
সাগর ডাকে, ঝড়ের দাপট ভয় পেওনা!
ভাঙুক এখন কাঁচের মতন বাথ সুখের স্বপ্নগুলো
হোক উধাও.. ... ..

এখনো মানুষ আমি

শীতল গঙ্গোপাধ্যায়

পাতা-ঝরা বিষণ্ণ শব্দ বুকে নিয়ে
হেঁটে গেছি একা একা পূর্বে-পশ্চিমে বহু দূরে-
নিকানো উঠোন 'পরে সজনের টুপ্ টাপ্ ছন্দ ছাড়িয়ে
কখনো হাল্কা মেঘ ভেসে ওঠে মনের আকাশে
কখনো বৃষ্টি পড়ে বজ্র-বিদ্যুৎ সাথে নিয়ে—
ছোট ছোট ঘাস আর অপরাজিতার নীল বুকে
তবুও মানুষ আমি
আমারও ঘর আছে--ঘরেতে অরণ্য আছে......
অরণ্যে শ্বাপদ খেলা করে।

এখন অনেক বেলা—সকাল হয়েছে শেষ করে
এখন পায়ের নীচে মাটি কাঁপে থর থর করে
এখনও বুকের মাঝে গোপন গভীর নিরবতা
আদিম শব্দের পায়ে কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়ে মরে
তবুও মানুষ আমি,
আমারও ঘরে আছে অরণ্য......শ্বাপদ......
শ্বাপদের পায়ে পায়ে রক্ত, ছোট নুড়ি রক্তে রাঙা
রক্তের লাল রঙে ব্যথিত প্রত্যুষ
সূর্যের আগমনী গায়।

আছো কোথায়, বন্ধু?

শুভংকর রায়

রাত্রি গভীর হোক আরও—
যেতে যেতে আটকে থাক এই চাঁদ
উচ্ছ্বাসিত অরণ্যের তুঙ্গ মগডালে।

তারপর সারারাত
খেলা হোক লুকোচুরি
গাছ-গাছ আর কেবলই গাছের ভীড়ে
বাঘ সিংহ বুনোহাতি আর শেয়ালের
আর নেকড়ের আর খরগোসের সাথে -

আমিও ছুটব, ছুটে ছুটে যাব
ছিঁড়ে ফেলে এই মন; কেবলই খেয়ালে
সেই সব স্মৃতি পথ দিয়ে
ছুটতে ছুটতে আর নাচতে নাচতে
পরিত্যক্ত সেই সব গাছের কোটরে
ঝোপঝাড় নদী খাল বনে, গুহার আঁধারে
আছো কোথায়, বন্ধু,
আমার আজন্ম মানবতা?

এসো খেলি স্বচ্ছতোয়া চাঁদে
এসো খেলি হিংস্রতার ভীড়ে
এসো খেলি এই সেই অরণ্য গভীরে!

ঝড়

দেবাশিস প্রধান

ঝড়ের সাথে প্রলয় আসে
দুর্দিন ঐ ঘাসে ঘাসে...
সবখানেতেই ঝড়,
মাঝ নদীতে ভাসছে দ্যাখো
অবিন্যস্ত খড়!

নদীর বুকে উথাল পাথাল
বুকের মাঝে আরক্ত খাল
জোয়ার ভাটার অভিমানে তৈরী করে খাঁজ
সুখের ঘরে পাঁচ কাটা
কি যন্ত্রণায় নীল করো তুই
বজ্রবিকত বাজ!

একদিন প্রতিদিন : এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা

মৃণাল সেনের সাম্প্রতিকতম ছবি 'একদিন প্রতিদিন'-এ আছে সেই অমোঘ শক্তি, যার অপর নাম প্রগাঢ় উন্মোচন, যা ভ্রষ্ট আদমের মত আর্তনাদে আমাদের দগ্ধ করায়, সারাক্ষণ এক প্রবল উৎকণ্ঠায় ডুবিয়ে রেখে অবশেষে ঠেলে দেয় এক অতল, অনিবার্য খাদের দিকে। বস্তুত, এই ছবি আক্ষরিক অর্থেই একটি বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণ আমাদের ছবি দেখার ইতিহাসে (যার মধ্যে এই প্রতিবেদক অবশ্যই তার দেখা কিছু সাহেব-সুবোদের তৈরী ছবির প্রসঙ্গ দায়িত্ব নিয়েই মনে ক'রতে চায়।) একটি বিপন্ন বিস্ময়, একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। এমনকি ছবিটি দেখতে দেখতে কখনো এরকমও মনে হ'য়েছে, মৃণাল সেনের পূর্ববর্তী ছবিগুলির ঐতিহ্যও এখানে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে—এই ছবির দমকা বাতাসে নয়, বিবর্ণ উজ্জ্বলতায়। ছবিটি দেখে আমরা বিমূঢ় হ'য়ে যাই, আঁতকে উঠি—এই নিষ্ঠুর জীবনের ভিস্যুয়াল পর্যবেক্ষণ, এই অপলক অবলোকন আমাদের মধ্যবিত্ত ভঙ্গুর স্বাতন্ত্র্যবোধে সজোরে লাথি মারে। আর অস্তিত্বে লাথি পড়লেও আঁতকে উঠবে না, সে কোন্ উন্মাদ?

একটি সামান্য কাহিনী (অমলেন্দু চক্রবর্তী) সূত্র অবলম্বনে মৃণাল সেন এই অসামান্য ছবিটি তুলেছেন। একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের একদিনের একটি আকস্মিক ঘটনা অবলম্বনে প্রতিদিনের দিন যাপনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন, তা বড় বেশি নিষ্ঠুর, বড় বেশি স্বার্থপরতায় ভরা। উত্তর কলকাতার একটি সংকীর্ণ, স্যাঁতসেতে, ফাঁকা গলির মধ্য দিয়ে একটি অস্পষ্ট রিকসার এগিয়ে আসা দিয়ে ছবি শুরু হয়। সেই গলিতে বল খেলতে গিয়ে একটি ছেলের মাথা ফাটে, ডাক্তারখানা থেকে মাথায় ৩টে সেলাই নিয়ে ছেলেটি বাড়ি ফেরে। এবং তখন ক্যামেরা প্যান ক'রে দেখানো হয় বাড়িটিকে, যে বাড়িটি এই ছবির মূল চরিত্র। তাঁর ছবির স্বভাবসিদ্ধতা অনুযায়ী মৃণাল সেন নেপথ্য ভাষণের সাহায্যে আমাদের সাথে এই বাড়িটির পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন। আমরা ক্রমশ জেনে যাই ১৮৫৭ সালে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর বছরে, বাবু শ্রীযুক্ত নবীন মল্লিকের হাতে এই বাড়ি তৈরী হয়। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, সি. এম. ডি. এ-এর হাত ঘুরে স্বাধীনোত্তর কালেও তা অবিকল, অপরিবর্তিত। অর্থাৎ, সিপাহী বিদ্রোহের উদ্দীপনা, রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও আমরা সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি, একই গ্লানিময় জীবনে বন্দী হ'য়ে আছি। বস্তুত, এই ১৬ ঘরের মধ্যে ১১টি পরিবারের শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা তো এই ঘৃণময় সমাজেরই একটি নিষ্ঠুর চিত্রকল্প। বাড়ির পর আমরা মৃণালের কয়েকটি অনবদ্য কাট্ সটের মাধ্যমে চিনে ফেলি এই বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার স্বভাবচরিত্র—যার মধ্যে ডিক্টেটর-সদৃশ বাড়িওয়ালা, যিনি ভাড়াটেদের জল, আলো মেপে দেন, একটি বিশেষ সংযোজন।

তারপর ক্যামেরা এই বাড়ির একটি বিশেষ পরিবারকে ক্লোজ-আপে এনে ফেলে। আমাদের পরিচয় হয় হৃষিকেশ সেনগুপ্তের সাথে, অবসর প্রাপ্ত এই মানুষটির ৬ জনের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল তাঁর বড় মেয়ে চীনু—যার আয়ের উপর এই ৬টি প্রাণীর বেঁচে থাকা নির্ভর ক'রে আছে। এবং একদিন হঠাৎ ৭টা বেজে যায়, সেই মেয়ে বাড়ি ফেরে না। ৭টা-৮টা-৯টা রাত বাড়ে—বাড়ে-চীনু ফেরে না—ফেরে না—ফেরে না—উৎকণ্ঠা বেড়ে চলে। মেজ বোন মীনু দিদির অফিসে অহেতুক ফোন করে এসে জানায় দিদি অফিসে নেই। তারপরও রাত বাড়ে নিজস্ব নিয়মে, হৃষিকেশের চোখের সামনে দিয়ে হেলেদুলে শেষ ট্রাম চ'লে যায়, রেডিওতে একসময় সারাদিনের অনুষ্ঠানও শেষ হয়, তবু চীনু ফেরে না, বাড়ির সকলে জেনে যায় এতরাত ক'রেও মেয়েটা বাড়ি ফিরলো না। শুরু হ'য়ে যায় তৎপরতা—থানা, হাসপাতাল, মর্গ খোঁজা শেষ ক'রে একসময় সকলে ফিরে আসে। চীনু ফেরে না। আর নিষ্ঠুর পরিচালক তখন কী ভয়ংকরভাবে দর্শকের হৃদ্পিন্ড নিয়ে তুচ্ছ বলের মত লোফালুফি শুরু ক'রে দেন! বাড়িময় শুরু হ'য়ে যায় অশ্লীল ফিসফাস, গভীর কুমীর কান্না। অবশেষে একসময় সব যেন থিতিয়ে আসে, বাড়িটা তলিয়ে যায়, অসীম নির্জনতায়। ঘরের মধ্যে হৃষিকেশের পরিবার পাথরের মত ব'সে থাকে একাএকা, অসহায়। আর তখন সারা ঘরে ঘড়ির, নিশ্বাসের, নির্জনতার শব্দ কী ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে! এবং সেই হিম নৈঃশব্দই ছবিকে পৌঁছে দেয় শেষ অনিবার্যতায়। হঠাৎ, হঠাৎই সেই অস্বস্তিকর নীরবতা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায় মীনুর আকস্মিক আক্রমণে—সে মাকে অভিযুক্ত করে স্বার্থপরতা এবং কর্তব্যহীনতার অভিযোগে। এই পর্যায়ের তীক্ষ্ণ এবং স্থিরলক্ষ্য সংলাপে মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গুর মূল্যবোধগুলি খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়ে, মীনুর সংলাপে স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থার একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এই দৃশ্যের আয়নায়। বলা যায়, এইটিই ছবির প্রাণদৃশ্য। আশংকা, উৎকণ্ঠা, মায়ামমতা তছনছ ক'রে বেরিয়ে আসে অনিবার্য দাঁত-নখ। শুধু

পরম অসহায়তার মধ্যে তখন বসে থাকেন হৃষিকেশ, আর কী করুণ তাঁর সেই বসে থাকা!

এবং তারপর প্রায় শেষরাতে নিষ্পাপ মুখে চীনু ফিরে আসে। চীনু ফিরে আসে তখন, যখন তার আর না-ফেরা বিষয়ে সকলেই স্থির সিদ্ধান্তে পেঁৗছে গেছে, যখন তার মৃতদেহ ফিরলেই সকলে অস্বস্তি থেকে, মধ্যবিত্তের ঠুনকো লজ্জাবোধ থেকে অন্তত বাঁচতো. এবং সেই ফেরার কাছে এই ফেরা তো বস্তুতই খুববেশী মূল্যহীন। মৃণাল এখানে মুখ্যত পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্বের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেও, তাকে দেখাতে চেয়েছেন এই সামাজিক ব্যবস্থার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে—সেজন্যেই চীনুর প্রেমিকের '৭৬ সালে পুলিশের গুলিতে খুন হওয়ায় সংবাদ নিছক সংবাদকে ছাপিয়ে আমাদের আরো অনেকদূর নিয়ে যায়। আসলে, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বায়বীয় ঘটনা নয়। কেননা মৃণাল নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন শিল্পীকে আজ প্রতিনিয়ত ঘটনার চাপে খানিকটা সামাজিক নৃতাত্ত্বিকের, রাজনৈতিক প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ ক'রতেই হবে। এবং মৃণালের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে বলেই তাঁর ক্যামেরায় নারীর এই শোচনীয় বন্ধন দেখে আমরা লজ্জিত হই, পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাকে ওতপ্রোত দেখি ব'লেই তথাকথিত সমাজসেবিকা মহিলাদের তন্তুজ-বন্ধন-মুক্তি আন্দোলনের তুলনায় তা অনেক মহান হ'য়ে ওঠে, এ-কথা লেখাই বাহুল্য।

তো, চীনু বাড়ি ফিরে আসে। নিষ্পাপ তার চোখমুখ। সে আকুলভাবে জানাতে চায় নিজের কথা। কেউ শোনে না, শুনতে চায় না, কথা বলে না, বিশ্বাস করে না। এবং এখানে মৃণাল একটি অদ্ভুত ফিল্মেটিক্ কাজ দেখিয়েছেন। হঠাৎ চীনুর ফেরার সাড়া পেয়ে একে একে সারা বাড়ির আলোগুলো জ্বলে ওঠে। ক্যামেরা নীচ থেকে পুরো বাড়িটাকে ধরে। চারদিকে তখন অসংখ্য সন্দিগ্ধ, অশ্লীল চোখমুখগুলি ঘিরে আবহসঙ্গীতে যেন রণদামামা বেজে ওঠে। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ান ব্যাঘ্রমনস্ক বাড়িওয়ালা, ক্যামেরা-কৌশলে হঠাৎ যাকে ধুতি, গেঞ্জি পরা হিটলার বলে ভ্রম হয়। তিন মুহূর্ত তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্যামেরা সিঁড়ি দিয়ে বীর-দর্পে তাকে নীচে নামিয়ে আনে, একেবারে হৃষিকেশের দরজায়। তিনি নেমে আসেন পুরুষ শাসিত সমাজের, খয়া-খর্বুটে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের, কাগজে একনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে। আর নেমে এসে হৃষিকেশকে শাসান 'ভদ্রলোকের বাড়িতে' একটি মেয়ের রাত ক'রে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে। এবং সেই সাথে তাঁকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশও দেওয়া হয়। এই দৃশ্যে তখন হঠাৎ চীনুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'আপনারা বিশ্বাস করুন'—এই অসহায় অসম্পূর্ণ আর্তি যখন আমাদের গভীর বেদনার দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন, ঠিক তখনই সেই কান্নাকে অসীম ক্রোধে পরিণত ক'রে উল্কার মতো ছুটে আসে চীনুর ভাই তপু। সে হঠাৎ দুরন্ত রাগে বাড়িওয়ালার কলার চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে ওঠে, ফেটে পড়ে—'অমন ভদ্রতার মুখে লাথি মারি'—শোনা যায় তার মুখে এই অনিবার্য সংলাপ। এবং আমরা তখন মুহূর্তে তপুর হাত ধ'রে পেঁৗছে যাই সেই স্থির লক্ষ্যে, যেখানে আমাদের পেঁৗছুবার কথা আছে। সেজন্যই সেই ভয়াল হতাশার রাত যখন শেষ হয়, তখন দেখা যায় আগের রাতে যেই মা ভয়ে, লজ্জায় কুঁকড়ে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মা-ই পুনরায় অনায়াস সাহসে ভোরবেলা বাইরে এসে দাঁড়ান। আসলে, আমাদের হতাশা, ভয়, লজ্জা, গ্লানির আড়ালে যে একধরণের সাহসও গোপন থাকে, তা স্পষ্ট ক'রে দেখাতে চেয়েছেন মৃণাল সেন। এবং সে দেখানো স্থির, শৈল্পিক, অব্যর্থ।

মৃণালের এই ছবিতে রাজনৈতিকতার তাগিদে মিটিং, মিছিল, পুলিস, মনুমেন্ট ইত্যাদি অনেকানেক অনুষঙ্গ, যা অক্লেশে ব্যবহৃত হতে হতে খুব বেশি ক্লিশে হ'য়ে গেছে, না থাকলেও এই ছবি মোটেই রাজনীতি বর্জিত নয়। তবে তা অনেকটাই দার্শনিকতা, শৈল্পিকতায় মণ্ডিত। বস্তুত, এখানে রাজনীতি থাকলেও রাজনৈতিক চেঁচামেচি নেই। এখানে তা আমাদের দেখে নিতে হয় নিজস্ব চৈতনা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। আর এ-কথা কে না জানে যে, প্রাত্যহিক দেখা থেকে শিল্পের দেখা, যা নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের মত, অনেক বেশি শক্তিশালী, অমোঘ। বস্তুত, শিল্পীর যেমন দায় থাকে জনগণকে এন্টার-টেন করার, অনুরূপভাবে দর্শকেরও তো দায় থেকেই যায় শিল্পীকে বোঝার। শিল্প তো আর পোস্টার, শ্লোগানের বিকল্প নয়। তাই শ্লোগানই এখানে মৃণালের হাতে শিল্প।

এবং সেই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে সার্থক ক'রে তোলার জন্য যাঁরা সর্বতোভাবে দায়ী, তাঁরা হ'লেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, শ্রীলা মজুমদার, উমানাথ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মমতাশংকর প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই কী অসাধারণ দৃপ্ততায়, অভিনয় হীন অভিনয়ে ছবির চরিত্রের রক্তমাংসের সাথে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছেন! তাছাড়া সঙ্গীত (বি. ভি. কারন্থ), ক্যামেরা (কে. কে. মহাজন), চিত্রনাট্য (মৃণাল সেন), সম্পাদনা (গঙ্গাধর নস্কর)—সবকিছু মিলে ছবিটিকে সার্থকতার দিকে পেঁৗছে দিয়েছে। সর্বোপরি, ছবিটিতে রঙের ব্যবহার একটি দুর্লভ উপহার। একটি কালো জীবনের কাহিনী রঙের সহায়তায় আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।

তবে এসব সত্ত্বেও কয়েকটি ছোটখাটো দুর্বলতা আমাদের ঈষৎ পীড়িত করে। যেমন, ১। বুড়ি ঠাকুমাকে দিয়ে 'মেয়ে জন্ম বড় কষ্টের' ইত্যাদি শরৎচন্দ্রীয় সংলাপ একেবারেই প্রয়োজন হীন, বাহুল্য মনে হয়। আমরা তো সে কথা আগেই টের পেয়ে গেছি ঘটনার সহায়তায়—তাহ'লে এই অতিরিক্ত সংলাপ কেন? নাকি মৃণাল দর্শকের বুদ্ধির প্রতি ততোটা আস্থাশীল নন? ২। রঙের কাজ এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছেলেটির সকালবেলার ব্যান্ডেজের লাল রক্ত রাতেও কেন একটুও কালো হয় না? ৩। স্কুটারে ওই অন্তর্বিহীনপথ কিসের জন্য এলাকার মধ্যে থানা কত যোজন দূরে থাকে? এটাতো গতি এবং উত্তেজনা বোঝাতে বাংলা ছবির পুরনো ফরমুলা। ৪। শেষ ট্রামের অতক্ষণ দাঁড়াবার প্রয়োজন কি শুধুমাত্র হৃষিকেশের উৎকণ্ঠা বেশি সময় নিয়ে দেখাবার কারণে? ৫। মৃণাল কি মীনুর ভূমিকাহীন অভিযোগের জন্যে খুব বেশি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন? ৬। হাসপাতালে মৃতা মেয়েটি কার বোন সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কতটুকু? ঠিক যেমন প্রয়োজন হীন রাস্তায় জল-বিয়োগের দৃশ্যটি। মৃণাল কেন ভুলে যান যে, তিনি কোন কলকাতা-বিষয়ক ডকু-

[শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়]

বইপত্র

নিশাকালের স্বরধ্বনি/শ্যামল সেন

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। পাঁচ টাকা

সময়কে একজন কবি কীভাবে দেখেছেন তা বোঝা যায় জীবনকে তিনি কীভাবে দেখেছেন তা থেকে। শুধু ন্যুব্জ পৃষ্ঠ বৃদ্ধ সময় নয়—দ্বান্দিক গতিবেগে তীব্র সময়ই শ্যামল সেনের কবিতার অধিষ্ঠাতা আবেগ। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত জীবন, জীবনের কাছে পরাভূত মৃত্যু বা মৃত্যুতেও মহৎ জীবন—শ্যামল সেন ছুঁয়ে আছেন। কথাগুলো মনে পড়ছে কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থ "নিশাকালের স্বরধ্বনি" বইটি হাতে পেয়ে। আরো বলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ, "মরুবৃত্তে সময়ের ক্রোধ" এবং "নিশাকালের স্বরধ্বনি" এ দুয়ের মধ্যে সময়ের যে ফারাক—তাতে শ্যামলবাবুর বোধ, বিশ্বাস এবং তাঁর কবিত্বের উত্তরণকে উপলব্ধি করে।

"নিশাকালের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যারা যুদ্ধরত" তাদেরই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটা কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। কাজেই কাব্যগ্রন্থে নিয়মমাফিক কোন 'মুখবন্ধ' বা 'প্রস্তাবনা'-র তথাকথিত কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। সংকলনের আটত্রিশটা কবিতাই সে দায়িত্ব পালন করেছে। আমার মনে হয় কবি নিজেও তা সচেতনভাবে জানেন। আর জানেন বলেই "অকাল-বৈশাখীর কবিতা" দিয়ে যা শুরু হয়েছে, "এখন উদ্ধার সতর্ক শাসনে" তা শেষ হয়েছে। একটু ভুল বললাম, বিষয় ও আবেগগত ঐক্যের নির্দিষ্ট উপলব্ধিতে এসে থেমেছে—জীবনের টানে। কারণ—"স্মৃতি নয়, এখনও ভয়ংকর উজ্জ্বল সেইদিন,/চোখের উপর উঁচিয়ে রেখেছে তার ধারালো সঙিন" ['এখন উদ্ধার সতর্ক শাসনে']

কবিতাগুলো লেখা হয়েছে প'চাত্তর থেকে আটাত্তর—এই চার বছরে। সত্তর দশকের শেষার্ধ যাকে বলতে পারি। যখন শাসকগোষ্ঠীর হিংস্রনখর থাবায় দেশ বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যে সময় বার্ধক্যের নয়, তারুণ্যের বিচক্ষণতার নয় উদ্দীপনার, শীতল প্রজ্ঞার নয় আগ্নেয় উপলব্ধির—সেই সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি বলেন, "লঘুরসে কলম ধরার বাসনা ছিলনা কোনদিন,/আজো নেই/এই সমৃদ্ধির আহ্লাদে দিনকানা সোনার দেশে/এই কালরাত্রিতে" [অকাল-বৈশাখীর কবিতা] কারণ সমাজ সচেতন পর্যবেক্ষক শ্যামলবাবু জানেন—"কী যেন দেবার কথা ছিল, এখনও আছে/হাজার দুয়ারী এই বুকের দরজা খুলে/বসে থাকি, বেলা অবেলায়..." ['বিষদাঁত']

বস্তুতঃ এই হাজার দুয়ারী বুক নিয়েই তিনি খুঁটে খুঁটে তুলেছেন সেই সময় সমাজ এবং সামাজিককতাকে। 'চতুরঙ্গ' কবিতায় তাই বিদ্রূপের বাঁশি বাজিয়েছেন 'আত্মপর', 'সৎসাহিত্য' কখন বা 'নীতিরাজ' বা 'অনুশাসন' কে লক্ষ্য করে এক এক রাগিনীতে। কিংবা যখন 'গরমিল' দেখেন "বিদ্যে বোঝাই মানুষগুলি/মাথায় নিয়ে পায়ের ধুলি/আস্থা রাখে আপোষে" অথবা "এইভাবে যুদ্ধের সাজসজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে/সজ্জন ধার্মিক যিনি/শান্তিজলে গা ধুয়ে/পরকালের ধ্যানে বসেন" ['অস্ত্রের নিজস্ব খেলা'] এবং সমাজতান্ত্রিক 'প্রগতির তালিমারা দেশের বেহায়াপনায় কবির স্যাটায়ার যখন ফেটে পড়ে "লেনিন আপনি কোথা, কন্দুর/ডাকি শোকসভা—দ্বিতীয় মৃত্যুর"। তখন আর হাসি আসে না। সেই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্য-স্রোতের মাঝে দুফোঁটা সাদা অশ্রু চিক্‌চিক্ করে ওঠে। কবির ব্যথিত হৃদয় পাঠককে সচেতন করে। ধাক্কা মারে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আসলে শ্যামলবাবু সমাজসচেতন পর্যবেক্ষক। চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও মনে, প্রকাশে ও প্রেরণায় তিনি দুর্গত জনের মুখপাত্র। তাই তিনি জানেন জীবন মানে ভেঙে পড়া নয়,—ভেঙে বেরিয়ে আসা। আর সেই জীবনের তাড়নাই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। সেই প্রাণস্পন্দনকে ফুটিয়ে তুলতে কবিতা হ'ল তাঁর হাতিয়ার। এখানেই তিনি মানিক-সুকান্তের উত্তরসূরী। জনগণের কবি—জনজাগরণের কবি। তাই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে ওঠে—হাজার প্রতিকূলতার ভেতরেও। কারণ তাঁর তো জানা আছে "জীবনের দাম দিয়ে/রণবাদ্য বাজিয়ে/একে একে রাত সরে/দিন আসে ঘরে ঘরে" ['দিন আসে']। তাই সেই প্রয়োজনের আয়োজনটুকু করতেও তিনি পিছপা নন—"তিরিশের ক্রুদ্ধ যৌবন নিয়ে সাধ্য ছিল কমরেড/আপনার সাথী হবো/দামাল ছেলের মতো ছুটে যাবো মাঠ মিল খেতে/রোদ জলে হেমন্তের বীজ বুনে দিতে"। এইভাবে—অবশেষে কবির প্রত্যয় দৃঢ় কংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে। হোক না তা নিশাকালে—হোক না তা যতই অন্ধতমস। কারণ—"নবযুগের পান্ডারা/বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে থাকুন আপনারা।/যারা জাগায়—জেগেই আছেন;/বুক চিতিয়ে লড়বে যারা/নবযুগের স্রষ্টা তারা,/চিরকালটা এগিয়ে থাকেন"।

শেষ করার আগে যে কথাগুলি বলা একান্ত প্রয়োজন তা হ'ল—শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আরও একটু ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। হিরণ মিত্রের প্রচ্ছদে পদানত জীবনের মনোচিত্র সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। পাঁচ টাকা মূল্যকে স্মরণ রেখেই বলছি প্রত্যেক সৎ পাঠককেই গ্রন্থটি আকর্ষণ করবে। এবং শেষতঃ কবির কথাতেই বলতে হয়—"শান্তিকামী ছলনার জাতীয় আগস্ট থেকে/নভেম্বর কত দূর"?

—দুর্গা ঘোষাল

চন্দন বসুর তুলিতে—



পরিবর্ত শক্তি উৎস

ভূ-তাপ শক্তি/জিওথার্মাল এনার্জি—বৈজ্ঞানিকদের মতে,—পৃথিবীর কেন্দ্রে একধরণের তরল আছে; ভূ-ত্বকের গভীরতা ৩২ কিলোমিটার. ৩২ কিলোমিটার নীচের এই তরল পদার্থের নাম ম্যাগমা। ম্যাগমা সবসময় প্রচন্ড গরম অবস্থায় থাকে। ভূ-ত্বকের মধ্যে কোন জায়গায় ফাটল দেখা দিলে সেই ফাটল দিয়ে ম্যাগমা পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রচন্ড চাপ। এই চাপে ম্যাগমা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত। আর যে সমস্ত জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হয় তাদের বলে আগ্নেয়গিরি। (প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের ফাটলের বহিঃর্মুখ সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে থাকে বলেই বাংলায় অগ্ন্যুৎপাত কেন্দ্রের নাম আগ্নেয়গিরি) ভূ-ত্বকের ফাটল বন্ধ হয়ে গেলে অগ্ন্যুৎপাতও বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-ত্বকের ৩২ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে জল ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। মানুষ জল ও খনিজ পদার্থ ভূ-ত্বকের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ভাবে আহরণ করে। আবার জলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবেই জল ভূ-পৃষ্ঠের উপর চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা জল সধারণতঃ গরম হয়; এবং জল বেরিয়ে আসার জায়গাগুলির নাম উষ্ণ-প্রস্রবণ. উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্টির পিছনেও ম্যাগমার যথেষ্ট অবদান আছে. ভূ-ত্বকের কোন জায়গায় হয়তো জলের অবস্থান এত গভীরে যে ম্যাগমার তাপে জল আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এখন যদি সেই জায়গায় ভূ-ত্বকে কোন ফাটল সৃষ্টি হয় তবে সেই ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ভূ-কেন্দ্রর প্রচন্ড চাপই এই নির্গমনের কারণ। সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণের।

ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ জিওথার্মাল এনার্জির ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক এই নিয়মটি পালন করা হয়। ভূ-ত্বকে একটি নল বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ টিউব-ওয়েলের মতই। তফাৎ শুধু গভীরতায়। ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা ৩২ কিলোমিটার হলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তার চেয়ে অনেক গভীরতাতেই ম্যাগমা পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিকেরা সেই জায়গাগুলি নির্ণয় করে দেন। ভূ-ত্বকে নল অনুপ্রবেশ করানোর অর্থ হল ভূ-ত্বকে একটি ফাটল সৃষ্টি করে ম্যাগমার কাছাকাছি পৌঁছানো। ম্যাগমা এতই গরম যে ভূ-ত্বকের মধ্যে অনেকদূরে পর্যন্ত তার তাপ পাওয়া যায়। প্রথমে যে নলটি বসানো হয় তার ঠিক কেন্দ্রে আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের নল বসানো হয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো একই কেন্দ্র বরাবর দুটি নল ভূ-পৃষ্ঠে উলম্ব অবস্থায় বসানো হল। সাধারণতঃ এই নলগুলিকে ভূ-ত্বকে ২৭০০ মিটার পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করালেই চলে।

এখন বাইরের নলটি দিয়ে ঠান্ডা জল ভূ-কেন্দ্রের দিকে পাঠানো হয়। ভূ-কেন্দ্রের প্রচন্ড তাপের প্রভাবে সেই জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। বাষ্পের সাধারণ গতি উর্ধমুখী। প্রচন্ড চাপে ঐ বাষ্প ভেতরের নল দিয়ে ভূ-ত্বকের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-ত্বকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এই বাষ্পের পরিমাণ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০০০০ থেকে ৮০০০০ পাউন্ড। তবে ২ লক্ষ পাউন্ড প্রতি ঘণ্টায় চাপ এইভাবে নির্গত বাষ্পর থেকে পাওয়া গেছে।

প্রচন্ড চাপে নির্গত এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর টারবাইন ঘোরানো গেলে তার সংগে জেনারেটর সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর উত্তরে জেয়ার্স নামক জায়গায় ১২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে, যেখানে ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। জেয়ার্সের জিওথার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিটের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১৪ মেগাওয়াট; এটি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং ইউনিটের প্রতিটির নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট।

শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয় ইটালী, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকো, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আইসল্যান্ডেও বর্তমানে জিওথার্মাল এনার্জি অর্থাৎ ভূ-তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আগ্নেয়গিরি এলাকার বহু জায়গায় বাইরে থেকে জল আর অনুপ্রবেশ করাতে হয় না। ভূ-ত্বকের ভিতরের জল বেরোবার জায়গা পেয়ে প্রচন্ড তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জোয়ার-ভাঁটা থেকে সংগৃহীত শক্তি/টাইডাল এনার্জি সমুদ্র ও নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এক বিশেষ ধরণের টারবাইন জোয়ার-ভাঁটা সমৃদ্ধ নদী অথবা সমুদ্রে সংস্থাপন করা হয়। সেই টারবাইনের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ফ্রান্স এই ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদনে পথিকৃৎ।

হাইড্রলিক গ্যাস—১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতিটি মন্টগোলফায়ার আবিষ্কার করেন। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। নদী বা সাগরের জলকে যান্ত্রিক উপায়ে নীচু জায়গা থেকে উপরে

[শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়।

বিভাগীয় সংবাদ

বীরভূম জেলা :

ইলামবাজার ব্লক যুব-করণ—গত ২২শে মার্চ থেকে চার দিন ব্যাপী যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ইলামবাজার ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় ইলামবাজার প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসব পালিত হয়। মূল উৎসবের আগে ১৫ই মার্চ ১৯৮০ যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে নানা ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সঙ্গে পঃ বঃ সরকারের মৎস্য প্রদর্শনীর স্টল খোলা হয়েছিল। এছাড়া কুটীর শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বয়স্ক শিক্ষার প্রদর্শনীও ছিল। উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। সকালে ১০ কি. মি. দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসব আরম্ভ হয়। ব্রতচারী নাচ, প্রদর্শনী কবাডি খেলা, নাটক ইত্যাদি সকাল থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত জনসমাবেশে মুখরিত হয়েছিল।

২৩শে মার্চ প্রদর্শনী ভলিবল খেলা, জিমন্যাসটিক প্রদর্শন, হাবু গান, সাপুড়ে গান, ফকির গান, ভদু গান সাঁওতাল নৃত্য, বাউল গান, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৪শে মার্চ মেয়েদের প্রদর্শনী কবাডি প্রতিযোগিতা, যোগাসন প্রদর্শন, গীতিনাট্য, তথ্য বিভাগ কর্তৃক ছায়াচিত্র প্রদর্শন। খ্যাতনামা শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তীর বিচিত্রানুষ্ঠান প্রায় ৪০০০ হাজার নরনারীকে আনন্দ দিয়েছে।

২৫শে মার্চ ছিল বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি। সন্ধ্যা ৮টায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। সভায় জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা পি. সি. সেন সভাপতি ও ভারতকুমার মদন ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানলাভকারীদের একটি মেডেল ও মানপত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বি. ডি. ও. নন্দদুলাল অধিকারী সভার উদ্বোধন করেন। ব্লক যুব আধিকারিক মদনমোহন সিংহ সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। সভার শেষে "ভারতকুমার" মদন ঘোষ এবং 'সারা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী" মলয় সরকার এবং বীরভূম জেলার কৃতী দেহগঠন সংস্থা কর্তৃক দেহ সৌষ্ঠের প্রদর্শনী এবং মুর্শিদাবাদের উমা দত্ত ও কাকলী মিত্র কর্তৃক যোগাসন ও একক জিমন্যাসটিক প্রদর্শন অনুষ্ঠান প্রায় দু হাজার নরনারীকে মুগ্ধ করে এবং যুব উৎসবের সমাপ্তি হয়।

যুব উৎসবের দিনগুলিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যুব উৎসব প্রাঙ্গণে আসেন—তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ব্রজমোহন মুখার্জি।

যুব উৎসবের মাধ্যমে প্রদর্শনীগুলি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনেছিল। প্রতিদিনকার জনসমাগম দেখে মনে হ'তো যেন মেলা বসেছে। মেলার মতই নাগরদোলা, দোকান ইত্যাদি সবের আয়োজন ছিল।

বাঁকুড়া জেলা :

ছাতনা ব্লক যুব-করণ—সম্প্রতি ছাতনা চন্ডিদাস বিদ্যাপীঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ছাতনা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও ছাতনা ব্লক যুব উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় ব্লক পর্যায়ে এই প্রথম যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পাঁচদিন ব্যাপী এই যুব উৎসবের সূচনা হয় ১৯শে মার্চ '৮০ সকাল ৮টায় এবং পরিসমাপ্তি ঘটে ২৩শে মার্চ '৮০ সন্ধ্যা ৭টায়। যুব উৎসবের দিনগুলিতে ব্লকের ৩৩টি গ্রামীণ যুব সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচশত প্রার্থী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি, বিতর্ক ও একাংক নাটক প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। খেলাধুলার অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিভাগে ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও ৮০০ মিঃ দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা নিক্ষেপ ও ডিসকাস থ্রো প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিঃ দৌড়, লং জাম্প, শট পুট, ডিসকাস থ্রো ও বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা উৎসবের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। ব্লকের ৮টি যুব নাট্যগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৩শে মার্চ '৮০ যুব উৎসবের শেষ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগী ও যুব নাট্যগোষ্ঠীকে ৮০টি পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য সুভাষ গোস্বামী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসব আয়োজনে ব্লকের যুব-ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। যুব উৎসবে প্রতিদিনই সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহস্রাধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটে। ব্লকের যুব ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক মনোভাব বিকাশে ও প্রসারে যুব উৎসব আয়োজনের এই প্রয়াস সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

সোনামুখী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও রামপুর মিতালী সংঘের সহায়তায় ১৫ই মার্চ ১৯৮০, শনিবার সোনামুখী পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি গোবর্দ্ধন দাস মহাশয় রামপুর খেলার মাঠে এক অনাড়ম্বর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্বোধনী সঙ্গীতের সাথেসাথে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে "যুব উৎসব '৮০"-এর উদ্বোধন করেন।

পতাকোত্তোলনের সময় সমস্ত প্রতিযোগী, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেদীর চারিদিকে বৃত্তাকারভাবে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশের সমৃদ্ধি আরও বাড়িয়ে তোলেন।

পতাকোত্তোলনের পর নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী চারিটি বিভাগের [বালক "বড়", বালক "ছোট", বালিকা "বড়", বালিকা "ছোট"] "খেলাধুলা প্রতিযোগিতা" (হিট্) শুরু হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা আশাতীত হওয়ায় বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তাল রেখে ও

প্রয়োজনীয় বিরতির মাধ্যমে "খেলাধুলা-প্রতিযোগিতা" বিকাল ২-০০ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে থাকেন। আনন্দের বিষয় গ্রীষ্মের দাবদাহ সত্ত্বেও প্রতিযোগী ও বিচারকদের মধ্যে কোন রকম উৎসাহের ঘাটতি দেখা যায়নি।

বিকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যথারীতি নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী রামপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুরু হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগেও প্রতিযোগীর সংখ্যা আশানুরূপ হওয়ায় বিচারক-মণ্ডলী রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের আগে ঐদিনকার প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেনি।

পরের দিন ১৬ই মার্চ '৮০ সকাল ৮-৩০ মিনিটে খেলাধুলার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আগের দিনের তুলনায় এদিন আরও বেশী উৎসাহী দর্শক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি খেলার চূড়ান্ত ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো হয়।

ঐদিন বিকালে (২-৩০) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শুরু করা হয়। ঐদিনকার অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় খুব অল্পসময়ের মধ্যেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

বাঁকুড়া জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি রঞ্জিতকুমার মণ্ডল মহাশয় বিশেষ অসুবিধার জন্য এই পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরহিত্য করতে না পারায় পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি গোবর্দ্ধন দাস এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুরস্কার বিতরণের পর ব্লক যুব আধিকারিক; "যুব উৎসব" কমিটির সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি পর পর "যুব উৎসবের" উদ্দেশ্য সহ "যুব কল্যাণ" বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচী আলোচনার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

এছাড়া তাঁরা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে যুবকদের কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

ইন্দাস ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় যুব সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় গত ২২শে মার্চ '৮০ ইন্দাস উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন ব্লক যুব আধিকারিক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এর পর শুরু হয় নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচী। ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অ্যাথলেটিকসের অন্যান্য বিষয়সূচী। ঐদিন বিকেলে শুরু হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুইটি বিভাগেই প্রভূত জনসমাগম হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ক্রীড়ানুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু করা হয়। বিকেলে আরম্ভ হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত গীত, স্বরচিত কবিতা ও যেমন খুশী সাজো। রাত্রি ৭টা নাগাদ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। ঐদিন পুরস্কার বিতরণী সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাঁচুগোপাল আদিত্য ও প্রধান অতিথি ছিলেন রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সলিল কুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি মহাশয় পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন। এ ছাড়া এই সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বি. ডি. ও. ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিবর্গ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। পরিশেষে প্রধান অতিথি মহাশয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বি. ডি. ও. ইত্যাদি যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিযোগী ও সমবেত জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেন।

নদীয়া জেলা :

রানাঘাট-২—গত ৩১-৩-৮০ তারিখে **দত্তপুলিয়া** ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন -এর সহযোগিতায় রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের পরিচালনায় দত্তপুলিয়া ফুটবল ময়দানে বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় এক মনোরম পরিবেশে দত্তপুলিয়া ইউনিয়ন একাডেমির প্রধান শিক্ষক কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন নদীয়া জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারক গোপেশ্বর মুখার্জী মহাশয়। বন্দুক থেকে গোলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে পতাকা উত্তোলন এবং যোগদানকারী সংস্থাগুলি নিজ নিজ পতাকা সহ মাঠ পরিক্রমাই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয়।

সকাল ৯টায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী খো খো ট্রেনিং শুরু হয় এবং ১১টায় শেষ হয়, ইতিমধ্যে সকাল ৯-৩০ মিঃ ১৫০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খো-খো ট্রেনিং শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দুই ঘণ্টা ব্যাপী কবাডি ট্রেনিং শুরু হয়। এই দুই ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা নেয়। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নদীয়া জেলা কবাডি প্রশিক্ষক শান্তিময় দত্ত এবং খো খো প্রশিক্ষক দিলীপ চক্রবর্তী। বেলা ১টায় ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং ২টায় বড়দের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ৩টায় লোক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রভূত জনসমাগম হয়।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ব্যক্তিগত লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা ও দলগত দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা। প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক এই প্রতিযোগিতা উত্তেজনার মধ্যে উপভোগ করেন।

ঐদিনকার শেষ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেদের লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা দর্শক মণ্ডলীর মন ভরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা ৬টায় দত্তপুলিয়া ইউঃ একাডেমির প্রধান শিক্ষক মহাশয় তথা সভাপতি মহাশয় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করে ঐদিনের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের প্রচেষ্টায় গত ২১-৫-৮০ থেকে ৪-৬-৮০ তারিখ পর্যন্ত দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলার শরীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় ১৪ দিন ব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দত্তপুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীন গ্রামগুলি থেকে ৫৩ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নাম লেখায়। ২১শে মে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক মহাশয়ের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া

শুরু হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কাঞ্চন ব্যানার্জী এন. আই. এস. এবং শংকর ব্যানার্জী এন. আই. এস.। শিক্ষার্থীগণ বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে সব কিছু শেখানো এবং শেখা সম্ভব নয়। তথাপি শিক্ষার্থীবৃন্দ যে বেশ কিছু কলাকৌশল রপ্ত করেছেন তার প্রমাণ মেলে ৪-৬-৮০ তারিখে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকায়। উক্ত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি সত্যভূষণ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক গোপেশ্বর মুখার্জী। সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের সামনে শিক্ষার্থীগণ তাঁদের শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রদর্শনী দেখান এবং যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেন। ফলে অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত উপস্থিত প্রায় ২000 হাজার দর্শক প্রতিযোগিতামূলক খেলাটি উপভোগ করেন। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের পুষ্প স্তবক সহ মানপত্র প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণনগর-১নং ব্লক তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন—স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের জন্য গত ১২ই জুন '৮০ কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অর্থানুকুল্যে 'ব্লক তথ্য কেন্দ্রের' উদ্বোধন করা হয়।

এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন সুবল মার্ডি, মহকুমা শাসক, সদর (দক্ষিণ) এবং কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধান সভার সদস্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জেলা শরীর সংগঠক বিনয়-ভূষণ দে, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অতুল চন্দ্র টিকাদার, সমাজ-শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক মণি চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে যুব সমাজকে "তথ্য কেন্দ্রের" সংগে সৌহার্দাপূর্ণ যোগাযোগের সাদর আহ্বান জানান।

এই তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্প, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি, ভ্রমণ সংক্রান্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সাম্প্রতিক তথ্যাদি সংগ্রহের সুযোগ সুবিধা লাভ করবে স্থানীয় যুব সম্প্রদায়।

বর্ধমান জেলা :

মেমারী ব্লক যুব-করণ—১৯৮০ সাল ২২শে মার্চ মেমারী ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেমারী সন্তোষ মঞ্চে এক বিরাট যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার। এই অনুষ্ঠান চলে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত। যুব উৎসবের খেলাধুলার আয়োজন করা হয় স্থানীয় মেমারী ভিঃ এমঃ হাইস্কুল হোটপুকুর ময়দানে। নাটক এবং প্রদর্শনী হয় মেমারী সন্তোষ মঞ্চে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধান সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার পচা গলা সমাজ ব্যবস্থা ও ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের উত্তরণের ক্ষেত্রে নতুন পথের আলোক বর্তিকা নিয়ে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেন—যত দুর্যোগই আসুক তা কাটবেই। এটা ইতিহাসের নিয়ম; তিনি বলেন, অমৃতের সন্তান মানুষ—সেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল হচ্ছে যৌবন।

অত্যন্ত রুচিশীল এই প্রদর্শনীটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদর্শনী, ১নং ব্লক যুব-করণে সীবন শিক্ষা কেন্দ্র, পঞ্চগ্রাম সমবায় কুটির শিল্প, আমাদপুর স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর স্টলগুলি। এই উৎসবে ২১টি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন গড়ে ৫৫ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১১২ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার এবং প্রসংশা পত্র দেওয়া হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাপতি মেহবুব জাহেদী।

মালদহ জেলা :

পুরাতন মালদা ব্লক যুব-করণ—গত ২৬শে জুলাই, ১৯৮০ মঙ্গলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে দুটি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। (১) মেয়েদের সীবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২) ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারমধ্যে ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণে ৫০ জন সফল ছাত্রকে এবং মেয়েদের সীবন প্রশিক্ষণে ২৬ জন সফল ছাত্রীকে প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় যুব নেতা অজয় খাঁ. প্রধান অতিথি হিসাবে বিধান সভার সদস্য শুভেন্দু চৌধুরী বলেন, এই বৃত্তিমুখী শিক্ষার ফলে যদি কিছু ছেলে-মেয়ে সরকারী চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই কিছু রোজগারের জন্য সচেষ্ট হন তবেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে। ফলে সরকার আরও অধিক সংখ্যায় এই বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে উৎসাহী হবেন। সবশেষে তিনি প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।



পুরাতন মালদা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে বৃত্তিমুখী পাম্প-সেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষণরত ছাত্ররা।

পাঠকের ভাবনা

খেলাধুলা ও দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা বিষয়ে দুটি নিয়মিত বিভাগ

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। কিন্তু নিয়মিত পাঠক হিসাবে এই পত্রিকাকে আরও সুন্দর করবার জন্য আমি কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

প্রথমত বলতে পারি প্রত্যেক পত্রিকায় কিছু নিয়মিত বিভাগ আছে। এই পত্রিকার ক্ষেত্রে সেটা না করা গেলেও যেটা করা যেতে পারে সেটা হল খেলাধুলা বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে ব্যাডমিন্টন, যথা প্রকাশ পাড়ুকোন সম্পর্কে বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্বন্ধে, বা আন্তর্জাতিক কোন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বা অ্যাথলেটিক খেলোয়াড় সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাহলে পত্রিকাটির যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তেমনি যুবকদের কাছে পত্রিকাটি সম্পর্কে আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। তবে খেলাধুলা সম্পর্কে কি প্রকাশ করা যেতে পারে না পারে সেটা সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচ্য বিষয়। আমার কথা হল খেলাধুলা বিভাগের মাধ্যমে খেলাধুলা সম্পর্কে নিয়মিত কিছু এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করুন অর্থাৎ খেলাধুলাকে এই পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করুন।

দ্বিতীয়ত আর একটি কথা বলতে চাই সেটা হল "দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক" সমস্যাবলী সম্পর্কে নিয়মিত কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করা যেটা এই পত্রিকা এড়িয়ে গেছে। যেমন ধরুন আসাম সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মাত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন ফেব্রুয়ারী '৮০ সংখ্যায় (আসামের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে—অনিল বিশ্বাস)। যাই হোক আসাম সম্পর্কে আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করুন কারণ আসাম সমস্যা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং এ সমস্যা সম্পর্কে যুবকদের ভালভাবে জানানো দরকার। সেই রকম আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও কিছু লেখা প্রকাশ করুন।

সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যদি সম্ভব হয় তবে দুটি বিভাগকে নিয়মিত করুন। আমার মনে হয় যুবমানস পত্রিকাটি তবেই যুব মানসে গভীরভাবে রেখাপাত করবে।

—অমরেন্দ্রনাথ পাল
সুভাষনগর, বনগ্রাম
২৪-পরগনা

লিটিল ম্যাগাজিন ও ছোট গল্প

॥ ১ ॥

আমি একজন মাসিক যুবমানসের পাঠক। মে-সংখ্যা পড়লাম। ঋতীশ চক্রবর্তীর "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য", আলোচনাটি অত্যন্ত প্রশংসার অধিকার রাখে। লেখক-লেখিকার কাছে আমার আবেদন লিটিল ম্যাগাজিনের জীবন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখা যুবমানসের পাতায় তুলে ধরুন। এ ছাড়া মাননীয় সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে আমার আবেদন এই বলিষ্ঠ পত্রিকাতে দুটি করে গল্পের স্থান দেওয়া হোক।

গৌরাঙ্গ দাশ
গ্রাঃ মহিষা, ডাঃ কুমড়া কাশীপুর
২৪ পরগনা

॥ ২ ॥

গ্রাহক হওয়ার পর প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়েই আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন—এক বাস্তব সত্য" লেখাটি চমৎকার। তবে লেখক একটা সমস্যার কথা তুলে ধরেননি। সেটা হলো বিক্রি করার অসুবিধা এবং পত্রিকার প্রচার বা উদ্দেশ্যর কথা সাধারণ লোককে জানানো। কারণ "লিটিল ম্যাগাজিন" পড়বার মত পাঠক সমাজ এখনও পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হয়নি। খুব কম লোককে দেখেছি যাঁরা খোঁজ খবর করে লিটিল ম্যাগাজিন পড়তে চান। অথচ লিটিল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। যুবমানস পত্রিকার উন্নতি হবে আশা রাখি।

দেবাশীষ বর্ধন
৫৮ মিলন পার্ক, গড়িয়া
কলকাতা-৮০

অলচিকি হরফ—সরকারী স্বীকৃতি

আমি আপনার পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তরুণ যুব-সমাজের "স্বপ্নকে" বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে হচ্ছে যে, মাননীয় বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফ "অলচিকি"-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, হ্যাঁ পূর্বের সরকার কল্পনাও করেননি। পশ্চিমবাংলার ২৫ লক্ষ সাঁওতাল ভাই-বোনদের ঐতিহ্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিলেন বামফ্রন্ট সরকার। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পশ্চিম-বাংলার বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফকে স্বীকৃতি দিলেন। এজন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা আরও অনেক

কাজ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "যুবমানস" পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

তপনকুমার উপাধ্যায়
সম্পাদক, বসিরান মিলন সংঘ
রায়গঞ্জ/পোঃ দিনাজপুর

সূচী বিন্যাস ও প্রকাশনা

অবহেলিত যুব সমাজকে সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক এবং তাঁদের সাহিত্য চেতনাকে পরিস্ফুটনের জন্য, আপনারা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ 'যুব মানস' পত্রিকার প্রকাশনায় গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। এবং গ্রাম বাংলার অবহেলিত প্রতিভা সংগ্রহে মনযোগ দিয়েছেন—এজন্য উদ্যোক্তা-দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবু বলছি 'যুব মানস' পূর্ণাংগ নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যখন এর প্রকাশনা তখন সাহিত্যের সব কটি শাখার অর্থাৎ অঞ্চলভিত্তিক লোক সংস্কৃতি, রম্যরচনা, ছড়া, ধারাবাহিক জীবনমুখী উপন্যাস ইত্যাদির সংযোজন থাকা ভালো। অবশ্য কট্টর পাঠক হিসাবে এটা আমার অনুরোধ। সবশ্রেণীর পাঠকের পাঠস্পৃহা যাতে মিটে যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলছি। সেই সংগে অনুরোধ করছি মাসিক 'যুবমানস' যাতে ঠিক সময়ে অর্থাৎ মাসে মাসে প্রকাশিত হয় তার জন্য উদ্যোগ নিতে। দেরীতে পত্রিকা (যুবমানস) হাতে পেলে উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। শিথিলতাও আসে। জানিনা মফস্বলের একজন সাধারণ পাঠকের হৃদয়াকুতি 'যুবমানসে' ছায়া ফেলবে কিনা? ছায়া ফেলুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

এ. কালাম
কান্দুরী.এড়োয়ালী
মুর্শিদাবাদ

ভাই-এর ভাবনা

লেখক, সাহিত্যিক বা কবি কোনো ভাবেই আমি সাহিত্য জগৎ বা ম্যাগাজিন জগতে পরিচিত নই। বলা বাহুল্য অত্যন্ত আশার সংগে আমার এই রচনাটি পাঠালাম। প্রথম কোনো পত্রিকায় রচনা পাঠাবার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে গিয়ে দেখলাম একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে আমার উৎসাহ হয়ত কিঞ্চিৎ অধিক। প্রথমেই এত বড় এক পত্রিকার দিকে হাত বাড়ানো। আমার মন দুঃসাহসিক বললেও বিবেক এক অদম্য আকর্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আশা করি নয় নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনাদের হাত-ও এই অখ্যাত কবির দিকে এগিয়ে আসবে। উৎসাহের মাত্রা, আকর্ষণের প্রভাব তাতে নিশ্চয়ই আরো বেড়ে যাবে এবং অসংকোচে বলতে পারি দুঃসাহসিকতার হীনতা ক্রমশঃ কমে যেতে বাধ্য হবে। অতএব শুধুমাত্র আপনাদের মিলিত হাত ধরার জন্য আমার হাত আগেই বাড়িয়ে অপেক্ষায় রইলাম। নিশ্চই বিফল হবো না। অন্ততঃ এই কৈশোর উদ্দামে মত্ত যুবক মন তাই বলছে।

আপনাদের এক ছোট্ট কবিবন্ধু বা ভাই—

প্রবীর কুমার দাস
পি-১১, ব্যাঙ্ক গার্ডেনস্‌
পোঃ বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগনা

[শিল্প-সংস্কৃতি: ২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মেন্টারী তুলছেন না! এমনকি বাড়িওয়ালার চরিত্র বোঝাতেও তা ততো প্রয়োজনীয় নয়। অবশ্য দৃশ্য দুটি অতিনাটকীয়তা বর্জিত হওয়ায় শৈল্পিক। তবে, এইসব অনাবশ্যক ছিদ্রান্বেষণ ক'রেও বলতে হয়, শেষ পর্যন্ত মৃণাল যে চীনুর দেরী ক'রে বাড়ি ফেরার কারণ দর্শাতে তেলেভাজা প্রিয় দর্শকের দাবী মেটাতে একটি গোল গল্পের অবতারণা করেন নি, সেজন্যে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এবং এভাবেই, এইসব হৃদয় ও বুদ্ধিবের ধারা সহ মৃণাল সেন তাঁর সাম্প্রতিক ছবিটি তৈরী করেছেন যা অনায়াসে তাঁর এতদ্কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি ব'লে বিবেচিত হবে, টালিগঞ্জের কাছে তো বটেই।

—গৌতম ঘোষদস্তিদার

[বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা: ৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তোলা হয়। এবারে উপরের জলকে নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে টারবাইনের উপর দিয়ে চালিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তার সাথে সংযুক্ত জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, পদ্ধতিটির উৎপাদনক্ষমতা খুব কম।

গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট/বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট

গরুমহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর মলকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে গ্যাস তৈরী করে আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারে প্রচলন হয়েছে। তবে ব্যবস্থাটি কুসংস্কারের প্রভাবে জনপ্রিয় হয় নি। গোবর-গ্যাস থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু কুসংস্কার এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়। এ ছাড়া দারিদ্র্য জনিত কারণে গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় গবাদি পশুর মালিকের সংখ্যাও কম। অতএব গোবর গ্যাস পরিবর্ত শক্তির উৎস হয়েও কাজে আসছে না, গোবর গ্যাসের মত একই পদ্ধতিতে মানুষের মল থেকেও গ্যাস উৎপন্ন করে কাজে লাগানো যায়। এই ধরণের প্ল্যান্টের নাম বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু ধরণের শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা বর্তমানে গবেষণাধীন অবস্থায় আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র



গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।



লাভপুর ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণরত।



রাইনা ব্লক যুব উৎসবে তরুণ সংঘ মঞ্চস্থ নাটক 'কাক দ্বীপের এক মা'।



গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবে ছবি আঁকতে ব্যস্ত শিশু শিল্পীরা



হাড়োয়া ব্লক যুব উৎসবে আদিবাসী সংঘের আদিবাসী বালক বালিকাদের নাচের দৃশ্য

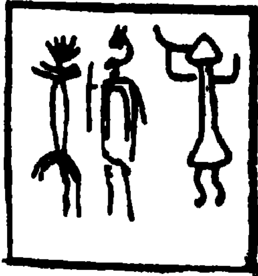
যুবমানস

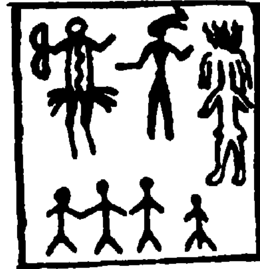
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
নভেম্বর, '৮০

নভেম্বর বিপ্লব









সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : বিজন চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শিল্প-সংস্কৃতি

খেলাধুলা

বিভাগীয় সংবাদ

দীনেশ মজুমদারের জীবনাবসান

রাজ্য বিধানসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা দীনেশ মজুমদার গত ২৮শে অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর।

প্রয়াত শ্রীমজুমদারের জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার গালিমপুর গ্রামে, ১৯৩৩ সালের ১লা জুন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে ১৯৪৮ সালে নদীয়া জেলার রাণাঘাটের রূপশ্রী ক্যাম্পে চলে আসেন। এই সময় উদ্বাস্তু আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালনার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন।

রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। যুব আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিষদীয় রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে প্রথম যাদবপুর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৭২ এবং '৭৭ সালেও ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে হেলিসিঙ্কিতে এবং ১৯৭৮ সালে কিউবায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি লুসাকায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন। দেশে ফেরার পথে তিনি লন্ডন, বার্লিন, রোম এবং কায়রো ভ্রমণ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অসংখ্য গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে আমরাও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি।

—সঃ মঃ যুবমানস

মধু গোস্বামী-র সংযোজন—

সহজ সুরে যে ডেকেছে
সেই পেয়েছে সাড়া,
চোখ রাঙিয়ে যে এসেছে
সেই খেয়েছে তাড়া।
বাঁচার লড়াই যে করেছে
সেই পেয়েছে পাশে,
মৃত্যু তাকে হানুক ছোবল
জীবন ভালবাসে!

সম্পাদকীয়

ভাবতে অবাক লাগে তেষট্টি বছর আগের একটি দেশের একটি ঘটনা—কী সীমাহীন তার গুরুত্ব, কী গভীর তার তাৎপর্য। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর বুকে তো কত ঘটনাই ঘটে চলেছে। কত রাজা-উজীরের পরিবর্তন হয়েছে। কত রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে। ঘটা করে কত রাজা-রাণীর অভিষেক হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনার কথা কে কখন শুনেছে যে ৬২ বছর ধরে গোটা দুনিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শ্রদ্ধার সাথে একটি ঘটনাকে বছরে অন্ততঃ একবার স্মরণ করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বছরে অন্ততঃ একবার শপথ গ্রহণ করেন দেশে এক সুখী ও সমৃদ্ধি-শালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নভেম্বর মাসে (ঐ দেশের পঞ্জিকা অনুসারে অক্টোবর মাসে) তখনকার সাধারণ মানুষের কাছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হোল। প্রচন্ড প্রতাপ-শালী শাসনকর্তা জারশাহীর পতন ঘটল। কোন রাজবংশের কোন সৌভাগ্যবান রাজপুত্রের হাতে এই বিরাট দেশের শাসনভার গেল না। দেশ শাসনের দায়িত্ব এমন কি কোন ব্যক্তির হাতেও পড়ল না। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল যৌথভাবে একটি শ্রেণী। যে শ্রেণী হোল শ্রমিক-শ্রেণী—গতর-খাটা মানুষের শ্রেণী।

জার্মান দেশের দার্শনিক পন্ডিত কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানা ও শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দলিল "কমিউনিস্ট ইশতেহার" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেন যে ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী একদিন দেশকে পরিচালিত করার ক্ষমতা—রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। অর্থাৎ মেহনতকরা শক্ত হাতে শ্রমিক-শ্রেণী শেষ পর্যন্ত দেশের রাজা হয়ে রাজদন্ড হাতে নেবেন। তখনকার দিনের এই অকল্পনীয় কথা শুনে রাজনীতির পন্ডিত থেকে শুরু করে সকলে মার্ক্স সাহেবকে বদ্ধ পাগল বলে উপহাস করেছিলেন। পাগলা গারদ তাঁর যথাযোগ্য স্থান বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কিন্তু মাত্র ২৩ বছর পর ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে দেশের একটি অংশের পরিচালন ক্ষমতা কেড়ে নেয়—এরই নাম প্যারি কমিউন। যদিও এটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আবার হাতছাড়া হয়। মার্ক্স সাহেব যে উন্মাদ নয়—এ রকম ঘটনা যে ঘটতে পারে—এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্বে এই ঘটনা আলোড়ন তুলল।

প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজনৈতিক আকাশে যে চমক সৃষ্টি হয়েছিল তার ৪৬ বছর পর রাশিয়ায় তা বাস্তবে রূপ নিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই সার্থক বিপ্লব বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করল মার্ক্স সত্যদ্রষ্টা রাজনৈতিক দার্শনিক। মহান নভেম্বর বিপ্লব শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন নয়—এই বিপ্লব গোটা শোষণ ব্যবস্থার অবসান করে শোষকগোষ্ঠীকে সমূলে উৎখাত করে মেনহতী শ্রেণীর একনায়কত্বে এক নতুন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। মানুষের দ্বারা মানুষের উপর শোষণ চিরদিনের জন্য বন্ধ হোল। কল-কারখানার শ্রমিকের মেহনতে যে পণ্য উৎপন্ন হবে তার ন্যায্য অংশ থেকে তারা চিরবঞ্চিত থেকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে আর মালিকশ্রেণী—উৎপাদনের সাথে যাদের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই—তারা মুনাফার পাহাড় গড়ে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের উৎকট আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে—এ ব্যবস্থা বন্ধ হোল। যে ক্ষেতমজুরের ঘামে ক্ষেতে ফসল তৈরী হবে জোতদার-জমিদারশ্রেণী মান্ধাতার আমলের ভূমিব্যবস্থার জোরে তার সবটুকু প্রায় আত্মসাৎ করতে থাকবে—এ প্রথাকে লুপ্ত করে দেয়া হোল। এক কথায়—উৎপাদন সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে নূতন করে স্থাপন করা হোল। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তি মালিকানা চুরমার করে দিয়ে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হোল। ফলে দেশে উৎপন্ন সম্পদ মানুষের মধ্যে সুষম বণ্টনের বনিয়াদ তৈরী করল। জীবনের সনাতনী যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি পেল। যুব-জীবনে বেকারিত্বের অভিশাপের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য সুনিশ্চিত হোল। মানুষ নূতন জীবনের স্বাদ পেল—তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেল।

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সকল মানুষের সৃজনীশক্তির সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ আসলো। মুনাফা সৃষ্টির জন্য নয়—দেশের মানুষের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি চালু হোল। সমস্ত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রবল গতিতে এগিয়ে চলল।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে হৃদ্‌কম্প শুরু হোল। ধনিকশ্রেণী শিহরিয়ে উঠল। নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে সমস্ত প্রকার চেষ্টা শুরু করল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এই নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আলোকিত হয়ে—নিজ দেশে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বাকী অংশে এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ শক্তিশালী হচ্ছেন, সংগঠিত হচ্ছেন, লক্ষ্যকে স্থির রেখে, আদর্শে অবিচল থেকে এই ব্যবস্থা কায়েমের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে সকল পুঁজিবাদী দেশে এখন এক চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। মানুষের দুর্ভোগ একনাগাড়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এক অস্থির পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এই দেশগুলি চলছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও এই সমস্যাগুলি অনিবার্য কারণেই বর্তমান। সমস্ত দিকে অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। কাজের সুযোগ আরও বেশী সংকুচিত হচ্ছে। বেকারিত্বের তীব্রতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দেশের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ থেকে মানুষের বিশেষ করে লড়াকু যুবসমাজের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক জগতে ক্লীবতা, অশ্লীলতা, যৌনতা এবং জীবন-বিমুখতার জোয়ার সৃষ্টি করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হচ্ছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, কু-সংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, আত্ম-কেন্দ্রিকতার মত বিষাক্ত ব্যাধিগুলির প্রসারের দ্বারা যুবমনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এর সুযোগ গ্রহণ করছে। কতকগুলি সংগত ক্ষোভকে সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁককে সুনিপুণভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে—দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণ হানার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হচ্ছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে এক ব্যক্তির হাতে দেশ শাসন করার যাবতীয় ক্ষমতাকে সমর্পণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ভাড়াটে আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের জড়ো করে তাদের দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কড়চা গাওয়ার মঞ্চ তৈরী করা হচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের সাথে আমরাও ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করছি। দেশের মানুষ বিশেষতঃ যুবসমাজকে তাই আমরা আহ্বান করব—আসুন দেশের বিদ্যমান সমস্যার কারণ এবং সামগ্রিক অবস্থার এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজে আমরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করি। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশের মাটিতে তাকে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ব করার ব্রতে আমরা দীক্ষাগ্রহণ করি। দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যা পেরেছেন—আমরা যা পারি নি—সেই না পারার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য এই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে বজ্রকণ্ঠে ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ করি।

নবীনের জিজ্ঞাসা: প্রবীণের উত্তর

সৌমিত্র লাহিড়ী

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী এবার উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণ নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে উৎসব মুখর হয়ে উঠবেন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্য দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করবেন আর শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ পুঁজিবাদী দুনিয়ার মেহনতী জনগণ নিজ নিজ দেশের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন।

১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বরের রক্তঝরা দশটা দিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা দুনিয়া। নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় অভিযান দেখে শংকিত হয়েছিল দেশে দেশে শোষক শাসক আর অত্যাচারীর দল। কিন্তু বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, মেহনতী জনগণের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনে জর্জরিত পরাধীন দেশের সংগ্রামরত জনগণের কাছে, এই বিপ্লব এক নব যুগের সূচনা করেছিল, বহন করে এনেছিল আগামী দিনের ঊষার আলো। মানব জাতির ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব-ই একমাত্র বিপ্লব নয়। রুশ দেশের বিপ্লবের আগেও বহু বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বহু রক্ত ঘাম আর অশ্রুর পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে এসেছিল সে সব বিপ্লব। যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বিপ্লব, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব মানব সমাজে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু মানব ইতিহাসের সমস্ত সংঘটিত বিপ্লবের সংগে নভেম্বর বিপ্লবের পার্থক্য ছিল বিরাট। কি সেই মৌলিক পার্থক্য?

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী বহনকারী ফরাসী বিপ্লবও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করতে পারেনি। সেই বিপ্লবেও শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেনি। নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে সংঘটিত সমস্ত বিপ্লব—ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রগতির কথা বলা হলেও, মানব জীবনের কিছু কিছু সমস্যার মোকাবিলা করলেও সেই সব বিপ্লব শোষণের অবসান ঘটায় নি। নভেম্বর বিপ্লবই পৃথিবীর বুকে মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব যা শোষণের অবসান ঘটিয়েছে, নতুন যুগের সূচনা করেছে।

একদল শোষকের জায়গায় আর একদল শোষককে বসানো, এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না। নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সকল রকম ব্যবস্থার অবসান করা, সমস্ত শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, উৎপাদনের উপায়-সমূহে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, রাষ্ট্র কর্তৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কত্ব কায়েম করা, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-কর্তৃত্ব সংস্থাপিত করা, বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজের শতকরা দশভাগ মানুষের গণতন্ত্রের অবসান করা এবং মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র অর্থাৎ সমাজের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

নভেম্বর বিপ্লব আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কঠোর পাহারা ও নিষ্ঠুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ, অনেক তথ্য এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির সংবাদ আসতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অসংখ্য সৈনিক নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে নতুন পথ নির্দেশ খুঁজে পান। এক নতুন ধরনের সংগ্রাম জন্মলাভ করে। যদিও বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বিকৃত তথ্যই প্রচার করত, নভেম্বর বিপ্লবের লাল ফৌজদের দস্যু বলে চিহ্নিত করত, বলশেভিক জুজুর ভয় দেখাত এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আতঙ্ক ছড়াত, তবুও তারই মধ্যে অনেকে খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির পথ। চোরা পথে বিপদের বিপুল ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীরা সংগ্রহ করতেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের বই, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের চিরায়ত গ্রন্থাবলী।

যাদের হাত ধরে ভারতের জনগণ মুক্তির নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছিলেন, যারা তখন কৈশোরের স্বপ্নময় জগৎ ছেড়ে যৌবনের প্রাণোচ্ছ্বলতায় স্বাধীনতার সংগ্রামে খুঁজে ফিরছিলেন বিকল্প পথ, তাঁদেরই কয়েকজনকে নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলাম। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধুরী আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, নবপ্রজন্মের কাছে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করেছেন।

আমাদের প্রশ্নাবলী

সবার কাছেই আমরা একই প্রশ্ন উপস্থিত করেছিলাম। সেই প্রশ্নগুলি হলো—

১। নভেম্বর বিপ্লবের কথা কবে কখন কোথায় কার কাছে প্রথম শুনলেন। আজকের নয়, তখনকার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

২। নভেম্বর বিপ্লবের সংগে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের কি মৌল পার্থক্য আপনার চোখে ধরা পড়েছিল?

৩। নভেম্বর বিপ্লবোত্তর চিন্তাধারাটি কিভাবে আপনি গ্রহণ করলেন?

৪। নভেম্বর বিপ্লবোত্তর আশা-প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে?

৫। নভেম্বর বিপ্লব প্রসংগে আপনার কোন ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে কি?

৬। নভেম্বর বিপ্লব কি আর অতীতের মত যুব সমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না?

৭। নভেম্বর বিপ্লব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে?

৮। বর্তমান যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার বক্তব্য কি?

বিনয় চৌধুরী

"আমরা তখন নতুন পথ খুঁজছি। ভাবছি স্বাধীনতার পর কি হবে, সমাজ কেমন হবে, কিভাবে গড়ে তুলব আমাদের দেশ। তখন

যৌবনের তেজ, রক্তে দোলা দিত স্বাধীনতার সংগ্রাম, মিছিল মিটিং দেখতাম, আকর্ষণ অনুভব করতাম, কখনও মিশে যেতাম জনতার ভীড়ে। কিন্তু ঐ প্রশ্ন—স্বাধীনতার পর কি হবে? পথ কি? এমন সময় নতুন আইডিয়ার সন্ধান পেলাম, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলাম"—চিন্তার অতল স্রোত থেকে উঠে এসে বললেন বর্তমান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জননেতা বিনয় চৌধুরী।

প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে মহাকরণে সময় দিতে পারেন না। জটিল দপ্তরের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। পর পর কয়েকদিন সময় দিয়েও অন্য কাজে আটকে গেছেন। কখনও বা দর্শনাথীর ভীড়ে কথা বলতেও পারেন নি। তারই মধ্যে এক ফাঁকে একদিন সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন কিশোর। যখন সেই যুগান্তকারী বিপ্লবের সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাবলী বুঝতে পেরেছেন তখনও তাঁর বয়স বেশী নয়, সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘকালের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মনে করতে হচ্ছে যৌবনের কথা। স্মৃতি বড় প্রতারক। বড় দ্রুত হারিয়ে যায়। খুব সামান্য অংশই সে বহন করতে পারে। তবু মানুষের মনে এমন কিছু কিছু ঘটনা গেঁথে থাকে যা চিরকালের সম্পদ। নভেম্বর বিপ্লবের সেই দোলা লাগানো ঘটনাবলীরও অনেকটাই শ্রদ্ধেয় নেতার স্মৃতিপটে অম্লান রয়েছে। তাঁর কথা থেকেই বলিঃ আমার বয়স এখন সত্তর। সব কথা তাই মনে রাখা মুশকিল। প্রায় পঞ্চাশ বাহান্ন বছর আগেকার কথা। তাই এখন আর মনে করতে পারছি না কবে কোথায় কখন কার কাছে প্রথম নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম। তবে নভেম্বর বিপ্লবের কথা প্রথম শুনেই খুব অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলাম এমন নয়। ধীরে ধীরে তার আদর্শ, তার সাফল্য আমি এবং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠন যুগান্তর দলের অন্যান্য অনেকে বুঝতে পেরেছিলাম।

আত্মশক্তির সংবাদ

মনে পড়ছে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কথা, বটুকেশ্বর ও ভগত সিংদের সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লিতে বোমা ফেলার কথা। এসব জানতে পেরে উজ্জীবিত হয়েছিলাম। এ সময়ে 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে নিয়মিত সংবাদ পড়তাম, জানতে পারতাম অনেক ঘটনা। রোমাঞ্চ লাগত। তখন আর কত বয়স? বিশের দশকের শেষ দিককার কথা।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ

বিপ্লবী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা ছাত্র সম্মেলনে পরিচয় হয়। ভূপেনদার কাছ থেকে ক্রমশঃ জানতে পারি রুশ বিপ্লবের কথা।

হুগলীর শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হয়েছি। সরোজও (সরোজ মুখার্জি) ভর্তি হয়। সে আমার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তখন আমরা যুগান্তর দলে ছিলাম। ছাত্রজীবনে বিপ্লব ও বিপ্লবী আদর্শ দ্রুত আকর্ষণ করে। আমাকেও করেছিল। ভূপেনদার প্রেরণা তো ছিলই। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম বিপ্লবের কথা। বুঝতে চেষ্টা করলাম। জানতে পারলাম শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে।

তখন কি বই পড়েছিলাম?

• ডঃ দত্তর সঙ্গে আলাপের পর পড়তে থাকি William Rhys-এর Russian Revolution জন রীডের দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন, স্তালিনের লেনিনিজম, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মার্কস এঙ্গেলস্-এর কিছু কিছু বই। এ ছাড়াও আরও অনেক বই পড়েছি। সব নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

বই সংগ্রহ

হ্যাঁ বেশ জটিল কাজ ছিল। বই পাওয়ার ব্যাপারে বর্মন পাবলিশিং হাউস খুব সাহায্য করেছিল। ওখানে অনেক বই পেতাম। তবে অন্যভাবেও ব্রিটিশ শাসকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে সংগ্রহ করতাম, পড়তাম আর নব আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতাম।

১৯৩১ সাল। হালিম সাহেব (প্রয়াত আবদুল হালিম), সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জি ও আমি পরিচিত হয়েছি। সরোজ, হালিম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

রোমান্স ছাড়তে পারছিলাম না

ইয়ং ম্যান হিসাবে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রশ্ন, ও নানা জিজ্ঞাসা, মনকে দোলা দিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, সন্ত্রাসবাদের রোমান্স ছাড়তে পারছি না, আবার মনে প্রাণে সেই পথই আমার বিপ্লবী জীবনের পথ ভাবতে পারছি না। দ্বন্দ্ব নিরসনে ছুটলাম আমাদের দলের নেতা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর কাছে। জানতে চাইলাম পার্টির কর্মসূচী কি, ভবিষ্যতের রূপরেখা কি?

না, তিনি সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে গেলাম। কয়েকজন মিলে তৈরী করলাম ইন্ডিয়ান সোশিয়ালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি। ১৯৩২ সাল। পরে তারও পরিবর্তন হল। তৈরী হলো ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভল্যুশান পার্টি। বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার যুবকদের অনেকের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী দলের মতপার্থক্য দেখা দিল। তারা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে যোগাযোগ হল মার্কসবাদীদের সঙ্গে। আগেই বলেছি আমরা নতুন পার্টি গড়ে তুললাম। সরোজ অবশ্য প্রথম থেকেই হালিমদের সঙ্গে ছিল।

জেলে কাটল পাঁচ বছর

১৯৩৩ সাল। আমি, হরেকেষ্ট (প্রখ্যাত কৃষক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার) প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। সেবার সাজা হল না। কিন্তু বীরভূম ষড়যন্ত্র মমলায় আবার গ্রেপ্তার হলাম। সাজা হল সাড়ে চার বছর। জেলের মধ্যে মারামারি করার দরুন সাজা বেড়ে হল পাঁচ বছর।

দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সংঘাত অতিক্রম করে এবং মার্কসবাদের বইপত্র পড়ে আমি নভেম্বর বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য ধরতে পারি।

সমাজের সর্বনিম্নস্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে

নভেম্বর বিপ্লবের সঙ্গে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের মৌল পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি উজ্জীবিত হয়েছিলাম। শ্রমিকশ্রেণী মেহনতী মানুষ শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে। জমিদার ও ধনিকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করে পরিকল্পনা মাফিক দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে, শোষণহীন সমাজ কায়েম করছে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানোই নভেম্বর বিপ্লবের মৌল পার্থক্য অন্যান্য বিপ্লবের থেকে।

সবকিছু বিচার করে বিপ্লব কতদূর ভাবতে হবে

প্রথমের দিকে, অস্বীকার করব না, রোমান্টিক ভাব ছিল। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রসঙ্গে

আশা প্রত্যাশাও জাগে। কিন্তু তত্ত্ব যত আয়ত্ব করেছি, বুঝতে পেরেছি ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা অনেক। অসম বিকাশ। জাতপাতের সমস্যা, ধর্মের প্রভাব, বিশাল দেশ, সংগ্রামের নানা দোলাচলতা সব কিছু বিচার করে বিপ্লব কতদূর ভাবতে হবে। নিজেদের আরও প্রস্তুত করতে হবে। আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসীবাদের পরাজয় ও লাল ফৌজের বিরাট সাফল্য, দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের বিপুল অগ্রগতি এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ লেনিনবাদ অধ্যয়ন ও রপ্ত করার মধ্য দিয়ে এ স্থির বিশ্বাস অর্জন করেছি যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বিপ্লবের প্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে। দীর্ঘ সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতার দর্পণে বলতে পারি যুব সমাজের হতাশার কোন কারণ নেই। পথ অভ্রান্ত, তাকে আয়ত্ব করতে হবে। নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করতে হবে, এবং প্রয়োগ করতে হবে।

আকর্ষণ ক্ষমতা কমেছে?

এ কথা ঠিক, বিভ্রান্তি বেড়েছে। আমরা যাদের দেখে উজ্জীবিত হয়েছিলাম সেই লেনিনের দেশে সংশোধনবাদী বিভ্রান্তি আছে। চীনের বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানারকম মতপার্থক্য ও অনৈক্য বর্তমান কালের যুব সমাজের মধ্যে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। হয়ত আগের মত চট করে আকর্ষণও করতে পারছে না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তাদের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল কথা তুলে ধরতে পারলে, সঠিকভাবে ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পারলে যুব সমাজ আকৃষ্ট হবেই। তাই যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরা দরকার। যুব সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে খুবই তৎপর। তাই এখনও অসংখ্য যুবক নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন ভারত গড়ার সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজ আমাদের আরও যত্ন সহকারে করতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ আজও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। নভেম্বর বিপ্লব যে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করেছিল, সেই যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারাই বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এক বিপ্লব তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশেই ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অভ্যুদয় আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারবে না

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে দুঃখজনক বিরোধ এবং মত-পার্থক্য এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশ্নে সম্প্রতি কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যাশিত সাহায্য ও সমর্থন সব সময় মেলেনি, বড় বড় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকায়ও কোথাও কোথাও দোদুল্যমানতা রয়েছে। সবই সত্যি। কিন্তু ইতিহাসের গতি কে রুখবে। আদর্শের ভাস্বরতা বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে ম্লান হওয়ার নয়। বিরোধ ও এমন কি সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উপস্থিতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশধারা এ কথাই প্রমাণ করছে যে সাম্রাজ্যবাদীদের আজ আর এমন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে তারা জাতীয় মুক্তি অভিযানের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ দ্রুত পিছু হটছে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও ক্রমশঃ দেশে দেশে বিপুল শক্তি অর্জন করছে।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুবকদের কাছে আমার বক্তব্য জানতে চান? আমি তাদের একথাই বলতে চাই যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ চির অম্লান। এই বিপ্লবের তত্ত্ব আয়ত্ব করুন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল সিদ্ধান্তগুলি আত্মস্থ করুন।

জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস বুঝে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ শিখতে হবে

আজ আমাদের দেশের সামনে এক জটিল অবস্থা। জাতপাতের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মেহনতী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার কাজে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ভারতের জনগণের প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে হলে, বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে ভারতীয় জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে হবে, আমাদের অতীত ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র বুঝতে হবে, তার অধিক মার্কস-বাদী মূল্যায়ন করতে শিখতে হবে এবং সংগ্রাম বিকশিত করার কায়দা কৌশল রপ্ত করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। যুব সমাজ অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী, তাদের স্বপ্ন বিরাট। সেই স্বপ্ন সফল করার শপথ নিতে হবে। নভেম্বর বিপ্লবের চির অম্লান আদর্শ উর্ধ্বে তোলার মধ্য দিয়েই হতাশা অতিক্রম করার এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে অবিচল থাকার দায়িত্ব নিতে হবে।

ত্রিদিব চৌধুরী

প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেশী সময় লাগেনি। একদিন সকালে সোজা চলে গেলাম তাঁদের পার্টি কমিউনে। ১৯৫২ সাল থেকে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ী ত্রিদিববাবু কলকাতায় সাধারণত এখানেই থাকেন। বহরমপুরে ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি। কংগ্রেসের ভেতরে ছিলেন অন্যান্য বিপ্লবীদের মতই। ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসের আপোষমুখী অহিংস নীতির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। আর. এস. পি. গঠিত হওয়ার পর থেকে নিজ মত ও পথে নিষ্ঠাবান থেকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করছেন। এখন তিনি আর. এস. পি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক। সত্তর অতিক্রান্ত ত্রিদিববাবু আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলে গেলেনঃ

আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রথম ১৯১৯-২০ সালে নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনি। আমার আত্মীয় তখনকার দিনে দেশে বুর্জোয়া খবরের কাগজে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে যে সমস্ত বিকৃত এবং বিরূপ সংবাদ প্রকাশিত হত প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমার কাছে গল্প করত। তখন খুব একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আমার মনে দেখা দেয়নি।

নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আমি কিছুটা ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই আর একটু বেশী বয়সে। কলেজে প্রথম

বার্ষিক ক্লাসে পড়ার সময় জন রীডের দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন (ইং) এবং জর্মান বুর্জোয়া লেখক Rene Fullop Mueller-এর Lenin and Gandhi এবং Mind and Face of Bolsevikism -এর মাধ্যমে ১৯২৮-২৯ সালে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারি।

2Mueller বলসেভিক বিপ্লব সম্পর্কে খুব সহানুভূতিসম্পন্ন না হলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর বইগুলি অনেকখানি তথ্যানুগ ছিল এবং নভেম্বর বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে আকৃষ্ট করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মী

আমি সে সময় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস গণ আন্দোলন আমাদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অন্যদিকে পুরনো বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক গণ সমর্থনের অভাবের দরুন তারও সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে তখন সংশয় দেখা দিতে আরম্ভ করে।

নভেম্বর বিপ্লব শ্রেণী বিপ্লব

এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবাদ উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করার জন্য। পৃথিবীর বুকে সংঘটিত অন্যান্য বিপ্লবের সঙ্গে এই মৌলিক তফাৎটাই আমার চোখে ধরা পড়েছিল।

এম. এন. রায়ের প্রভাব

জারতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য আমাদেরকে স্বভাবতই শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম এবং নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করে এবং সেই আদর্শের পিছনে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা আছে তার দ্বারাও আমরা প্রভাবিত হই। এম. এন. রায়ের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ আমাদের এ সময়ে এদিকে কিছুটা প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাঁর ও অবনী মুখার্জির লিখিত India in transition আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

তখন মার্কসবাদী সাহিত্য এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পাঠান সংবাদ পত্রিকা 'IMPRECOR' প্রভৃতি গোপন পথে এদেশে আসত। খুব নিয়মিত ছিল না। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন আটকে যেত। আমরা এসব বইপুঁথি এবং পত্রপত্রিকা থেকেই নভেম্বর বিপ্লব ও সমাজবাদী রুশ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হই।

ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শুরু হয়

কিছু ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত দোটানায় ছিলাম। পুরনো সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের আকর্ষণ আমাদের মনে বেশ প্রবল ছিল। আবার নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী আদর্শও আমাদের মনকে খুবই আলোড়িত করেছিল। যার ফলে আমরা পুরনো বিপ্লবী আন্দোলন নতুনভাবে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম।

রূপান্তরের দিকে পুরনো বিপ্লবী আন্দোলন

এ সময়ে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রভাবে Workers and Peasant's Party -র মাধ্যমে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই সময়ে বলা চলে পুরোনো বিপ্লবী আন্দোলন একটা রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টা, প্রভৃতির প্রভাবে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত পুরোনো ধরনের সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা জেলে এবং বন্দীশালায় সমবেত হয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এ সময়েই মোটামুটিভাবে মার্কসবাদী বিপ্লবীদের ভেতরে দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা ক্রমশঃ সংগঠিত রূপ নেয়। যথাঃ (১) বিপ্লবীদের একাংশ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হল। (২) অপর অংশ সোভিয়েটের স্তালিনবাদী নীতির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হতে চেষ্টা করল।

তবে এই দুই ধারাই যে আদর্শগতভাবে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ ও চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতীতের মত বিপ্লবীদের মনকে আলোড়িত করে না

নভেম্বর বিপ্লব ৬৩ বছর আগে ঘটেছে। আজকের প্রজন্মের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের কথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বেশী কিছু নয়। নভেম্বর বিপ্লবের পরে প্রথম দুই দশকে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ এবং চিন্তাধারা যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীদের মনকে আলোড়িত করত এখন আর সেটা করে না।

অনেক দূরে সরে এসেছে

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে চীন, পূর্ব ইয়োরোপ, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে স্তালিনের সময় থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব নানান কারণে আমলাতন্ত্র ভিত্তিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছে। যার ফলে আমার ধারণা বর্তমান সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব নভেম্বর বিপ্লবের লেনিনবাদী চিন্তা ও আদর্শ থেকে অনেক দূর সরে এসেছে।

......তবুও ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য

তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতাদর্শগত সংগ্রাম চীনে প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতা, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের ভেতরে মাওবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে কিছুটা পদক্ষেপ—এসব কারণের জন্য নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা দুর্বল হয়ে এসেছে। সেইজন্য নভেম্বর বিপ্লব অতীতের মত এখনকার যুব সমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক যুগের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনে নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়]

দুই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা—

দীনেশ রায়

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে (রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর) দুনিয়ার অন্যতম এক বৃহৎ কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অনগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে সমগ্র বিশ্ব কেঁপে উঠল। মার্কিন সাংবাদিক জন রীড সে সময় রাশিয়ায় উক্ত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে রীড ঐ সময়কার ঘটনাবলী "যে দশ দিন বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল" শিরোনামায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। জন রীডের এই বিখ্যাত পুস্তকখানি বহু ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পড়েন। এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন লেনিন স্বয়ং।

ঘটনাটি কী? ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের পরিচালনায় রুশদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)র নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্র এবং পুঁজিপতিদের অন্তবর্তী সরকার (কেরেনেস্কী সরকার)কে উচ্ছেদ করে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সূচনা করে। নভেম্বর বিপ্লব বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিলোপ ঘটিয়ে রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের সর্বহারা শ্রেণী শাসকশ্রেণীর মর্যাদা পায় এবং এইভাবে সংকট-মুক্ত, শোষণ-মুক্ত এবং বেকারী-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের গোড়াপত্তন হয়।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের বিশ্বফ্রন্ট, যাকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণ দুর্ভেদ্য বলে মনে করতেন, তাতে বিরাট ফাটল ধরে। বিশ্বভূখণ্ডের ছয় ভাগের এক ভাগ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে নতুন এক যুগের সূচনা হয়। দুনিয়া দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়—পুঁজিবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবির। দুই শিবিরের দুই ভিন্ন মতাদর্শ এবং বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা। দুই শিবিরের কথা লেনিন এবং পরবর্তীকালে স্তালিন তাঁদের একাধিক রচনায় উল্লেখ করেছেন।

লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক রচনা "সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর"-এ বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদকে যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করতে হয় তা হলে বলতে হবে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তর। লেনিন বলেছেনঃ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরই শুধু নয়, পুঁজিবাদের শেষ স্তরই শুধু নয় সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বক্ষণ।

রাশিয়ায় ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব লেনিনের উপরোক্ত তত্ত্বের সঠিকতা কাজের মধ্যে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সঠিক। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রভাবে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় তার আঘাতে পুরোনো ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্বভূখণ্ডের তিনভাগের এক ভাগ এখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বাড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রতি-আক্রমণের সে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের আবরণে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় অনুপ্রবেশের জন্যে মরীয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একেই বলা হয় "নয়া-উপনিবেশবাদী" অভিযান। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী অভিযানের শিকার হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়া-উপনিবেশবাদী দেশ নয়; তবে আমাদের দেশ বিপদমুক্ত, একথা বলা চলে না।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাশিয়ায় তাদের পরস্পরকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয় নি। শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল; অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আরম্ভ করে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ পর্যন্ত সব কিছুরই আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯১৮ সালে বিশ্বের ১২টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ক্ষমতাচ্যুত রুশদেশের ভেতরের প্রতি-বিপ্লবীদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শিশু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন ও সাম্রাজ্যবাদীরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হস্তক্ষেপের যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার কমিউনিজমে পৌঁছানোর ধাপ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কর্মসূচি রচনা করে। কিন্তু লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কর্মকাণ্ড দেখে যাওয়ার সুযোগ পান নি। ১৯২৪ সালে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের এই মহান রণনীতিবিদ্ এর জীবনাবসান ঘটে। "কমিউনিজমের অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৈদ্যুতিকরণ" এটা লেনিনেরই কথা। লেনিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শিষ্য স্তালিনের ওপর। নানান প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা অতিক্রম করে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজটি সহজ সরল ছিল না। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য কারণে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মান প্রাক্-১৯১৩ সালের স্তরে নেমে গিয়েছিল।

তাছাড়া স্তালিন ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে সংশোধনবাদ, সুবিধাবাদ, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ, বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। যে

সমস্ত প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল সেগুলির মধ্যে আছেঃ একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব কী না, কৃষকসমাজ সম্পর্কে নীতি, ট্রট্স্কীর বিরতিহীন বিপ্লবের তত্ত্ব ইত্যাদি।

স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী নীতি ও কার্যক্রমই বিজয়ী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের রাস্তায় এগিয়ে যান।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা চালু করা হল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা অনুযায়ী স্থির হল ১৯২৮-৩৩ সালের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে মূলধনী লগ্নী হিসাবে খাটানো হবে ৬,৪৬০ কোটি রুবল; এর মধ্যে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের জন্য খাটানো হবে ১,৯৫০ কোটি রুবল, যানবাহন ব্যবস্থার জন্য খাটানো হবে ১,০০০ কোটি রুবল এবং কৃষিকার্যে খাটানো হবে ২,৩২০ কোটি রুবল।

প্রথম যোজনার লক্ষ্য ছিল—অনগ্রসর কৃষিপ্রধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা, কৃষির যৌথ-করণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, বেকারী বিলোপ করা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা।

১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনা তখনই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই, চার বছর তিন মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের যুক্ত অধিবেশনে রিপোর্ট প্রসঙ্গে স্তালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ফলাফল পর্যালোচনা করেন। রিপোর্ট-এ পরিষ্কার দেখা গেল প্রথম যোজনা সম্পাদনের কল্যাণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান সাফল্য অর্জন করেছেঃ

(ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৭০ ভাগ দাঁড়িয়েছে।

(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিল্প ব্যাপারে পুঁজিবাদী শক্তির উচ্ছেদসাধন করেছে এবং শিল্পক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(গ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্র থেকে শ্রেণী হিসাবে ধনী কৃষকদের উৎখাত করেছে এবং কৃষিতে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনটনের অবসান ঘটিয়েছে এবং কোটি কোটি গরিব কৃষক স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহের স্তরে উঠেছে।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিল্পে বেকার সমস্যা বিলুপ্ত করেছে এবং আট ঘণ্টা রোজ বজায় রেখেও অনেকগুলি শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা রোজ ও অস্বাস্থ্যকর উপ-জীবীকার ক্ষেত্রে দিনে ছয় ঘণ্টা রোজের প্রথা প্রবর্তন করেছে।

(চ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বশাখায় সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ দূরীভূত হয়েছে।

এই ধরনের অগ্রগতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কর্মসূচী ছিল প্রথম যোজনার চাইতেও বিশালতর। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কাল শেষ হওয়ার আগেই প্রাক্-যুদ্ধ কালের তুলনায় শিল্পোৎপাদন প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। মূলধন সংবর্ধনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে সকল শাখায় মোট ১৩,৩০০ কোটি রুবল লগ্নীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি শাখাকে সম্পূর্ণরূপে শিল্পসজ্জায় সজ্জিত করা সুনিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় যোজনায় প্রধানত কৃষিকার্যের যান্ত্রিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হয়। যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের পদ্ধতিকে যান্ত্রিকীকরণের মধ্যে পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সেই সাথে শ্রমিক-কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেরও ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার জন্য সোভিয়েতের জনসাধারণকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৃহত্তর স্বার্থে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ও হাসি-মুখে এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গড়ে না উঠত তা হলে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সে বিশ্বের জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হোত না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের ঐতিহাসিক বিজয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্ভেদ্যতা আর একবার সুপ্রমাণিত করে। শোষণ-মুক্ত, সংকট-মুক্ত, দারিদ্র্য-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতিও হয়েছে। অনেকগুলি ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতির কথা স্তালিনের রিপোর্ট, ভাষণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাবে পাওয়া যাবে। এই ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলি না হলে অগ্রগতির গতিবেগ আরও দ্রুত হত। তবে নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এখানে বড় কথা হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এগিয়ে গেছে এবং এখন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন এক মহতী শক্তি যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্ত-র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত অনৈক্য দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই অনৈক্যকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এই অনৈক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সৌভাগ্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর বিশ্বভূখণ্ডের ছয় ভাগের একভাগ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাধারণ সংকটের আবর্তে পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্ব-ভূখণ্ডের তিনভাগের একভাগ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠার পটভূমিতে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট আরও গভীর হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে ক্রম-বর্ধিত হারে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্পণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়গুলিতে বেসরকারী মালিকানার দরুন নৈরাজ্য ও অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবস্থায় সত্যিকারের কোন পরিকল্পনা সম্ভব নয়। যেহেতু কোন পরিকল্পনা নেই ও থাকতে পারেও না, এবং যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাই বাজারের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর-শীল, সেহেতু জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করা যায় না। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের তাগিদে পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধিত হারে অটোমেশান, যান্ত্রিকীকরণ ও শ্রমিকসংখ্যা হ্রাসের এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যান্য কল চালু করে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে

যেমন অসংখ্য শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত করে, অপরদিকে তেমনি জনগণের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় বেশি উৎপাদন হয়, এবং ফলে "অতি-উৎপাদনের" সংকট দেখা দেয়। অতি-উৎপাদনের সংকটের মোকাবিলায় জন্য আবার উৎপাদন হ্রাস করতে হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর কালে ১০ বছর অন্তর অন্তর এই ধরনের সংকট দেখা দিত।

শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আত্মপ্রকাশের পটভূমিতে পুঁজিবাদ স্থায়ী সাধারণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। স্থায়ী ও সাধারণ সংকটের অর্থ এ নয় যে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সংকট একই হারে বেড়ে চলবে। সাধারণ সংকটের অর্থ হলঃ মাঝে মাঝেই মন্দা দেখা দেবে, উৎপাদনের হার হ্রাস পাবে, বেকারী বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে। পুঁজিপতিরা এই সংকট কিছুটা কাটিয়ে উঠবে এবং আংশিক স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু সংকট থেকেই যাবে। পুঁজিবাদ এই সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়।

পুঁজিবাদী লগ্নীর চরিত্র এমনই যে, এই লগ্নী যত বাড়বে, ততই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে একদিকে যেমন আরও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবে, অপরদিকে তেমনি অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে, তাদের দারিদ্র্য ও দুস্থতা বাড়বে। এটা পুঁজিবাদী লগ্নীর অমোঘ নিয়ম যা আজিকার পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সর্ববৃহৎ ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি? ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২·৩ ভাগ মাত্র। এটা বিশ্বব্যাংক প্রচারিত হিসাব। আমেরিকার জনসমষ্টির শতকরা ১·৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক জাতীয় আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ এবং কোম্পানি শেয়ারের শতকরা ৮২ ভাগ ভোগ করে। এই দেশের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের প্রান্তসীমার নিচে বাস করেন, এবং এ'দের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে "চরম দুস্থ" বলা যায়। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ শ্রমিকের জন্য কোন সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা নেই, এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ শ্রমিককে কোন বেকারী সাহায্য দেওয়া হয় নি। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক বেকার।

বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতি এখন তুঙ্গে। এই মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিকদের প্রকৃত আয় হ্রাস করে দিচ্ছে। ১৯৭৯ সালে বৃটেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার। বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌রা বলছেন, ১৯৮২ সালের প্রথমার্ধে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়ে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজারে দাঁড়াবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের কাজ রীতিমত অগ্রসর লাভ করছিল এবং শিল্পব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটছিল, তখন, ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এক অভূতপূর্ব আকারের মারাত্মক বিশ্বব্যাপী সংকট ফেটে পড়ে এবং পরবর্তী তিন বছরে সেই সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে। শিল্পসংকটের সঙ্গে কৃষিসংকটও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তিন বছর ধরে (১৯৩০-৩৩) অর্থনৈতিক সংকট চলার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন ১৯২৯ সালের শতকরা ৬৫ ভাগ, বৃটেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ৬৬ ভাগ ও ফ্রান্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নেমে যায়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়, ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে শতকরা ২০১ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

"পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অনেক বেশি উন্নত এর থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেল, সমাজতন্ত্রের দেশটিই হল সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র অর্থনৈতিক সংকট-মুক্ত দেশ" [সি-পি-এস-ইউ (বি)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]।

১৯২৯ সালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকট এবং পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পটভূমিতেই বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ কীনস্ তাঁর দাওয়াই হাজির করেন। কীনস্-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোন গলদ নেই। তবে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন দাওয়াই প্রয়োজন। নতুন দাওয়াই হলঃ রাষ্ট্রীয় লগ্নী বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির বিকাশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রাণকর্তা হিসাবে ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও ইতালিসহ সবগুলি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই কীনস্‌কে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কীনস্-এর দাওয়াই পুঁজিবাদের রোগ সারাতে পারে নি এবং পারবেও না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎখাত ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে সমাজের পরিত্রাণ নেই।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট বলতে যা বোঝায় তার কোন স্থান নেই। উৎপাদনের উপায়গুলিতে বেসরকারী মালিকানা, সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নৈরাশ্য ও অরাজকতা, পরিকল্পনার অভাব, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লালসা প্রভৃতি থেকেই অর্থনৈতিক সংকট আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানাই সংকট সৃষ্টির বিরুদ্ধে বড় গ্যারান্টী। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক যোজনায় শুধুমাত্র লক্ষ্যই নির্দিষ্ট করা হয় না, এই লক্ষ্য যাতে বাস্তবায়িত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এখানেই সমাজতান্ত্রিক যোজনার সঙ্গে তথাকথিত পুঁজিবাদী যোজনার (যেমন ভারতে) মৌল পার্থক্য। সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁরা যে দ্রব্য উৎপন্ন করছেন তা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগানো হবে, পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করার জন্য নয়। সেকারণেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণা পান।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনে ১৯৪৯ সাল থেকেই মূল্যস্থিতি বজায় আছে। চীন সরকার সম্প্রতি কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দর বাড়িয়ে দিয়েছেন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণাদানের জন্য। উৎপন্ন ফসলও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্রয় করছে। গণসাধারণতন্ত্রী চীনে ১৯৪৯ সালে কৃষকদের ওপর করের বোঝা ছিল শতকরা ৩২ ভাগ, এখন সেই বোঝা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। চীনের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত। ভারতে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল পরোক্ষ কর। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলি লোকসানে চলে।

আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বভূখণ্ডের তিনভাগের একভাগ নিয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠিত। এখন বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ শতকরা ৪০ ভাগ। এই অংশ যে অনুপাতে বাড়বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব যখন কঠিনতম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে ডুবে আছে, তখন তাদের পক্ষে সামান্যতম পরি-

বৃদ্ধির হারও রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না, যখন বেকারীর মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতির কবলে ধুঁকছে, তখন পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে ও মূল্যস্থিতি রক্ষিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন বেকারী নেই, দারিদ্র্য নেই, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে এখন সরকারী হিসাব অনুযায়ীই ২ কোটির ওপর বেকার রয়েছেন, দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৩৩ কোটি অতিক্রম করে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতি

১৯১৩ সালে জারতন্ত্রের শাসনকালে যেখানে বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ উৎপন্ন হোত সেখানে ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই ২০ শতাংশ উৎপন্ন করেছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে ৩৪ শতাংশ বেশি তেল এবং ২৬ শতাংশ বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে।

১৯৮০ সালের প্রথম ৬ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩৬·২০ কোটি টন কয়লা, ৫·৪৭ কোটি টন অপরিশোধিত লৌহ, ৭·৫৯ কোটি টন ইস্পাত এবং ৯২ লক্ষ টন ইস্পাত টিউব উৎপন্ন করেছে। শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের গড় মজুরী ৩·৬ শতাংশ বেড়েছে। সামাজিক ভোগের তহবিল থেকে সুযোগ-সুবিধাদানের পরিমাণ ৫,৬০০ কোটি রুবল অতিক্রম করেছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীন

১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লক্ষেরও বেশি যুবক এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সরকার ১৯৭৮ সালের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই পরিসংখ্যানগুলি প্রচার করেছেঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন—৩০,৪৭,৫০,০০০ টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ৭·৮ শতাংশ বেশি); শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্য ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে ১৪·৩ শতাংশ এবং ১৩·৫ শতাংশ বেড়েছে; ১৯৭৭ সালে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,০৪,৬০,০০০ টন; ১৯৭৮ সালে এটা বেড়ে হয়েছে ৩,১৭,৮০,০০০ টন, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৫৫·৩ শতাংশ; কয়লা উৎপাদন—৬১·৮০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি); অপরিশোধিত তেল—৮·৭০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ১৯·৫ শতাংশ বেশি); খুচরো বিক্রয় ১৬ শতাংশ বেড়েছে (জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি চিহ্ন); যৌথ সংস্থাগুলি থেকে কৃষকদের আয় ১৭·৭ শতাংশ বেড়েছে; দেশের শতকরা ৬০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে; জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহ ৪৪·৪ শতাংশ বেড়েছে (কর না চাপিয়ে)।

চীনে ১৯৪৯ এবং ১৯৭৯ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ভারতে এই বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ মাত্র।

চীন ও ভারত

এখানে কোন তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা অর্থহীন। কারণ চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে বিকাশের পুঁজিবাদী রাস্তা গ্রহণ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সবাই পরিচিত। বেকারী বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, দারিদ্র্যের প্রান্তসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের আয় ও সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার নগণ্য। পুঁজিবাদী রাস্তার এই পরিণতি হতে বাধ্য।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালনকালে আমাদের দুই ভিন্ন মতাদর্শ ও দুই ভিন্ন রাস্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে হবে এবং তার থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

[নবীনের জিজ্ঞাসা : প্রবীণের উত্তর/৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আজও নভেম্বর বিপ্লবের সেই মূল আদর্শ এবং নীতির সঙ্গে বিশেষ করে লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারা এবং নীতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী রকম আছে।

আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুব সমাজকে সেই মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা তুলে ধরতে পারলেই যুব সমাজ আমাদের দেশেও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

হতাশার স্থান নেই

আপনারা—নভেম্বর বিপ্লবের আশা প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছে। আজকের যুব সমাজকেও সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

*প্রবীণ জননেতা আবদুর রাজ্জাক খানের সাক্ষাৎকার অংশটি পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

জনশিক্ষার প্রসার ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে

সুকুমার দাস

যে কোন দেশে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, তার মধ্যে যে ক্ষমতা অন্তর্নিহিত রয়েছে তার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। জনসাধারণের সকল অংশ যদি শিক্ষিত না হয়, রাষ্ট্র ও সমাজের নতুন ধ্যানধারণার সঙ্গে যদি তারা পরিচিত না হয়, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যদি তারা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে দেশের কোনরূপ উন্নয়ন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। তাই কেবল বিদ্যায়তনের সাধারণ শিক্ষা নয়, সামগ্রিকভাবে জনশিক্ষার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যায়তনে শিক্ষার সুযোগ থেকে নানাভাবে বঞ্চিত বিস্তীর্ণ জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বাণী পৌঁছে দিতে হবে। এবং, যারা বিদ্যায়তনে পাঠের সুযোগ পেয়েছে তাদেরও পরবর্তী জীবনে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে আজও কি সাধারণ শিক্ষা, আর কি জনশিক্ষা, কোন দিকেও উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। তাই, স্বাধীনতার তেত্রিশ বৎসর পরেও দেশের শতকরা ৬৬ জন মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে।

যেসব মানুষ এখন দেশে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তারাও যে শিক্ষা পাচ্ছে তা-ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, চরিত্র গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্করহিত। তাই দেখা যায়, এই শিক্ষা গ্রহণের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই সমাজের কোন কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের সুরুতে কেরানী তৈরীর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল আজও মোটামুটি তাই চলছে। যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা ওপর ওপর। মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। বর্তমান যুগের উপযোগী ভারতের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নি। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে, তা বয়স্ক শিক্ষাই হোক, আর গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই হোক, যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এত সামান্য যে উল্লেখের মধ্যেই পড়ে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা ভাবতে হবে। এবং, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। তবে মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতের মত পুঁজিবাদী দেশে তা সম্ভব নয়। এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুঁজিবাদীরা নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার চেষ্টা করবে। এতদিন পরেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে মূলত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি 'elitist system' রয়ে গেছে, গ্রামের দরিদ্র কৃষক, কারখানার শ্রমিক, শহরের বস্তীবাসীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার বাইরে থেকে গেছে, তার কারণ এই। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে সেখানেও নয়। কারণ, এই সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করা যাবে না, বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী সংবিধানপ্রদত্ত বিশেষ অধিকারের বলে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখবে, এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে সংবিধান সংশোধনের দ্বারা রাজ্য তালিকার পরিবর্তে কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। তথাপি, এর মধ্যেও যতটুকু করা সম্ভব, তা করতে হবে। এবং, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক।

অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ক'টি কাজের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রাক-বিপ্লব জারশাসিত রাশিয়ায় দেশের শতকরা মাত্র ২৫ জন লোক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এই হার আরও কম—শতকরা মাত্র ২০। শতকরা ৮০ জন লোককে অশিক্ষিত রেখে নতুন সমাজ গড়া যায় না। তাই লেনিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৭ই অক্টোবর, ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগগুলির দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, "আমাদের দেশে নিরক্ষরতার মত একটা জিনিস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনৈতিক শিক্ষার কথা বলাটা বাড়াবাড়ি। এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটা এমন একটা অবস্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরর্থক। নিরক্ষর ব্যক্তি পড়ে রাজনীতির বাইরে। আগে তাকে অ-আ-ক-খ শিখতে হবে। সেটা ছাড়া কোন রাজনীতি হতে পারে না। সেটা ছাড়া হয় গুজব, জল্পনাকল্পনা, রূপকথা আর বদ্ধধারণা, কিন্তু রাজনীতি নয়।" এই কারণে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যেমন প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপ্লবের সময় গ্রামের জমিদারদের কাছ থেকে যে সব বই ছিনিয়ে নেয়া হয় তা সকলের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথম দিকে কাগজের অভাব, ছাপাখানার অভাব, বই-এর অভাব, তথাপি সমবেত চেষ্টায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং লাল ফৌজকেও এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে যুক্ত করা হয়।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর এই জোর দেয়া হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত পোল্যান্ডের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান গুরুত্ব লাভ করে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ। ভিয়েতনামে মুক্তিসংগ্রাম চলার সময়েই হো-চি-মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ শুরু করেন এবং এই কাজে তারা অনেকটা সফলও হন।

কেবল শিক্ষার প্রসার নয়, লেনিন আর একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেন। তা হল সমগ্র জনসমাজকে নতুন রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যারা জারের আমলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে তারা বুর্জোয়া ধ্যানধারণায় পুষ্ট। নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। শিক্ষক-

সমাজের অধিকাংশই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে অন্য বুদ্ধিজীবীরাও। এদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই লেনিন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। চীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য তাই ছিল। কিন্তু তা বিপথগামী হয়েছে।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে শ্রমিক কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা, এবং ভোগ্যপণ্য বন্টনে সমবায় সমিতির ব্যবহারের জন্যও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে। এটাও জনশিক্ষা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদপত্রকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই কাজে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র বাধ্যতামূলক। শিক্ষার অধিকার সংবিধানস্বীকৃত অন্যতম নাগরিক অধিকার।

শিক্ষানীতি নির্ধারণে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বীকৃত। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নতুন শিক্ষা নীতি স্থির করার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক ছাড়াও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নেয়া হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে সর্বস্তরে তার ওপর জাতীয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর কেন্দ্রীয় আইনসভায় ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ সালে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে নতুন শিক্ষা নীতির প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষানীতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জার্মানী, পোল্যান্ডে প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের মনে যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সচেতন করা হয়, শান্তির পক্ষে তাদের মনকে গড়ে তোলা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতিগোষ্ঠীর বাস। জারের আমলে এদের মধ্যে শিক্ষার কোন প্রসারই হয় নি। অধিকাংশ ভাষাগোষ্ঠীর পৃথক ভাষা থাকলেও অনেকেরই পৃথক কোন লিপি ছিল না। সমাজতন্ত্রের আমলে এদের পৃথক লিপি গড়ে তোলা হয়েছে, এদের মধ্যে শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার হয়েছে এবং এদের পৃথক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার পরেও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকে 'Continuing Process' হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে কারখানায়, অফিসে, কৃষিখামারে সর্বত্র সাপ্তাহিক, সান্ধ্য ক্লাশের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণা, রাষ্ট্রের গৃহীত নতুন নীতি ও উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা বা Correspondence Course-ও আছে। পোল্যান্ডে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় পোলিশ টিচার্স ইউনিয়নের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এক রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পুঁজিবাদী দেশের মত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। এবং সব প্রতিষ্ঠানই সমাজের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এ সব দেশে নেই। যুগোস্লাভিয়ায় বিদ্যায়তনগুলি স্ব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (Self managing institution) রূপে পরিচালিত। স্ব-পরিচালনার বুনিয়াদী সংস্থা রূপে যে বিদ্যায়তন পরিষদ রয়েছে তা প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেয়া হয়। সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ যদি ভারতে জনশিক্ষার প্রসার করতে হয় তাহলে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপরে। বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করার অভিযানে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক সংগঠনের সামগ্রিক অংশগ্রহণ চাই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক করতে হবে। বিদ্যায়তনের শিক্ষা শেষ হবার পরেও সবাই যাতে নিয়মিত শিক্ষার মধ্যে থাকে তার জন্য কল-কারখানা, অফিস কাছারী, গ্রামগঞ্জ সর্বত্র কর্মে নিযুক্ত লোকেদের জন্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। ব্যাপকভাবে সর্বত্র করেসপন্ডেন্স কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, মিশনারি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংস্থার যে বহুমুখী কর্তৃত্ব আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরিচালনায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্তমানকালের উপযোগী করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার পরিচালনায় পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের দর্পণে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

পৃথিবীতে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল থেকে বহু বিদ্রোহ বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলির দ্বারা শোষণের ভিত্তি বারবার কম্পিত হয়েছে কিন্তু শোষণের অবসান ঘটে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। একদল শোষকের পরিবর্তে আরেক দল শোষকের আবির্ভাব ঘটেছে। প্যারি কমিউন কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা দখল করলেও আবশ্যিক প্রস্তুতির অভাবে স্থায়ী হতে পারে নি। প্যারি কমিউনের দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কার্ল মার্কস ভবিষ্যৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন সেই শিক্ষার আলোকে ধাপে ধাপে ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং পরিণতিতে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম সফল বিপ্লবের বিজয় বৈজয়ন্তী রচনা করলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার গোড়াপত্তন করলেন। প্রতিবিপ্লবী সোশ্যাল রেভোলিউশনারী ও ট্রটস্কিপন্থী প্রমুখদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন সাম্রাজ্যবাদী দুর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও পৃথিবীতে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। আর সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে বিশ্ববিপ্লবের উৎসমুখ এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় ভিত্তি।

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে এই বিপ্লব এবং পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কার্য শুধু পুঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র করান তাই নয়, উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনেও নতুন এক দৃষ্টিকোণ এনে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে যায়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের স্তর থেকে প্রায় বিপ্লবের স্তরে রূপান্তরিত হয়। রুশ বিপ্লবের বহু কৌণিক সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাই দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াচক্রকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তাই চক্রান্তের পর চক্রান্ত, একের পর এক গৃহযুদ্ধ, বহির্যুদ্ধ নবজাত সমাজতান্ত্রিক রুশিয়াকে মুকাবিলা করতে হয়। লেনিনের সুযোগ্য সহযোগী স্তালিনের নেতৃত্বে রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান জনগণ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও সীমাহীন আত্মত্যাগের পথে সেই চক্রান্তগুলি ব্যর্থ করে দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অমোঘ জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইতিহাসের কঠিনতম লড়াই হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার। নবজন্মের অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সমৃদ্ধ বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার জনগণ স্তালিনের নেতৃত্বে মৃত্যুপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমি থেকে পুঁজিবাদ উৎখাত করতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবির রচিত হয়েছে। মহান চীনের বিপ্লব, ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি, সর্বশেষ ভিয়েতনামের অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় সমগ্র বিশ্বে ভারসাম্য পাল্টে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, দেশে দেশে শোষক শ্রেণীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করেছে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের কার্যকরী সূত্রপাত ঘটেছিল নভেম্বর বিপ্লবের দিনগুলি থেকে। রুশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব দেশে দেশে মুক্তি-সংগ্রামের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কমরেড স্তালিন বলেছেন: "অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সূচিত করে মানবজাতির ইতিহাসের একটি মূলগত পরিবর্তন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক একটি আমূল পরিবর্তন, বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি একটি আমূলে পরিবর্তন, সংগ্রামের পদ্ধতি এবং সংগঠনের ধরনসমূহে, জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যগুলির রীতিনীতিতে, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক শোষিত জনগণের সংস্কৃতিতে ও মতাদর্শে আমূল পরিবর্তন।"

॥ দুই ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী আঘাত এবং রুশ দেশের প্রথম সর্বহারার বিপ্লব সমগ্র ভারত তথা এশিয়াভূমিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল এবং মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শে সংযোজিত হল নতুন চেতনা। মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার অবশ্যম্ভাবীতার প্রতি রাজনৈতিক দৃষ্টি এনে দিল। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির শিক্ষায় বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল এবং ক্রমশ সংগঠনের রূপ নিতে থাকল। বিশের দশকের শুরুর এই দিনগুলির অবস্থা বর্ণনা করে শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন: "দেশের অবস্থা এখন খুবই গরম। তাপের ওপর চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ আজও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইলেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব যে এদেশে একদল বিপ্লবী মার্কসবাদে দীক্ষিত কর্মী গড়ে তুলছিল শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় বলেন: "সামরিকতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের যমজ সন্তান; এরা তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছায়া, এদের ফল, এদের বল্কল—সব কিছুই বিষাক্ত। একমাত্র সম্প্রতি এর পাল্টা শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই

পাল্টা শক্তি হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী।" সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শ্যেনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রবাসে ও দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর কমিউনিস্টরা পার্টি গড়ে তুললেন ধীরে ধীরে। শুরু হল সম্পূর্ণ নতুন এক গণজাগরণের সাধনা, ভারতবর্ষের ভিত বদলের সংগ্রাম।

ভিত বদলের সংগ্রাম যখন বিপ্লবী সর্বহারা মানুষেরা শুরু করে, শোষণের জগদ্দল পাথর সরানোর লড়াই যখন চতুর্দিকে কাঁপন তোলে তখন উপরিতলে অর্থাৎ চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতিতেও নতুন সংগ্রাম জন্ম নেয়। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের এক বিশিষ্ট অংশ কখনও বৈজ্ঞানিক চেতনায়, কখনও মানবিকতাবোধে সভ্যতার পিলসুজ এইসব নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। কায়েমীস্বার্থের প্রস্তর দুর্গে আছড়ে পড়ে গণজাগরণের ঢেউ, আবহাওয়ায় নব বসন্তের আগমনী বার্তা। হেমন্তের ঝরা-পাতার বিষণ্ণতা ও গর্ভস্থ বসন্তের আগমনী গান তখন শিল্পী, সাহিত্যিকদের কণ্ঠে। বিশের দশকেই শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলির মুখপত্র প্রকাশ হতে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলাদেশে 'গণবাণী', বোম্বাইতে 'ক্রান্তি', পাঞ্জাবে 'কীর্তি', সংযুক্ত প্রদেশে 'ক্রান্তিকারী' ইত্যাদি পত্রিকা নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে মেহনতী মানুষের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় পত্রপত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে তিরিশের দশকে বাংলা দেশে আবার বহু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। যেমন, সাপ্তাহিক 'চাষীমজুর' (১৯৩২), সম্পাদক—বৈদ্যনাথ মুখার্জী, 'দিনমজুর' (১৯৩৩), মার্কসবাদী (১৯৩৩), সম্পাদক—অবনী চৌধুরী, 'মার্কসপন্থী' (১৯৩৩), সম্পাদক—আবদুল হালিম, 'গণশক্তি' (১৯৩৪), সম্পাদক—সরোজ মুখার্জী, 'জঙ্গীমজদুর' (হিন্দী), সম্পাদক—সোমনাথ লাহিড়ী, 'মাসিক গণশক্তি' (১৯৩৭), সম্পাদক—মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী প্রমুখ, 'আগে চলো' (১৯৩৮), সম্পাদক—আবদুল হালিম। বলাবাহুল্য সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকার প্রচার সহ্য করে নি। বারবার এইসব পত্রিকার উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বৈপ্লবিক আদর্শের মুখপত্র প্রকাশ অব্যাহতই থেকেছে।

শুধু মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ পত্রপত্রিকা নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের টানাপোড়েনে ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকার চরিত্রেও রূপান্তর আসে। তৎকালীন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুযোগ্য সম্পাদনায় যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পালন করেছিল তেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংবাদাদি প্রচারেও সহায়তা করেছিল। কিন্তু অচিরেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে অপসারণ করে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আর সেই নোংরা চরিত্র আজও বহন করে চলেছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাপ্তাহিক যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সাপ্তাহিক স্বাধীনতা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা। মার্কসবাদী বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এই সময় 'নবযুগ', 'লাঙল' ও 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে এক গণজাগরণের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে 'দৈনিক স্বাধীনতা' শ্রমজীবী মানুষের 'সত্যযুগ' পত্রিকাও সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে গণ-তান্ত্রিক সাংবাদিকতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। এ ছাড়াও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্ররূপে বিভিন্ন সময় 'স্বাধীনতা', 'মতামত' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকাগুলিও ক্রমশ শ্রেণী চরিত্রে বিপরীত কোটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চরিত্রের ইতিবাচকতা হারিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত মালিকানার পত্রপত্রিকাগুলি বহুল প্রচারের সৌভাগ্য নিয়েও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকে।

॥ তিন ॥

সমাজ বিপ্লব তো শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনে না, শিল্পসাহিত্যের জগতেও নিয়ে আসে পালাবদলের জোয়ার। সাহিত্য শিল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য সব সময়ই সামাজিক মানুষের শুভাশুভ বিচার বিশ্লেষণ করা। মানবতাবাদী লেখকেরা সমাজ সংসারের সমস্ত মানুষের মঙ্গল বিধান করতে গিয়ে এমন এক ধরনের চেতনার শিকার হয়ে পড়েন যেখানে সুর-অসুরের, শোষক-শোষিতের ভেদাভেদ থাকে না। ফলে তাঁর দ্বারা কায়েমীস্বার্থের শরীরে আঁচড়টিও লাগে না। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন লেখকদের সামনেও এ প্রশ্ন নিয়ে এল—সকল মানুষের শুভ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হতে পারে না। অসম সমাজ-ব্যবস্থার অবসান ঘটানর মধ্যেই ব্যাপকতর মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর সেই কাজের আহ্বান দুনিয়াব্যাপী রেখেছে নভেম্বর বিপ্লব। সেই বিপ্লবের দুরন্ত আহ্বানে যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্র আলোড়িত তখন সাহিত্যের জগত তো দূরে থাকতে পারে না! পারেও নি। বাংলাদেশে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। আর এই সাহিত্যের অগ্রচারী স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি প্রত্যক্ষভাবে নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজরুল তখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত। তাঁর তৎকালীন সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় লিখেছেন : "তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানর পর নজরুল সেইদিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গানবাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়।"

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই নজরুল কবিতায় এই বিপ্লবের জয়ধ্বনি ঘোষণা করলেন :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ওই নূতনের কেতন ওড়ে
কাল-বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে লিখেছেন : "এই কবিতা রাশিয়ার বিপ্লববাদকে অভ্যর্থনা করে লেখা। তখন ভারতে বা বাংলায় কোন নতুনের কেতন আর দেখা যাচ্ছে না, দিক-দেশ স্তিমিত হয়ে পড়েছে—একমাত্র আশার আলো জেলেছে নতুন মানবতাবাদ, অধিকারের সমত্ববোধ। এই আন্দোলনের সূত্রপাত সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে, ভারতবর্ষে নয়, রাশিয়ায়।" নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'শ্রমিকের গান', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি কবিতা

এবং 'সাম্যবাদী'র কবিতাগুলি মার্কসবাদে বিশ্বাস ও নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সঙ্গীত অনুবাদ করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রক্ত-পতাকা উত্তোলনের অকুণ্ঠ আহবান তিনিই প্রথম জানিয়েছেন দেশ-বাসীর সামনে :

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।...
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

নজরুলের সেনা-জীবনকালীন রচিত উপন্যাস 'ব্যথার দান'-এ লাল-ফৌজের ভূমিকার উল্লেখ আছে।

সে সময় 'গণবাণী', 'লাঙ্গল', 'ধূমকেতু', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল ছাড়াও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের রচনায় নবচেতনার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যতীন্দ্র নাথের চাষার বেগার, লোহার ব্যথা, বারনারী প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অবশ্য ইতিপূর্বেই (অর্থাৎ ১৯০৫ সালের) রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'লেনিন' নামের কবিতাটি আমরা কখনই বিস্মৃত হতে পারি না। লেনিনের মৃত্যুর পরও যখন বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি কুৎসা করে চলেছে তখন পূর্ব বাংলার এই কবি শুধু লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাই নয় বিপ্লবের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছেন :

"বারংবার মৃত্যুবার্তা রটায়েছে বিশ্বদূত
হয় নি সে কাল অঙ্কে লীন
এইবার মরেছে লেনিন।
রুশের গগনসূর্য অস্তমিত আজ
জনগণ অধিরাজ
জীবন্মৃত জাতি চিত্তে জ্বালাইবে দীপ্ত হুতাশন
সত্য কি মরেছে লেনিন?"

তিরিশ ও চল্লিশের যুগে কল্লোল—কালিকলম—সংহতি প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যের আঙ্গিকগত সমৃদ্ধি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমন দেখা দিয়েছিল সাধারণ অন্ত্যজ জীবনযাত্রার মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি ও আগ্রহ। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, অশোকবিজয় রাহা, বিষ্ণু দে দিনেশ দাস, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র প্রমুখের মধ্যে কম-বেশী নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত গণচেতনা স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দু-এক জনকে বাদ দিলে বেশীর ভাগই ভারতের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগ্রাম, গণ-নাট্য আন্দোলন এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগ্রামের পায়ে পা মিলিয়ে এঁরা কবিতা লিখেছেন এবং তার বেশীর ভাগই নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষপাতী। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের '৭ই নভেম্বর', 'সোভিয়েট ভূমি', 'বিপ্লব' প্রভৃতি কবিতা বাংলা কবিতার জগতে দিক্‌চিহ্নস্বরূপ। সুকান্তের 'মধ্যবিত্ত', '৪২', 'কৃষকের গান', 'বোধন', 'বিদ্রোহের গান', 'দিন বদলের পালা', 'একুশে নভেম্বর' প্রভৃতি বহু কবিতায় উন্নত কাব্য-শৈলীতে রচিত হয়েছে বিপ্লবের জয়গাথা। সুকান্ত লিখেছেন:

"কিছু না হলেও আবার আমরা
রক্ত দিতে তো পারি
পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারী
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি।"

"দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকুট; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি, একটি প্রেমের কবিতা, নবজীবনের গান; মঙ্গলাচরণের মেঘ বৃষ্টি ঝড়; অরুণ মিত্রের কাঁটাতার; রাম বসুর তোমাকে, যখন যন্ত্রণা; কৃষ্ণ ধর, সিদ্ধেশ্বর সেন, গোলাম কুদ্দুসের কবিতা প্রভৃতি বাংলা প্রগতি সাহিত্যের রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। যে পথ ধরে আজও অসংখ্য কবি-সৈনিক পথ হেঁটে চলেছেন কণ্ঠে রয়েছে তাঁদের অত্যাচারিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের জীবনের জয়গান। স্বাধীনতাপরবর্তী অপশাসন ও স্বৈর-শাসনের দিনগুলিতে যেসব কবি অগ্নিশপথে বিপ্লবের জয়ধ্বনি প্রচার করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, দুর্গাদাস সরকার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সাধন গুহ, সনাতন কবিয়াল, গোপীনাথ দে, অমল চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, দীপংকর চক্রবর্তী, জিয়াদ আলি, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাসগুপ্ত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নিমাই মান্না, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রায়, সাগর চক্রবর্তী প্রমুখ নবীন ও প্রবীণ কবিরা।

॥ চার ॥

বিশের দশক থেকে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবজাত গণচেতনা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বোধ করি ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের। বিপ্লবী সাহিত্যের আদর্শ শুধু এদেশে নয় সম্ভবতঃ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সঞ্চারিত হয়েছিল এই মহাকাব্যের মাধ্যমে। 'মা' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ এদেশের রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী-দের চিন্তাক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের অনুবাদে বিমল সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পুষ্পময়ী বসুর অবদান অপরিসীম।

বিশের দশকে মণীন্দ্রলাল বসু রচিত 'অরুণ' গল্পে রুশ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের উল্লেখ আছে। রুশ বিপ্লবজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সম্পর্কে ভারত-বাসীর বিশেষ করে বাঙ্গালীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললেন: "আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সবচেয়ে বড়োকরে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্য-কর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার।...এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।...অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে

তারাই একমাত্র।" রাশিয়া ভ্রমণের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং শোষিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিমূলক জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, নারায়ণ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ সেকালের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অবজ্ঞাত, অবহেলিত জীবনযাত্রার মানুষদের নিয়ে গল্প, উপন্যাস রচনার প্রবণতা। অনতিপরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ, ননী ভৌমিক, অসীম রায়, সুশীল জানা, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণময় মান্না প্রমুখ কথা-সাহিত্যিক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখে সমকালীন সংগ্রাম আন্দোলনের উদ্দাম জোয়ারের তালে তালে অসংখ্য সৃষ্টিসম্ভার উজাড় করে দিয়েছেন। এই সৃষ্টির জন্য বাংলা সাহিত্য গর্বিত এবং বলা চলে এই সৃষ্টি-ধারাই বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবপথ রচনা করে দিয়েছে। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সাহিত্য আজও অম্লানভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যে গণচেতনার ধারার পরিপোষকতা করে চলেছে। এই পথ ধরেই এসেছিলেন সমরেশ বসু, কিন্তু আজ তিনি প্রতিক্রিয়ার শিবিরে হারিয়ে গেছেন। সংগ্রামী জীবন দর্শনের ধারাটি কথা-সাহিত্যে অব্যাহতভাবে আজও যাঁরা বহন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তপোবিজয় ঘোষ, চিত্ত ঘোষাল, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মণি মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কালিদাস রক্ষিত, মিহির আচার্য, দেবদত্ত রায়, রামশঙ্কর চৌধুরী, হীরালাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কার্যকরী রূপ পায় নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। নাটকের ক্ষেত্রে নতুন দিনের বাণী বহন করে এনেছিলেন মন্মথ রায়, শচীন সেন-গুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। এ'দের সৃষ্ট নাটক বাংলা নাটকের গতিধারা সম্পূর্ণ বদলে দিল। রঙ্গমঞ্চে ও প্রধানত রঙ্গমঞ্চের বাইরে মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে বাংলার প্রগতি-মূলক ও গণনাট্য এই সব নাট্যকারের সৃষ্টিকে নির্ভর করেই ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারা বহন করেই অন্যান্য শক্তিমান নট ও নাট্যকাররা এসেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন উৎপল দত্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, জ্যোছন দস্তিদার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ভট্টাচার্য, চিররঞ্জন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী, বাসুদেব বসু, শ্যামাকান্ত দাস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দেবাশিষ মজুমদার, বিদ্যুৎ নাগ, শুভংকর চক্রবর্তী, শশাংক গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদেশে সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রাম আজও চলছে এবং চলবে যতদিন পর্যন্ত না আরব্ধ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়।-আর সমস্ত বাধা বিপত্তি অপসারণ করে সংগ্রামী মানুষের বিজয় ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য। সেই সংগ্রামের সাথীরূপে সাহিত্যের একটি প্রবল ধারা উত্তরোত্তর বেগবান হয়ে প্রবাহিত হতেই থাকবে। মাটির বুকে যেমন গাছ ও তার ফুল-ফলের জীবনরস নিহিত থাকে, তেমনি মানুষের সংগ্রামের মধ্যে জীবনমুখী সাহিত্যের উৎস। সেই উৎসমূল থেকে নিয়ত প্রাণরস আহরণ করে বিপ্লবী সাহিত্য তার স্থান করে নেবেই এই সমাজে।

ভারতীয় শিল্পে শোষণের হার

গোপাল ত্রিবেদী

কার্ল মার্ক্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যাল'-এর প্রথম খণ্ডে পণ্যের মূল্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—উৎপাদিত উপকরণের মূল্য, শ্রমের মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে সব মূল্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের কার্যকালের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্য তৈরী করতে দু' রকমের উপকরণ লাগে—উৎপাদিত উপকরণ ও মানুষের শ্রম। উৎপাদিত উপকরণের মূল্য, সেটা তৈরী করতে যে পরিমাণ শ্রম লেগেছিল তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদিত উপকরণের শ্রমমূল্যের সঙ্গে আরও শ্রম সংযোজিত হয়ে নূতন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

শ্রম সংযোজনের জন্য শ্রমিক তার শ্রমের মূল্য মজুরী হিসাবে পায়। আর বাদবাকী শ্রমমূল্য শিল্পপতি উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ শ্রমিক যতটা সময় কাজ করে ততটা শ্রমমূল্য সৃষ্টি করে; কিন্তু সৃষ্ট শ্রমমূল্যের এক অংশ শ্রমিক শ্রমের মূল্য হিসাবে পায়, আর বাকী অংশ যে শিল্পপতি শ্রমিককে নিয়োগ করে তার হাতে উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকে। সেইজন্য মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রমের মূল্যের অনুপাতকে শ্রমিক-শোষণের হার বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমিক যদি দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে এবং সে যে মজুরী পায় তার পরিমাণ যদি পাঁচ ঘণ্টা কাজের সমান হয়, তা হলে তিন ঘণ্টার কাজ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক-শোষণের হার দাঁড়ায় $\frac{৩}{৫}$×১০০=৬০ শতাংশ।

মার্ক্সের সংজ্ঞা অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ণয় করতে হলে পণ্যের মোট মূল্য ও তার ভাগ তিনটি শ্রমিকের কার্যকালের পরিমাপে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু শিল্পোৎপাদনের যে হিসাব আমরা পাই তাতে পণ্যের শ্রমমূল্য জানা যায় না, সব মূল্যই টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। সেইজন্য মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার প্রচলিত হিসাব থেকে নির্ণয় করা যায় না। তবু শিল্পোৎপাদনের যেসব হিসাব টাকার অঙ্কে পাওয়া যায় তা থেকে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বন্ধে একটি স্থূল ধারণা করতে কোন অসুবিধা হয় না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বন্ধে একটি স্থূল হিসাব উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

ভারতের শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সকল তথ্য 'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্-ডাস্ট্রিজ্'এর কল্যাণে পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ্' এই সকল তথ্য প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই ত্রিশটি বছরের মধ্যে দু' বছরের কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কারণ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালের জন্য 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ্'এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নি।

'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্ডাস্ট্রিজ'এর তথ্যে ২৯টি প্রধান শিল্পে বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারকারী ও ২০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী সব কারখানাকে ধরা হয়েছে। 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ্'এর তথ্যে বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারকারী যে সব কারখানায় ৫০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে এবং বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করে না এমন যে সব কারখানায় ১০০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতের বড় বড় সব কারখানার একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

এই সকল কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য থেকে যে সকল উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট মূল্য বাদ দিলে কারখানায় সংযোজিত মূল্যের পরিমাণ জানা যায়। কারখানায় সংযোজিত মূল্যের দু'টি ভাগ আছে—শ্রমিকের মজুরী এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিককে বেতন, ভাতা, বোনাস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে তার মোট পরিমাণকে শ্রমিকের মজুরী বলে ধরা হচ্ছে। কারখানায় সংযোজিত মূল্য থেকে শ্রমিকের মজুরী বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তাকে স্থূল অর্থে উদ্বৃত্ত মূল্য বলা যেতে পারে। এইভাবে পাওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যকে শ্রমিকের মজুরী দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে একশ' দিয়ে গুণ করলে শ্রমিক-শোষণের শতকরা হার পাওয়া যায়। এইভাবে পাওয়া হিসাবটি আমরা উপস্থিত করছি। [২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-শোষণের হার সম্পর্কে আটাশ বছরের যে হিসাব আমরা উপস্থিত করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে শোষণের গড় হার ৭৭ শতাংশ। আটাশ বছরের গড় হার ৭৭ শতাংশ হ'লেও বছরে বছরে এই হার অনেকখানি উঠানামা করেছে। সংযোজিত লেখচিত্রে এই অবস্থাটি পরিষ্কারভাবে দেখান হ'ল।

স্থূল দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা হ'ল (১) ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার পরবর্তী কালের তুলনায় অনেক বেশী উঠানামা করেছিল, (২) ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার গড় হারের উপরে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল, এবং (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে শোষণের হার বছর দুই খানিকটা কমতে থাকলেও ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে আবার দ্রুত বাড়তে থাকে।

মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যকালের উপর এবং তার জীবনযাপনের জন্য সেই কার্যকালের কতখানি দরকার তার উপর। এগুলি আবার নির্ভর করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কিত শ্রেণী সংগ্রামের উপর, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহারের উপর। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সাথে শোষণের কি সম্পর্ক ভারতীয় শিল্পে দেখা যায় তা নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করছি।

ভারতীয় শিল্পে মূল্য-গঠন এবং শোষণের হার, ১৯৪৬—১৯৭৫

বৎসর	উৎপাদিত উপকরণের মূল্য (কোটি টাকায়)	শ্রমিকের মজুরী (কোটি টাকায়)	উদ্বৃত্ত মূল্য (কোটি টাকায়)	পণ্যের মোট মূল্য (কোটি টাকায়)	শোষণের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯৪৬	৩৯১	১০২	১০৯	৬০৩	১০৭
১৯৪৭	৫০১	১০৬	১০৬	৭৪৩	৭৮
১৯৪৮	৬০৬	১৬৬	১৫২	৯৫৪	৯২
১৯৪৯	৭০৩	১৭৭	৯৬	৯৭৬	৫৪
১৯৫০	৭৪৪	১৭২	১১২	১০২৮	৬৫
১৯৫১	৯৬০	১৮৯	১৫৭	১৩০৬	৮৩
১৯৫২	৮৬৯	২০১	১১৪	১১৮৪	৫৭
১৯৫৩	৭৮৯	২০৫	১২৯	১১২৩	৬৪
১৯৫৪	৯১৫	২১৯	১৫৪	১২৮৮	৭০
১৯৫৫	৯৮৬	২৩১	১৮৯	১৪০৬	৮২
১৯৫৬	১১৪৫	২৫৬	২১৩	১৬১৪	৮৩
১৯৫৭	১২৫৬	২৭০	১৯৮	১৭২৪	৭৩
১৯৫৮	১২২২	২৬৮	২২২	১৭১১	৮৩
১৯৫৯	১৭৯১	৪০৮	৩৭৫	২৬০৪	৮৬
১৯৬০	২২৮৬	৪৮২	৩৮২	৩১৫০	৭৯
১৯৬১	২৭০৫	৫৩৬	৪৫২	৩৬৯৩	৮৪
১৯৬২	৩০৬১	৬২৮	৪৮৭	৪১৭৬	৭৮
১৯৬৩	৩৫০৪	৭০২	৫৯৩	৪৭৯৯	৮৪
১৯৬৪	৪১২৪	৮৩০	৬৭৩	৫৬২৭	৮১
১৯৬৫	৪৭৯২	৯৭০	৭৩০	৬৪৯২	৭৫
১৯৬৬	৫৪১৬	১০৭২	৭৬০	৭২৪৮	৭১
১৯৬৭	—	—	—	—	—
১৯৬৮	৬৫৭৭	১৩০৮	৭৮৮	৮৬৭৩	৬০
১৯৬৯	৭৫১৭	১৪৬২	৯৭৭	৯৯৯৬	৬৭
১৯৭০	৮৫০৭	১৬৫৯	১১৫০	১১৩৪৬	৬৯
১৯৭১	৯৯৪৩	১৮২২	১৩০১	১৩০৬৬	৭১
১৯৭২	—	—	—	—	—
১৯৭৩	১১৮৯৪	২২৬৩	১৮৩৬	১৫৯৯৩	৮১
১৯৭৪	১৬২৭১	২৭৮৮	২৭০৪	২১৭৬৩	৯৭
১৯৭৫	১৯২৩৬	৩১৬০	২৬০৯	২৫০০৫	৮৩

সূত্রঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম স্তম্ভের তথ্যগুলি 'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্ডাস্ট্রিজ' এবং 'এনুয়্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ' থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যগুলি হিসাব করে বার করা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে দেখা যায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং মালিকরা কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। সুতরাং শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরিমাপক হিসাবে দু'টি বিষয়কে গ্রহণ করা যায়—বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিরোধের ফলে কর্মচ্যুত শ্রম-দিনের সংখ্যা। শ্রমিক-মালিক বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি মাপা যায়। আর গড়ে একজন শ্রমিক আন্দোলনের ফলে যতদিন কর্মচ্যুত হয় তার দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা মাপা যায়। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করছি।

ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ১৯৪৬—১৯৭৫

বৎসর	বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ('০০০)	কর্মচ্যুত শ্রম-দিবসের সংখ্যা ('০০০০)	কর্মচ্যুত শ্রমদিবসের শ্রমিক প্রতি গড়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৪৬	১৯৬২	১২৭২	৬·৪৮
১৯৪৭	১৮৪১	১৬৫৬	৯·০০
১৯৪৮	১০৫৯	৭৮৪	৭·৪০
১৯৪৯	৬৮৫	৬৬০	৯·৬৩
১৯৫০	৭২০	১২৮১	১৭·৭৯
১৯৫১	৬৯১	৩৮২	৫·৫২
১৯৫২	৮০৯	৩৩৪	৪·১২
১৯৫৩	৪৬৭	৩৩৮	৭·২৫
১৯৫৪	৪৭৭	৩৩৭	৭·০৭
১৯৫৫	৫২৮	৫৭০	১০·৮০
১৯৫৬	৭১৫	৬৯৯	৯·৭৮
১৯৫৭	৮৮৯	৬৪৩	৭·২৩
১৯৫৮	৯২৯	৭৮০	৮·৪০
১৯৫৯	৬৯৪	৫৬৩	৮·১২
১৯৬০	৯৮৬	৬৫৪	৬·৬৩
১৯৬১	৫১২	৪৯২	৯·৬১
১৯৬২	৭০৫	৬১২	৮·৬৮
১৯৬৩	৫৬৩	৩২৭	৫·৮০
১৯৬৪	১০০৩	৭৭২	৭·৭০
১৯৬৫	৯৯১	৬৪৭	৬·৫৩
১৯৬৬	১৪১০	১৩৮৫	৯·৮২
১৯৬৭	১৪৯০	১৭১৫	১১·৫১
১৯৬৮	১৬৬৯	১৭২৪	১০·৩৩
১৯৬৯	১৮২৭	১৯০৫	১০·৪৩
১৯৭০	১৮২৮	২০৫৬	১১·২৫
১৯৭১	১৬১৫	১৬৫৫	১০·২৪
১৯৭২	১৭৩৭	২০৫৪	১১·৮৩
১৯৭৩	২৫৪৬	২০৬৩	৮·১০
১৯৭৪	২৮৫৫	৪০২৬	১৪·১০
১৯৭৫	১১৪৩	২১৯০	১৯·১৫

সূত্রঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের তথ্যগুলি 'ইন্ডিয়ান্ লেবার ইয়ারবুক্', 'ইন্ডিয়ান্ লেবার গেজেট্' এবং 'ইন্ডিয়ান্ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাকে দ্বিতীয় স্তম্ভের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে চতুর্থ স্তম্ভের সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে।

রাশি বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতিতে শ্রমিক-শোষণের হারের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি নজরে পড়ে তা হ'লঃ (১) শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে তীব্রতার সম্পর্ক খুবই দুর্বল, এবং (২) তার ফলে সামগ্রিকভাবে শোষণের হারের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায় শোষণের হার উঠানামার বিশ্লেষণে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা খুবই দুর্বল। এটা ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে শোষণের হারের, দুর্বল হলেও, একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকরা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে ধর্মঘটকে প্রলম্বিত করে শোষণের হার কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে শোষণের হারের একটি ক্ষীণ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হ'ল, শোষণ যত বাড়ছে তত অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। তবে অধিক সংখ্যায় শ্রমিককে আন্দোলনে সামিল করার ব্যাপারে অনেক দুর্বলতা থাকায় এই সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।

পরিশেষে বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। আমরা এখানে শ্রমিক-শোষণের হারকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আরও যে সব বিষয় আছে (যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি) সেগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি নি। তাছাড়া, শোষণের হারের শিল্পগত ও আঞ্চলিক তারতম্যও বিশ্লেষণ করি নি। তাই যে চিত্রটি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে তা খুবই স্থূল এবং বিচার সাপেক্ষ।*

* প্রবন্ধটি রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে 'সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অরগানিজেশন'-এর কলকাতা অফিসের গ্রন্থাগারিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের টিচার ফেলো শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভগৎ যে সাহায্য করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্বীকার করছি।

প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী ও সহজ পাঠ

তাজ মহম্মদ

দীর্ঘদিন পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আলাপ আলোচনার পর যখন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নতুনভাবে প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার, ঠিক সেই মুহূর্তে নানারকম আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিছু কিছু সাহিত্যিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তীব্রভাবে আক্রমণ করছে এই নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে, এবং অবশ্যই তারা একটা নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সচেতনভাবে আক্রমণ হানার চেষ্টা করছেন। যা হোক সমাজ বিকাশের ধারাকে রুখে দেওয়ার মত ইতিহাস আজও তৈরী হয় নি। তবুও কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এই পরিবর্তন যদি যথাযথভাবে না হয় তাহলে সমাজজীবন নানারকম প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের রীতি দেশে দেশে প্রচলিত। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালে যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রাথমিক স্তরে চালু হয়েছিল তা আজও পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত। পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করা হচ্ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ২৫ বছর পর সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও বাস্তবানুগ করার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার করছে তাকে নিশ্চয় সাধুবাদ জানানো উচিত।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন কোন গোপন ঘটনা নয়

কিছু কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও দৈনিক সংবাদপত্র ফলাও করে লিখতে শুরু করলেন যে, এই সরকার নাকি গোপনভাবে এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের কাজ সারছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা ধরে ফেললেন ভাবটা এই রকমই। কিন্তু এ'রা কি সত্যি কথা বলছেন? আদৌ নয়। ঐসব বুদ্ধিজীবীরা এবং সংবাদপত্রগুলো খবর না রাখতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনের সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁরা জানেন, খবর রাখেন। সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ বিনয় ভবনের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৪৩৫-ইডিএন(পি) তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর-এর এক আদেশনামায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করে। যে কোন কারণেই হোক সেই কমিটি ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই কমিটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যকরীভাবে এই সিলেবাস কমিটি কাজ শুরু করে। এছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। সার্বিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এবং এই কমিটির অধিবেশনগুলিতে ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিলেবাসকে আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগপোযোগী করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছুদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এ্যাডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT)এর পরিচালনাধীনে ওরিয়েন্টেশন কার্যসূচী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে ঐ সব বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রগুলি নেহাতই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যই এরকম বিরূপ মন্তব্য ও অভিযোগ উত্থাপন করছেন।

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে

যখন নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ কিছু কিছু দৈনিক সংবাদপত্রের সাথে সুর মিলিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন। ভাবাবেগের আতিশয্যে এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এত হৈচৈ করছেন। ভাবটা এমনই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার ইজারা নিয়েছেন একমাত্র তাঁরাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গে যখন অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল, চারিদিকে হঠকারী রাজনীতির ধারক বাহকরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে নষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হানছিল, তখন কিন্তু ঐ সব বুদ্ধিজীবীর দল এগিয়ে আসেন নি সামান্যতম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। এ'রা ভাবাবেগে বিভোর হয়ে রাজ্যে যখন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন আন্দোলন করার হুমকি দিলেন। আশ্চর্যের কথা, তাঁরা একবার দাবি করলেন না, একটা শিক্ষামূলক আলোচনার, যখন সরকার উদাত্তভাবে মূল্যবান অভিমত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের কাছে এটা খুব দুঃখজনক যে, 'সহজ পাঠ' সংক্রান্ত বিতর্কে বিরোধীরা এবং ঐ সব সাহিত্যিক সমালোচকরা শিশুবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পরিহার করে শিশুসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠে'র মূল্যায়ন করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ও

ভাষানীতিকে আক্রমণ করলেন, তাঁরা 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে পরিবেশকে দূষিত করে মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য বামফ্রন্ট বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলছেন। রবীন্দ্রনাথের নাম এবং 'সহজ পাঠে'র মত একটা শিশুপাঠ্য আদরণীয় বইকে নিয়ে জল ঘোলা করে তাঁরা চুপ করবেন না এটা সহজেই অনুমেয়। এই ঘোলা জলের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সমগ্র পাঠক্রমের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার চেষ্টা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিতে পরিবর্তনের যে সুপারিশ গৃহীত হয়েছে সেই পরিবর্তনের বিরোধী এ'রা। কিন্তু বাস্তবভিত্তিক, হাতে কলমে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলা যায় না। তাতে ওদের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আসলে এ'রা মৌলিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্তরের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছেন। বাঁধ ভেঙে দিতে চেয়েছেন, এ'রা অচলায়তনকে ধরে রাখতে চান, আসলে পরিবর্তনেই এ'দের বাধা। সেইজন্য এ'রা 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে কৌশলে রবীন্দ্র-প্রীতির নামে আপত্তি করতে চাইছেন। তাঁদের এটাও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে, এই 'সহজ পাঠ' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রণয়ন করেছিলেন।

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ও 'সহজ পাঠ'

সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম কখনই চিরকাল এক রকম থাকতে পারে না। সে কারণে এটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'সহজ পাঠ' কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু এটা ভাবা নিতান্তই অন্যায় যে 'সহজ পাঠ' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে তা চিরকালই পাঠ্যসূচীতে থাকবে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানেন তাঁরা বুঝবেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনদিন অনড় মানসিকতার মানুষ ছিলেন না। যিনি নিজে সারা-জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নতুন নতুন ভাবে সবকিছুকে গড়তে চেয়েছিলেন, সে কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনা কেমন ছিল আর আধুনিক যুগ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে একে গ্রহণ করা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই 'সহজ পাঠ'কে গ্রহণ করতে হবে। আবহমানকালের বাঙলাভাষীদের জন্য বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়ে'র পরেও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'সহজ পাঠ' শান্তি-নিকেতনের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' বর্জন করার জন্য নয়। ভাষা শিক্ষার পরে পড়ুয়াদের ভাব ও ছন্দের জগতে প্রবেশের পথকে উপযুক্ত করার জন্য এবং বাস্তব প্রয়োজনেই। সেজন্য প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাষা, ভাব ও ছন্দের সমন্বয়-সাধনকল্পে যে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচিত হবে তা রবীন্দ্রনাথ বিরোধী তো নয়ই বরং তা রবীন্দ্রচেতনার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষার প্রথম স্তরে শিশুদের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনে যে দিকগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হ'ল—অক্ষর পরিচয়, মুদ্রিত অক্ষর, লিপিশিক্ষা অভ্যাস করানো, শব্দের সাথে পরিচয়, শব্দ গঠন, উচ্চারণ রীতি, অযুক্তাক্ষর শব্দ ও যুক্তাক্ষর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন, বাক্য প্রয়োগের ব্যাকরণরীতি ও প্রয়োগের দক্ষতা কিভাবে দেওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের সমন্বয় সাধনই বা কিভাবে করা যায়। এ ছাড়াও ভাষাশিক্ষা বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট সূত্রগুলি অনুধাবন করানো প্রয়োজন।

শিশুরা যাতে প্রচলিত ছড়া ও গাথার সাথেও এ স্তরে পরিচিত হতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত বা নজরুলের শিশুপাঠ্য কবিতা ও ছড়ার সাথেও শিশু-দের পরিচিত করা আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। শব্দ, বাক্য ও অনুষঙ্গগুলি বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী শিশুদের সুস্পষ্ট মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ ছাড়াও এ পুস্তকটি এমন হওয়া উচিত যা শিশু-দের কাছে আকর্ষণীয় হবে ও অনুশীলনে শিশুদের উৎসাহ যোগাতে সাহায্য করবে।

নতুন পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

(১) এই পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ক্রান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি, জীবনব্যাপী শিক্ষণের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেওয়া।

(২) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি পাঠক্রম রচনায় গ্রহণ করা হয়েছিল।

(৩) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উদ্দেশ্যে শিশুর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকল্পে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কাজ" শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন পাঠক্রম সংযোজিত হয়েছে।

(৪) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(৫) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৬) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠক্রমে বিষয়টি শিখনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির সাধারণ ইঙ্গিত সন্নিবেশিত হয়েছে।

(প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।)

যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার শিশুসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠ'কে মূল্যায়ন করতে বসেন নি সে কারণে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের কাছে আবেদন শিশুসাহিত্যের যে নিজস্ব বিজ্ঞান আছে তার নিরিখেই যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু হ'তে যাচ্ছে তাকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে বিচার করতে হবে—কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়।

শিশুসাহিত্য না শিশুশিক্ষা?

কেতকী বিশ্বাস

'সহজপাঠে'র কথা মনে হলেই যে ছবিটি স্বাভাবিকভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি এরকম—৫ থেকে ৭ বৎসরের একটি শিশু চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে পড়ছে,—"রাম বনে ফুল পাড়ে, গায়ে তার লাল শাল," বা "উস্রি নদীর ঝরণা দেখতে যাব দিনটা বড় বিশ্রি......সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সংগে উস্রির ঝরণায়,"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্রকল্প মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি ওই শিশুকে 'সহজপাঠ' থেকে একটা গল্প বলতে বলুন, সে তৎক্ষণাৎ গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে। আসল তফাৎটা এখানেই।

'সহজপাঠ' শিশুসাহিত্য হিসাবে অতুলনীয়। ছন্দমাধুর্যে, ধ্বনি-বিন্যাসে, ভাবের সহজ এবং সপ্রতিভ অভিব্যক্তিতে 'সহজপাঠ' শিশু-মনকে অভিভূত করে। শিশুমনের কল্পনার উন্মেষ ও সম্প্রসারণে 'সহজপাঠ' অদ্বিতীয়। স্মরণপ্রক্রিয়াকেও 'সহজপাঠ' সাহায্য করে। কিন্তু শিশুসাহিত্য এবং শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। যে 'চিন্তা' রবীন্দ্রনাথকে 'সহজপাঠ' প্রণয়নে অভিলাষী করেছিল, সেই চিন্তাই পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীতে। উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যটা একই—শিশুকে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে তার পাঠ্যবিষয়ে আকৃষ্ট করা, এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা। লক্ষ্য এক হলেও 'সহজপাঠ' সার্থক শিশুশিক্ষার বই হয়ে ওঠে নি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করতে পারেন নি। 'সহজপাঠে' শিশুর মনকে সক্রিয় করে তোলার কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সেদিক থেকে বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা 'পিতৃদ্রোহিতা'র প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ভেবে দেখবেন পিতার অনুশ্রুত পথে পুত্রের অধিক অগ্রগতিকে 'পিতৃদ্রোহিতা' বলা যায় কি না!

আমার মনে হয় সমালোচকরা 'সহজপাঠে'র ব্যাপারটাকে আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু তারা যদি কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীর পিছনে সঠিক চিন্তাকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হতেন এবং তার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীটা ভাল করে পড়তেন তাহলে হয়তো আসরে নামতেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁরা জিনিসটাকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ হিসাবে নিচ্ছেন এবং সেইভাবেই প্রচার করছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল, যে কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীর সমর্থক যারা, (যেমন আমি) রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের এতটুকু ঘাটতি নেই। রবীন্দ্র-নাথকে স্বীকার করতে কোনরকম ভাবাবেগের প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের স্থান তথাকথিত ভাবাবেগ, অন্ধতা বা চক্ষুলজ্জার উর্ধ্বে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখন আসল কথায় আসা যাক। শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। শিশুসাহিত্য শিশুর মনকে যে অনির্বচনীয়, অব্যক্ত ভাল লাগার রাজ্যে নিয়ে যায়, শিশুশিক্ষা সেই রাজ্যকে কায়েম করতে সহযোগিতা করে, শিশুর অন্তর্নিহিত (inherent) সুপ্ত (dormant) শক্তি ও গুণের বিকাশ ঘটিয়ে। শিশুসাহিত্য শিশুর কল্পনাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সাহায্য করে। সৌন্দর্য ও রুচি-বোধ জাগ্রত করে। শিশুশিক্ষা তাকে পরিচিত করে পার্থিব পরি-বেশের সংগে। ব্যবহারিক জীবনে শিশুকে অভ্যস্ত করে তোলে এবং সময়োপযোগী মানসিক গঠনে সহযোগিতা করে। এদিক থেকে শিশুশিক্ষায় কোনরকম বিশেষীকরণ বা বিষয়ের পৃথকীকরণ না থাকাই সংগত।

যাইহোক শিশুশিক্ষার বিষয়টাকে আমরা দু'ভাবে নিতে পারি। সাঙ্গীকরণ (adjustment) [দৈহিক, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক] এবং নিয়ন্ত্রণ (direction) [ভিতর এবং সাধারণভাবে], এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মানসিক গঠন অনুযায়ী বেড়ে উঠতে সাহায্য করা বা তার ভিতরকার সুপ্ত গুণাবলীর সম্যক্ বিকাশ ঘটানই শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সব থেকে আগে প্রয়োজন শিশুর সক্রিয়তা (দৈহিক এবং মানসিক)। শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় শিশুর কোন ভূমিকা আছে অতীতে স্বীকার করা হত না। কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইউ রোপের বিভিন্ন অংশে এই বিষয়ে শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ রুশোই (Jean Jacques Rousseau) স্পষ্টভাবে শিশু-কেন্দ্রিক (child-centric) শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন। শিশুকে শিশু হিসাবে দেখবার স্বপক্ষে ছিলেন তিনি। (Child is a child, before a man, or child is not a miniature adult.) পেস্টালোজিও (Johann Heinrich Pestalozzi) বলেন শিশুরা চারাগাছের মত। অধিক যত্নের ফলে যেমন পাতিলেবু গাছে কমলা ফলে না তেমনি শিক্ষার প্রকারভেদে শিশুর গুণগত পরি-বর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। অরবিন্দও বলে গেছেন শিক্ষক শিশুর সাহায্যকারী মাত্র, "হুকুমনামার সহায়" নয়। (Teacher is the helper and guide, not a task-master) রবীন্দ্রনাথ নিজেও শিক্ষার কথা ভেবেছেন বারে বারে। শিক্ষার সংগে আনন্দের সাঙ্গীকরণ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথাও আমরা জানি।

এইখানে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া প্রয়োজন। শিশুর আনন্দের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একজন পরিপূর্ণ মানুষের আনন্দের উপকরণ যোগাতে সমগ্র নন্দনতত্ত্ব নিঃশেষিত হতে পারে কিন্তু শিশুর আনন্দ অতি সামান্যই। শিশুরা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন, এই পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই তার অপরিসীম কৌতূহল, আর সেই কৌতূহল নিবৃত্তেই তার সব থেকে বেশি আনন্দ। এই সময় তার মানসিক গঠন যেমন সরল থাকে তেমনি তার আনন্দ বেদনাও (শিশু বলতে ৫—৮ বৎসরের মধ্যে)। ব্যাপারটা মূর্ত হয়ে ওঠে যদি আমরা শিশুদের খেলার উপকরণগুলি খেয়াল করে দেখি।

শিশুশিক্ষার পাঠ্যসূচী হবে শিশুর মনে প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল উদ্দীপক এবং সরলভাবে সেই কৌতূহল নিবৃত্তকরণের সহায়ক। এক কথায় শিশুশিক্ষার পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও পাঠ্যসূচী এমন হওয়া উচিত যাতে করে শিশু প্রশ্ন করতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে

নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করতে পারে। পাঠ্যসূচীর বিষয়-বস্তু বর্ণনামূলক হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এবার আসা যাক ভাষাশিক্ষা প্রসঙ্গে, শিশুর ভাষা প্রধানতঃ কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। এই শিশুর জগৎ, জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং নিজেকে চিনবার ভাষা, শিশুর আত্মবিকাশের ভাষা। শিশুর ভাষাশিক্ষা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে করে সে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে। তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কল্পনার কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এদিক বিচার করলে 'সহজপাঠ' শিশুর ভাষাশিক্ষার সহায়ক নয়। 'সহজ-পাঠে'র ভাষা প্রধানতঃ ভাবের ভাষা। এই ভাষা শিশুর মনকে আচ্ছন্ন করে বা দোলা দেয়, কিন্তু এই ভাষাকে শিশু তার নিজের করে ভাবতে পারে না। তাই সহজপাঠের গল্প থেকে কোন প্রশ্ন করলে সে সহজপাঠের ভাষাতেই উত্তর দেয়।

'সহজপাঠ' শিশুকে সাংগীকরণ প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করে না। কারণ সহজপাঠের গল্পগুলি প্রধানতঃ কল্পনাশ্রয়ী। অবাস্তব বলা যায় কিনা জানি না কিন্তু এর বাস্তবতার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার অনেক পার্থক্য। কোন শিশু যদি প্রশ্ন করে—সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র কে?' 'সংসারবাবুর বাসা কোথায়?' 'বেণী বৈরাগী কেমন লোক?' 'পেঁচার ডাক কেমন?' আমরা সদুত্তর দিতে পারি না।

শিশুপাঠ্য বইগুলিতে চিত্রমালার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ছবির সাহায্যেই শিশুকে তাড়াতাড়ি শেখানো যায়। কিন্তু দেখতে হবে ছবিগুলি যেন সরল, বস্তুমূলক হয়। ছবিগুলি দেখেই যেন সে চিনতে পারে বা তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে। অথবা যে জিনিস সে দেখেনি সে সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারে। কিন্তু 'সহজপাঠে'র চিত্রগুলিকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি না। সবসময় চিত্রগুলিকে দেখে তারা চিনে উঠতেও পারে না যে কোন্ জিনিসের ছবি। যার ফলে তারা যখন ছবিগুলিতে রং করে (শিক্ষকের কথা অনুসারে) তখন প্রায়শঃ দেখা যায় যে রং দিয়ে তারা এক-একটা কিম্ভূতকিমাকার তৈরি করছে। সেদিন কোন একটা দৈনিকে একটা চিঠি পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন যে যদি 'সহজপাঠ'কে অপসারণ করতে হয় তো রামায়ণ মহাভারতের গল্প-গুলিকেও অপসারণ করতে হয়। (যদিও আমি নিশ্চিত নই, 'সহজ-পাঠে'র শিশুদের রামায়ণ মহাভারতের গল্প পাঠ্য আছে কিনা!) যাইহোক মহাভারত বা রামায়ণের গল্পগুলি মূলতঃ রূপকধর্মী। মহাকাব্য হিসাবে এই গল্পগুলি মনুষ্যসমাজের চিরন্তন সত্যকেই মূর্ত করে। এই গল্পগুলি শিশুর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, শিশুকে উৎসাহিত করে, মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এই-ভাবেই শিক্ষপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ (as direction) হিসাবে কাজ করে।

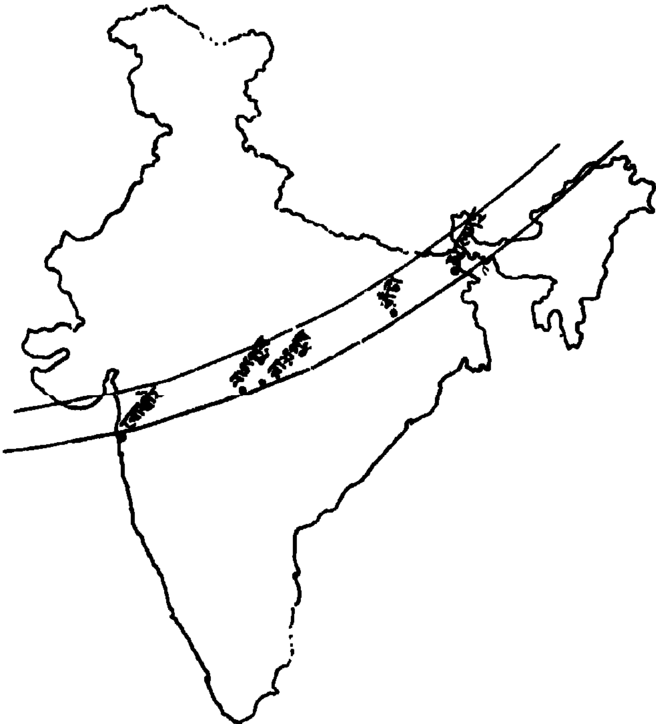
অবশেষে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর্গ ও সুধীজনকে অনুরোধ করব যে তাঁরা শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা যেন পরিচালিত না হন। শিশুশিক্ষার ব্যাপারটা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানভিত্তিক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, রাতকে রাত, দিনকে দিন, ক্ষেতমজুরকে ক্ষেতমজুর, বর্গাদারকে বর্গাদার, মহা-জনকে মহাজন, সুদখোরকে সুদখোর হিসাবে চিনতে দেওয়া বা সাহায্য করাটা কোন অপরাধ হতে পারে না। বর্তমান শিশুরা যদি আগামী সভ্যতার ধারক ও বাহক হয় তবে, শুরুটা শুরু থেকেই হওয়া ভাল নয় কি? 'জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা' বলতে আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে।

প্রতিবেদন

তারার গ্রহণ

অধ্যাপক সত্য চৌধুরী

১৯৮০ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের আকাশে তারার গ্রহণের একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে। সূর্যকে আড়াল করার ফলে চাঁদের ছায়ায় পৃথিবীর স্পর্শিত অঞ্চলে যেমন সূর্যগ্রহণ হয় ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একই নিয়মে এসএও ১৮৭৩৫৮ নামক একটি অনুজ্জ্বল তারাকে ইউনোমিয়া নামের একটি গ্রহাণু অল্প কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। ফলে তারাটিতে গ্রহণ লাগে। এই তারার গ্রহণ সম্পর্কে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে একটা পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই পূর্বাভাস অনুসারে গ্রহণের আবছা চলমান ছায়াঞ্চল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ২১ সেকেন্ডে বোম্বাইয়ের কাছে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করার কথা। ছায়াঞ্চলের পরিসর আনুমানিক ৪০ মাইল। এই ছায়া মধ্যভারত অতিক্রম করে বিহার ছুঁয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে। ছায়ার গতিপথে ছিল বোম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর, রায়পুর, হাজারিবাগ, রাঁচী, মালদহ, গৌহাটি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহর, পরে ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে ছায়াঞ্চলের চীনের মাটিতে প্রবেশ করার পূর্বাভাস ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলিতে সূর্যাস্ত অপেক্ষাকৃত দেরীতে হয় বলে পূর্বাঞ্চল থেকে এই ছায়া পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। অন্ধকার এবং নির্মেঘ আকাশ এ ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের আবশ্যক শর্ত।



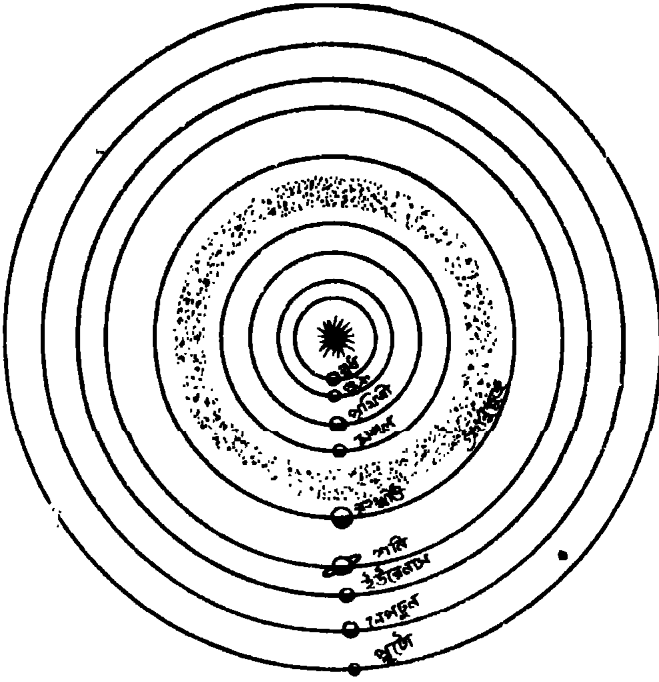
আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে সেদিন মালদহে ছিল সৌরজগতের এই বিরল ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ।

বাঙ্গালোর জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের ইউরেনাস গ্রহের বলয় আবিষ্কারক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য মালদহ কলেজ মাঠে একটি অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বসিয়েছিলেন। এই গবেষকদলে ছিলেন বাঙ্গালোরের মিঃ চন্দ্রমোহন, কলকাতার পজিশনাল অ্যাসট্রোনমি সেন্টার ও কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্সের এ কে ভাটনগর, স্বপন শূর প্রমুখ। তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গাজোলের আদিনা মসজিদ, মালদহ কলেজ এবং ফরাক্কা থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মালদহ কলেজ ছিল মূল কেন্দ্র। সেখানে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃহদাকার টেলিসকোপ বসানো হয়েছিল।

গ্রহাণু

বোড-টিসিয়াস সূত্র অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে সূর্য থেকে ২৭ কোটি মাইল দূরে একটি গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বহুকাল আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থানটি ফাঁকা বলেই মনে হ'ত। অবশেষে ১৮০১ সালে সিসিলির বৈজ্ঞানিক পিয়াজী মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একটি গ্রহের সন্ধান পান। মাপজোক করে দেখা গেল গ্রহটি অতিশয় ক্ষুদ্র, ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমক দেবতার নাম অনুসারে গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল সিরিস। পরে গভীরতর অনুসন্ধান চালিয়ে সিরিসের কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আরও অনেক ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কার হতে লাগল। আচরণে গ্রহের মত হলেও আয়তনে এরা খুব ক্ষুদ্র—তাই এদের নাম হ'ল গ্রহাণু বা গ্রহকণা। সংখ্যায় এরা হাজার হাজার, হাজার ত্রিশেক হতে পারে। গ্রহাণুপুঞ্জ হ'ল এদের সম্মিলিত নাম। সবচেয়ে বড় ৪টির নাম—সিরিস, ভেস্টা, জুনো ও পালাস। বাকী গ্রহাণুগুলির ব্যাস ১০০ মাইল থেকে শুরু করে ১ মাইল পর্যন্ত। অনেকের ব্যাস আরও কম। এখনো পর্যন্ত ২ হাজার গ্রহাণুর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেছে।

গ্রহাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কারো কারো কক্ষপথ খুব বেশী উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার ফলেই ঈরস নামক ১৬ মাইল ব্যাসের গ্রহাণুটি কখনো কখনো পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। গ্রহাণুদের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। কেউ গোলাকার, কেউ শঙ্কু আকৃতির, আবার কেউ বা নোড়ার মত। কোন বড় গ্রহ বা উপগ্রহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে গ্রহাণু কক্ষচ্যুত হয়ে সেই গ্রহ বা উপগ্রহের গায়ে আছড়ে পড়তে পারে। মঙ্গল বা চাঁদের দেহস্থিত খাদগুলি গ্রহাণুদের আঘাতের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। পৃথিবীর বুকেও বহু গ্রহাণু আছড়ে পড়েছে। আমেরিকার আরিজোনা খাদ (বর্তুলাকার মুখের ব্যাস ১ মাইল) এবং ভারতবর্ষে পুণার নিকটবর্তী লোনার খাদ (মুখের ব্যাস ৬০০ ফুট) পৃথিবীর বুকে নেমে আসা গ্রহাণুদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।



ইউনোমিয়া

গত ৬ই অক্টোবর এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার গ্রহণ সৃষ্টিকারী গ্রহাণুটির নাম ইউনোমিয়া। ১৯৫১ সালে এই গ্রহাণুটি আবিষ্কৃত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা পরিমাপক এককের হিসাবে ইউনোমিয়ার উজ্জ্বলতা ৭·৪, এর আকৃতি গোলাকার নয়, সম্ভবতঃ নোড়ার মত। ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস এখনো অজ্ঞাত। অবশ্য উজ্জ্বলতা থেকে গ্রহের আয়তন নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি আছে—তবে পদ্ধতিটা নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত নয়। স্থূল হিসাবে ইউনোমিয়ার ব্যাস ১৬০ থেকে ১৭০ মাইলের মধ্যে হতে পারে বলে অনেকে আন্দাজ করেন। সারা বিশ্বের জ্যোতির্পদার্থবিদদের মধ্যে এই গ্রহাণুটির সঠিক ব্যাস মাপার জন্য গভীর আগ্রহ আছে। ৬ই অক্টোবর এর ব্যাস মাপার দুর্লভ সুযোগটি উপস্থিত হয়েছিল। ইউনোমিয়ার আড়ালে এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার অন্তর্ধান এবং পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা এবং গ্রহণের সময়টুকু নিখুঁতভাবে নির্ণয় করাই ছিল সেদিন গবেষকদের প্রধান কাজ। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই একটি গ্রহাণুর আয়তন ও আকৃতি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। এই ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের সুযোগ খুব কম পাওয়া যায়। তারার গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে শুধু গ্রহাণুর আয়তন আকৃতিই নয়, সৌরজগতের গঠন সম্পর্কেও বহু মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব।

পর্যবেক্ষণের ফলাফল

ইউনোমিয়ার আয়তন ১৬০/১৭০ মাইল ধরে নিয়ে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি গ্রহণের আনুমানিক সময় এবং গ্রহণের এলাকা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু ইউনোমিয়ার ব্যাস সম্পর্কে উজ্জ্বলতা থেকে নিরূপিত হিসাবটি যদি একেবারেই বেঠিক হয় এবং ব্যাস যদি ৪৫/৪৬ মাইলের কম হয় তাহলে তারার গ্রহণের ছায়ার পক্ষে পৃথিবীর মাটিতে পেঁছানর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং গ্রহণের ফলে যে ছায়াশংকু সৃষ্টি হয় তার শীর্ষবিন্দুটির পৃথিবীপৃষ্ঠের বহু উপর দিয়ে আকাশ পথে চলে যাওয়ার কথা। ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পর্যবেক্ষণের সময় শক্তিশালী টেলিস্কোপের চোখে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন ছায়া ধরা পড়ে নি। গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডঃ ভট্টাচার্য মালদহ কলেজ প্রাঙ্গণে টেলিস্কোপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তই করলেন যে, ইউনোমিয়ার ব্যাস কোনমতেই ৪৫/৪৬ মাইলের বেশী নয়। তাহলে ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস কত? প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিকদের সামনে এখনো খোলা থাকলো।

মইশাল বন্ধু

কল্যাণ দে

মাঠের শেষে নদী।

নদীর নাম বালাসন। নদী পেরিয়ে তরাই-এর নিবিড় অরণ্য। শাল, শিশুগাছের শাখায় শাখায় কাঁধে কাঁধ হাতে হাত।

বৈশাখের শীর্ণ নদী। বালির আসন পেতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে যেন ধ্যানমগ্ন। নদীর এপারে বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে তারাবাড়ি গ্রাম। তারাবাড়ি থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট প্রায় আড়াই মাইল পথ; কখনো কাঁচা কখনো পীচ ঢালা।

তারাবাড়ি গ্রামের জোতদার প্রহ্লাদ সিংহ। তাঁরই বাড়ির মইশাল দীনকাটু সিংহ।

দীনকাটুর ত্রি-সংসারে কেউ নেই। জন্মেছিল ধূপগুড়ির কমলাই নদীর ধারের কোনো এক গাঁয়ে। ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল প্রহ্লাদ সিংহের বাড়ি। সেই থেকে এখানে আছে। ওর বয়স এখন চব্বিশ। ঐ তরাই-এর নিবিড় অরণ্যের পুরানো শালগাছের মতই পুরুষ্ঠু ওর শরীর। মোষ আর গরুর দেখাশোনা ওই করে বরাবর।

জোতদার বাড়ির দোতলা বাড়ির একতলার বারান্দায় এক ছোট্ট ঘরে ওর একলার সংসার। খোক্‌রার বিছানায় ময়লা কিছু কাঁথা। একটা কাঠের বাক্স। একটা খাটো ধুতি, একটা পিরান, একটা গামছা, ভাঙা আয়না, কমদামী চিরুনী—এই তার সম্বল। আর আছে একটা আড় বাঁশের বাঁশী।

বৈশাখ মাসের সকাল।

এক টুকরো মেঘ পাকা করমচার মত সূর্যটাকে হনুমানের মত বগলদাবা করে ফেলেছে।

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে একটু। গোয়ালঘরে পবুনা, আন্ধারু প্রিয় দু'টি মোষ ডাকছে।

চোখ কচলে নিয়ে দীনকাটু হেঁকে উঠল, রইস রে রইস মুই যাছো।

জবাব এল, অ্যাঁ—এ—এ—এ।

তাড়াতাড়ি কুয়োয় গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নিয়ে গোয়ালঘরে চলে এল। কালো কুচকুচে কালবৈশাখী মেঘের মত দু'টি তাজা মোষ ওকে দেখে খুশীতে ডেকে উঠল।

দেবী প্রতিমার গায়ে চক্‌চক্ করা গর্জন তেলের মত চক্‌চকে গায়ে হাত বুলিয়ে পবুনার চোখে চোখ রেখে এক স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলতে লাগল দীনকাটু।

পবুনাকে আদর করছে দেখে আন্ধারুর মনে হিংসে জাগল। সে শিং দিয়ে আল্‌তো করে দীনকাটুর পিঠে খোঁচা মারল। দীনকাটু পবুনাকে বলে উঠল, দ্যাখেছিস্ সতীনের আগ? মুই কাক্ বেহা করিম? তোক্ না আন্ধারুক্? হেসে বলে ফেলল সে, না হায় গে, না হায়। মুই দোনোজনাকে বেহা করিম। কথাগুলো বলার সংগে সংগে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দমকা বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মত। সে দীর্ঘশ্বাসের সংগে সংগে স্মৃতির অ্যালবাম উল্টে গেল। বেরিয়ে এল কিছু ছবি।

বালাসন নদীর ওপারে রাজবংশীদের গ্রাম। সে গ্রামের এক গরীব চাষীর মেয়ে টিয়া।

টিয়ার শরীরে সবুজ ঘাসের চিকন আস্তরণ। চোখের কোণে তরাই-এর অরণ্যের নিবিড় প্রশান্তি। বুকের মধ্যে পাংখাবাড়ির পাহাড়ী চুড়া। কেমন যেন হাড়িয়ার নেশার মত নেশা লাগায় টিয়া।

মোষ চরাতে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ একদিন দীনকাটু চীৎকার শুনতে পেল। কায় ছুন্ মোক্ বাঁচান—বাঁচান। হাতের লাঠিটা নিয়ে বাইশ বসন্তের জোয়ান মোষের মত শক্তিধর দীনকাটু ছুটে গেল চীৎকারের উৎসস্থলে।

একটি কিশোরী মেয়েকে ঘিরে ধরেছে এক ঝাঁক মৌমাছি। কি করবে এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে ছুটে গিয়ে কিশোরীকে কাঁধে তুলে চোঁ—চোঁ—খাঁ—এক দৌড়। বালাসনের জলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে নামার আগে নামিয়ে দিল কিশোরীকে। দু' একটা মৌমাছি তখনো এসেছিল পেছন পেছন ধাওয়া করে। তা দেখিয়ে কিশোরী চীৎকার করে উঠল, অ্যালহায় ও যায় নি গে যায় নি। সকালবেলার সূর্য উঠল যুবকের মুখে। সে বলে উঠল, ধ্যাৎ, হাতাস খাছিস ক্যান্! মুই তো ছু। এবারে রঙ লাগল কিশোরীর মুখের আকাশে। বলল, কায় তুই? তুই কি মরদ?

এতক্ষণে সামলে নিল দীনকাটু। একটা মেয়ের সাথে আগে তো সে কখনো এমন করে কথা বলে নি। তাই লজ্জা পেল। মাথা নীচু করে পা বাড়াল সে মোষের খোঁজে।

ভয় তখনো কাটে নি। কিশোরীর গলায় নামল সন্ধ্যাবেলার বাঁশ বাগানের ভয়ার্ত ভাব। চেঁচিয়ে বলে ফেলল, তোমহা কায় মুই জানোনা। দোহাই লাগে বাপ পঞ্চানন ঠাকুরের। মোক্ ছাড়িয়া তোমহা চলিয়া যান্ না।

কি খেয়াল চাপল দীনকাটুর মাথায়। কপট গাম্ভীর্যে বলে বসল, মোর কাম ছেগে পরের বেটি। মুই যাছো। মোর নাম দীনকাটু সিংহ। থাকে ছু তারাবাড়ির গিরির ঘর।

—মুই পাথরঘাটার সর্প সিংহের বেটি টিয়াশ্বরী। জঙ্গলৎ আইছিনু খড়ি লুড়াবার। মোর দেহাৎ মাছির বিষ। মোক্ কি ঘর নেগায় দিবার পারিস?

—ঘরৎ গেলে মানসি কি কবে?

—কায় কি কবে হাতাস খাছিস ক্যান্? আয় দেখি, কোন্‌ঠে ছে তোর ভইস।

—ক্যানে, ভইস দিয়া তোর কি হবে গে গাভুর মাইয়া?

—মুই ভইসের পিঠৎ চড়ি ঘরৎ যাম। সেথা মোর ভেল্লা কাম পড়িয়াছে। মা মোর আন্ধা, দেখির না পায়। বাপ্ গেইছে হালবাড়ি হাল জোতিবার। ছোটো ভাইডা গেছে বাপের তানে পান্ধা ধরি।

দূর থেকে ডেকে ওঠে পবুনা, আন্ধারু।

—হুইযে পরের বেটি ডাকাছে মোর পবনা, আন্ধারু।

—বা, বা, ক্যামন সোন্দর নাম রাখেছিস্ তোর ভইসের নাম। বলেই এক দৌড়। দৌড়ে গিয়ে পবনার শরীরে হাত বোলাল টিয়া।

এক লাফে চড়ে বসল পবনার পিঠে। পবনাও হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে নতুন সওয়ারী নিয়ে চলল নদীর ধার ধরে।

—হেই টিয়া, ভইস লেগাইস্ না? ঘরৎ যাইয়া ছেকিবা হবে।

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জিব ভ্যাংচিয়ে টিয়া জবাব দিল, তুই কচু খাইস ঘরৎ যাইয়া। মুই যাছু ঘর।

কি আর করে দীনকাটু। সে-ও গিয়ে লাফিয়ে উঠল আন্ধারুর পিঠে।

আগে পিছে চলল দু'টি মোষ নদীর ধারের পাতলা কাশ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দূরে শোনা গেল ভাওয়াইয়া গান।

ধিক, ধিক, ধিক মইশাল রে
মইশাল ধিক গাবুরালী
এ হ্যানো সুন্দর নারী,
ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি। মইশাল রে॥

* * * *

ভার বান্ধ ভাড়টি বান্ধ হে
মইশাল বান্ধ মাথার কেশ
আজি বা ক্যানে দেখং মইশাল
ছাড়িলেন আমার দ্যাশ। মইশাল রে॥

—ও মইশাল, শুনেছিস্ গাহান?

—তোর কোনো লাজ শরম লাই রে টিয়া। তোর বাপো মা ক্যান্ দেয় না বেহা এতডা গাভুর বয়সৎ!

খিলখিল করে বালাসন নদীর মত চঞ্চল স্বরে হেসে উঠে টিয়া বলে বসে, মুই তবাই-এর মাইয়া। জঙ্গলের লাখান মোর মন, হেই—এ—ত্ত বড়—অ—; লাজ? লদীর কি কোনো লাজ ছে? অয় কেমন করি বয়আ যাছে কোন্ সে দূরের নাম না জানা দ্যাশের তানে কায় জানে!

—তুই তো ভালয় কাথা কবার পারিস!

—করার পারিম্ নি! খগেন দা যে কলেজ পড়ে। অয় মোক এ গিলা শিখাইছে।

—খগেন রায়? হামার রাজবংশী ভাষাৎ যায় নেডিওৎ গাহান গাছে?

বাড়ির কাছাকাছি এসে টিয়া হঠাৎ মোষ থেকে নেমে পড়ল। চোখের কোণে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলে গেল, ফের দেখা হবে লদীর পার জঙ্গলৎ, আসিস্ দেই?

চলে গেল টিয়া।

জীবনের কোন্ নিভৃত মন্দিরে বেজে উঠল যৌবনের ঘণ্টা। কিসের এক নেশার টানে মনটাকে জড়িয়ে নিয়ে দীনকাটু ফিরল জোতদার বাড়ি।

দিন যায়। সময়ের শ্লেটে নানান দাগ কেটে বছর ঘোরে। বালাসন নদীর ধারে জঙ্গলের নিভৃত কোণে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে দুটি হৃদয় সরব হয়ে উঠে। সৃষ্টির প্রথম দিনের মানব-মানবী যেন ফিরে পেয়েছে সে বন। বাতাস ওদের কথা বহন করে নিয়ে যায়। পাহাড় প্রতিধ্বনি করে তা ফিরিয়ে দেয়। দিন যায়। দিন যায়।

প্রকৃতির কোলে মোষ ছেড়ে দিয়ে টিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে দীনকাটু। তার বাঁশের বাঁশীতে শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানের সুর।

গাও তোলো, গাও তোলো
মইশাল বন্ধু রে॥
গাও তোলো, গাও তোলোরে মইশাল
গাও তোলোরে ডাঙিয়া
ওরে কোন্ বা চোরায় নিয়া যায় মোক
চুরি করিয়া রে।
মইষ চরান্ মোর মইশাল বন্ধু
কোন্ বা চরের মাঝে
ওরে এলাও ক্যানে ঘান্টির ড্যাং
মুই না শোনং ক্যান রে॥
মইষ দোয়ান মোর মইশাল বন্ধু
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই পরু ধরুং যায়া রে॥

টিয়ার চোখ বেয়ে নামে পাহাড়ী ঝোরার জল। টিয়া কেঁদে ওঠে।

—কান্দিস ক্যানে টিয়া! চমকে ওঠে বলে দীনকাটু।

—তুই এমন ক্যানে দীনকাটু? তোর বাঁশী শ্যামের লাগান। মোর মন পাগল করি দেয়। মুই ঘরৎ রবার পারু না।

দীনকাটু গভীর আবেগে টিয়াকে কাছে টেনে নেয়। বুড়ো বট-গাছে ডেকে ওঠে কোকিল।

টিয়ার অন্ধ মা ওর কথাবার্তায় লক্ষ্য করে নুতন সুর। ওর খগেনদাও আর খুঁজে পায় না কিশোরী মেয়ের সেই আগের জিজ্ঞাসা-ভরা প্রশ্নের রেশ।

—হ্যাঁরে টিয়া, কি হইছে তোর? এমন করির কি ভাবেছিস? দিন দিন তোর এত কিসের টান খড়ি লুড়াবার? নুকাইস ক্যান?

—না খগেন দা। মোর কোনো নি হায়।

—লাজ করেছিস ক্যান? কাকো কি মন ধরিছে?

—কিযে কহছিস তুই! তোক্ ছাড়ির কাকো না চাহু মুই। তুই যে মোর দাদার দাদা।

—হ্যাঁ বুঝেছু। রঙ লাগিছে তোর মনৎ।

টিয়া আর চেপে রাখতে পারে না। এসব বোধহয় চেপে রাখাও যায় না। এ যে পাহাড়ের ভেতরের জমা জলের স্রোত। বাইরে বেরুবার জন্য সদাই চঞ্চল।

সব খুলে বলে সে। সেদিনের সেই মৌমাছি থেকে বেঁচে আসা, জঙ্গলের নিভৃতে মোষের পিঠে চড়ে ঘর বাঁধবার অভিসার। বালা-সনের উন্মুক্ত বুকে জলবিহার, দীনকাটুর বাঁশী শুনে উতলা হয়ে যাওয়া, কিছুই বাকী রাখল না। পরিশেষে কান্নাভেজা গলায় বলে ফেলে, জানিস খগেন দা, অয় মোক্ বেহা করির চায়। অয় পরের ঘরের মইশাল। মোক্ বেহা করিলে যে অর পণ দিবার নাগিবে। বাপক তুই তো চিনিস। বাপ কি মোর পণ ছাড়ির মোর বেহা দিবে? অয় কোন্ ঠে পাবে এত্লা টেকা! চোখে টিয়ার বর্ষার বৃষ্টি।

—তুই ভাবিস ক্যানে টিয়া। তুই মোর বইন, তোর খুশীর লাগির, তোর ঘর সংসারের তানে মোর কি কোনোই দায়িত্ব নাই? কত নাগিবে?

—দুইশো টেকা নাগিবে। তুই, তুই দিবো খগেন দা? টিয়ার চোখে মুখে লাউ-এর আকশিতে ধরা কঞ্চির অবলম্বনের আশ্বাস পাবার আগ্রহ।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। মুই দিম। যা কয়া আয়নে যায়া।

টিয়ার পায়ে বনের ছন্দ জাগল। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে দৌড়ে চলল টিয়া।

বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে নদীর ধারের কাশবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল তাদের সেই পরিচিত বটগাছের নীচে।

আপন মনে মগ্ন হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে দীনকাটু। বাঁশীর সুর এমন করে কাঁদছে যে টিয়া ঠিক থাকতে পারল না। ভরা বর্ষার বালাসন নদীর কূলের শালগাছে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনকাটুর বুকে। এক হাতে বাঁশীটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। কান্নাঝরা গলায় বলে উঠল, তুই মোক্ খুউব ভালবাসিস না হায় রে দীনকাটু?

চোখের ভেতর স্বপ্ন—অথচ মুখের ভাষা যেন দূরের ঐ সাদা পাহাড়টার মতই দূরের, এমন স্বরে জবাব দিল দীনকাটু, ভালবাসার কি কোনো দাম ছে রে টিয়া? এ পিথিমিৎ যার টেকা ছে, অর সব ছে। দ্যাখিস না ক্যানে গিরির বেটা ভুবনক। কলেজৎ গিয়া বাঙালী চেংড়ি ক ভালবাসি বেহা করিছে। ওমার টেকা ছে তায় তানে ওকিলের বেটি বেহা করির পারিছে। মুই? মুই তো গিরির বাড়ির মইশাল। বাপ নাই, মাও নাই। ঘর নাই, বাড়ি নাই। জমি নাই, জোত নাই। টেকা নাই—কোনোই নাই।

এবার টিয়া বলল, তুই ভাবেছিস ক্যানে? তোর মোর বেহা ঠিক হবে দেখে লিস।

—কেমোন করির?

—তোক্ ভাবির নি লাগে। মুই সব ঠিক করি ফেলাই ছু। খগেন দা টেকা দিবে।

এবার দীনকাটুর আগ্রহের বীজ চারা গাছের মত দুলে উঠল। বলল, ঠিক কহছিস তো টিয়া? কোন্‌দিনা যাম তোর বাপের লগৎ? আজি?

লজ্জার রঙ লাগল টিয়ার মুখে। জলদি করার কি কাম? যাইস না ক্যানে একদিন।

—ইডা কি কহছিস! দেরী ক্যানে? মুই অ্যালহায় যাম্।

—তোর খুশী।

টিয়া ছুটে চলল বাড়ির দিকে। ওর চোখে একটা ছোট্ট ঘর। মাথায় সিঁদুর। হাতে শাখা। হঠাৎ—বাপ্‌গে বাপ্—চীৎকার। পড়ে গেল টিয়া।

দূর থেকে দীনকাটু চেঁচিয়ে উঠল, কি হইছে রে টিয়া?

—মোক্ সাপে কাটিছে দীনকাটু। মোক্ সাপে কাটি—

—কি কহলো? সাপ? উন্মত্তের মত তীব্র বেগে ছুট্ লাগাল দীনকাটু। দৌড়ে গিয়ে দেখল একটা গোখরা সাপ জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

হায় বাপ্, কি হবে গে!

হঠাৎ একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ভীষণ আক্রোশে সাপটাকে মারতে লাগল দীনকাটু। পেশীতে ওর জিঘাংসার স্রোত। নিরীহ সাপ পারবে কেন! সে তো এমনি কামড়ায় নি। শরীরে পড়েছিল চাপ তাই ফুঁসে উঠে ছোবল মেরেছিল।

সাপটাকে মেরেও শান্তি পেল না দীনকাটু।

এদিকে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল টিয়া।

রাগের দেবী হুঁশ ফিরিয়ে দিলেন দীনকাটুকে। দ্রুত গামছা ছিঁড়ে টিয়ার হাঁটুতে বাঁধ দিল সে। কাঁধে নিয়ে এতদিনে সমস্ত লাজলজ্জা ত্যাগ করে ছুটে চলল টিয়াদের বাড়ি। টিয়াকে ওর বাপের কাছে পৌঁছে দিয়েই দীনকাটু ছুটল ওঝার বাড়ি।

এদিকে সর্প সিংহের চীৎকারে জেগে উঠল পাড়া। সবাই এল ছুটে। ছুটে এল খগেন রায়।

খগেন রায় এসে অর্ধ-চৈতন্য টিয়াকে জিজ্ঞেস করল, কোন্‌ঠে তোক্ কামড়াইছে রে টিয়া?

—কায়? খগেন দা?

—হ্যাঁ রে টিয়া, মুই।

—অয় কোন্‌ঠে গেইসে? মুই আর বাঁচিমনি খগেনদা। মরার আগৎ অর কোলৎ মাথা রাখি মরির পালে শান্তি পানু হয়। অক ডাকা না ক্যানে?

—অয় ওঝা আনির গেইসে। আসিবে অ্যালহায়।

টিয়ার বাপ, মা, ভাই সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। পাড়া-পড়শীরাও শোকে স্থির চিত্রের মত ইজেলে লগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ওঝা নিয়ে যখন দীনকাটু এল টিয়া তখন শেকড়-কাটা গাছের মত নেতিয়ে পড়েছে।

দীনকাটু প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে টিয়ার মত নরম শরীরটাকে কোলে নিয়ে হু-হু করে কালবৈশাখীর ঝড়ের বেগে কেঁদে উঠল।

পৃথিবীর নীলাকাশে যেখানে প্রতিনিয়ত পাখি ডানা মেলে, সে আকাশের নীলিমায় হঠাৎ কালো মেঘ এসে সমস্ত নীল রঙকে ব্লটিং কাগজ দিয়ে যেন চুষে নিল।

দীনকাটুর কোলে মাথা রেখে সবুজ রঙের টিয়ে পাখি যেন বিষের নীল রঙে রাঙা হয়ে ভালবাসার সবুজ দ্বীপের ঘাসে শেষ আশ্রয় নিল।

—দীনকাটু। অ—দীনকাটু। কোন্‌ঠে গেইল রে?

জোতদার প্রহ্লাদ সিংহের ডাকে দীনকাটুর তন্ময়তা ভাঙল। সে দ্রুত মোষগুলি নিয়ে গোয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে এল।

—অ্যালহায় ও যাইসনি?

—যাছু গিরি।

পবনা, আন্ধারুকে নিয়ে দীনকাটু চলল বালাসন নদীর পারে। যেখানে বটগাছের নীচে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে তার ভালবাসা। সেখানে গিয়ে মোষ ছেড়ে দিয়ে বাঁশীতে বাজাবে সুর—যে সুর বাতাসের দেয়াল ভাঙতে ভাঙতে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরিয়ে দেবে—

জীবন, জীবন, জীবন বন্ধু রে
তুই মোক্ ছাড়িয়া গেইলে
আদর করিবে কায়
ও জীবন বন্ধু রে॥

কবিতা

বাজার বড় মন্দা

অমল চক্রবর্তী

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকের দাঁতের ধার বেড়ে চলে,
ছাপোষা মানুষ মগজ গুলে খেতে খেতে
হাঁ-মুখে এখন হাওয়া খায়,
হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ত্রিভঙ্গ দাঁতের সারি
যেন ধ্রুপদী কত্থক।

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকী সভ্যতা সোনার গাড়ুতে জল ভরে মলত্যাগ করে,
উচ্ছন্ন মানুষ কুকুরকে শ্রেণীশত্রু ভেবে
আস্তাকুঁড়ের কুরুক্ষেত্রে গদা ঘোরায়,
পরণে দু'আঙুল নেংটি
বাকিটা স্বর্গীয় ঈশ্বর নিয়েছে।

বাজার বড়ই মন্দা।
জাহাজ তাই কুমারী মেয়ের মত বন্দরে ভেড়ে,
ক'মাস পরে গর্ভভারে হেলেদুলে চলে যায়
জামাতার আদর খেয়ে বাপের দেশে,
গর্ভে তার কোটি কোটি মানুষের দলিত পিন্ড।
ফেরীঘাটে অন্ধকারে দেশজ যুবতী শোয় মাত্র পাঁচ টাকায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকের রাজদন্ড প্রহরীর হাতে
লৌহদন্ড বংশদন্ড হয়ে উঁচিয়ে থাকে।
পোড়াবিত্ত মানুষ, চৈতন্য এদেশী দেবতা,
তাই ট্রেনে বাসে গ্রামে পথে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফেরে রাতে,
ক্লান্ত উপবাসী তবু অভ্যস্ত ভালবাসা সংসার বাড়ায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
গলতে গলতে এক রুপাইয়া মাত্র উনিশ পয়সা।
ওয়েজ ফ্রিজ? কিংবা প্রফিট ফ্রিজ?
প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন? চুলোয় যাক।
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জিন্দাবাদ!
মেট্রোতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ঘামছে
'রতির্নিবেদনম' ছবিতে,
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংস্কৃতির ঐক্য চাই—বন্ধুগণ......
অবশেষে সন্ধ্যা নামে কাকের কলহে।

বাজার বড়ই মন্দা।
যার আদর্শ আছে ট্যাঁকে পয়সা নেই,
যার পয়সা আছে মগজে কুৎসিৎ লোভের ঘা,
শিশুর সামনে চিতায়-চাপানো ভবিষ্যৎ,
তাজা যৌবনের সামনে মসৃণ অনন্ত গহ্বর,
বৃদ্ধের সামনে শাদা দেয়াল, পেছনে ধূসর স্মৃতি,
নারীর সামনে রন্ধন ও গর্ভধারণ,
পুরুষের সামনে আস্ফালন ও পতন।
আবার ভোর আসে
পুঁজির বেশ্যাগারে সারারাত কাটিয়ে রক্তিম চোখে।

বাজার বড়ই মন্দা।
মন্দ মন্দ গতিতে পাল তুলে চলেছে ইস্টিমার, গাধাবোটের সারি,
জনগণ রয়েছে তাতে।
একটা পাখির শিসে
একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্নায়
একটা কিশোরের অবাক চোখে
এক বৃদ্ধার ভ্রূকুঞ্চিত বলীরেখায়
একজন কমিউনিস্টের উদ্ধত কপালে
যে চিহ্ন রয়েছে কে তার অর্থ বলে দেবে?
বণিকের রাজদণ্ড ফিরে যাবে রাজদণ্ড হয়ে
স্ফীতোদর সভ্যতার শেষ বিনাশে?

তাই যেন হয়।
এ বাজার বড় দুঃসময়।

হে প্রভু, উদয় হও

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

হৈ হৈ শব্দ তুলে আসরে নামলো বিদূষক,
কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা রমরমিয়ে আসর জমালো—
তারপর দুঃখ নিয়ে বসে রইলো বিমূঢ় দর্শক,
বিদূষক চলে গেছে, লাইটম্যান আলোও নেভালো।

যুবমানস ॥ ২২
মস্কোয় অলিম্পিক্, হকিতে জিতেছে যেন কে,
ইচ্ছে না থাকলেও মঞ্চ থেকে সরে যেতে হয়—
গোড়ালির অসহ্য ব্যথা, চোখেতেও বাধো বাধো ঠেকে,
মধ্যবিত্ত মহোদয়, ময়না কি নতুন কথা কয়?

নাহয় দুঃখসুখ একান্তই নিজস্ব ব্যাপার,
নাহয় নিজস্ব কোনো ব্যাপারেই দুরন্ত অনীহা—
তবুও জ্বর বাড়লে গায়ে তুলি শীতের র‍্যাপার,
হে প্রভু, উদয় হও, কেড়ে নাও জীবনের স্পৃহা।

ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

মইনুল হাসান

কাউকে ফুল দ্যায় নি সে
জন্মের সময়ে ডেকেছে শঙ্খচিল
অশান্ত প্রকৃতির কানফাটা হাহাকার
ঘুরিয়ে দিয়ে যায় গতি
তীব্র ঘৃণাতে ফেটে পড়ে ইতিহাস
মিথ্যার ফুলঝুরি—শুধু মিথ্যা ফানুস
(তাই) যৌবনের উদ্দীপ্তবাহু
খুঁজে নিল মাঠে ময়দানে—জীবন

ফুটন্ত টকটকে লাল গোলাপ
লজ্জায় ভেঙে ভেঙে যায়
কালো ফুটপাত আরও লাল দেখে
সেখানে খুঁজেছে জীবন—স্থলপদ্ম
রক্তিম পূবাকাশ তাই খুঁজেছে সকাল
চেতনাতে তৈরী হয়ে যায় ইতিহাস
ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

যোজন সাগর দিতে পাড়ি…

অনির্বাণ দত্ত

পাহাড় কি পেরোনো যায় লাফিয়ে—
সাগরে হারানো যায় দাপিয়ে?
যেতে হয় পায়ে হেঁটে
বাধা ভেঙে ঢেউ কেটে হাঁফিয়ে!
ঝড়ো হাওয়া নীলাকাশ কাঁপিয়ে।

উঁচু চুড়ো ছুঁতে পারে শামুকও
সন্তবার বুকে হেঁটে থামুকও
মাঝপথে কাঁটা-ক্ষতে নামুকও
তুষারের ঝড় কি বা খর রোদ-বৃষ্টি
সঠিক লক্ষ্যে তার দৃষ্টি।

পিঁপড়েরা তাই বুঝি আস্তেই
শানায় দাঁতের খুদে কাস্তেই?
হাজার লক্ষ দিন বাঁচতেই
মিলে মিশে হাঁটে এক সারি—
যোজন সাগর দিতে পাড়ি?

হে নভেম্বর

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
'রে শত্তুর রে শত্তুর'
চতুর্দিক চষি
ভাইকে দিই দুয়ো আমি
মাকে করি ভাগ
আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে
অন্ধ বুনো রাগ।

কে আমায় শত্রু চেনায়
আমায় চেনায় কে—
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
তুমি ছাড়া আর কে!

রাজা যায়, রাজ্যে আসে
ভিন্ন সাজে রাজা

পারিষদরা হেঁকে বলে
বাজা, ঢোলক বাজা।
যুদ্ধে মরি যুদ্ধে মারি
রই যে-কে-সেই প্রজা
নভেম্বর হে বলতে শেখাও
আমিই আমার রাজা।

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
আমার অসির ঘায়ে লুটায়
মোরাদাবাদে ভাই
নির্বিচারে খুন করেছি
আসাম ত্রিপুরায়
শত্রুকে ঠিক মিত্র দেখায়
চোখে রঙীন ঠুলি
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
দাও এ ঠুলি খুলি।

শব্দ তুলে রাখি

অচিন চক্রবর্তী

শুধু ভালবাসায় খাদ মেশাবো না
বলেই কিছু শব্দ আমি সরিয়েছি গোপন দেরাজে।

এখন সময় বড় বাজে,
সমস্ত বিপণন দিনক্ষণ ভর্তি করে শুধু
ভোজবাজি হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর, সত্য সাঁই বাবা
যেন বা হাজির অঞ্চলে। চালে-ডালে
কেরোসিনে-চিনিতে-বিদ্যুতে কিংবা শিশু-খাদ্যে প্রস্ফুট প্রভাব;
দলেমুচড়ে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি সমস্ত স্বপন।
উপজাত কুয়াশায় পরিব্যাপ্ত জীবনযৌবন।

তবু মন
সাঁতরে পেরুতে চায় সময়ের সর্বনাশা গাঙ
হাতে হাত ধরে, মরুভূমি
যেমন পেরয় রাহী হৃদয়ে হৃদয় জুড়ে দিয়ে
বুকে বুক রেখে, অন্ধকার
তেমনি পেরিয়ে যাব বেমালুম প্রত্যয়ে নিবিড়
বিশ্বাসের শিখা জেলে পরিপার্শ্ব তুষার গলিয়ে।

দুরন্ত সে অভিযাত্রায়
নিটোল উক্ততা চাই বলেই এখন
শব্দ বাছাই করি, ছন্দ যাচাই করি, আর
শুধু ভালোবাসায় খাদ মেশাবো না
বলেই কিছু শব্দ তুলে রাখি গোপন দেরাজে॥

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

সাইবারনেটিক্স্

গণিত, বলবিদ্যা আর শরীরতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যে কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হতে পেরেছে তার নাম—সাইবারনেটিক্স্ (Cybernatics)। আরও সহজে বলা যায় প্রাণী ও যন্ত্রের ভিতর যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার নাম সাইবারনেটিক্স্।

সাইবারনেটিক্স্ কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এর অর্থ ছিল "নিয়ন্ত্রক" (Steersman) অথবা আরও সাধারণভাবে কথাটি একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আর আজকের বিজ্ঞান সাইবারনেটিক্স্ বলতে কি বোঝায় তা আগেই বলেছি।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সে কথা থাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরের ভ্যান্ডার বিল্ট হলে (Vander Bilt Hall) মাসে একবার কিছু বৈজ্ঞানিক খাওয়াদাওয়া করতে একত্রিত হতেন। বিজ্ঞানের সব শাখারই কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির এই একত্রিত ভোজপর্ব ছিল বৈজ্ঞানিক আলোচনার এক বিচিত্র স্থান। প্রতিটি ভোজ-সভার পর কোন একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা হত। এরকম একটি ভোজসভায় ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলোজির (পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়) অঙ্কের প্রখ্যাত অধ্যাপক এন. ওয়াইনার (N. Wiener) ও দুজন প্রখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ ডঃ রোজেনব্লুয়েথ (Dr. Rosenblueth) এবং ডঃ ওয়াল্টার ক্যানন্ (Dr. Walter Cannon) আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল এমন সমস্ত সমস্যা নিয়ে যেখানে একই সংগে গণিত ও শরীরতত্ত্ব জড়িত। কি রকম?

একটা যুদ্ধ চলছে। একজন পাইলট একটা এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল যে সামনে একটা অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট্ (বিমান বিধ্বংসী কামান) থেকে গুলী ছোঁড়া হচ্ছে। পাইলট দ্রুততার সাথে প্লেন আরও উঁচুতে উঠিয়ে নিল এবং তার যাত্রাপথ বদল করল। এই যে কাণ্ডটা ঘটল তার জন্য পাইলটের বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না। যদি পাইলট ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত না নিত তবে বিমানটি ধ্বংস হতে পারত। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার একটি যন্ত্রায়িত রূপ দেওয়া গেলে মানুষের উপর আর নির্ভর করতে হয় না। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঐ তিন বিজ্ঞানী অনুভব করলেন ঐ রকম একটি যন্ত্রায়িত ব্যবস্থার কথা।

এইবার কাজকর্ম শুরু হল এবং অবশেষে বলবিদ্যা, গণিত ও শরীরবিদ্যাকে এক জায়গায় হাজির করা গেল। আবিষ্কৃত হল সাইবারনোটক্স্।

বৈজ্ঞানিকদের মতে,—"বৈজ্ঞানিক বিপ্লব জন্ম দিয়েছে অ্যাটম বোম-এর আর সাইবারনেটিক্স্ এনেছে নতুন এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব।"

চলচ্চিত্রে রুশ বিপ্লবঃ আইজেনস্টাইনের দুটি ছবি

দেবাশীষ দত্ত

একদা যে আশ্চর্য প্রতিভাধর নিজের মধ্যে একটি যুগকে সৃষ্টি ও বহন করে তার স্মৃতি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন যুগান্তরের দর্শক সমাজে, সেই চলচ্চিত্র গুরু আইজেনস্টাইন সোভিয়েৎ চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নির্মিত আইজেনস্টাইনের দুটি নির্বাক ছবি 'স্ট্রাইক' (১৯২৪) ও 'অকটোবর' (১৯২৭) দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। দুটি ছবিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের সুরটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'স্ট্রাইক' আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার শিল্পগত সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায় ছবিটিতে। চলচ্চিত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি এই ছবির মাধ্যমে অসামান্য নিপুণতায় প্রকাশিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছিলেন। তার পরিচয় এই ছবির সর্বত্র। তিনটি অংশে বিভক্ত এই ছবিটিতে একটি কেন্দ্রীয় সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়।

একটি কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 'স্ট্রাইক'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা কারখানা মালিকের অনুচর এবং গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটি শ্রমিকের আত্মহত্যা ধর্মঘটকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করার পর সর্বপ্রথম অবকাশের অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু ক্রমে দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। শ্রমিকদের শেষ সম্বলটুকুও খাদ্যসংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। প্রলোভন ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে পুলিশ ধর্মঘটের নেতাদের আলাদা করে দিতে চায়। গুণ্ডাদের আক্রমণের দ্বারা শ্রমিকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। একটি ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে পুলিশী অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে ছবিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবির এই বিষয়বস্তু ও ঘটনা-প্রবাহ মোটামুটি সরল এবং সমসাময়িক। ছবিটির মূল বৈশিষ্ট্য তার ডকুমেন্টারি-সুলভ বিন্যাসে। 'পটেমকিন'-এর মত 'স্ট্রাইক'ও কোন ছবির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিচালকের কল্পনায় এসেছিল। পরে 'পটেমকিন'-এর মত এটিও পূর্ণাংগ ছবির রূপ পায়। বস্তুত, 'টুয়ার্ড ডিকটেটরশিপ' নামের একটি ছবির অংশ হিসেবে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। ছবির সমাপ্তিতে আপাত-হতাশার যে সুরটি ফুটে উঠেছে, তা থেকে এটা বোঝা যায়।

শোনা যায়, আইজেনস্টাইন প্রকৃত কারখানার পরিবেশে 'স্ট্রাইক' নাটক অভিনয় করার বাসনা পোষণ করেছিলেন। ক্রমে অভিনয়-মঞ্চ (এবং সার্কাসের অংগন) ছেড়ে পুরোপুরিভাবে চলচ্চিত্রে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই ছবিটিতে তাঁর জীবনের এই দুটি বিশেষ দিকের ছায়াপাত ঘটেছে। একদিকে বাস্তব উপাদানের আশ্রয়ে বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি ও পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, অন্যদিকে সার্কাসের লঘু সুরের সাথে তাল রেখে 'ডিটেল'-এর কাজে কখনো কখনো অতি-রঞ্জনের ঝোঁক এসেছে। প্রচারমূলক পোস্টারের ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তরুণ আইজেনস্টাইন এইভাবেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের ভাষাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। এক নতুন পরীক্ষায় ব্রতী আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের প্রচলিত ধারা, প্রকাশশৈলী ও বিন্যাসকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন এবং সে প্রয়াসে তিনি সর্বাংশে সফল হয়েছিলেন। কারখানার বাস্তব পরিবেশ ছবিটিকে অশেষ মূল্য দিয়েছে। দৃশ্য গ্রহণের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও অভিনয়ের শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গী ছবিটির গুরুত্ব বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

১৯২৭ সালে রুশ চলচ্চিত্র-শিল্প অকটোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী পালন করে দুটি অসামান্য চলচ্চিত্র– পুডভকিনের 'দি এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' এবং আইজেনস্টাইনের 'অকটোবর' প্রযোজনার মাধ্যমে। শেষোক্ত চিত্রটির মাধ্যমে নির্বাসিত লেনিনের গোপন প্রত্যাবর্তন এবং বলশেভিকদের ক্ষমতাদখলের মধ্যবর্তী চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি বিবৃত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের অসামান্য শিল্পদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। একটা যুগের ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য আইজেনস্টাইন প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পর্যায়ের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, তাদের যথার্থ ভূমিকাটুকু চিনে নিতে দর্শকদের এতটুকু অসুবিধা হয় না। কয়েকটি শক্তিশালী দৃশ্যকল্পের ব্যবহার ছবিটিকে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দিয়েছে। প্রধান দৃশ্যগুলির সম্পাদনা নিঃসন্দেহে আইজেনস্টাইনের শিল্পক্ষমতার পরিচায়ক। কয়েকটি ইংগিতময় মন্তাজের ব্যবহার অপূর্ব। জটিলতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে সেগুলি দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে। স্বকীয় চিন্তার কল্যাণে তিনি রুশ চলচ্চিত্রে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মারী সিটনের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

Eisenstein had become captive of his own thought processes and his extra-ordinary vision of what the art of film could become.

আজ যদিও আইজেনস্টাইনের ছবি চলচ্চিত্রের ভিত্তিগত ব্যাকরণের ভূমিকা নিয়েছে, তবুও 'অকটোবর'-এর শিল্পসৌন্দর্য পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

বিভিন্ন দৃশ্যের সংগঠনে চিন্তাশীল আইজেনস্টাইনের কারিগরী নিরীক্ষার পরিচয় বর্তমান। দৃশ্যগ্রহণের কাজে এডুয়ার্ড টিসের যথেষ্ট পারংগমতার পরিচয় বর্তমান। কয়েকটি 'কাটিং'-এর কাজ অপূর্ব। এই ছবির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একজন শিল্পানুগত পরিচালকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী। এই দৃষ্টিভংগী থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি স্মরণীয় আবেগ-মুহূর্ত যা অনেক সময়ে জটিল রূপ নিলেও দর্শকচেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। অপূর্ব দৃশ্য গ্রহণের কাজ এবং ডকুমেন্টারি-সুলভ গুণ ছবিটিকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু আইজেন-স্টাইনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী, মূল্যায়ন এবং বিন্যাস এই ছবির সমৃদ্ধির মূলে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে খেলাধূলা

অশোক বসু

পৃথিবীর দেশে দেশে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই ৬৩ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের বিপুল সাফল্য সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের জনগণের মনে আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সমাজতন্ত্র মানব জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের সমস্যা যেমন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে তেমনি সৃজনধর্মী দিকগুলির উৎসমুখও উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির খেলাধুলো ও শরীর চর্চার সাফল্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনা সুরু করার আগেই এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের চিত্র এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবচেয়ে জনবহুল সমাজতান্ত্রিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাত্র দুটি দেশের কথা বলা হলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই দুটি দেশের মত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও খেলাধুলোয় যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হলো তারাও খেলাধুলো ও শরীরচর্চায় সমগুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

গণ-শরীরচর্চা ও গণ-খেলাধুলো

৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক শারিরীক পটুতা বজায় রাখার কর্মসূচীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই খাতে ব্যয় করা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৭৮ সালের বাজেট থেকে। কেবলমাত্র এই একটি বছরেই "জনস্বাস্থ্য ও শচীরচর্চার" কর্মসূচীর জন্য ১,২৬,০০০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করা হয়। এই বছর সোভিয়েত জনসংখ্যার পরিমাণ ছিলো ২,৬০০ লক্ষ। এই দুটি তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই প্রমাণিত হবে শরীরচর্চা খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের বহর।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও, শরীর শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ হ'ল ৪ পয়সা মাত্র। নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের খসড়া বয়ানে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "পৃথিবীতে ক্রীড়াখাতে সম্ভবতঃ এর চেয়ে কম খরচ কেউ করে না।"

শিশুকাল থেকেই

সোভিয়েতে শিশুকাল থেকেই শরীরচর্চা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে গণ-খেলাধুলো ও শরীরচর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। গণিত, পদার্থবিদ্যা বা অন্যান্য বিষয়ের মত শরীরচর্চায় প্রাপ্ত নম্বর ছাত্রছাত্রীদের রিপোর্টে ও স্কুল স্নাতকদের ডিপ্লোমায় স্থান লাভ করে।

যে সব শিক্ষার্থী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খেলাধুলো শিখতে চায় তাদের জন্য বিশেষ জুনিয়র ক্রীড়া স্কুলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের ৫,৯৫৬টি স্কুলে ৯ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২০ লক্ষ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করে।

স্কুলপর্যায়ে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করে পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এরকম ক্রীড়াকুশলীদের মধ্যে যেমন আছেন ইগরতের, ভার্নেসিয়ান, তামারা প্রেস, নৌলিকিন ইত্যাদি। আবার স্কুলের ছাত্রছাত্রী থাকা অবস্থাতেই ওলিম্পিক ও বিশ্বখেতাব জয় করেছেন এমনও বহু সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী আছেন। এদের মধ্যে আছেন সাঁতারু মারিনা কোসভায়া (মন্ট্রিল ওলিম্পিক বিজয়ী) ও জিমনাষ্ট মাশা ফিলাতোভা ইত্যাদি।

খেলাধুলোর জন্য

একেবারে স্থানীয় মাঠ থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত বিশাল বিশাল ক্রীড়াসমাহার। খেলাধুলোয় সুযোগ-সুবিধার একটি ব্যাপক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো:

১১৪ লক্ষ দর্শকের আসন সম্বলিত বৃহদাকার ষ্টেডিয়াম ৩,৮৮২টি; জিমনাশিয়াম ৬,৬০০টি; সন্তরণক্ষেত্র ১,৪৩৫টি; বন্দুক ছোঁড়ার কেন্দ্র ৬,৬০০টি; ফুটবল মাঠ ১,০০,০০০টি।

প্রশিক্ষণ

সোভিয়েত ক্রীড়া আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন প্রায় ৩ লক্ষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পেশাদার প্রশিক্ষক ও ৬০ লক্ষেরও বেশী স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক।

খেলাধুলোর খরচ

এদেশে খেলার জায়গা, প্রশিক্ষণ, খেলার জিনিসপত্র বা জামা-কাপড়ের খাতে ক্রীড়াবিদ্‌দের কোনও খরচ করতে হয় না। ক্রীড়াসমিতির সভ্য হিসাবে তাকে বছরে মাত্র ৩০ কোপেক চাঁদা দিতে হয়। যা নাকি এক প্যাকেট সিগারেটের দামের সমতুল্য। রাষ্ট্রীয় ও গণ-সংগঠনগুলি, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রধানত প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াসভার খরচ বহন করে।

শীর্ষস্থানীয় কোনো প্রতিযোগিতায় যখন কোনো ক্রীড়াবিদ্‌ তার ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করে তখন সেই প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ ও ক্রীড়াবিদ্‌দের যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ বহন করে হয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি নয়তো কেন্দ্রীয় সমিতি।

পরিচালন ব্যবস্থার শীর্ষে

সমগ্র ক্রীড়া আন্দোলনকে পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলো সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটি।

ক্রীড়া কমিটির দায়িত্বের মধ্যে রয়েছেঃ খেলাধুলোর বৈষয়িক ও

কারিগরী ভিত্তির উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্মধারার সংগঠন, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক গবেষণার সমন্বয় সাধন, জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন, ক্রীড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ, খেলাধুলোর সাজসরঞ্জামের উৎপাদন ও বিতরণের সমন্বয় সাধন ও নতুন নতুন ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ। সমস্ত মন্ত্রীদপ্তর ও সরকারী এজেন্সীসমূহকে সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

এই কমিটির আবার বিভিন্ন উপবিভাগ ও ক্রীড়াবিষয়ক বোর্ড আছে। যেমন, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস্, জলক্রীড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত বোর্ডের সাথে ৪৭ ধরনের খেলাধুলোর বিশেষজ্ঞরা যুক্ত আছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃস্থানীয় ক্রীড়াসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সেই গোড়ার আমল থেকেই ক্রীড়া আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তোলার কাজে সব সময় সাহায্য করে আসছে। অসংখ্য ছোট ছোট ক্রীড়া ক্লাবকে ঐক্যবদ্ধ করে ঐচ্ছিক ক্রীড়াসমিতি গঠনে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এক সময় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটিতে ট্রেড ইউনিয়নের ঐচ্ছিক ক্রীড়া সংগঠন আছে। এই সংগঠনগুলি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে এই পাঁচ বছরে ২০ হাজার শীর্ষস্থানীয় এ্যাথলেটের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয়, বিশ্ব ও ওলিম্পিক খেতাব জয় করার গৌরব অর্জন করেন। সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ক্রীড়াবিদদের জন্য ৩৫,০০০ ক্রীড়াঙ্গণ তৈরী করে দিয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের দশম পঞ্চবার্ষিকী কালে (১৯৭৬-১৯৮০) নতুন যে ৫৭২টি স্টেডিয়াম, ৪৩৬টি সন্তরণ ক্ষেত্র, ২,২৯২টি জিমনাসিয়াম ও ৫০০টি জলক্রীড়াকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ৬০০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করেছে।

সারা সোভিয়েত জুড়ে রয়েছে প্রাথমিক সংগঠনগুলি

সোভিয়েত ক্রীড়া ও শরীরচর্চা আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠনগুলির সদস্য সংখ্যা কোথাও এক ডজন আবার কোথাও বা বেশ কয়েক হাজার। এ-জাতীয় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা হলো ২ লক্ষ ২০ হাজার। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমস্ত প্রাথমিক সংগঠনগুলির অবস্থান গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সমানুপাতিক। ৬২ শতাংশ ও ৩৮ শতাংশ। সোভিয়েতে বসবাসকারী গ্রামাঞ্চলে ও শহরের জনসংখ্যার অনুপাতও শহরে ৬২ শতাংশ, গ্রামে ৩৮ শতাংশ।

খেলাধুলায় সোভিয়েত নারী

শরীরচর্চা ও খেলাধুলাসমেত সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার সোভিয়েতে শুধু কথার কথা নয়—এই সমানাধিকার সত্যিকারেরই সুরক্ষিত। অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আছে মায়েদের কাজ করার উপযুক্ত অবস্থা, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, শিশুদের মায়েদের মাইনেসহ ছুটি ও কাজের সময় কমিয়ে আনার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর ফলে নারীদের প্রকৃত সমানাধিকারের ব্যবস্থাটি সুরক্ষিত হয়েছে।

সোভিয়েত জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো নারী-ক্রীড়া। নারীক্রীড়া হয়ে উঠেছে নারীমুক্তির একটি কার্যকরী মাধ্যম। সোভিয়েত ক্রীড়াসমিতি ও ক্লাবগুলির বিভিন্ন বিভাগে ২ কোটি নারী নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষক, কোচ ও ক্রীড়া-সংগঠনের নেতাদের মধ্যেও বহু নারী আছেন। ২১তম ওলিম্পিকে যোগদানকারী সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে বহুসংখ্যক নারী প্রতিযোগী ছিলেন ও এই ওলিম্পিকে সেই নারী প্রতিযোগীরা ৪০টি স্বর্ণপদক জয় করার গৌরব অর্জন করেন।

জনপ্রিয় খেলা

খেলায় অংশগ্রহণের বিচারে জনপ্রিয় খেলাগুলির শীর্ষে রয়েছে জিমনাস্টিক। তারপর ট্রাক ও ফিল্ড। জনপ্রিয় খেলাগুলি এবং যে পরিমাণ দর্শক এই সমস্ত খেলাগুলি দেখে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো:

জিমনাস্টিক (৭০ লক্ষ), ট্রাক ও ফিল্ড (৬০ লক্ষ), ভলিবল (৫০ লক্ষ), ফুটবল (৪০ লক্ষ), বাস্কেটবল (৪০ লক্ষ), বন্দুক ছোঁড়া (৩০ লক্ষ), হ্যান্ডবল (৮ লক্ষ), অসিক্রীড়া (৫০ হাজার), অশ্বক্রীড়া (২৫ হাজার), পালতোলা নৌকা চালনা (২০ হাজার), আধুনিক পেন্টাথলন (৪ হাজার)। এছাড়া শীতকালীন স্কী (৪০ লক্ষ), দাবা (৩০ লক্ষ)।

উল্লেখ্য যে একেবারে আঞ্চলিক খেলাগুলি বাদ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ রকমেরও বেশী খেলাধুলোর প্রচলন আছে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত খেলাধুলো

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০০টিরও বেশি জাতি ও অধিজাতি আছে। যাদের প্রত্যেকেরই একটি বা তার বেশী ঐতিহ্যশালী খেলা আছে যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলাগুলিকে সর্ববিধ উপায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

ওলিম্পিকে কৃতিত্ব প্রদর্শন

সোভিয়েত ক্রীড়াবিদরা সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে হেলসিংকি ওলিম্পিকে যোগদান করেই মার্কিন প্রতিযোগীদের সামনে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেন। ১৯৫২'র ওলিম্পিকে সোভিয়েত প্রতি-যোগীরা ২২টি সোনা, ৩০টি রুপা ও ১৯টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল ওলিম্পিকে বেড়ে এই পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় সোনা ৪৭, রুপা ৪৩ এবং ব্রোঞ্জ ৩৫টি।

গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিকে সোভিয়েত ক্রীড়াবিদরা যত পদক জিতেছেন তার মোট সংখ্যা ৬৮৩টি। এর মধ্যে সোনা ২৫৮টি, রুপা ২২১টি ও ব্রোঞ্জ ২০৪টি। লক্ষণীয় যে এই একই সময় মার্কিন ক্রীড়াবিদদের প্রাপ্ত পদকের সংখ্যা মোট ৬০৬টি। তার মধ্যে সোনা ২৫৪টি।

চীন

সাধারণতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই গণ-শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর ওপর জোর দেওয়া হলো

বলা যেতে পারে চীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকে গণ-শরীরচর্চা, গণ-খেলাধুলো ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর উন্নয়নের জন্য ১৯৫২ সালে চীন সাধারণতন্ত্র শরীরচর্চা ও ক্রীড়া কমিশন গঠন করা হয়। অঞ্চলে, প্রদেশে ও পৌর এলাকাগুলিতে ঐ একইভাবে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও পৌর কমিশন গঠন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪০টি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ৩,০০০টি অবসরকালীন ক্রীড়া বিদ্যালয় রয়েছে।

ক্রীড়াসংগঠন ও সংস্থাসমূহ

ক্রীড়াকে গণমুখী করে তোলার জন্য সারা চীন ক্রীড়া ফেডারেশনের একটি সদর দপ্তর আছে বেজিংএ। সারা দেশে এই ফেডারেশনের শাখা আছে।

ট্রাক-ফিল্ড, সাঁতার, জিমনাষ্টিক, বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভারোত্তলন, সাইক্লিং, জলক্রীড়া, কুস্তি ইত্যাদি বিভাগীয় খেলাধুলোর উৎকর্ষ সাধন ও এগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ৩০টি জাতীয় সংস্থা আছে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে ৮টি বৃহৎ গণ-শরীরচর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বেজিং, তিয়ানজিন, উহান, সেনিয়াং, জিয়ান, চেংদু, সাংহাই ও গুয়ানঝেউতে এই কেন্দ্রগুলির অবস্থান।

খেলাধুলোর জন্য

বড় ও মাঝারি ধরনের শহরগুলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ সরঞ্জামসহ ষ্টেডিয়াম ও জিমনাশিয়াম তৈরী করা হয়েছে। বৃহদাকার ষ্টেডিয়ামগুলির মধ্যে বেজিং ওয়ার্কার্স ষ্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা এক লক্ষ। মাঝারি ধরনের ষ্টেডিয়ামগুলিতে ১৮,০০০ দর্শকের আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন বেজিং ক্যাপিটাল ষ্টেডিয়াম, সাংহাই ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া বেজিং-এ খেলাধুলো সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি বিশালকায় গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

খেলাধুলোকে গণমুখী করে তোলো

খেলাধুলোকে গণমুখী করে তোলায় চীনের আগ্রহের সীমা নেই। অন্যদিকে খেলাধুলোয় গণ-অংশগ্রহণই হলো আজকের চীনের বৈশিষ্ট্য। চীনের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই হ'ল শিশু ও যুব। এদের মধ্যে খেলাধুলোর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কলেজে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি করে পিরিয়ডে শরীর-শিক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছে।

সারাদেশব্যাপী শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় শরীর চর্চা ও ক্রীড়া কমিশন কতকগুলি মান নির্ধারণ করেছেন। মান অনুযায়ী বয়সভেদে শিশু, তরুণ ও যুবকদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। শিশু বিভাগ ১০ থেকে ১২। জুনিয়র (১) বিভাগ ১৩ থেকে ১৫। জুনিয়র (২) বিভাগ ১৬ থেকে ১৭। সিনিয়র বিভাগ ১৮ থেকে ৩০। সফল অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রীয় সার্টিফিকেট ও ব্যাজ দেওয়া হয়।

বলের খেলা

টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল ও ভলিবল হলো চীনে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কেবলমাত্র জিলিন প্রদেশেই ১০ হাজার ফুটবল টীম রয়েছে আর তাদের অধীনে রয়েছে ১,১০০ ফুটবল মাঠ। আবার একইভাবে গুয়াংদর প্রদেশ "ভলিবল খেলোয়াড়দের বাসগৃহ" বলে খ্যাত। এখানে কয়েক হাজার ভলিবল টীম রয়েছে। এখানে ভলিবল খেলোয়াড়দের নিজেদের তৈরী করা কোর্টের সংখ্যাই হলো ২,১০০টি।

আর একটি জনপ্রিয় খেলা

সাঁতার চীনে খুবই জনপ্রিয়। ১৯৭৮ সালে শীতকালীন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১ লক্ষ সন্তরণবিদ্ অংশগ্রহণ করে।

ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় ক্রীড়া

উরসু একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি সামরিক ট্রেনিং-এর সাথে বেশ কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রদেশে সেই সমস্ত প্রদেশবাসীর নিজস্ব কিছু কিছু প্রাচীন জনপ্রিয় খেলা আছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই খেলাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হলোঃ অন্তর্মোঙ্গোলিয়ার মল্লক্রীড়া, অশ্বচালনা ও তীর নিক্ষেপ। জিনাঞ্জিয়া, তিব্বত, কুইনঘাই-এ অশ্বচালনা। ইয়ানথিয়ান ও জিহুযাংবান্নায় যথাক্রমে সাঁতার ও ড্রাগন নৌকা দৌড় ইত্যাদি।

অতীতে খেলাধুলোর মান ছিলো অত্যন্ত নীচুতে। সেখান থেকে শুরু করে……

এছাড়া অতিপ্রাচীন "গো" এবং "দাবা"—সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

খেলায় গণঅংশগ্রহণ খেলার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পুরাতন চীনে ক্রীড়ার মান ছিলো অত্যন্ত নীচু। কিছু কিছু খেলার প্রচলনই ছিলোনা চীনে। এই অবস্থা থেকে শুরু।

১৯৩২ সালের দশম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র একজন। ১৯৩৬ সালে একাদশ ওলিম্পিকে চীনের পক্ষে একজন মাত্র মহিলা প্রতিযোগী ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করেন।

খেলাধুলোয় সন্দেহাতীত অগ্রগতি

১৯৪৯-এ চীন সাধারণতন্ত্রের জন্ম ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করলো। এ সময় থেকেই চীনের ক্রীড়াবিদ্‌রা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন ও বিশ্বখেতাব অর্জন করতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে চীনের প্রতিযোগী ভারোত্তলন-এ ব্যান্টামওয়েট বিভাগে ক্লিন ও জার্কে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ একই প্রতিযোগী পরবর্তী সময়ে ভারোত্তলন-এর দুটি বিভাগেই—ব্যান্টামওয়েট ও ফেদার-ওয়েট-এ—ক্লিন ও জার্কে নয় নয়বার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চীনা ভারোত্তলকরা ৯টি বিভাগে ১৯টি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

জেন ফেনগুওই চীনের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী যিনি ১৯৫৭ সালে উচ্চ লম্ফনে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

১৯৫৯ সালে, ২৫তম বিশ্ব টেবিল টেনিসে চীন সর্বপ্রথম পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে খেতাব অর্জন করে। তার পরবর্তী সময়ে টেবিল টেনিসে চীনের জয়যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিভাগেই।

১৯৭৮ সালে, ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান গেমসে চীনা অ্যাথলেটরা ৫৬টি সোনার পদক জয় করেন। অবশ্যই এই সংখ্যাটি পূর্ববর্তী ওলিম্পিকে প্রাপ্ত পদকের চেয়ে ২৩টি বেশি।

এছাড়া জিমন্যাস্টিক, ডাইভিং, ফেন্সিং, বন্দুক ছোঁড়া, ট্রাক ও ফিল্ড, ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবলে চমৎকার ফলাফল ক্রীড়াজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খেলাধুলোয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ও চীনের দ্রুত সাফল্যের কারণ অবশ্যই ধনবাদী দুনিয়ার তুলনায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর সমাজ-ব্যবস্থা। খেলাধুলার ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ, গণ-অংশগ্রহণ ও গণ-কার্যক্রমের মধ্যেই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠিটি।

বিভাগীয় সংবাদ

২৪-পরগণা ঃ

বারাসাত ব্লক যুব-করণ ২নং-এর উদ্যোগে ৩০শে আগস্ট, ১৯৮০ তারিখে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো 'সূর্যগ্রহণ, ১৯৮০'। এই আলোচনাচক্রে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে এই আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জয়দীপ চৌধুরী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী শ্যামলী ভদ্র এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম এ. পি. সি. বিদ্যায়তনের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান পুলককান্তি মিত্র। মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অলকা পাল পুরস্কার বিতরণ করেন।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১১টি বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করে। ৬ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীহৃষিকেশ মাইতি, পুরস্কার বিতরণ করেন কাকদ্বীপ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীতারাশংকর মাইতি। প্রধান অতিথি ছিলেন সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

নদীয়া ঃ

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—২২শে আগস্ট, বগুলো। হাঁসখালি যুব তথ্যকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। তিনি তাঁর অভিভাষণে বললেনঃ হাঁসখালি ব্লক যুব-করণের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগমন স্থানীয় যুবসমাজে ক্রমবর্ধিত, প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হচ্ছে। আমরা এর বৃহত্তর সাফল্য কামনা করি।



গত ২২শে আগস্ট হাঁসখালি ব্লক যুব তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। এই অনুষ্ঠানে তিনি বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্রের জনৈকা শিক্ষার্থিনীর হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ঐদিন ১৯৭৯-৮০ সালের বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে টেলারিং ও রেডিও শাখায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংসালিপি দিয়ে সম্বর্ধিত করেন শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। মোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংসালিপি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ, বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (কলিকাতা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় গত ৬.৯.৮০ তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 'ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা'-১৯৮০ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। শক্তিনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মহুয়া চ্যাটার্জী, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র তন্ময় রায় এবং কৃষ্ণনগর লেডী কারমাইকেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী করবী বসাক যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই ৩ জন বিজয়ী প্রতিযোগী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর '৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

ঐ দিনের অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুবেশচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রানাঘাট-২ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের পরিচালনায় ১১ই আগস্ট সোমবার ১৯৮০ রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ে ব্লক যুব 'তথ্যকেন্দ্রে'র উদ্বোধন করা হয়। তথ্যকেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান, ক্রীড়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও কর্ম-সংস্থানসমন্বিত প্রায় একশত পুস্তক-পুস্তিকা এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোন এক অনুরাগীর হাতে পুস্তক তুলে দিয়ে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রানাঘাট ২নং ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রানাঘাট মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্বোধক মহাশয় তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপস্থিত শ্রোতৃ-

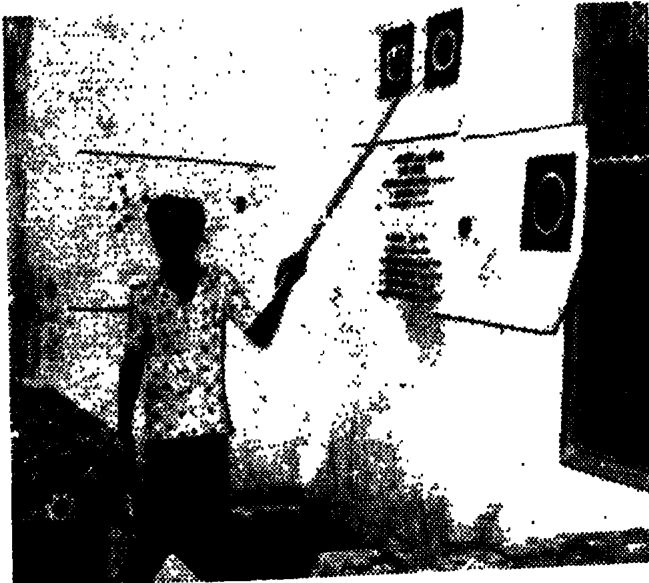
মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যুব সংস্থা, বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত প্রতিনিধির তরফ থেকে প্রায় ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই মর্মে আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে, নেহরু যুবক কেন্দ্র (বর্ধমান) ও বিড়লা কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ সহযোগিতায় এবং রানাঘাট-২ ব্লক যুব-করণের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গত ৪ঠা আগস্ট বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সূর্যগ্রহণ-৮০। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

পশ্চিম দিনাজপুরঃ

রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণ—বিগত বছরগুলির মত এ বছরও যুব-কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ও কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার উদ্যোগে বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে রায়গঞ্জ মোহনবাটী হাই স্কুলে রায়গঞ্জ ব্লক লেভেল ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল—সূর্যগ্রহণ-১৯৮০। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন মোহনবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালিপদ সরকার। এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যথাক্রমে সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, অমিয় ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের কৃতী ছাত্রদের নাম নীচে উল্লেখ করা হলঃ পার্থ ঘোষ, করোনেশন হাই স্কুল—১ম স্থান। পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র—২য় স্থান। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য় স্থান। মিলন মুখার্জী, রামপুর এস. সি. হাই স্কুল—সান্ত্বনা পুরস্কার। তপন ব্রহ্ম, মহারাজা জগদীশনাথ হাই স্কুল—সান্ত্বনা পুরস্কার। অনিমেষ সাহা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—সান্ত্বনা পুরস্কার।



রায়গঞ্জ ব্লক ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে বক্তব্য রাখছে শ্রীমান অসিত দাস

উপরোক্ত প্রথম তিন জন ছাত্র জেলা বিজ্ঞান আলো অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

যুবকল্যাণ বিভাগ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে ও রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ব্যবস্থাপনায় 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্র' অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১৩.৯.৮০ তারিখে রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী মোট ২১ জন ছাত্র এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ও কৃতী ছাত্রদের হাতে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রীসত্যব্রত ঘোষ। প্রতিযোগিতার কৃতী ছাত্রদের নাম নিম্নরূপঃ পার্থ ঘোষ, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল—১ম। জয়ন্তকুমার সরকার, পার্বতীসুন্দরী (কালিয়াগঞ্জ) স্কুল—২য়। পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, এস. ডি. পি. ইউ বিদ্যাচক্র, রায়গঞ্জ—৩য়। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য়। সৌম্যকান্তি গুহ, সরলাসুন্দরী স্কুল, কালিয়াগঞ্জ—৪র্থ। বিশ্বজিৎ দাস, ইসলামপুর হাই স্কুল—৫ম। তাপস কুণ্ডু, হিলি রামনাথ হাই স্কুল-৬ষ্ঠ।



পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান পার্থ ঘোষ পুরস্কার গ্রহণ করছে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়ের হাত থেকে

উপরোক্ত ছাত্রদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীরা রাজ্য ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭.৯.৮০ তারিখে কলকাতায়। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপকগণ ডঃ সুপ্রকাশ আচার্য, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়) এবং শ্রীধ্রুবদেব-নারায়ণ সিং (বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়)।

কোচবিহার ঃ

দিনহাটা ব্লক যুব-করণ—এই বৎসর দিনহাটা ব্লক যুব-করণের পক্ষ থেকে ২৫টি গ্রামীণ ক্লাবকে খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জাম—ফুটবল, ভলিবল, পিটিস্যু, জার্সি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি এই অফিসের পক্ষ থেকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয় ওকড়াবাড়ী অঞ্চলে। এই শিবিরেও ৩০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি নিগমনগরে এই যুব-করণের উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয় একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এতে ৮টি গ্রামীণ ফুটবল সংস্থা অংশগ্রহণ করে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই করণের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ১টি ট্রাক্টর, ৪টি মাইকের দোকান এবং একটি স্টেশনারী দোকানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র গত ৬ই সেপ্টেম্বর এই যুব-করণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমুকুলচন্দ্র দেবনাথ, সভাপতি, দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তম সাহা, সোনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নীলাম্বর সরকার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে অতীশ রায়, নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়। এই তিন জন এর পর জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করবে।

পুরুলিয়া ঃ

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব-করণ—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বাগমুণ্ডি ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে "সূর্যগ্রহণ-১৯৮০"—এই বিষয়ের উপর বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতামূলক এই আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিল স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করতে এই ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন আদিবাসী অধ্যুষিত অনুন্নত এলাকায় এই প্রথম। সেমিনারে আগ্রহী শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। চার জন সফল প্রতিযোগীকে অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কারস্বরূপ বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় করমহাপাত্র। বিজ্ঞান আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

দার্জিলিং ঃ

কার্শিয়াং ও মিরিক ব্লক যুব-করণ—গত ৩০.৮.৮০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় কার্শিয়াং ও মিরিক ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় কার্শিয়াং পুষ্পরাণী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেষণের জন্য এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিলো "১৯৮০ সালের সূর্যগ্রহণ"। এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলের বিজ্ঞানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আলোচনাচক্রে প্রথম হয় কার্শিয়াং রামকৃষ্ণ হাই স্কুল ফর গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী কুমারী কবিতা লামা, দ্বিতীয় হয় সেন্ট যোসেফ গার্লস্ হাই স্কুলের ছাত্রী কুমারী পেমা দুমা দুকপা, তৃতীয় হয় পুষ্পরানী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র বালীকুমার দাস। এছাড়া আরো দুজনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম তিন জন জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কার্শিয়াং ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রী এন. জি. দুকপা ও প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে পুষ্পরানী মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী এ. কে গুপ্ত ও স্থানীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী বি. পি. গুরুং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান।

মিরিক ব্লকের যুব আধিকারিক ও কার্শিয়াং ব্লকের ভারপ্রাপ্ত যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান জানান যে, চলতি বৎসরের জন্য গত ২৭শে আগস্ট কার্শিয়াং ব্লকের ২৫টি ক্লাবকে মোট ছয় হাজার টাকা ও মিরিক ব্লকের মোট ১৬টি যুব সংস্থাকে ছয় হাজার টাকা হিসাবে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কার্শিয়াং ব্লকের আরো ১৯টি ক্লাবকে পাঁচ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জামাদি অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং মিরিক ব্লকের যুব সংস্থাগুলির জন্য পাঁচ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জামাদি যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে। এই সমস্ত আর্থিক অনুদান লাভ করায় যুব সংস্থাগুলি খেলাধুলোর প্রতি নতুনভাবে উৎসাহিত হয়।

মালদহ ঃ

পুরাতন মালদহ ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা—গত ৩০শে আগস্ট ১৯৮০ শনিবার মঙ্গলবাড়ী জি. কে. জুনিয়ার বিদ্যালয়ে যুবকল্যাণ বিভাগ ও বি-আই-টি-এম'এর যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদহ ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ব্লকের ৫টি বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে স্থানীয় বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদিবোন মুখার্জী। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কাজল সরকার, সূর্যকান্ত বর্মণ ও রমেন ব্যানার্জী মহাশয়।

পুরস্কার বিতরণী সভায় শ্রীচৌধুরী বলেন এই রকম প্রতিযোগিতার ফলে গ্রাম-বাংলার মানুষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, এবং শ্রীদিবোন মুখার্জী বি-ডি-ও মহাশয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন তাঁরা যেন প্রতি বৎসর ছাত্রদের এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। সর্বশেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীচৌধুরী মহাশয়।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংস্থা, কলিকাতা, যৌথ উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১০.৯.৭৯ তারিখ বুধবার বেলা ২টায় একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'সূর্যগ্রহণ ১৯৮০'। হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা রায় এবং পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমলয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅবনীকুমার মণ্ডল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমলয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় এবং যুব-করণের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

যুবমানস

এজেন্সি নিতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হলে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।



মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান আলোচনা চক্র—'৮০-তে প্রথম স্থানাধিকারী মেরী ইম্যাকুলেট স্কুলের ছাত্র শ্রীমান সত্যজিৎ সেনকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। পুরস্কার বিতরণ করেন কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অপরাজিতা দাশগুপ্তা।